# আমাদের গান্ধিজী

শ্রীধীরেন্দ্র লাল ধর

প্রচ্ছদ :
শ্রীআশু বন্দ্যোপাধ্যায়

মুদ্রাকর :
শ্রীবিভূতিভূষণ পাল
দত্ত প্রিন্টিং ওয়ার্কস
বাগমারী রোড
কলিকাতা

চিত্র মুদ্রন :
নিউ গয়া আর্ট প্রেস

প্রকাশক :
শ্রীপ্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক
ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানী
৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা ১২

প্রথম সংস্করণ
গান্ধী-জন্মতিথি

আশীর্বাদ

মো. কং. গান্ধী

শ্রোতা-পদ-রেণু করো মস্তক-ভূষণ।
তোমরা এ অমৃত নিলে সফল হবে শ্রম ॥

—কবিরাজ গোস্বামী

এই সংস্করণের বিক্রয়মূল্য থেকে এক হাজার টাকা বাংলার উপেক্ষিত

# গান্ধী-মহারাজ

গান্ধী মহারাজের শিষ্য
কেউ বা ধনী, কেউ বা নিঃস্ব,
এক জায়গায় আছে মোদের মিল—
গরিব মেরে ভরাই নে পেট,
ধনীর কাছে হই নে তো হেঁট,
আতঙ্কে মুখ হয় না কভু নীল।
ষণ্ডা যখন আসে তেড়ে
উঁচিয়ে ঘুষি ডাণ্ডা নেড়ে
আমরা হেসে বলি জোয়ানটাকে,
'ঐ যে তোমার চোখ-রাঙানো,
খোকাবাবুর ঘুম ভাঙানো,
ভয় না পেলে ভয় দেখাবে কাকে।'
সিধে ভাষায় বলি কথা,
স্বচ্ছ তাহার সরলতা,
ডিপ্লম্যাসির নাইকো অসুবিধে।
গারদখানার আইনটাকে
খুঁজতে হয় না কথার পাকে
জেলের দ্বারে যায় সে নিয়ে সিধে।
দলে দলে হরিণবাড়ি
চলল যারা গৃহ ছাড়ি
ঘুচল তাদের অপমানের শাপ—
চিরকালের হাতকড়ি যে
ধুলায় খসে পড়ল নিজে,

# আমাদের গান্ধিজী

আজ থেকে প্রায় সত্তর বছর আগের কথা।

সিন্ধু ও বোম্বাই প্রদেশের মাঝে যে দেশটুকু আছে সেখানে অনেকগুলি ছোট-খাটো দেশীয় রাজ্য আছে, তাদেরই মধ্যে একটীর নাম রাজকোট। রাজকোটের এক ইস্কুলে সেদিন বিশেষ থম্‌থমে ভাব,—ইনেস্‌পেকটার এসেছেন ইস্কুল দেখতে।

মাষ্টার মশাইরা ত্রস্ত, কোনো ক্লাশে কোনো ছেলের মুখে কোনো কথা নেই, হেড-মাষ্টার মশাই বারান্দা দিয়ে মাঝে মাঝে ঘুরে যাচ্ছেন, মাষ্টার মশাইরা ছেলেদেরকে বার বার বুঝিয়ে দিচ্ছেন,—ইনেস্‌পেকটার এলে কি ভাবে উঠে দাঁড়াতে হবে, প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলে কি ভাবে বলতে হবে, ইত্যাদি।

ছেলেরা দুষ্টুমি ভুলে গেছে, বুকের ভিতর টিপ্‌ টিপ্‌ করছে।

যথাসময়ে ইনেস্‌পেকটার জাইল্‌স্‌ সাহেব এসে পড়লেন। গটগট করে এসে তিনি ক্লাশে ঢুকলেন,বললেন—কোন ক্লাশ ?

—চতুর্থ শ্রেণী। এটা ইংরাজী পড়ার ঘণ্টা।

—বেশ, তোমরা নিজের নিজের খাতায় পাঁচটা ইংরাজী শব্দ লেখ দিকি। বানান ভুল করো না কিন্তু!

ছেলেরা খাতা খুলে বসে, মিষ্টার জাইল্‌স্‌ এক একটী শব্দ বলেন, ছাত্রেরা খাতায় লেখে। মাষ্টার মশাই পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখেন, কেমন লেখা হচ্ছে।

সামনের সব কজন ছেলেই ঠিক ঠিক লিখছে কিন্তু মোহনদাস যে শেষ কথাটি ভুল করে ফেললো 'কেট্‌ল্‌' ( kettle ) শব্দটীতে দুটো t আছে আর ও একটা t লিখে বসে আছে! এই একটী ছেলের একটী ভুলের জন্য, সমস্ত ক্লাশটীর অখ্যাতি হবে। মাষ্টার মশাই ছেলেটির পাশে এসে দাঁড়ালেন, কিন্তু বলে দেবার তো উপায় নেই, জুতোর ডগা দিয়ে ইসারা করলেন—পাশের ছেলের খাতা দেখে ভুলটা শুধ্‌রে নাও। কিন্তু মোহনদাস নেহাৎ ভালো মানুষ, ইসারার অর্থ সে বুঝতে পারলো না। তার ভুল বানানই ইনেস্‌পেক্টার সাহেবের সামনে তুলে ধরলো।

মোহনদাস ছাড়া আর সবাইকারই ঠিক হয়েছিল। সেজন্য জাইল্‌স্‌ সাহেব অবশ্য কিছু বললেন না। কিন্তু তিনি চলে যাবার পর মাষ্টার মশাই বললেন—তোমার মত

বোকা ছেলে আমি জীবনে দেখি নি! অতো ইসারা করলুম তবু পাশের ছেলে৷ খাতাটা দেখে শুধরে নিতে পারলে না?

আট-নয় বছরের ছেলেটী মাথা হেঁট করে বকুনি শুনলো। পাশের ছেলের খাতা দেখে টুকতে পারে নি বলে তার মনে কিন্তু এতটুকু দুঃখ হোল না; দুঃখ হোল এই ভেবে যে, যে-কথাটা আর সবাই জানে সেটা সে জানে না। সেদিন থেকে ইস্কুলের বই পড়ায় সে আরো বেশী করে মন দিল।

ছেলে মানুষ তার উপর পাঠ্য বইও অনেকগুলি।

ভাল করে পড়া করতেই দিন কেটে যায়।

নীরস বই,—পড়তে মন বসে না, তবুও পড়তে হয়, আর সব সহপাঠীদের পিছনে তো পড়ে থাকা যায় না।

সকাল সন্ধ্যা মোহনদাস কেবল পড়ার বই পড়ে।

হঠাৎ একদিন চোখে পড়লো বাবা একখানি বই কিনে এনেছেন—'শ্রবণের পিতৃভক্তি'।

দু' এক পৃষ্ঠা উল্‌টাতে উল্‌টাতে গল্পটী বেশ জমে ওঠে। পৌরাণিক কাহিনী। অন্ধ পিতামাতার একমাত্র ছেলে শ্রবণ। বয়স নেহাৎ কম, কিন্তু সাধ্যমত বাপমায়ের সেবার কোন ত্রুটি করে না। সেই ছেলে যখন মারা যায় তখন তার বাপ-মায়ের দুঃখে চোখে আর জল রাখা যায় না। বইখানি শেষ করে বালক মোহনদাস কেঁদে ফেলে। শ্রবণের মৃত্যুদৃশ্যটা চোখের সামনে যেন ভেসে ওঠে।

দিন কয়েক পরে এক চিত্রপ্রদর্শকের দল ঘুরতে ঘুরতে রাজকোটে এলো; ম্যাজিক-লণ্ঠনে ছবি দেখিয়ে তারা পয়সা রোজগার করে। ছেলেমেয়ের কাছে তখনকার দিনে অমন মজার ব্যাপার আর কিছু ছিল না। সবাই হৈ-চৈ করে ছুটলো তাদের ছবি দেখতে।

মোহনদাসও একদিন তাদের ছবি দেখলো।

পৌরাণিক কত গল্পের কত ছবি তারা দেখালো, তার মধ্যে শ্রবণের পিতৃভক্তির কয়েকখানি ছবিও ছিল। সদ্য-পড়া গল্পটি তখনও তার চোখের সামনে ভাসছে, বালকের মনের কল্পনা সেই ছবিগুলির মধ্যে যেন প্রাণ খুঁজে পেল, বালক তন্ময় হয়ে গেল। একখানি ছবিতে দেখলো, শ্রবণ কাঁধে একটি বাঁক নিয়েছে, সেই বাঁকের দুধারে দুই ঝোলায় অন্ধ বাপ-মাকে বসিয়ে তীর্থ-ভ্রমণে বেরিয়েছে, ছবিখানি মোহনদাসের

ভারী ভালো লাগলো। তারপরেই এলো মৃত্যুদৃশ্য, চোখের জলে মোহনদাসের বুক ভেসে গেল।

তারপর কতদিন গেল। শ্রবণকে বালক ভুলতে পারলো না, পিতৃভক্তির কথা উঠলেই বালক অন্যমনস্ক হয়ে যায়, পড়ার বইয়ের পাতায় উপর ভেসে ওঠে শ্রবণের মুখ, কানে এসে বাজে শ্রবণের বাপ-মায়ের করুণ বিলাপ। বাবা একটা কনসার্টিনা কিনে দিয়েছিলেন সেইটি নিয়ে কখনো কখনো একা বসে বালক বাজাতো সেই করুণ বিলাপের সুর।

ছোট নগরটির বুকে একদিন সাড়া পড়ে গেল,—এক যাত্রার দল এসেছে; গীতাভিনয় হবে!

তখনকার দিনে যাত্রা হওয়াটা মোটেই সাধারণ ব্যাপার নয়! নগর-শুদ্ধ লোক ভেঙে পড়লো যাত্রার আসরে।

বাড়ীর লোকদের সঙ্গে বালক মোহনদাস গেল দেখতে। কোথা দিয়ে কখন যে রাত কেটে গেল টের পেল না। হরিশ্চন্দ্রের নিষ্ঠা, রোহিতাশ্বের মৃত্যু, শৈব্যার দুঃখ তার মনকে আচ্ছন্ন করে ফেলছিল, কতবার যে সে চোখ মুচেছে তার হিসাব নেই। যাত্রা যখন ভাঙলো তখনও তার চোখের কোলে অশ্রুর ছাপ। উষার আলোয় যাত্রার আসর থেকে সে যখন উঠে এলো তখন শুধু একটিমাত্র অনুভূতি তার মনে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে—শুধু একটী কথার জন্য হরিশ্চন্দ্র কত দুঃখ পেল, তবু সত্য থেকে টললো না। রাজ্য, টাকা-পয়সা, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য সবের চেয়ে সত্য বড়। তারও যদি এমন একটা রাজ্য থাকতো তাহলে সেও একবার হরিশ্চন্দ্র হবার চেষ্টা করতো।

রামায়ণে শোনা আর একটি গল্প বালক মোহনদাসের মনে দাগ কাটে, হরিশ্চন্দ্রের মত যাঁকে চণ্ডাল সাজতে হয়নি, সহজ সত্যকে যিনি সরলভাবে প্রকাশ করেছিলেন, অন্যায়কে অন্যায় বলতে তাঁর বাধে নি, কোন শাস্তি তাঁকে নত করতে পারে নি—সে ভক্ত প্রহ্লাদ।

আর রাজা রামচন্দ্র! পিতার সত্যপালনের জন্য চৌদ্দ বছর বনে যেতে দ্বিধা করলেন না! যেদিন রাজা হবেন সেইদিনই বনে চলে গেলেন। সত্যপালন তাহলে রাজা হওয়ার চেয়ে বড়!

বালক মোহনদাসের মনে সত্য-অনুরাগের উন্মেষ ঘটলো সেইদিন থেকে।

সত্যনিষ্ঠা তার বাবারও তো কম নেই। অন্যায়ের প্রতিবাদ করে জেলে যেতেও তিনি ভয় পান নি।

# আমাদের গান্ধিজী

পলিটিক্যাল এজেন্টের এক কর্মচারী রাজকোটের রাজা ঠা[illegible]হেবকে অপমান করেছিল। মোহনদাসের বাবা করমচাঁদ তখন ছিলেন রাজকো[illegible] দেওয়ান, তিনি লোকটিকে তখনই রীতিমত ধমকে দিলেন। লোকটা [illegible] ফিরে গিয়ে পলিটিক্যাল এজেন্টকে কি বোঝালো কে জানে, এজেন্ট হুকুম [illegible] দেওয়ানেরই অন্যায় হয়েছে, তাঁকেই মাপ চাইতে হবে!

কাবা গান্ধী ছিলেন ভারী তেজী লোক, নির্ভয়ে তিনি উত্তর দিলেন—কখনো না। আমি কোন অন্যায় করিনি।

দেশীয় রাজ্যের উপর পলিটিক্যাল এজেন্টের ক্ষমতা অসীম, রাজকোটের দেওয়ানকে তিনি জেলে পাঠাবার ব্যবস্থা করলেন। কাবা গান্ধী জেলে গেলেন তবু মাপ চাইলেন না।

তাকেও ঠিক তার বাবার মত হতে হবে—অন্যায়কে স্বীকার করা চলবে না। জীবনে কখনো অন্যায়ের কাছে মাথা নোয়াবেন না!

মা সেবার প্রতিজ্ঞা করলেন সূর্য্যদর্শন না করে তিনি খাবেন না। বর্ষাকাল, এইমাত্র সূর্য্য দেখা গেল, আবার এখনি মেঘে ঢাকা পড়ে গেল। খাবার সময় আকাশের পানে তাকিয়ে তারা বসে আছে—সূর্য্য একবার দেখা গেলেই মাকে গিয়ে খবর দেবে। সারাটা দুপুর বসে থেকে থেকে হয়তো এক সময় সূর্য্য দেখা গেল, ছুটে গিয়ে মাকে ডেকে আনতে আনতে আবার মেঘের আড়ালে ঢাকা পড়ে গেল, সন্ধ্যা অবধি আর সূর্য্য দেখা গেল না, সারা দিন মায়েরও খাওয়া হোল না।

পর পর অমন হয়তো তিনদিন কেটে গেল। মেঘে মেঘে আকাশ অন্ধকার হয়ে আছে। মাকেও তিনদিন উপবাসে থাকতে হোল।

এও এক ধরণের সত্য পালন! দেবতার উদ্দেশে নিজের চিত্তশুদ্ধি।

বিকাল বেলা মায়ের সঙ্গে মোহনদাস কোন কোন দিন যায় বিষ্ণুমন্দিরে, কোন দিন বা বাবার হাত ধরে যায় বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে। সেখানে লাধা মহারাজ নিত্য সন্ধ্যায় তুলসীদাসী রামায়ণ পাঠ করেন, তাঁর মিষ্টি গলা গানের সুরের মত ধ্বনিত হয়:

রঘুপতি রাঘব রাজারাম
পতিত পাবন সীতারাম...

পিতার পাশে বসে বসে সে রামায়ণ পাঠ শো[illegible] বালক বোঝে না। সুমিষ্ট কণ্ঠ তার মনকে প্রভাবিত করে রাখে। [illegible] মহারাজের মুখের পানে সে

তাকিয়ে থাকে : সুন্দর সুপুরুষ বায়বহী, ছেলেবেলায় নাকি এঁর কুষ্ঠ হয়েছিল। হাত পা ক্ষত হচ্ছে, রস পড়ছে, রক্ত পড়ছে, আত্মীয় বন্ধুরা ঘৃণায় সরে যাচ্ছে। ডাক্তারদের অসাধ্য এ রোগ একবার ধরলে আর রক্ষা নেই। কত লোক কত কথা বললো, লাধা মহারাজ কিন্তু এতটুকু বিচলিত হলেন না। তিনি ছিলেন রামজীর ভক্ত। বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে এসে ঘায়ের উপর প্রসাদী বেলপাতা লাগান আর রাম নাম জপ করেন। বেলপাতার মধ্যে কি ছিল কে জানে, ধীরে ধীরে ঘা শুকাতে লাগলো, লাধা মহারাজের কুষ্ঠ সেরে গেল। কুষ্ঠের ক্ষতচিহ্নগুলি পর্যন্ত নিশ্চিহ্ন হয়ে মিলিয়ে গেল তাঁর দেহ থেকে। তাঁর যে কোন দিন কুষ্ঠ হয়েছিল এখন আর তা বলে হয় না।

লাধা মহারাজের মুখের পানে তাকিয়ে মোহনদাস সেই সব কথাই ভাবে। বাড়ী ফিরে ধাত্রী রম্ভা দাসীর কাছে কথা তুললে তিনি বললেন—রাম নাম জপ করলে অমনি হয়। দেবতার নামের কাছে কি আর ডাক্তার বদ্যি বলে কিছু আছে? অসুখ বিসুখ কি, রামনাম করলে ভূত প্রেত শুদ্ধ পালায়।

ভূত প্রেতের ভয় মোহনদাসের খুব বেশী, সময় অসময় ভয় পেলেই সে রামনাম জপতে সুরু করে।

পাঠশালার পড়া শেষ করে মোহনদাস হাই-স্কুলে ভর্ত্তি হলেন।

ভাল ছেলে : এক বছর পুরস্কার পেলেন, দু'বছর বৃত্তি পেলেন, দু'মাসের মধ্যে এক বছরের পাঠ শেষ করে ডবল প্রমোশন পেলেন একবার।

কিন্তু অমন ভাল ছেলেরও মুস্কিল হোল, জ্যামিতি আর সংস্কৃত নিয়ে।

জ্যামিতি পড়ানো হয় ইংরাজীতে, ক্লাশে মাষ্টার মশাই তো দিব্যি বুঝিয়ে দিয়ে যান, তখন বুঝতে কোন কষ্ট হয় না, কিন্তু নিজে পড়ার সময়েই যত গোলমাল, সবই যেন ঘুলিয়ে যায়। তার উপর ক্লাসে পড়া দেবার সময় বলতে হয় ইংরাজীতে। আগাগোড়া মুখস্থ না করে উপায় নেই। একটির পর একটি প্রতিজ্ঞা পার হয়, [illegible]হনদাস ভাবেন কত মুখস্থ করতে হবে, শেষ অবধি কি সমস্ত বইখানিই [illegible] নাকি। তাবলে একেবারে আশাও ছাড়েন না, যতটা সম্ভব [illegible] করেন।

ত্রয়োদশ [illegible] মাথা খুলে যায়, দেখেন অতি সাধারণ যুক্তি দেওয়া, এ তো অতি স[illegible]দিন থেকে আর তাঁকে মুখস্থ করতে হয় না, জ্যামিতি জলের মত সহজ হয়ে [illegible]।

জ্যামিতির সমস্যা তো মিটলো, কিন্তু সংস্কৃত! নতুন শব্দরূপ, ধাতুরূপ, সন্ধি

সমাস,—কত মুখস্থ করবেন? তার উপর পণ্ডিতমশাই [illegible] লোক, পড়া না হলে আর রক্ষা নেই!

সংস্কৃতের বদলে ফার্সি পড়া চলে,—এতো মুখস্থ করবার হাঙ্গামা নেই, মৌলবী সাহেব বেশ ঠাণ্ডা মেজাজের লোক, পড়াও দেন কম করে।

মোহনদাস সংস্কৃত ছেড়ে ফার্সি ক্লাশে গিয়ে যোগ দিলেন।

মোহনদাস ফার্সি ক্লাশে যাচ্ছে পণ্ডিত মশাইয়ের দৃষ্টি এড়ায়নি, পণ্ডিত কৃষ্ণশঙ্কর পাণ্ডে সেদিনই মোহনদাসকে ডেকে বললেন—বাবা, তোমার বাবা দেওয়ানজী পরম বৈষ্ণব। আর সংস্কৃত আমাদের দেবভাষা, হিন্দুধর্মের যত কিছু শাস্ত্র সব সংস্কৃতেই লেখা। অমন বৈষ্ণবের সন্তান হয়ে সামান্য পরিশ্রমের ভয়ে তুমি নিজের ধর্মের ভাষাটাই ছেড়ে দেবে? যেখানে যখন কঠিন লাগবে আমাকে বলবে, আমি যদি তোমাকে না শেখাতে পারি তখন অন্য কথা! দেখনা কদিন চেষ্টা করে, তারপর ফার্সি তো আছেই!

কঠোর পণ্ডিত মশায়ের কাছে এমন স্নিগ্ধ স্নেহ মোহনদাস আশা করেন নি, বড় লজ্জা পেলেন।

পণ্ডিত মশাই বললেন—এখন গোড়ার দিকে হয়তো একটু কঠিন লাগছে, কিন্তু এর ভিতরে প্রবেশ করলে দেখবে এমন মিষ্টি ভাষা আর নেই!

পরদিন থেকে মোহনদাস আর ফার্সি ক্লাশে গেলেন না, পণ্ডিত কৃষ্ণশঙ্কর পাণ্ডের কাছে রীতিমত সংস্কৃত পড়তে সুরু করে দিলেন।

বছর তেরো বয়সে মোহনদাস বিড়ি খাওয়া সুরু করলেন। বন্ধুবান্ধবের কুসংসর্গে মিশে নয়, কিশোর চিত্তের চপলতার খেয়ালে।

কাকা সিগারেট খান,—এক মুখ ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকিয়ে পাকিয়ে উঠে মাথার উপর, তাঁরও ইচ্ছা করে তিনি অমনি করে ধোঁয়া ছাড়েন, গোলাকার ধোঁয়াগুলো ধাক্কা খায় কড়িকাঠের গায়ে। কিন্তু সিগারেট পান কোত্থেকে? সিগারেট কিনতে তো পয়সা চাই!

অন্তরঙ্গ এক বন্ধুর কাছে কথাটা পাড়তেই সে বললো—কাকাবাবু খেয়ে যে সিগারেটের টুকরাগুলো ফেলে দেন সেগুলো কুড়িয়ে নিয়ে রেখো—আমরা সেগুলো খাব!

মন্দ যুক্তি নয়, কাকাবাবুর ফেলে-দেওয়া সিগারেটের শেষটুকু নিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে ক'দিন ধূমপান চললো।

বৌদি মোহনদাসকে শিখিয়ে পড়িয়ে দেন—কোথায় কখন কেমন ব্যবহার করতে হবে।

সময়-অসময় বাড়ীর মেয়েরা ঐক্যস্বরে গান জুড়ে দেন, প্রতিবেশীদের শান্তি ভঙ্গ হচ্ছে সেদিকে তাঁদের খেয়াল থাকে না।

বাবা ও কাকার বয়স হয়ে গেছে, এইটাই তাঁদের শেষ কাজ, কাজেই ধুমধামের আর অন্ত থাকে না। বিয়ের কয়েকটা দিন যে কোথা দিয়ে কেটে যায়, মোহনদাস তা জানতেও পারেন না। হাতের কাছে খেলবার মত এক সঙ্গিনী পেয়ে মনটা খুসি হয়।

কদিন পর থেকে আবার রীতিমত পড়াশুনা সুরু হয়।

মোহনদাস সেবার সপ্তম মানে উঠেছেন।

ইস্কুলের হেডমাষ্টার ছিলেন, দোরাবজী এতুল্‌জি গিমি। ছেলেদের স্বাস্থ্যের উপর তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। তিনি নিয়ম করে দিয়েছিলেন যে উঁচু ক্লাশে যত ছেলে পড়ে সবাইকেই বিকালে খেলার মাঠে হাজির হতে হবে। হয় খেলা, না হয় ব্যায়াম—একটা কিছু না করলে শরীর মজবুত হবে না।

বিকাল চারটার সময় ইস্কুলের মাঠে ছেলেদের নাম ডাকা হয়। হাজির না থাকলে কৈফিয়ৎ দিতে হবে! কৈফিয়ৎ শুনে হেডমাষ্টার মশাই যদি সন্তুষ্ট না হন, তাহলেই জরিমানা দিতে হবে—এক আনা বা দু-আনা।

মোহনদাসের একদিন জরিমানা হয়ে গেল।

খেলা-ধূলা কি ব্যায়াম করা মোহনদাস পছন্দ করতেন না সত্যি, তা বলে মাষ্টার মশাইকে ফাঁকি দেবার ইচ্ছা তাঁর ছিল না। তবুও—

তখন মর্নিং ইস্কুল হচ্ছে, দুপুরে ইস্কুল হলে ছুটীর পর একেবারে খেলার মাঠ হয়ে আসেন, কিন্তু মর্নিং ইস্কুল হলে আবার বাড়ী থেকে যেতে হয়। সেদিন দুপুরে মেঘে মেঘে আকাশ ছেয়ে ছিল, সময়টা ঠিক বুঝতে পারেননি, ঘড়িও ছিল না, বিকালে বেরুতে দেরী হয়ে গিয়েছিল। মাঠে গিয়ে দেখেন অনেক আগেই খেলাধূলা শেষ হয়ে গেছে।

পরদিন হেডমাষ্টার মশাই তো কৈফিয়ৎ চেয়ে বসলেন।

মোহনদাস সত্য কথাই বললেন, কিন্তু গিমি সাহেব তা বিশ্বাস করলেন না, জরিমানা করে দিলেন।

দু-এক আনা জরিমানা দেওয়াটা কিছু নয়, কিন্তু হেডমাষ্টার মশাই যে তার কথা

বিশ্বাস করলেন না, তাকে মিথ্যাবাদী বলে ধরলেন এই দুঃখটাই বড় হয়ে মনে বাজলো, সারাটা দিন নিজেকে বড্ড ছোট বলে মনে হতে লাগলো। যে অন্যায় তিনি করেননি তার জন্য তাকে সাজা পেতে হবে! কেবলই কান্না পেতে লাগলো।

পরদিন মোহনদাস আবার হেডমাষ্টার মশাইকে সব কথা বললেন। গিমি সাহেব মানুষ ছিলেন ভালো, এবার আর তিনি অবিশ্বাস করলেন না, বললেন—বেশ, তুমি যখন বলছ, এবার না হয় তোমার জরিমানা মাপ করে দিলাম, কিন্তু এখন থেকে সময় ঠিক রেখে চলবে।

আর কোন দিন মোহনদাসের মাঠে যেতে দেরী হয়নি।

সেই থেকে হোল সময়ানুবর্ত্তিতার শিক্ষা!

মোহনদাস ভালো করে খেলতে পারতেন না, ভালোভাবে ব্যায়াম করতে পারতেন না, সব সময়েই কেমন যেন আড়ষ্ট হয়ে থাকতেন।

কারুর সঙ্গেই ভালো করে ভাব জমাতে পারতেন না, বন্ধু ছিল নেহাৎ কম।

একটী বন্ধু ছিল ভারী দুষ্টু,—বিড়ি খেতো, মাংস খেতো।

বড়দা বলতেন—মোহন, ওর সঙ্গে মিশো না, ও ছেলে ভালো নয়।

মা বলতেন—মোহন ওর সঙ্গে তোমার না মেশাই ভালো।

মোহন হেসে বললেন—তোমরা কিছু ভেবো না মা, কদিনের মধ্যে আমিই ওকে শুধ্‌রে দিচ্ছি, দেখো—

কিন্তু তার মন বদলাবে কি সে-ই মোহনদাসের মন বদলে দিল। বন্ধুটী প্রায়ই বলতো—দেখ ভাই, খাওয়া-দাওয়ার সঙ্গে ধর্মকর্মের কোন যোগ নেই। রীতিমত যদি মাংস খেতে না পার তাহলে শরীর মজবুত হবে না, মনের বল বাড়বে না। জান তো কবি নর্মদ বলেছেন:

দেখ ভাই, ভীমের মত ইংরাজের ছেলে
ক্ষীণ দেহী ভারতীয়ে শাসে অবহেলে
পাঁচ হাত দীর্ঘ বপু তাদের আকার
মাংসাহার একমাত্র কারণ তাহার।

বন্ধুটী বলল—দেখ ভাই, যদি ইংরাজের হাত থেকে দেশকে উদ্ধার করতে চাও, তাহলে মাংস খেয়ে আগে ওদের মত গায়ে জোর কর, তবে তো মারামারি করতে পারবে, তবে তো সাহস বাড়বে!

—মাংস খেলে সাহস বাড়বে?

—নিশ্চয়। দেখ না, সাহেবগুলোর কি সাহস!

এই সাহসের কথায় মোহনদাসের মনে আর দ্বিধা থাকে না। ভয় বেচারার সঙ্গের সাথী। আলো নিবিয়ে রাত্রে শুতে পারে না, অন্ধকার হলেই মনে হয় এখুনি বুঝি খাটের নীচে থেকে ভূত বেরুবে, হয়তো বা পাশের জানালা দিয়ে লম্বা হাত বের করে চোরে কখন গলা টিপে ধরবে, কোন এক সময় একটা সাপ এসে শুয়ে থাকবে বিছানার পাশে। মনটা ছ্যাঁৎ ছ্যাঁৎ করতে থাকে, ঘুম আর আসে না। আর মাংস খাওয়া অভ্যাস করলে, এই সব ভয় আর থাকবে না! শুধু সাহস আর সাহস!

তখনই মোহনদাস মাংস খেতে রাজী হয়ে গেলেন।

সেইদিনই বিকাল বেলা বন্ধুটী সব ব্যবস্থা করে ফেললো। নদীর ধারে নিরিবিলিতে বসে কজনে মিলে মাংস আর পাঁউরুটি খাওয়া হোল।

কিন্তু মাছ মাংস খাওয়া তো আর অভ্যাস নেই, মনের মাঝে কেমন যেন একটা অস্বস্তি বোধ হতে লাগলো, স্বপ্ন দেখলেন: ছাগলের মাংস হজম হয়নি, মরা ছাগলটা তার পেটের মধ্যে বেঁচে উঠেছে, করুণ স্বরে আর্ত্তনাদ করছে!

ঘুম ভেঙে যায়, মনটাও খারাপ হয়ে যায়, সারা রাত আর ঘুম হয় না।

কিন্তু মনের এই বিকার স্থায়ী হয় না, সাহসী হবার আকাঙ্খা দুর্নিবার হয়ে ওঠে। বন্ধুটির সঙ্গে আবার একদিন মাংস খাবার আয়োজন হয়। এবার তবে আর নদীর ধারে নয়, এবার এক বড়লোকের বাড়ীতে দিব্যি সাজানো হলঘরে ডাইনিং টেবিলে বসে মাংস-ভোজন চলে।

এবার আর প্রথমবারের মত মনে বিকার জাগে না।

বার কয়েক খেতে খেতে বেশ অভ্যাস হয়ে যায়। পাঁঠার কথা আর মনে ওঠে না, মাংসটা কেমন রান্না হোল সেই কথাই ওঠে।

মুস্কিল বাধে কিন্তু বাড়ীতে। বিকালে পেট ভরে মাংস খেলে, রাত্রে তো আর কিছু খাওয়া চলে না, বাড়ী ফিরে মোহন মাকে বলেন—আজ আর কিছু খাব না মা, ভালো খিদে হয়নি!

মায়ের কাছে এমনি মিছে কথা বলতে হয়—দু-একবার নয়, বারবার।

সে রাত্রে শুয়ে শুয়ে ভাবেন, শ্রবণের পিতৃভক্তির কথা, ভাবেন হরিশচন্দ্র কখনও মিথ্যাকে আশ্রয় করেন নি। তাঁদেরই আদর্শে তিনি নিজেকে গড়ে তুলতে চান, অথচ মায়ের সঙ্গে প্রতারণা করে চলেছেন দিনের পর দিন।

সারারাত মোহনের চোখে ঘুম আসে না। শুয়ে শুয়ে শুধুই ভাবেন। দুবছর আগের বিড়ি খাওয়ার কথাটা তার মনে জাগে, তখন তো এমন ভাবে দিনের পর

দিন বাপমায়ের কাছে মিছে কথা বলতে হয়নি, কিন্তু মাংস খাওয়ার জন্য আজ তা হচ্ছে। বিড়ি খাওয়াটা অতো সহজে ছেড়ে দিলেন, আর আজ মাংস খাওয়াটা ছাড়তে পারবেন না? অন্যায়কে জয় করতে পারবেন না?

মোহনদাস মন স্থির করে ফেললেন। পরদিনই বন্ধুটিকে জানিয়ে দিলেন—আর আমি মাংস খাব না।

এক কথায় মাংস খাওয়া বন্ধ হোল বটে, কিন্তু অতো সহজে জের মিটলো না। এই সব ব্যাপারে মেজদার ধার হয়ে গেছে প্রায় পঁচিশ টাকা, সেই ধার এখন শোধ হয় কিসে? জলপানির পয়সা জমিয়ে এতো গুলো টাকা তো কোনদিনই শোধ করা যাবে না। এদিকে হোটেলওলা প্রতিদিনই তাগিদ দিচ্ছে—টাকাটা এবার শোধ করে দাও?

মেজদার মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়ে।—কি করবেন? কি করলে দেনা শোধ হবে? বাড়ী থেকে চাইলেই তো সব জানাজানি হয়ে যাবে। তাহলে?

মেজদার হাতে একটা সোনার তাগা ছিল, ঠিক হোল তা' থেকে দরকার মত কেটে নিয়ে, বিক্রী করে, দেনা শোধ করা হবে?

দু'ভাই স্যাকরার দোকানে ছুটলেন।

তাগা কেটে ঋণ শোধ হোল।

ঋণ মুক্ত হলেন বটে কিন্তু মোহনদাস মনে শান্তি পেলেন না; তাঁর মনের মাঝে কাঁটার মত বিঁধতে লাগলো,—খুবই অন্যায় করা হয়েছে, তিনি বাপ মায়ের স্নেহের অপমান করেছেন। শ্রবণ বা হরিশচন্দ্র কখনও এমন করতেন না!

নাঃ, বাপ মায়ের কাছে কোন কিছু লুকানো ভালো নয়। বাবার কাছে সে সব কথা বলবেন। কিন্তু বাবার সামনে এতো কথা বলবেন কেমন করে? বাবা একবার মুখের পানে তাকালেই তো সব গোলমাল হয়ে যাবে! বাবা অবশ্য কোনদিনই প্রহার করেননি, এখন যে প্রহার করবেন, তাও তো মনে হয় না। তবু—

মোহনদাস এক লম্বা চিঠি লিখে ফেললেন।

শেষে লিখলেন—আমি আপনার কাছে ক্ষমা চাইছি। এমন কাজ আর কখনও করবো না। এর জন্য আপনি আমাকে যে শাস্তি দেবেন, তাই আমি মাথা পেতে নেব!

চিঠিখানি হাতে নিয়ে ভয়ে ভয়ে মোহনদাস পিতার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন।

কাবা গান্ধীর তখন অসুখ, বিছানায় শুয়েছিলেন। মোহনদাস চিঠিখানি তাঁর হাতে দিলেন।

চিঠি পেয়ে কাবা গান্ধী বিস্মিত হয়েছিলেন, পড়তে পড়তে তিনি উত্তেজিত হয়ে বিছানার উপর উঠে বসলেন। মুখের রেখায় রেখায় ফুটে উঠলো ব্যাকুলতা, ব্যাকুলতা রূপান্তরিত হোল বিরক্তি ও ক্রোধে, শেষে তিনি যেন সান্ত্বনা খুঁজে পেলেন। তৃপ্তিতে স্নিগ্ধ হয়ে উঠলো তাঁর মুখ, একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললেন, চোখের কোলে জল টলমল করে উঠলো। একটি কথাও তিনি উচ্চারণ করলেন না, চিঠিখানি ছিঁড়ে ফেললেন।

পিতাকে মোহনদাস কোনদিন এমন রূপে দেখেননি। ক্রোধের কোন কারণ ঘটলে উত্তেজনায় যে মানুষটী মাটীতে মাথা ঠুকে কপাল ফুলিয়ে ফেলেন, পুত্রের এতো বড় অপকর্মের জন্য তিনি কি বিধান দেবেন, কে জানে! সন্ত্রস্ত মনে মোহনদাস এতক্ষণ পিতার সামনে দাঁড়িয়েছিলেন। কিন্তু পিতা যখন কিছুই বললেন না, তখন মোহনদাস বুঝলেন পিতা সত্যনিষ্ঠাকে কত দূর ভালবাসেন,—ব্যক্তিগত লাভ ক্ষতির উপর তিনি সত্যকে স্থান দিয়েছেন, সেইজন্যই বোধ হয় কয়েক বছর আগে পলিটিক্যাল এজেন্টের সামনে বুক ফুলিয়ে দাঁড়াবার সাহস তাঁর হয়েছিল। শ্রদ্ধায় মোহন-দাসের মন ভরে গেল।

মোহনদাসের মনটা অস্থির হয়ে উঠেছে পিতার অসুখ ক্রমশঃ বাড়ছে।

খেলাধূলার মাঠ থেকে ছুটি নিয়েছেন, ইস্কুল থেকে ফিরেই বরাবর এসে বসেন বাবার কাছে।

রাত দশটা এগারোটা অবধি পিতার বিছানার পাশেই কাটান। কখনো মাথায় হাত বুলিয়ে দেন, কখনো পা টিপে দেন, কখনো বা হাত টেপেন।

করমচাঁদ গান্ধীর জীবনের আশা ক্রমেই ক্ষীণ হয়ে আসছে।

একদিন রাত এগারোটার সময় বেচারা মোহনদাস সবেমাত্র নিজের ঘরে এসে শুয়েছেন, এমন সময় চাকরটা ছুটে এলো—খোকাবাবু, শিগ্‌গির আসুন, কর্ত্তা কেমন করছেন!···

মোহনদাস ছুটে গেলেন। পিতা তখন বাক্‌শক্তি হারিয়ে ফেলেছেন। অল্পক্ষণ পরেই তিনি দেহত্যাগ করলেন।

শোকের প্রথম আঘাতে কিশোর মোহনদাস মুহ্যমান হয়ে পড়লেন। কারণে-অকারণে মনে উঠতে লাগলো কত ছোট ছোট ঘটনা, কত টুকরো টুকরো কথা।

মনে পড়লো পোরবন্দরে পিতার হাত ধরে বিষ্ণু-মন্দিরে ও রামজী-মন্দিরে বেড়ানো। বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে পিতার কোলের কাছটিতে বসে লাধা মহারাজের রামায়ণ পাঠ শোনা,—আরো কত কি।

কিন্তু সব কিছুই সহে যায়, মহাকাল বিস্মৃতির আবরণ টেনে দেয় মনে। ভাবাবেগ শান্ত হয়ে আসে ক্রমশঃ। ধীরে ধীরে আবার প্রাত্যহিক কাজ সুরু হয়।

বছর ছয়েক পরে মোহনদাস প্রবেশিকা পরীক্ষা দিলেন।

তখনকার দিনে সব জায়গায় পরীক্ষার কেন্দ্র ছিল না, কাথিয়াবাড়ের ছাত্রদের যেতে হোত আমেদাবাদে।

মোহনদাসকেও আমেদাবাদে আসতে হয়েছিল।

রাজকোট থেকে আমেদাবাদ প্রায় দেড়-শো মাইল পথ। এতটা পথ মোহনদাস কোন দিন একা যান নি, কিন্তু এবার যেতে হোল। অন্য সময় হলে হয়তো কেউ সঙ্গে যেত, কিন্তু এখন পয়সার বড্ড টানাটানি কাজেই—

আঠারো বছরের ছেলেটী একক যাত্রাপথে শঙ্কিত হয়ে উঠেছিলেন সত্যি, কিন্তু যেতে যখন হবেই, তখন আর ভেবে লাভ কি!

কয়েকটা দিন কোন রকমে আমেদাবাদে কাটিয়ে মোহনদাস বাড়ী ফিরলেন।

পরীক্ষা ভালই হয়েছিল, মোহনদাস ভালো ভাবেই পাশ করলেন।

এবার কলেজে পড়ার পালা।

মোহনদাস ভবনগরের শ্যামলদাস কলেজে ভর্ত্তি হোলেন।

রাজকোট থেকে ভবনগর অনেক দূর, কিন্তু কাছাকাছি আর তো কোন কলেজ নেই।

কিন্তু কলেজে পড়া বেশীদিন চলে না। পিতৃবন্ধু মাভজী দবে একদিন বলেন—কলেজে পড়ে কি হবে? চার বছর পড়ে বি-এ পাশ করে একটি ষাট টাকা মাহিনার কেরানী হ'বে তো? না হলে আরো দু'বছর পড়ে একটা উকিল হবে। তার চেয়ে মোহনকে বিলাতে পাঠিয়ে দাও, ব্যারিষ্টার হয়ে আসুক। বছর তিনেকের মধ্যেই ফিরে আসবে। হাজার চার পাঁচ টাকা খরচ হবে বটে, কিন্তু রোজগারের জন্য ভাবতে হবে না। দেওয়ানের ছেলে একবার বিলাত থেকে ঘুরে এলে কাথিয়াবাড়ের যে কোন রাজ্যে একটা দেওয়ানী জোটাতে কোন কষ্ট হবে না। ওকে এই বছরেই বিলাতে পাঠাও।

দাদা জিজ্ঞাসা করলেন—কি মোহন বিলাত যাবি?

মোহনদাস বললেন—যাবো, কিন্তু ওখানে ওকালতি না পড়ে ডাক্তারী পড়া যায় না?

দাদা বললেন—বাবার একান্ত ইচ্ছা ছিল তুমি আইন পড়। বৈষ্ণবের ছেলে ডাক্তারী পড়তে গিয়ে মড়া চিরবে এ তিনি পছন্দ করতেন না।

মাভজী বললেন—ডাক্তারী পড়লে তো আর দেওয়ানী মিলবে না। ব্যারিষ্টার হয়ে ফিরলে দেওয়ানী, কি ওই ধরণের একটা কোন বড় চাকরী মিলতে পারে, তাতে সংসারের এতোগুলো লোকের অন্ন-বস্ত্রের দুঃখ খানিকটা লাঘব হবে তো!

দাদার মনে লাগলো, সেই দিনই মায়ের কাছে কথা পাড়লেন—মোহনকে বিলাত পাঠালে কেমন হয়? মাভজী বলছিলেন…

সব শুনে মা বললেন—তোমার কাকাবাবু রয়েছেন পোরবন্দরে, তাঁকে একবার জিজ্ঞাসা করা ভালো না?

মায়ের কথা মত পরদিনই মোহনদাস পোরবন্দর যাত্রা করলেন। তখনও ওখানে রেলগাড়ী হয়নি, গরুর গাড়ীতে পাঁচ দিনের পথ, অর্ধেক পথ গাড়ীতে এসে বাকী অর্ধেক উটের পিঠে পার হলেন।

দাদা বলে দিয়েছিলেন—ঠাকুরদা ও বাবা ছিলেন পোরবন্দরের দেওয়ান, ওই রাজ্য থেকে কিছুটা সুযোগ সুবিধা পাবার দাবী আমাদের আছে। কাকাবাবুর সঙ্গে পোরবন্দরের এডমিনিষ্ট্রেটার সাহেবের সঙ্গে খুব খাতির আছে। কাকাবাবু তাঁকে ভালো করে বুঝিয়ে বললেই বিলাতে পড়ার খরচটা ওখানকার এষ্টেট থেকেই ব্যবস্থা হয়ে যেতে পারে!

কাকাবাবু কিন্তু বিলাত যাওয়াটা ঠিক পছন্দ করলেন না, বললেন—আমি কি বলবো! বিলাতে গেলেই দেখি সব ম্লেচ্ছ হয়ে যায়! তবে তোমার মা অনুমতি দিলে তুমি যেতে পার, আমি 'না' বলবো না। আর ওই এডমিনিষ্ট্রেটার সাহেবের কাছে এই বুড়ো বয়সে আমি আর তোমার জন্য ভিক্ষা চাইতে পারবো না, তুমি বরং নিজে গিয়ে তার সঙ্গে একবার দেখা কর গে, সাহেব মানুষ ভালো, একটা কিছু সুবিধা তিনি করে দেবেন।

মোহনদাস সেই দিনই সাহেবের কাছে চিঠি লিখলেন।

সাহেব জবাব দিলেন—আমার বাড়ীতে এসে আমার সঙ্গে দেখা কর। কথা হবে।

মোহনদাস সেইদিনই সাহেবের বাড়ীতে গেলেন।

নীচের অফিস-ঘরে কাজকর্ম সেরে লেলি সাহেব তখন উপরে উঠছেন, সিঁড়ির মুখে মোহনদাসকে ডেকে পাঠালেন।

বেচারা কাছে এসে দাঁড়াতে-না-দাঁড়াতেই বললেন—হ্যাঁ, তোমার কথা আমি সব শুনেছি, আগে বি-এ পাশ কর, তারপর এসো, এখন আমি তোমার জন্য কিছুই করতে পারবো না।

সাহেব গট্‌গট্‌ করে উপরে উঠে গেলেন। মোহনদাস স্তব্ধ হয়ে নীচে দাঁড়িয়ে রইলেন কিছুক্ষণ, কত আশা করে এসেছিলেন, কত কথা বলবেন বলে মনে মনে খসড়া করেছিলেন, কিন্তু একটি কথা বলারও ফুরসৎ সাহেব দিলেন না।

হতাশ হয়ে মোহনদাস রাজকোটে ফিরলেন।

মাভজী বললেন—না হয় ধার করে টাকার জোগাড় কর।

দাদা বললেন—যেভাবেই হোক্ টাকার জোগাড় আমি করবো।

মা কিন্তু তখনও দ্বিধা করছেন। একদিন কথায় কথায় বললেন—বিলাতে পড়তে যাওয়া আমার কিন্তু ভালো মনে হয় না। শুনেছি ছেলেরা সেখানে গিয়ে মদ খায়, মাংস খায়, মোহনও তো তাদের মত হয়ে আসবে!

মোহনের তখন জিদ বেড়ে গেছে, বললেন—তুমি দেখো মা, আমি কখনও সে রকম হব না।

মায়ের মন, ছেলেকে সুদূর প্রবাসে পাঠাতে সহজে সম্মতি দিতে পারেন না, বললেন—দেখি একবার বেচারজী স্বামীকে জিজ্ঞাসা করি—

বেচারজী স্বামী জৈন সন্ন্যাসী, গান্ধী-পরিবারের সঙ্গে তাঁর অনেক দিনের পরিচয়। সুখে-দুঃখে, সম্পদে-বিপদে সৎ নির্দ্দেশ পাবার জন্য সকলেই বেচারজীর মুখের পানে তাকায়। সব শুনে বেচারজী স্বামী মোহনদাসকে কাছে ডাকলেন, বললেন—মায়ের সামনে আজ তোমাকে তিনটি প্রতিজ্ঞা করতে হবে—বিলাতে গিয়ে মদ খাবে না, মাংস ছোঁবে না, আর মেম-সাহেবদের সঙ্গে বেশী মেলামেশা করবে না।

তখনই মায়ের পা ছুঁয়ে মোহনদাস প্রতিজ্ঞা করলেন, মায়ের মনে আর কোন সংশয় রইল না।

তখনকার দিনে বিলাত যাওয়া বড় সাধারণ ব্যাপার নয়। রাজকোটের হাই স্কুলে হৈ চৈ পড়ে গেল—মোহনদাস বিলাত যাচ্ছে।

ইস্কুলের ছেলেরা এক সভা করলো।

সভার মাঝে মোহনদাসের গলায় ফুলের মালা পরিয়ে দিল, অনেক ভালো ভালো কথা বললো, শুভেচ্ছা জানালো সকলেই।

সভা শেষে ধন্যবাদ জানিয়ে কিছু বলা দরকার, সেজন্য মোহনদাস তৈরী হয়েই

এসেছিলেন। দাঁড়িয়ে উঠে পকেট থেকে একখানি লেখা কাগজ বের করে পড়তে সুরু করলেন—সমবেত সহপাঠী, বন্ধু ও ভদ্রমহোদয়গণ…

এইটুকু পড়েই মোহনদাস থামলেন, একবার চোখ তুলতেই দেখেন সামনের সবাই তাকিয়ে আছে তার মুখের পানে। থর থর করে সারা দেহ কেঁপে উঠলো, মাথা ঘুরে গেল, লেখাটা আবার পড়তে গিয়ে কথা সব জড়িয়ে গেল, তোত্‌লা হয়ে গেলেন। কি যে পড়ছেন তা নিজে ছাড়া আর কেউই বোধ হয় শুনতে পেলে না। তা না থাক্, কোন রকমে কাগজের লেখাটা শেষ করেই ঝুপ করে বসে পড়লেন, একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলেন।

পরদিন মোহনদাস বোম্বাই রওনা হলেন।

তখন বর্ষাকাল। ভারত মহাসাগরে এই সময়টা ঝড়-ঝাপটার সময়। তার উপর ক'দিন আগে ঝড়ের মুখে পড়ে একখানি জাহাজ ডুবে গেছে। জানা-চেনা অনেকেই বললো—ক'দিন সবুর কর, আবহাওয়াটা একটু শান্ত হোক তখন যাবে। তাছাড়া এতটুকু ছেলে…একা একা…

কথাটা দাদার মনে লাগলো, সুযোগের প্রতীক্ষায় মোহনদাসকে এক আত্মীয়ের বাড়ীতে রেখে তিনি রাজকোটে ফিরে গেলেন।

ইতিমধ্যে বোম্বাইয়ের বেণিয়া-সমাজ একদিন মোহনদাসকে ডেকে পাঠালো, সমাজপতি শেঠজী বললেন—তুমি বিলাত যাচ্ছ বলে শুনলাম, সেখানে ওই সব কৃশ্চান-দের সঙ্গে মেলামেশা করলে জাতধর্ম্ম থাকে না, সেই জন্য আমরা তোমার বিলাত যাওয়া অনুমোদন করতে পারছি না।

মোহনদাস বললেন—মা'ও গোড়ায় ওই কথাই বলেছিলেন, আমি সেইজন্যে মায়ের কাছে প্রতিজ্ঞা করে বেরিয়েছি বিলাতে গিয়ে আমি মদ মাংস ছোঁব না।

—সে তুমি যতই বল—শেঠজী অবিশ্বাসের হাসি হাসলেন—সেখানে একবার গিয়ে পড়লে ওসব কোন প্রতিজ্ঞাই টিঁকবে না, আমি অমন অনেক দেখেছি। সেইজন্যই তোমার আত্মীয় হিসাবেই বলছি, বিলাতে যাবার কোন দরকার নেই, ওই ইচ্ছা তুমি ত্যাগ কর!

—এখন আর তা হয় না, বিলাতে যাব বলেই বাড়ী থেকে বেরিয়েছি। তাছাড়া পণ্ডিত মাভজী বলেছেন বিলাত যাওয়ার সঙ্গে ধর্ম্মের কোন সম্পর্ক নেই। সাধু বেচারজীও তো অনুমতি দিয়েছেন…

—তা তাঁরা দিন, কিন্তু স্বজাতি ও সমাজেরও তো একটা মত আছে।

—কিন্তু জাতির সঙ্গে আমার বিলাতে যাওয়ার যে কি সম্পর্ক আছে, তাতো বুঝতে পারছি না।

—এর ফলে কিন্তু তোমাকে জাতিচ্যুত হতে হবে!

—কি করবো বলুন, এখন আমি নিরুপায়!

শেঠজীর চোখদুটি লাল হয়ে উঠলো, বললেন—বেশ, তাহলে আজ থেকে তুমি জাতিচ্যুত হলে!

সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত সকলকে এটুকুও জানিয়ে দিলেন—স্বজাতি কেউ এই বিলাতযাত্রী যুবকের সঙ্গে মেলামেশা করলে, কোন ব্যাপারে মোহনদাসকে কোন রকম সাহায্য করলে তাকে পাঁচ সিকা জরিমানা দিতে হবে!

মোহনদাস কিন্তু এসবে ভয় পেলেন না। দাদাকে চিঠি লিখে জানালেন সব কথা।

দাদা জবাব দিলেন—কারুর কোন কথায় কান দিও না, যাওয়া স্থির করে যখন বাড়ী থেকে বেরিয়েছ, তখন তুমি নিশ্চয়ই যাবে!

মোহনদাসের আর কোন দুর্ভাবনা রইল না, এখন কবে জাহাজে চড়ে বসবেন সেই হোল চিন্তা।

হঠাৎ এক সঙ্গী মিলে গেল: ত্র্যাম্বক রায় মজুমদার নামে এক বাঙালী জুনাগড়ে ওকালতী করতেন, তিনি বিলাত যাচ্ছেন ব্যারিষ্টারী পড়তে।

কিন্তু তখনও মোহনদাসের টাকা এসে পৌঁছায় নি, চিঠি লিখে টাকা আনিয়ে নেবেন তারও সময় নেই। তাড়াতাড়ি এক আত্মীয়ের কাছে গিয়ে হাত পাতলেন—এখনকার মত কিছু টাকা আমাকে ধার দিন পরে দাদার কাছ থেকে চেয়ে নেবেন।

আত্মীয়টী ঘাড় পাতলো না, বললো—তোমাকে সাহায্য করে শেষে আমিও একঘরে হব?

শেষে এক বন্ধু টাকা দিল, স্যুট কিনে দিল, জাহাজের টিকিট কিনে দিল।

মোহনদাস সাগরের বুকে ভেসে পড়লেন।

জাহাজ।

মজুমদার মশাই ছাড়া আর সবাই বিদেশী। মন খুলে কারুর সঙ্গে কথা বলার উপায় নেই,—কখন ইংরাজী ভাষার কোথায় কোন্ ভুল হয়ে যায়।

মজুমদার মশাই বলেন—অমন লজ্জা পাবার কি আছে? বিদেশী ভাষা, ভুল তো হবেই, মনের ভাবটা বুঝিয়ে দিতে পারলেই হোল।

কিন্তু এই মনের কথা বোঝাবার জন্য মোহনদাস দিনরাত মনে মনে খসড়া করেন।

## খাবারের পাড়িতী

খাবার ঘরে যেতে গেলে হয় তো কারুর সঙ্গে ইংরাজীতে বেশীক্ষণ কথা বলতে হবে, সেই ভয়ে মোহনদাস খাবার ঘরে অবধি যান না। ঘরে খাবার আনিয়ে একা একা খান।

একদিন এক ইংরাজ ভদ্রলোক মোহনদাসকে জিজ্ঞাসা করে বসলেন—কি কর? কোথায় যাবে? কারুর সঙ্গে আলাপ কর না কেন? খাবার ঘরে তোমাকে দেখি না কেন? ইত্যাদি···

মোহনদাস তো কোন রকমে উত্তর দিলেন—আমি মাংস খাইনা বলেই খাবার ঘরে গিয়ে বসি না।

ইংরাজটী হেসে বললেন—একবার ইউরোপে গিয়ে পৌঁছাও, তারপর দেখা যাবে। এমনি ঠাণ্ডা যে মাংস না হলে সেখানে একদিনও চলবে না।

মোহনদাস আস্তে আস্তে উত্তর দিলেন—তেমন হলে সেখান থেকে চলে আসতে হবে। মায়ের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছি যে মাংস আমি খাব না!

—দেখা যাবে!—বলে ভদ্রলোক হাসলেন অবিশ্বাসের হাসি।

কদিন পরে জাহাজ এসে লাগলো সাউদাম্‌টন বন্দরে।

মজুমদার মশাইয়ের সঙ্গে মোহনদাস এসে উঠলেন লণ্ডনের ভিকটোরিয়া হোটেলে।

প্রকাণ্ড হোটেল, বিরাট ব্যাপার। অচেনা মানুষের ভীড় গিজগিজ করছে। অভিনব আদব কায়দা! অস্বস্তিকর পরিবেশ। প্রাণ হাঁপিয়ে উঠে। এখান থেকে কোথায় যাবেন তাই ভাবেন।

খবর পেয়ে ডাক্তার প্রাণজীবন মেহেতা এলেন দেখা করতে, বললেন—হোটেলে থেকে পড়াশুনা করার অনেক খরচ, কোন বাড়ীতে অতিথি হয়ে থাকলে খরচ অনেক কম পড়বে। সেই ব্যবস্থাই করতে হবে।

কথায় কথায় মেহেতার টুপিটা মোহনদাস হাতে তুলে নিয়েছিলেন, ছেলেমানুষের খেয়ালে টুপিটার কালো রেশমের উপরে হাত বুলাচ্ছিলেন। পালিশ-করা কালো রেশমের মসৃণ ভঙ্গীটা হাতের চাপে রুক্ষ হয়ে উঠলো, ডাক্তার মেহেতা তাড়াতাড়ি টুপিটা হাত থেকে টেনে নিলেন, বললেন—এই মাত্র বললাম কখনও কারুর জিনিষে হাত দিবে না, আর এখনই ভুলে গেলে? ভারতবর্ষের মত সহজ স্বচ্ছন্দে এখানে চলা চলবে না। জোরে কথা বললে লোকে হাসবে। পরিচয় হতে না হতেই আপনি কি করেন—কোথায় থাকেন, জিজ্ঞেস করলেই অভদ্র ভেবে লোকে পাশ

হবে। কথায় কথায় 'স্যর' 'স্যর' বললে লোকে ভাববে কারুর বাড়ীর চাকর, । আমাদের দেশের প্রাণখোলা ব্যবহারের সঙ্গে এদের কোথাও মিলবে না।

মেহেতার উপদেশ মত মোহনদাস পরদিনই হোটেল ছাড়লেন, ঘর ভাড়া করে ন জাহাজের সহযাত্রী এক সিন্ধী ভদ্রলোক।

দেড়দিন ভিকটোরিয়া হোটেলে থাকার দরুণ খরচ পড়লো তিন পাউণ্ড—প্রায় চল্লিশ টাকা। যে সব মাছমাংসের খাবার তিনি খাননি, বদলে আনতে লেছিলেন হোটেলের বিলে তারও দাম ধরা হয়েছিল।

যাক্ নতুন বাসায় তো উঠে এলেন, বেশ নিরিবিলি, কিন্তু বড় একা একা বলে মনে য়। হোটেলের ভীড়ের মধ্যে এমনভাবে নিজেকে উপলব্ধি করা যায়নি। অপরিচিত রিবেশ, অজানা পথঘাট, অচেনা সব মুখ, ভিন্ন ভাষা। মন হাঁপিয়ে উঠে, কেবলই ড়ীর কথা মনে পড়ে, মায়ের কথা মনে পড়ে। খেতে বসলেই চোখে জল আসে, ত্রে শুয়ে শুয়ে মোহনদাস কাঁদেন।

কিন্তু কাঁদতে কাঁদতে একদিন কান্না থেমে যায়, নতুন পরিবেশের সঙ্গে কিশোর । ক্রমশঃ পরিচিত হয়ে উঠে, মোহনদাস আত্মস্থ হয়ে, মন দৃঢ় করেন—যত কষ্টই াক না কেন, এখান থেকে তাঁকে মানুষ হয়ে ফিরতেই হবে, ব্যারিষ্টার হতে হবে, ার মা-ভাই-বোন তারই মুখের পানে তাকিয়ে আছেন যে!

ডাক্তার মেহেতার কিন্তু এ-বাড়ী পছন্দ হোল না। বললেন—না, এখানে থাকা চলবে না, শুধু লেখাপড়া শেখার জন্যই তো বিলাতে আসা নয়, বিলিতী আদব-কায়দাও তো শিখতে হবে!

মেহেতা সেখান থেকে মোহনদাসকে নিয়ে এলেন রিচমণ্ডে এক পরিচিত ভদ্র-লোকের বাড়ীতে।

নতুন গৃহস্বামী চমৎকার ভদ্রলোক, মোহনদাসকে তিনি দেখতেন নিজের ছোট ভাইয়ের মত। প্রথমেই তাঁর চোখে বাজলো মোহনদাসের খাওয়া-দাওয়ার বাচ-বিচার। ছোকরা যদি মাংস না খায়, তাহলে এই ঠাণ্ডার দেশে টিকবে কেমন করে?

বাড়ীর গিন্নী কি আর করেন, সকাল বিকাল যবের খুদ সিদ্ধ করে দেন, তাতে না থাকে নুন না থাকে লঙ্কা, মোহনদাস চোখ কান বুঁজে তো সেটুকু গিলে ফেলেন। সঙ্গে থাকে দু-তিন স্লাইশ রুটি আর একটু জ্যাম। জ্যাম দিয়ে রুটি খেতে মন্দ লাগে না। ইচ্ছা হয় আরো কয়েক টুকরো রুটি চেয়ে নেন, কিন্তু চাইতে লজ্জা করে।

গৃহস্বামীর চোখে কিছুই এড়ায় না, বিরক্তির সুরে একদিন তিনি বললেন—তুমি যদি আমার ভাই হতে আমি তোমাকে দেশে ফেরৎ পাঠিয়ে দিতাম, এই রকম খাওয়া দাওয়া করে তিন বছর এদেশে তুমি টিকবে কেমন করে তাই আমি ভাবি!

—কিন্তু মায়ের কাছে যে আমি প্রতিজ্ঞা করে এসেছি!

—তোমার মা কি জানেন যে এখানে এতো শীত, এমন বরফ পড়ে! যে দেশের যা খাদ্য। এদেশে মদ ও মাংস না খেলে তিন দিনে তোমার শরীর ভেঙে পড়বে। দু-একদিন তো নয়, পুরো তিনটি বছর এখানে তোমাকে থাকতে হবে। জীবনটা তো একটা গোঁয়াতুঁমি নয়!

—আপনি আমাকে মাপ করুন, আপনি যা যা বললেন সবই আমি মানি, কিন্তু মায়ের কাছে যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসেছি তার নড়চড় করতে পারবো না।

ভদ্রলোক তখনকার মত আর কিছু বললেন না। তবে এবার তিনি ভিন্ন পথ ধরলেন, একদিন বললেন—চলো, থিয়েটার দেখে আসি। পথে এক রেষ্টুরেণ্টে সান্ধ্য-আহার সেরে নিলেই হবে!

মোহনদাসের হাত ধরে তিনি গিয়ে ঢুকলেন হলবোর্ণ রেষ্টুরেণ্টে। বিরাট হোটেল, রাজকীয় জাঁকজমক, সারি সারি কত যে টেবিল, আর কত লোক যে সেখানে খাচ্ছে! বাজনা ও আলোর জৌলুষে চোখ ঝল্‌সে যায়। তারই মাঝে একটি ছোট টেবিলে মুখোমুখি বসলেন দু'জনে।

প্রথমেই এলো স্যুপ!

ভদ্রলোক বললেন—কই খাও।

মোহনদাস একটু ইতস্ততঃ করলেন, বললেন—দাঁড়ান, আগে জিজ্ঞেস করে নিই, এটা মাংসের স্যুপ কি না।

—যদি মাংসের স্যুপই হয়, কি হবে?

—খাব না।

—ব্যবহারিক শিষ্টাচারটুকুও তুমি জান না, এই হোটেলে এতো লোকের সামনে…

—কিন্তু মাংস তো আমি খাব না!

—এখানে মাংস ছাড়া তুমি আর কি পাবে? সারারাত তাহলে উপোস করে থাকগে।

—কাছেই একটা নিরামিষ রেষ্টুরেণ্ট আছে, যদি…

—বেশ, সেখানে গিয়ে খাওগে। খেয়ে এসে বাইরের ফটকে অপেক্ষা করো—

মোহনদাস উঠে পড়লেন।

বেচারার অদৃষ্টে সেদিন আহার ছিল না, গিয়ে দেখলেন নিরামিষ রেস্তোরাঁটি আগেই বন্ধ হয়ে গেছে। ফিরে এসে হলবোর্ণের কটকের সামনে পায়চারী করতে লাগলেন।

ভগবান বোধ হয় সেদিন তাঁকে পরীক্ষা করে দেখলেন।

ইংরাজ ভদ্রলোকটি কিন্তু সেদিন থেকে মাংস খাওয়া সম্পর্কে আর কোন কথাই তোলেন নি। মাঝে মাঝে শুধু উৎকণ্ঠা প্রকাশ করতেন—এই ঠাণ্ডার দেশে তুমি কি করে স্বাস্থ্য বজায় রাখবে, তাতো ভেবে পাই না!

মোহনদাস এবার ঠিক করলেন, খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে তাঁর যত দুর্ব্বলতাই থাক না কেন, বাইরের আদব কায়দায় তিনি পুরোদস্তুর সাহেব হবেন।

বোম্বাইয়ে-কেনা পোষাকগুলি বাতিল করে দিলেন।

আর্মি-নেভি ষ্টোর্স থেকে পোষাক কিনলেন, বণ্ড ষ্ট্রীট থেকে হ্যাট কিনলেন। শুধু একটা সান্ধ্য-পোষাকেরই দাম পড়লো দেড়শো টাকা, একটা টুপির দাম পড়লো চৌদ্দ টাকা।

দাদার কাছে চিঠি লিখলেন—সোণার চেন পাঠিয়ে দিন, নাহলে পকেট-ঘড়ি বুকে ঝোলাতে পারছি না।

বেশভূষা হোল, এবার প্রসাধনের পর্ব। চুলগুলো বেজায় অবাধ্য, কোনমতেই পালিশ থাকতে চায় না. প্রতিদিন আরশীর সামনে দাঁড়িয়ে অন্ততঃ দশ মিনিট মাথায় বুরুস না ঘষলে মনে স্বস্তি হয় না, তবু মনে হয় চুলগুলো যেন ঠিক থাকতে চাইছে না।

এবার কিছু নাচ শেখা দরকার। বিলিতী ভদ্রসমাজে মিশতে হলে ওটা জানতে হবে।

পঁয়তাল্লিশ টাকা খরচ করে মোহনদাস এক নাচের ক্লাসে ভর্তি হলেন।

সপ্তাহ খানেক নাচ শিখলেন, নাচবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু কিছুতেই পিয়ানোর তালে তালে পা পড়ে না, দেহের ভঙ্গিমাও ঠিক হয় না, সুরজ্ঞান না থাকলে মনে ছন্দজ্ঞান জাগে না, আগে সুরজ্ঞান দরকার। কাজেই—

পঁয়তাল্লিশ টাকা দিয়ে মোহনদাস একখানি বেহালা কিনলেন, এবং আরো কিছু টাকা খরচ করে ভর্তি হলেন এক বাজনা শেখার ইস্কুলে।

তারপর ভালো ইংরাজী জোর করে বলতে শেখার ইচ্ছায় এক বক্তৃতা-শিক্ষক

খুঁজে বের করলেন, এক গিনি ফী দিয়ে তাঁর ছাত্র হলেন। তিনি বক্তৃতা-সংগ্রহের এক বই কিনে, একটি বক্তৃতা মুখস্থ করে আসতে বললেন।

বক্তৃতা মুখস্থ করতে করতে সহসা মোহনদাসের মনে বিরক্তি জাগলো। এই ইংরাজী বক্তৃতা শিখে তাঁর হবে কি? দেশে বক্তৃতা করবেন কোথায়? সেখানে তাঁর ইংরাজী বক্তৃতা শুনবে কে, বুঝবে কে? বিলাতে তিনি তো আর চিরকাল থাকবেন না, এখানকার নাচ শিখে তাঁর লাভ কি হবে? আর বেহালা বাজনা তো দেশে ফিরে গিয়ে কোন বড় ওস্তাদের কাছেও শেখা চলতে পারে। দাদা কত কষ্ট করে দেশ থেকে টাকা পাঠাচ্ছেন, সে কি এই সব নাচ গান আর বক্তৃতা শেখার জন্য?

সেই দিনই মোহনদাস দু'খানি চিঠি লিখলেন:

বক্তৃতা-শিক্ষককে লিখলেন—আর বক্তৃতা শেখার দরকার নেই।

নৃত্য-শিক্ষককে লিখলেন—আজ থেকে নাচ শেখা বন্ধ হোল।

বেহালাটি নিয়ে নিজে গেলেন বেহালা শিক্ষয়িত্রীর কাছে, বললেন—বাজনা আর শিখবেন না, শিক্ষয়িত্রীর যদি সুবিধা হয়, তাহলে বেহালাটি তিনি যেন আর কাউকে বেচে দেন।

পয়সার অপচয় কমলো, সময়ের অপব্যবহারও আর রইল না, মোহনদাস এবার রীতিমত পড়াশুনায় মন দিলেন।

প্রথমেই মনে উঠলো রীতিমত ইংরাজী শেখার কথা।

এক বন্ধু বললেন—এখানকার ম্যাট্রিক পরীক্ষাটা দিয়ে দাও তাতে লাটিন পড়তে হবে, লাটিন ভাষাটা ভালো মত জানা থাকলে ইংরাজীটা দুরস্ত হবে।

কথাটা মোহনদাসের মনে লাগলো, ভর্তি হলেন এক প্রাইভেট ইস্কুলে।

লণ্ডনে ছ' মাস অন্তর ম্যাট্রিক পরীক্ষা হয়, তখন আর পাঁচ মাস বাকী। একেবারে সময়ের রীতিমত এক ছক কেটে নিয়ে মোহনদাস পড়াশুনা সুরু করলেন।

কিন্তু পাঁচ মাসের মধ্যে ইংরাজী ছাড়া আরো দুটি বিদেশী ভাষা—ফরাসী ও লাটিন শিখে পরীক্ষায় পাশ করা নেহাৎ সহজ কথা নয়। মোহনদাসও পারলেন না, লাটিন ভাষায় তিনি ফেল করলেন।

মনটা নেহাৎ মুষড়ে পড়লো, দাদা কত কষ্ট করে দেশ থেকে টাকা পাঠাচ্ছেন আর তিনি বিলাতে বসে তার অপচয় করছেন। একটা সামান্য পরীক্ষায় পাশ করার মত যোগ্যতাটুকুও তার নেই।

আবার পরীক্ষা দেবার জন্ত মোহনদাস তৈরী হলেন।

এবার তিনি নিজের খরচও অনেক কমিয়ে ফেললেন। মাসে খরচ হোত প্রায় পঁচিশ টাকা। এবার সেটাকে কমিয়ে আনলেন দেড়শো টাকায়। এতদিন বার ঘর আর শোবার ঘর আলাদা ছিল, দু'খানি ঘরের ভাড়াও দিতে হোত, এবার একখানি ঘর ভাড়া নিলেন পঁচিশ টাকায়। খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারেও ছুটা স্বাবলম্বী হবার চেষ্টা করলেন। একটা ষ্টোভ জোগাড় করে নিজের খাবার জেই তৈরী করতে লেগে গেলেন।—সকাল বেলা যবের খুদ সিদ্ধ আর কোকো, র সন্ধ্যাবেলা শুধু কোকো তৈরী করে নিতেন সেই ষ্টোভে। শুধু দুপুরের খাওয়াটা ইরে খেতেন আর রাত্রের জন্য রুটি কিনে আনতেন বাইরে থেকে। এতে খাবার চ দৈনিক এক টাকার বেশী পড়তো না, বার বার রেষ্টুরেণ্টে ছুটোছুটি করার য়রানি থেকেও বেঁচে গেলেন। দাদার উপর খরচার ভার অনেকটা সংক্ষেপ তে পেরেছেন ভেবে মোহনদাস স্বস্তি পেলেন, নতুন উৎসাহে সুরু করলেন াশুনা।

এবার মোহনদাস ম্যাট্রিক পাস করলেন।

ইতিমধ্যে মোহনদাস ব্যারিষ্টারী পড়াও সুরু করেছেন।

ব্যারিষ্টারী পড়া বিশেষ কঠিন কিছু নয়, বছর তিনেক লাগে পড়তে। পড়ার র খাওয়ার ব্যাপারটাই বড়। মাসে গড়-পড়তায় আটটী করে ভোজ-সভা বসে, তার মধ্যে অন্ততঃ দুটো ভোজে হাজির থাকলেই চলবে। এই সব সভায় জজেরা আসেন, ছাত্রদের সঙ্গে মোটামুটি কিছু-কিছু আলোচনা করেন। কেউ কেউ বক্তৃতা দেয়, তারপর চলে খাওয়া-দাওয়া।

বিলিতী রীতি অনুযায়ী খাদ্যের সঙ্গে মদেরও ব্যবস্থা আছে। ছোট ছোট এক একটি টেবিলের চারিপাশে চারজন করে ছাত্র বসে, প্রত্যেককে মাথা পিছু আধ বোতল করে মদ দেওয়া হয়। আহার্য্য ও মদের দাম বাবদ ছাত্রদের কাছে থেকে মাথা পিছু দু-তিন টাকা করে নেওয়া হয়। ওখানকার যে কোন একটা হোটেলে একবেলা খেতে এর দ্বিগুণ খরচা পড়ে। এই জন্যই এই সব ভোজ-সভায় ছাত্ররা সাধ্যমত কখনও কামাই করে না।

ব্যারিষ্টার হতে হলে এই ভোজ-সভায় হাজির থাকতেই হবে, মোহনদাসও এসে বসতেন, কিন্তু তিনি খেতেন না কিছুই—মাংস খাবেন না, মদ তিনি স্পর্শ করেন না। একটি টেবিলের একপাশে বসে বসে তিনি দেখতেন আর ভাবতেন—এই

মাংসাহার আর মদ্যপানের মধ্যে আইন শিক্ষার কতটুকু গুরুতত্ব নিহিত থাকতে পারে, ছাত্ররা এথেকে আইনের কি শিখছে?

লাজুক মোহনদাস চুপ করে একপাশে বসে থাকলেও দু-এক দিনেই তাঁর উপর সহপাঠিদের নজর পড়লো। সবাই মোহনদাসকে নিজের টেবিলে পাবার জন্য উৎসুক হয়ে উঠলো। মোহনদাস মদ খায় না, যে টেবিলে সে বসবে সেই টেবিলে তার ভাগের আধ বোতল মদ সেই টেবিলের আর তিনজন উপরি খেতে পারে, সেইজন্যই ছাত্রমহলে মোহনদাসের কদর বেড়ে যায়, সবাই আগে থেকে বলে রাখে—মোহনদাস কালকের ডিনারে তুমি আমাদের টেবিলে বসবে!

সেই দলে মোহনদাসের মত আরেকটি ছাত্র ছিল; সে পার্শী, সে-ও মদ মাংসের বিরোধী। ভোজ-সভায় আর সবাই খায় আর তারা দুজনে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে। এদিকে ডিনারের ফী দিতে হয় ঠিকই। শেষে আর পাঁচ জনের কথা মত দু'জনে মিলে এক দরখাস্ত করলো,—আমরা নিরামিষ খাই, আমাদের সেই মত ভোজ্য দেওয়া হোক!

দরখাস্ত মঞ্জুর-হোল, দু'জনের জন্য ফলমূল ও নিরামিষ খাদ্যের ব্যবস্থা হোল!

মোহনদাস এবার কিছু মেলামেশা সুরু করলেন।

লণ্ডনে নিরামিষ ভোজীদের এক সমিতি ছিল। তাদের একখানি সাপ্তাহিক কাগজ ছিল, মোহনদাস তাদের দলভুক্ত হয়ে পড়লেন। নিরামিষ ভোজনের পক্ষপাতী অনেক বড় বড় লোকের সঙ্গে তাঁর আলাপ-পরিচয়ও ঘটলো।

নিরামিষ ভোজী কয়েকজনকে নিয়ে মোহনদাস নিজের পাড়াতেই এক ক্লাব ক'রে বসলেন। নিজে হলেন তার সম্পাদক, সভাপতি হলেন ডাক্তার ওলড্ফীলড্ আর সহকারী হলেন স্যার এডুইন আর্নলড্।

নিরামিষ ক্লাবের একজন উৎসাহী কর্মী হলেও পাঁচজনের সামনে দাঁড়িয়ে মোহনদাস কখনও কিছু বলতে পারতেন না। দু এক বার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেই পা কাঁপে, তার পর যেই দেখেন সবাইকার দৃষ্টি এসে পড়েছে তাঁর মুখের উপর, আর মুখ দিয়ে কথা বের হয় না। যা কিছু বলার ছিল সবই কেমন যেন গোলমাল হয়ে যায়।

একবার মোহনদাস ঠিক করলেন কাগজে লিখে নিয়ে গিয়ে পড়বেন, চোখ থাকবে কাগজের উপরে, কারুরই চোখের পানে আর তাকাতে হবে না, কথার খেই হারিয়ে যাবে না, গড় গড় করে পড়ে যাবেন জলের মত।

ভেবে-চিন্তে সাজিয়ে-গুছিয়ে একটি বক্তৃতা লিখলেন—ফুলস্কেপের পুরো একটি পৃষ্ঠা।

সভার মাঝে কারুর পানে আর তাকালেন না, উঠে দাঁড়িয়ে কাগজখানি মেলে ধরলেন চোখের সামনে। তথাপি মনে হোল সবাই তাঁর মুখের পানে তাকিয়ে আছে, পা কেঁপে উঠলো, অক্ষরগুলো সব চোখের সামনে জট পাকিয়ে হিজিবিজি হয়ে গেল, পড়া আর হোল না, ঝুপ করে মোহনদাস চেয়ারে বসে পড়লেন। বন্ধু ত্র্যাম্বক রায় পাশেই ছিলেন, কাগজখানি নিয়ে তিনি পড়লেন লেখাটি।

এই দুর্বলতাটুকু জয় করতে মোহনদাসের বহু বছর লেগেছিল।

ব্যারিষ্টারী পাস করে যখন তিনি বিলাত থেকে ফিরছেন, নিরামিষী বন্ধুদের এক প্রীতি-ভোজে আপ্যায়িত করেন। বিলাতী রীতি অনুযায়ী ভোজনপর্বের আগে কিছুক্ষণ গান-বাজনা হয়, তারপর নিমন্ত্রণ-কর্তা কিছু বলেন। কি কি বলবেন অনেক আগে থেকেই মোহনদাস মনে মনে তার খসড়া করে রেখেছিলেন কিন্তু উঠে দাঁড়িয়ে একটি বাক্য শেষ করতে না করতেই তাঁর কথার খেই হারিয়ে গেল আর কিছু বলার পথ খুঁজে না পেয়ে মোহনদাস এক কথায় তাঁর ভাষণ শেষ করলেন—আপনারা যে আমার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেছেন ও এসেছেন তার জন্য আমি আপনাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি!

তাড়াতাড়ি মোহনদাস বসে পড়লেন, কিছুক্ষণ আর মুখ তুলতে পারলেন না, তাঁর অবস্থা দেখে উপস্থিত সকলের মুখে যে হাসি ফুটে উঠেছে, চোখ না তুলেই সেটুকু তিনি স্পষ্ট বুঝতে পারলেন।

ব্রাইটনের এক রেষ্টুরেণ্টে মোহনদাস একদিন খেতে গেছেন। কি খাবেন, ওয়েট্রেস্ এসে মেনুটা এগিয়ে ধরলো। মেনুটা আগাগোড়া ফরাসী ভাষায় লেখা। মোহনদাসের তখনও ভালোমত ফরাসী ভাষা শেখা হয়নি। তালিকা দেখে কোন্ খাবারটা নিরামিষ, কোন্‌টি আনতে বলবেন তা ভেবে পেলেন না; অথচ কিছু না খেয়ে তাড়াতাড়ি উঠে আসতেও পারেন না, ভাবলেন ওয়েট্রেস্‌কে একবার জিজ্ঞাসা করে নেবেন কি না।

সামনের টেবিলে এক মহিলা বসেছিলেন। তিনি মোহনদাসের এই ইতস্ততঃ ভাবটা লক্ষ্য করলেন, ব্যাপারটা বুঝে নিতে তাঁর দেরী হোল না, বললেন—আমি কি আপনাকে সাহায্য করতে পারি? মেনুটা পড়ে দোব?

মোহনদাস মৃদু হেসে মাথা নাড়লেন।

মহিলা তালিকা পড়ে মানে বুঝিয়ে দিলেন, মোহনদাস কি খাবেন, আর কি খাবেন না তা'ও বলে দিলেন। কথায় কথায় দিব্যি আলাপ জমে উঠলো, বিদায় বেলায় মহিলাটি তাঁকে নিমন্ত্রণ করে গেলেন রবিবার সন্ধ্যায় তাঁর বাড়ী যাবার জন্য।

মোহনদাস রবিবার দিন গেলেন সেই মহিলার বাড়ীতে।

মহিলা সাদরে অভ্যর্থনা জানালেন। অনেকগুলি মেয়ে ছিল সেই বাড়ীতে, তাদের সঙ্গে মোহনদাসের পরিচয় করিয়ে দিলেন। লাজুক মোহনদাস কেমন-যেন অপ্রতিভ হয়ে পড়লেন, কারুর সঙ্গেই ভালোমত আলাপ করতে পারলেন না।

বিদায়-কালে মহিলাটি আবার তাঁকে নিমন্ত্রণ করলেন পরের রবিবারের জন্য।

পর পর কয়েকটি রবিবার-সন্ধ্যা সেই বাড়ীতেই মোহনদাসের কাটলো।

বাড়ীর একটি মেয়ের সঙ্গে মোহনদাস ক্রমশঃ অন্তরঙ্গ হয়ে উঠলেন। তাদের বন্ধুত্বটা পাকা করে ফেলার জন্য ভদ্র-মহিলারও খুব উৎসাহ আছে বলে মনে হোল।

হঠাৎ একদিন মোহনদাসের মনে কেমন যেন একটা খটকা বাধলো—ভদ্র-মহিলাটি কি শেষ পর্য্যন্ত তাঁকে জামাই করতে চায় নাকি?

যত দিন যায় তত ভাবনা বাড়ে।

প্রতি রবিবারেই মোহনদাস সেই বাড়ীতে যান, কিন্তু মুখ ফুটে কাউকে কিছু বলতে পারেন না।

শেষে ঠিক করলেন চিঠি লিখে সব জানাবেন। চিঠিও লিখে ফেললেন: আপনি আমাকে ছেলের মত স্নেহ করেন, সেই স্নেহের বশেই আমার সঙ্গীহীন সুদূর প্রবাস-জীবনকে সহজ করে তোলার জন্য আপনি বাড়ীর মেয়েদের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। সেই পরিচয় আজ অন্তরঙ্গতায় এসে পৌঁচেছে। আপনি হয়তো ভাবছেন মেয়েটিকে আমি বিয়ে করবো। সেইজন্য আগেই আমি আপনাকে জানিয়ে দিতে চাই যে আমার বিয়ে হয়ে গেছে সেই ছেলেবেলায়, আমার বয়স ছিল তখন সবে মাত্র তেরো বছর। সত্য প্রকাশ করাই ভালো। আশা করি সেজন্য আপনার স্নেহ থেকে বঞ্চিত হ'ব না।······

চিঠি তো লিখলেন কিন্তু ভাষাটা মনঃপূত হোল না, ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে আবার লিখলেন। আবার ছিঁড়লেন। শেষে আবার লিখলেন। এবারকার চিঠিখানি পাঠিয়ে দিলেন।

পরদিনই মহিলার কাছ থেকে উত্তর এলো: মিথ্যা ধারণা নিয়ে মন খারাপ করো না, যথারীতি রবিবার সন্ধ্যায় তোমার নিমন্ত্রণ রইলো। তেরো-বছরে বিয়ে হওয়াটা

ভারী মজার ব্যাপার, সেই কাহিনীই সেদিন তোমার কাছে আমরা শুনবো। আসতে ভুলো না কিন্তু!

সেদিন থেকে সেই বাড়ী যেতে মোহনদাসের মনে আর কোন সঙ্কোচ রইল না।

ছেলেবেলা থেকেই মোহনদাসের খেলাধূলায় উৎসাহ কম। কোন রকম ব্যায়াম করা পছন্দ করতেন না, লম্বা লম্বা পা ফেলে বেড়িয়ে বেড়ানোটাই সবচেয়ে আরামপ্রদ বলে তাঁর মনে হোত। বিলাতেও সেই অভ্যাসটাই বজায় ছিল। ইচ্ছামত মাইলের পর মাইল ঘুরে বেড়াতেন যখন যেদিকে খুসি।

ওদেশে বিদেশী অতিথিদেরকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ীর মেয়েরা বিকালের দিকে বেড়াতে বের হয়—এই হোল রীতি। মোহনদাসও গৃহস্বামীর মেয়ের সঙ্গে বেড়াতে বেরুতেন।

তখন মোহনদাস ভেঁটনোরে থাকেন, বাড়ীর মেয়েদের সঙ্গে বেড়াতে বেরিয়েছেন। কথা বলতে বলতে বার বার মেয়েটি তাঁকে পিছনে ফেলে এগিয়ে যাচ্ছে। লম্বা লম্বা পা ফেলেও মোহনদাস তার নাগাল ধরতে পারছেন না। মেয়েটি যেন হাওয়ায় উড়ছে। অথচ বয়সে সে মোহনদাসের চেয়ে ছোট নয়, বরং বছর পাঁচেকের বড়ই হবে।

চড়াই ভেঙে মেয়েটি বরাবর একটি ছোট পাহাড়ের মাথায় এসে উঠলো। এবার সেই চূড়ো থেকে নেমে আসার পালা। মেয়েটি এক মিনিট ভাবলো না, তীরের মত এক দৌড়ে নেবে গেল। হীল উঁচু জুতো পায় দিয়ে পাহাড়ের গা বেয়ে ছুটতে কোথাও তার বাধলো না। এক নিঃশ্বাসে নীচে এসে মেয়েটি চীৎকার জুড়ে দিল—নেবে আসুন, নেবে আসুন, নাবতে পারবেন তো? না ভয় করছে···হাত ধরে নাবিয়ে আনবো নাকি?···

রীতিমত স্পোর্টস্‌ম্যান না হলে তেমন ভাবে নীচে নামা বড় সহজ কথা নয়। অনেক কষ্টে, ভয়ে ভয়ে কখনো পাথর ধরে, কখনো বসে বসে অতি সাবধানে মোহনদাস তো নীচে নাবলেন। গায়ে তখন রীতিমত ঘাম দেখা দিয়েছে।

মেয়েটি ঠাট্টা করে চীৎকার করে উঠলো—সাবাস! সাবাস!!

মোহনদাস বড়ই লজ্জা পেলেন। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলেন—ইংরাজ মেয়েদের সঙ্গে সহজে আর কখনোও বেড়াতে বেরুবেন না!

এতদিন মোহনদাস হিন্দুশাস্ত্র সম্পর্কে কিছুই জানতেন না।

তার উপর বিলাতী পরিবেশের মাঝে পড়ে হিন্দু ধর্ম সম্পর্কে তাঁর আর কোন কৌতূহলও ছিল না।

কিন্তু হঠাৎ তাঁর দুটি বন্ধু জুটে গেল,—দুই ভাই, দু'জনেই থিওজফিষ্ট।

ম্যাডাম ব্লাভাট্স্কি তখন হিন্দু দর্শন ও ব্রহ্মবাদ নিয়ে বিলাতে সাড়া তুলেছেন। তাঁর শিষ্যা আনি-বেশান্তের তখন খুব নাম। তাঁদের ব্যক্তিত্ব বিলাতের এক দল ইংরাজকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছিল, এই যুবক দু'জন সেই দলের।

মোহনদাসকে একদিন তাঁরা দুজনে সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন ম্যাডাম ব্লাভাট্স্কি ও আনি-বেশান্তের কাছে।

তারপর একদিন তাঁরা দু'জনে দু'খানি গীতা যোগাড় করে আনলেন, বললেন—তুমি হিন্দু, সংস্কৃত গীতাখানি তোমার ভালমতই জানা আছে, এই সংস্কৃত গীতাখানি তুমি পড়বে আর ইংরাজীতে আমাদেরকে মানে বুঝিয়ে দেবে। আর এই এডুইন আর্ণল্ডের লেখা গীতার ইংরাজী অনুবাদখানি খুলে আমরা মিলিয়ে মিলিয়ে পড়বো।

মোহনদাস 'না' বলতে পারলেন না। ইস্কুলে যেটুকু সংস্কৃত পড়েছিলেন,তাই সম্বল করে গীতাপাঠ সুরু করলেন। হিন্দুর ছেলের সংস্কৃত জানা যে কতখানি দরকার তা তিনি এই প্রথম উপলব্ধি করলেন। আর তারই সঙ্গে কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করলেন ইস্কুলের সেই পণ্ডিত মশাইটিকে।

প্রতিদিনই গীতা পড়েন, মানে ভাঙেন। বন্ধু দু'জন চলে যাবার পরেও অনেক সময় গীতার অনেক শ্লোক, অনেক কথা তাঁর মাথায় ঘুরতে থাকে। দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৬২ ও ৬৩ সংখ্যক শ্লোক দুটি তিনি মুখস্থ করে ফেলেন :

> ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
> সঙ্গাৎ সঞ্জায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে ॥
> ক্রোধাৎ ভবতি সংমোহ সংমোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
> স্মৃতি-ভ্রংশাদ বুদ্ধিনাশো, বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি ॥

[ বিষয়ের চিন্তা করতে করতে মানুষের মনে জাগে আসক্তি। আসক্তি থেকে জন্মায় কামনা। কামনা থেকে আসে ক্রোধ। ক্রোধ থেকে মোহ। মোহ স্মৃতি ভ্রংশ করে। তখন বুদ্ধি নষ্ট হয়ে বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। ]

গীতা শেষ করে মোহনদাস বাইবেল পড়েন। যিশুর 'সারমন অন্-দি-মাউণ্ট' মোহনদাসকে মুগ্ধ করে :

'অন্যায় দিয়ে অন্যায়কে প্রতিরোধ করার চেষ্টা করো না। যদি কেউ তোমার ডান গালে চড় মারে বাঁ গাল ফিরিয়ে দিও। যে তোমার গায়ের জামাটা কেড়ে নেবে, তোমার আলখাল্লাটাও তাকে দিয়ে দাও'...

তারপর পড়লেন বুদ্ধদেবের জীবনী 'লাইট অব এশিয়া'।

শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধদেব ও যিশুর তত্ত্বকথার মধ্যে চিত্তবিকারকে জয় করার যে ইঙ্গিত আছে, মোহনদাসের মনে তা এমনভাবে রেখাপাত করলো যে ধর্মের প্রতি একটা স্বতঃস্ফূর্ত অনুরাগ জেগে উঠলো তাঁর হৃদয়ে। রীতিমত ধর্মচর্চার দিকে মন ঝুঁকে পড়লো।

মনের ভাবান্তরে আহারাদিরও খানিক রূপান্তর ঘটলো। এতদিন মোহনদাস ডিমটাকে মাছ-মাংসের মধ্যে গণ্য করতেন না এবার ডিম খাওয়াও ছেড়ে দিলেন। মশলা খাওয়া বন্ধ করে দিলেন, মিষ্টি খাওয়া কমিয়ে দিলেন, শুধু সিদ্ধ তরকারী, রুটি আর কোকোই একমাত্র আহার্য্য হোল!

গুজরাতী লেখক নারায়ণ-হেমচন্দ্রর সঙ্গে মোহনদাসের পরিচয় ঘটলো। বেঁটে ছিপ্‌ছিপে মানুষটী, মুখে বসন্তের দাগ, লম্বা দাড়ী, কথা বলতে বলতে কেবলই দাড়ীতে হাত বুলান। প্রথম পরিচয়েই বলেন—তুমি আমাকে কিছু ইংরাজী শেখাবে? আমি ইংরাজী মোটেই জানি না।

পরদিন থেকেই খাতা বই নিয়ে তিনি মোহনদাসের ছাত্র বনে গেলেন। ব্যাকরণ নিয়ে তিনি মোটেই মাথা ঘামাতেন না, বলতেন—ভাষাটা বুঝতে পারা নিয়ে কথা। ব্যাকরণের জন্য কিছু বাধে না। আমি কোন দিন ইস্কুলে পড়িনি, কিন্তু মাতৃভাষা গুজরাটী ছাড়াও হিন্দি, মারাঠী ও বাংলাভাষা আমি জানি, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সমস্ত বাংলা রচনা আমি গুজরাটী ভাষায় অনুবাদ করেছি। তারপর শিখবো ফরাসী ভাষা, শুনেছি ফরাসী সাহিত্য খুবই সমৃদ্ধ। জার্মান ভাষাও বাদ দেব না। সারা য়ুরোপটা ঘুরে দেখতে হবে তো!

—আমেরিকা যাবেন না?

—নিশ্চয়। আমেরিকা না দেখলে তো পৃথিবীর আধখানা বাকী রয়ে গেল।

—অতো টাকা পাবেন কোথা?

—টাকার তো খুব বেশী দরকার নেই। সামান্য কিছু খাওয়া আর সাধারণ কাপড় জামা। যাতায়াতের খরচও খুব বেশী পড়বে না—ট্রেনের থার্ড ক্লাশ ও জাহাজের ডেক। বই লিখে যা দু'চারটাকা হবে, তাইতেই চলে যাবে, না চলে বন্ধু বান্ধবের কাছ থেকে কিছু কিছু ধার নোব।

সত্যই নারায়ণের খাওয়াপরার কোন আড়ম্বর ছিল না, পরনে ঢল্‌ঢলে একটি প্যান্ট, আধময়লা কোঁচকানো হলদে রঙের একটি পার্সী কোট। একদিন তো ধুতি

আর সার্ট পরে সোজা মোহনদাসের বাড়ীতে এসে উঠলেন। মোহনদাস বিস্মিত হলেন, জিজ্ঞাসা করলেন—এই পোষাকে আপনি পথে বেরুলেন কেমন করে? রাস্তায় ছেলেরা আপনার পিছু নেয় নি?

—একদল ছোকরা খানিকটা পথ আমার পিছু ধাওয়া করেছিল বটে, কিন্তু যখন দেখলো তাদেরকে আমি গ্রাহ্যই করি না, তখন হতাশ হয়ে ফিরে গেল।

হেমচন্দ্র ব্যবহারিক জগৎ সম্পর্কে ছিলেন বেপরোয়া।

তিনি মাছমাংস খেতেন না, সেইজন্য মোহনদাসের সঙ্গে তাঁর ভাব জমেছিল বেশী। একদিন তো মোহনদাসের জন্য কোথা থেকে তিনি মুগের ডাল জোগাড় করে আনলেন, নিজে রেঁধে মোহনদাসকে খাওয়ালেন।

কিছুদিন বিলাতে থেকে চলনসই ইংরাজী ও ফরাসী ভাষা শিখে নিয়ে হেমচন্দ্র একদিন ভেসে পড়লেন আমেরিকার উদ্দেশ্যে।

ফরাসী বিপ্লবের লীলাভূমি ফ্রান্স দেখবার আগ্রহ ছিল মোহনদাসের অনেক দিন থেকে, দিন সাতেকের জন্য তিনি প্যারিসে গেলেন বেড়াতে।

প্যারিসে তখন গ্রেট একজিবিশন হচ্ছে। হাজার ফিট উঁচু ইফেল-টাওয়ারে উঠলেন দু'তিনবার।

টাওয়ারের মাথায় এক রেষ্টুরেন্ট আছে, সওয়া পাঁচটাকা খরচ করলে সেই আকাশের মাঝে বসে খাওয়া যায়, মোহনদাসেরও সখ হোল একবার সেখানে বসে খাবার।

তারপর দেখলেন নৎরদাম গির্জা। স্থাপত্যে ও কারুকার্যে বিরাট ও মহীয়ান। ইফেল-টাওয়ারের তুলনাই চলে না এর সঙ্গে। ভিতরে ঢুকলে একটি অপূর্ব অনুভূতিতে মন ভরে ওঠে, মনে হয় যেন দেবতার সঙ্গে মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছি।

তিনবছরে মোহনদাসের ব্যারিষ্টারী ভোজ শেষ হয়ে গেল। রোমক আইন ও ইংরাজী আইনের দুটি পরীক্ষা দিয়ে মোহনদাস ব্যারিষ্টার হলেন। ১০ই জুন পরীক্ষার খবর বেরুলো, ১২ই জুন মোহনদাস ভারতগামী জাহাজে উঠে বসলেন।

ছাত্র-জীবনের উপর যবনিকা পড়লো।

জাহাজে বার বার মায়ের কথাই মনে হয়েছে। মায়ের কাছে প্রতিজ্ঞা করে বেরিয়েছিলেন, সেই প্রতিজ্ঞা থেকে আজ অবধি তিনি টলেননি, শুনলে মা কত খুসি

হবেন। কতদিন দিশি ভাল তরকারী খাওয়া হয়নি, যা নিশ্চয়ই কতরকম তৈরী করে রেখেছেন, যাওয়া মাত্রই হয়তো এতো থালা সাজিয়ে দেবেন, যা তিনি খেতেই পারবেন না। খেতে খেতে বিলাতের মেয়েদের গল্প বলবেন, যা শুনে অবাক হয়ে যাবেন।

বোম্বাইয়ের জাহাজ-ঘাটায় বড়দা এসেছিলেন; জাহাজ থেকে নেবেই মোহনদাস বললেন—চলুন আগে মাকে প্রণাম করিগে।—

দাদার দু'চোখ ছল ছল করে উঠলো, বললেন—মা তো নেই ভাই।

—মা নেই !!!

—না। তোমার পড়াশুনার ক্ষতি হবে বলে তোমাকে এতদিন জানাইনি।

এমনভাবে আঘাত পাবার জন্য মোহনদাস প্রস্তুত ছিলেন না, বিহ্বলের মত ভাইয়ের মুখের পানে চোখ তুলে তাকিয়ে রইলেন, দাদার কোন কথা তিনি শুনতে পাচ্ছেন কিনা ঠিক বোঝা গেল না। মুহূর্তমধ্যে সব কিছুই তাঁর কাছে অর্থহীন হয়ে উঠলো।

দাদা বুঝলেন, মোহনদাসের হাত ধরে ধীরে ধীরে বেরিয়ে এলেন ডকের বাইরে।

যাদের আদেশ অমান্য করে মোহনদাস বিলাত গিয়েছিলেন এবার তারা চঞ্চল হয়ে উঠলো—বিলাত থেকে যে ম্লেচ্ছ হয়ে ফিরেছে তাকে আবার নিজেদের মধ্যে গ্রহণ করবে কি করে!

তাদেরকে খুসী করার জন্য দাদা মোহনদাসকে বরাবর নিয়ে এলেন নাসিকে। সেখানে নর্মদা নদীতে স্নান করে তন্ত্র-মন্ত্র পাঠ করে মোহনদাস আগে শুদ্ধ হলেন, তারপর এলেন রাজকোটে।

দাদা এবার সমস্ত আত্মীয় স্বজনদের নিমন্ত্রণ করলেন, প্রায়শ্চিত্তের পর যেমন আমাদের প্রথা।

কিন্তু স্বজাতির মধ্যে দুটি দল হয়ে গেল।

একদল নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলো, আর একদল নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলো না।

দ্বিতীয়েরাই দলে ভারী ছিল। তাদের রক্ত চক্ষুর ভয়ে শ্বশুর, শাশুড়ী, বোন ও ভগ্নীপতি অবধি তফাতে সরে থাকতে বাধ্য হলেন। কিন্তু মোহনদাসের দিক থেকে সেজন্য কোন প্রতিবাদ উঠলো না, রীতিমত আইন ব্যবসায়ের দিকে তিনি মন দিলেন।

রাজকোটে ব্যারিষ্টারী সুরু হোল, কিন্তু একটিও মক্কেল জুটলো না।

শুভাকাঙ্ক্ষীরা বললেন—বোম্বাইয়ে গিয়ে বস গে,—সুবিধা হবে।

মোহনদাস বোম্বাইয়ে এলেন।

সেখানেও সে-ই অবস্থা! ফিট্‌ফাট সাহেবি-আনা ঠিক বজায় আছে, খরচ ঠিক চলছে মাসের পর মাস, রীতিমত কোর্টে হাজিরা দিচ্ছেন প্রতিদিনই, কিন্তু মক্কেল নেই একজনও।

বন্ধুরা বল্লেন—পাঁচ সাত বছর হাইকোর্টের ব্যারিষ্টারদের এমনিভাবেই কাটে, এতে হতাশ হবার কিছু নেই। বছর তিনেক পরে যদি মাসের খরচটা তুলতে পার তাহলেই নিজেকে ধন্য বলে মানবে।

তিনটি বছর এইভাবে কাটাতে হবে? মোহনদাসের মনে দুশ্চিন্তা দেখা দিল।

একদিন এক দালাল একটি মামলা নিয়ে এলো তাঁর কাছ। ছোট আদালতের সামান্য মামলা, ব্যারিষ্টারের ফী দিল দু'গিনি—ত্রিশ টাকা।

ফী'এর টাকা থেকে দালাল কমিশন চাইল।

মোহনদাস বললেন—না, দালালি আমি দেবো না।

—কিন্তু ছোট বড় সব উকিল ব্যারিষ্টারের কাছ থেকেই আমরা দালালি পেয়ে থাকি।

—অন্যেরা দিতে পারেন কিন্তু আমি দেবো না।

দালাল বেচারা আর কি করে, মামলা যখন একবার মোহনদাসের হাত তুলে দিয়েছে, তখন করার তো কিছু নেই!

এদিকে মোহনদাস মামলার কাগজপত্র ঠিক করে কোর্টে উপস্থিত হলেন, কিন্তু আদালতে বিচারকের সামনে বাদীকে জেরা করতে উঠেই, তাঁর পা কেঁপে উঠলো, মাথা ঘুরে গেল, মুখ দিয়ে কোন কথা বেরুলো না, কি জিজ্ঞেস করতে হবে তা অবধি তিনি ভুলে গেলেন। ঝুপ করে তিনি বসে পড়লেন। দালালকে বললেন—মামলা তিনি চালাতে পারবেন না, মাথা ঘুরছে।

ফীয়ের ত্রিশ টাকা ফেরৎ দিতে হোল।

বিলেত-ফেরৎ ব্যারিষ্টারের রকম-সকম দেখে, জজ্ ও উপস্থিত উকিলদের মুখে হাসি ফুটে উঠলো।

অক্ষমতার লজ্জায় মাথা নীচু করে মোহনদাস তাড়াতাড়ি আদালত থেকে বেরিয়ে পড়লেন।

তারপর কিছুদিন মোহনদাসকে আর আদালতে দেখা গেল না।

ব্যারিষ্টারী ছাড়া আর কি করা চলে, কি করলে সঙ্গে সঙ্গে দু'দশ টাকার সংস্থান হতে পারে—সেই কথাই মোহনদাস ভাবছেন, এমন সময় একদিন সকালে খবরের কাগজের পাতায় একটী বিজ্ঞাপন চোখে পড়লো : 'শিক্ষক চাই, দৈনিক এক ঘণ্টা করে ইংরাজী পড়াতে হবে, মাহিনা পঁচাত্তর টাকা।'

বিজ্ঞাপনটি একটি নামকরা হাই-স্কুলের।

মোহনদাস সেইদিনই দরখাস্ত করলেন।

দরখাস্তের উত্তর এলো—আসুন, দেখা করুন।

মোহনদাস ইস্কুল কর্তৃপক্ষের সামনে হাজির হলেন—ধোপদোস্ত, চোস্ত স্যুটপরা বিলাত-ফেরৎ এক ব্যারিষ্টার।

অধ্যক্ষ প্রথমেই জিজ্ঞাসা করলেন—আপনি বি-এ পাশ করেছেন, গ্রাজুয়েট ?

—না। আমি বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ম্যাট্রিক পাশ করে বিলাত যাই, সেখানে আবার লণ্ডন য়ুনিভার্সিটির ম্যাট্রিক দিই, লাটিন আমার দ্বিতীয় ভাষা ছিল।

—কিন্তু আমাদের যে গ্রাজুয়েট চাই, গ্রাজুয়েট না হলে তো আমাদের চলবে না।

অনেক আশা নিয়ে মোহনদাস গিয়েছিলেন, মুখ কালো করে বাহির হয়ে এলেন।

আরো কয়েকটি মাস কেটে গেল।

সারাটি দুপুর মোহনদাস আদালতে চুপ করে বসে থাকেন। সময় সময় তাঁর ঝিমুনি আসে, বেঞ্চে বসে বসে তিনি ঢোলেন।

তাঁর মত নিষ্কর্মা উকিল আর ব্যারিষ্টারদের দুপুরটা কাটিয়ে দেবার এই হোল রীতি। চোখ মেলেই দেখেন, তাঁর আশেপাশে আরো কতজন ঢুলছে। কারুরই কোন লজ্জা নেই।

প্রতিদিন হাঁটতে হাঁটতে আদালতে যাওয়া ও আসা ক্রমশঃ মোহনদাসের কাছে অর্থহীন হয়ে উঠলো।

ছ' মাসের মধ্যে আয়ের কোন রকম সংস্থান হোলনা।

এদিকে বোম্বাইয়ের মত সহরে ব্যারিষ্টারী চালে চলার খরচ তো আছে।

দাদা রাজকোটে ওকালতী করতেন, বললেন—ওখানেই চল, একটা কিছু ব্যবস্থা করা যাবে, তাছাড়া থাকা-খাওয়ার খরচ তো লাগবে না।

কথাটা মোহনদাসের মনে লাগলো, রাজকোটে এসে আফিস খুলে বসলেন।

দাদার এক উকিল বন্ধুর ভালো পসার ছিল, তাঁর যত গরীব মক্কেলকে তিনি

পাঠিয়ে দিতেন মোহনদাসের কাছে। মোহনদাস বসে বসে তাদের আরজী লিখে দিতেন। ফী যা পেতেন তা থেকে কিন্তু দাদার বন্ধুটিকে বখরা দিতে হোত। প্রথমে তিনি গোঁ ধরেছিলেন—বখ্‌রা দোব কেন?

দাদা বললেন—দালালি না পেলে ওরা তোমাকে মামলা দেবে কেন? আরো ব্যারিষ্টার তো রয়েছে, এখানেও তোমাকে তাহলে বোম্বাইয়ের মত নিষ্কর্মা হয়ে বসে থাকতে হবে।

বসে থাকার ইচ্ছা মোহনদাসের ছিল না, দাদার কথাই তিনি মেনে নিলেন। স্বচ্ছন্দে মাসে শ' তিনেক টাকা উপায় হতে লাগলো।

মোহনদাসের দাদা ছিলেন পোরবন্দরের যুবরাজের সেক্রেটারী ও উপদেষ্টা। এক অভিযোগ ওঠে যে যুবরাজকে কয়েকটি ব্যাপারে তিনি কুপরামর্শ দিয়েছেন।

কথাটা শেষ অবধি পলিটিক্যাল এজেন্টের কানে ওঠে।

দেশীয় রাজ্যের পলিটিক্যাল এজেন্টরা হচ্ছেন রাজারও রাজা। তিনি বড়দার উপর বিরূপ হয়ে উঠেন।

বিলাতে থাকার সময় ইংরাজ অফিসারটির সঙ্গে মোহনদাসের বেশ জানাশুনা ছিল, দাদা বললেন—তুমি একবার পলিটিক্যাল এজেন্টের কাছে গিয়ে সব বুঝিয়ে বলগে, তাহলে ব্যাপারটা মিটে যায়।

কথাটা মোহনদাসের মনঃপুত হোল না, বললেন--আগে একটা আরজী লিখে দিন না, তারপর কি হয় দেখা যাক্।

দাদা বললেন—লেখালেখি করে কিছু হবে না, এখানে ব্যক্তিগত পরিচয়ই সব। জানা-চেনা লোকের উপর যে যতখানি প্রভাব বিস্তার করতে পারে, সে ততখানি লাভবান হয়;—এদেশকে তুমি এখনও চিনলে না।

কাজেই মোহনদাসকে যেতে হোল পলিটিক্যাল এজেন্টের বাড়ী, তাঁকে দেখে এজেন্ট চিনতে পারলেন, বললেন—কি খবর, পুরানো পরিচয় ঝালাতে এসেছেন নাকি?

—একটা কথা বলতে এলাম।

—পরিচয়ের সুযোগ নিয়ে কারু জন্য কোন সুপারিশ করলে আমি শুনবো না কিন্তু!

—আমার দাদার কথাটা বলতে এসেছিলাম······

—তার কথা তোমার মুখ থেকে আমি শুনতে চাই না। তিনি অনেক কিছু ষড়যন্ত্র করেছিলেন! যদি তাঁর কিছু বলার থাকে তিনি লিখিতভাবে আমাকে জানাতে পারেন।

সাহেব উঠে দাঁড়ালেন, বললেন—আপনি তাহলে এখন যেতে পারেন, আমি উঠছি !

তবু মোহনদাস ছাড়লেন না, বললেন—আপনি দয়া করে আমার কথাটা আগে শুনুন !

সাহেব ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন, হাঁক দিলেন—চাপরাশি ! বাবুকে দরওজা দেখ্‌লা দো—

চাপরাশি এসে হাঁকলো—বাবুসাব, বাহার চলিয়ে—

মোহনদাস তখনও ইতস্ততঃ করছেন দেখে সাহেব ইঙ্গিত করলেন, চাপরাশি এগিয়ে এসে ঘাড় ধরে মোহনদাসকে ঘর থেকে বের করে দিল।

এতদূর অপমান মোহনদাস আশা করেন নি। রাগে অপমানে তাঁর চোখ-মুখ লাল হয়ে উঠলো, তখনই একটুকরো কাগজে লিখে সাহেবের কাছে পাঠিয়ে দিলেন—তুমি চাপরাশি দিয়ে আমার অপমান করেছ। যথাযোগ্য ত্রুটি স্বীকার না করলে, আমি তোমার নামে মানহানির মামলা করবো !

সাহেবও তখনই উত্তর পাঠিয়ে দিলেন—তুমি যা খুসি তাই করতে পার !

রাগে ফুলতে ফুলতে মোহনদাস বাড়ী ফিরলেন ; কি ভাবে এই অপমানের শোধ নেওয়া যায়, সেই কথাই কেবল তাঁর মনের মাঝে ঘুরতে লাগলো।

স্যার ফিরোজ-সা মেটা সেই সময় ক'দিনের জন্য রাজকোটে এসেছিলেন একটি মামলা পরিচালনা করতে। অতো বড়ো ব্যারিষ্টারের সঙ্গে মুখোমুখি দেখা করতে মোহনদাসের সাহসে কুলালো না, এক উকিল-বন্ধুর মারফতে সব কিছু লিখে-পড়ে ফিরোজ-সা'র কাছে পাঠিয়ে দিলেন।

সব পড়ে শুনে ফিরোজ-সা হেসে বললেন,—গান্ধীকে বলো, উকিল ব্যারিষ্টারের জীবনে এমন ব্যাপার অনেক ঘটে। নতুন বিলেত থেকে এসেছে কিনা তাই মাথাটা এখনও গরম আছে। পসার জমাতে হলে এই অপমান হজম করে নিতে হবে। বয়স কম, জীবনের অনেক অভিজ্ঞতা এখনও তার বাকী আছে। ব্রিটিশ অফিসাররা কেমন মানুষ তা সে এখনও জানে না। এই সাহেবের বিরুদ্ধে মামলা করে সে কিছুই করতে পারবে না।

ফিরোজ-সা'র কথা অবহেলা করা যায় না, মোহনদাস মামলা করতে সাহস পেলেন না।

কিন্তু এখানকার আদালত পলিটিক্যাল এজেন্টের কোর্ট। কোন মামলা-ব্যাপারে কিছু করতে হলেই ওই সাহেবটির সামনে গিয়ে দাঁড়াতে হবে। সুবিধা পেয়ে কবে

আবার সে আরেকটা কি অপমান করে বসে সেই শঙ্কায় মোহনদাস সদাই সন্ত্রস্ত হয়ে থাকেন। এমন সময় হঠাৎ তাঁর এক চাকরী মিলে গেল: পোরবন্দরের এক ব্যবসায়ীর মস্তবড় এক কারবার আছে দক্ষিণ আফ্‌রিকায়, সেখানে ছ'লক্ষ টাকা দেনা-পাওনা নিয়ে তাদের এক মামলা চলছে। সেই মামলা তদ্বির করার কাজে তারা মোহনদাসের মত একজন লোক চায়। তাদের বড় ব্যারিষ্টার আছে সেখানে, মোহনদাস গিয়ে শুধু তাঁকে সাহায্য করবেন। সেজন্য মোহনদাস মাহিনা পাবেন ষোল শত টাকা, যাতায়াত ও থাকা-খাবার খরচ কোম্পানী নিজেই বহন করবে।

মোহনদাস আফ্‌রিকা যাবার জন্য প্রস্তুত হলেন।

নতুন ব্যারিষ্টার প্রথম শ্রেণী ছাড়া চলা-ফেরা করা পছন্দ করেন না। এদিকে টিকিট কিনতে গিয়ে লোক ফিরে এলো, জাহাজে ডেক ছাড়া আর কোন টিকিট নেই!

ব্যারিষ্টার ডেকে যাবে? এদিকে আবার এই জাহাজে যেতে না পারলে একমাস বসে থাকতে হয়। মোহনদাস দেখা করলেন জাহাজের ক্যাপ্‌টেনের সঙ্গে। তার কথা-বার্তা শুনে ও চালচলন দেখে ক্যাপ্‌টেন খুসি হোল, বললে—বেশ, আমার ঘরে একটা উপরি বার্থ আছে, সেটা সাধারণতঃ যাত্রীদেরকে ভাড়া দেওয়া হয় না, সেটাই আমি তোমাকে দোব!

মোহনদাস ক্যাপ্‌টেনের ঘরেই আশ্রয় নিলেন।

ক্যাপ্‌টেনের হাতের কাছে একটি লোকের দরকার ছিল। দীর্ঘ আড়াই হাজার মাইল সমুদ্র-পথে পাড়ি জমাতে হবে, দিগন্ত বিস্তারী বৈচিত্র্যহীন নীল আকাশ ও নীল সমুদ্রের মাঝে পূরো দুটি সপ্তাহ কাটিয়ে দিতে হলে একজন সঙ্গী চাই বৈকি, সঙ্গীর সঙ্গে সময় কাটাবার সঞ্চয়ও ক্যাপ্‌টেনের ছিল—একটা দাবার ছক আর দু-রঙা ঘুঁটির সারি। অবসর পেলেই তিনি ডাকতেন—মিষ্টার গান্ধি, এসো এক হাত খেলা যাক!

মোহনদাস এর আগে আর কোনদিন দাবা খেলেননি, ওই ক্যাপ্‌টেনের কাছেই তাঁর শিক্ষা। খেলতে বসলেই তিনি হেরে যান। কাপ্‌টেন খুসি হন। ক্যাপ্‌টেন নিজেও পাকা খেলোয়াড় নন, তবু মোহনদাসকে হারিয়ে দেবার আনন্দে বার বার তাকে খেলতে ডাকেন, আবার খেলার শেষে মোহনদাসকে বোঝাতে সুরু করেন কি চাল দিলে মোহনদাস হারতো না।

তবুও মোহনদাস হেরে যান পরের বারে।

এই ভাবেই দীর্ঘ বৈচিত্র্যহীন দিনগুলি একটির পর একটি কেটে যায়। রেখাহীন দিগ্বলয়ের নীলিমা জাহাজের সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে চলে।

তেরো দিন পরে জাহাজ এসে লাগলো আফ্রিকার উপকূলে—লামু বন্দরে।

সেখান থেকে মোম্‌বাসা···জানজিবার···মোজামবিক্···তারপর ডারবান।

দাদা আবদুল্লা শেঠ নিজেই এসেছিলেন জাহাজঘাটে। তিনি ওখানকার একজন সেরা ব্যবসায়ী, তাঁরই কাছে মোহনদাসকে কাজ করতে হবে। মোহনদাসের চালচলন দেখে তো তিনি শঙ্কিত হয়ে উঠলেন—এই পুরোদস্তর সাহেবিয়ানায় অভ্যস্ত মানুষটির সুখ সুবিধার জন্য তাঁর কত টাকা খরচ হবে কে জানে!

কিন্তু এখন তো আর সে কথা ভেবে লাভ নেই, মোহনদাসকে তিনি নিয়ে এলেন নিজের বাড়ীতে।

দু একদিন পর দাদা আবদুল্লা মোহনদাসকে নিয়ে গেলেন ডারবানের কোর্টে, নিজের উকিলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন, পাশের একখানি চেয়ারে মোহন-দাসকে বসিয়ে গেলেন কোর্টের কাজ-কর্ম দেখার জন্য। ম্যাজিস্ট্রেট এতক্ষণ মোহন-দাসের পানে তাকিয়েছিলেন, এবার তিনি হুকুম দিলেন—পাগড়ী নামাও!

অকারণে মাথা থেকে পাগড়ী নামানো মানে অপমান। চারিপাশে আর সবার মাথায় যখন টুপি আছে তখন তাঁর মাথাতেই বা পাগড়ী থাকবে না কেন?

মোহনদাস পাগড়ী খুললেন না, আদালত থেকে বেরিয়ে চলে এলেন।

শেঠজী শুনে বললেন—এখানকার রেওয়াজই এই, ভারতীয়রা আদালতে ঢুকলেই মাথার পাগড়ী খুলে রাখতে হবে।

—এতো একটা অপমান!

—সে তো বটেই, কিন্তু এর প্রতিবাদ করে কে।

—আমি এবার থেকে সাহেবী টুপি মাথায় দিয়ে যাব।

—আপনার মত লোকের পক্ষে সেটা কি ঠিক হবে? অপমানটাই কি তাহলে মেনে নেওয়া হবে না? তাছাড়া দেশী পাগড়ীতেই আপনাকে মানায় ভালো, হ্যাট পরলে আপনাকে হোটেলের খানসামা বলে মনে হবে!

শেঠজীর কথাটা মনে লাগলো। কোর্টে কেন পাগড়ী খুলতে হবে সেই সম্পর্কে প্রতিবাদ জানিয়ে মিষ্টার গান্ধী এক লম্বা চিঠি লিখে পাঠালেন খবরের কাগজের অফিসে।

চিঠিখানি ছাপা হোল। কয়েকখানি কাগজে এই চিঠি নিয়ে আলোচনাও হোল, কেউ টিপ্পনী কাটলো, আবার কেউ বা মিষ্টার গান্ধীকে সমর্থন করলো। কয়েকদিনের

মধ্যেই পত্রিকা ও তার পাঠক মহলে অবাঞ্ছিত আগন্তুক (unwelcome visitor) হিসাবে মিষ্টার গান্ধী পরিচিত হয়ে উঠলেন।

শেঠজীর মামলাটি চলছিল প্রিটোরিয়ায়। সাত-আটদিনের মধ্যেই মিষ্টার গান্ধীকে প্রিটোরিয়ায় রওনা হতে হোল।

রাত ন'টার সময় নেতালের রাজধানী মরিৎস্‌বার্গে ট্রেন এসে থামলো। একজন ইংরাজ কামরায় উঠতে এসে মিষ্টার গান্ধীকে দেখে থম্‌কে দাঁড়ালো—একজন ভারতীয় কালা-আদমি প্রথম শ্রেণীর কামরায় বসে আছে! তখনই সে দু' জন রেল-কর্মচারীকে ডেকে আনলো। একজন কর্মচারী বললো—নেমে এসো। তুমি তৃতীয় শ্রেণীর কামরায় যাবে।

—কেন আমার কাছে প্রথম শ্রেণীর টিকিট আছে।

—তা হোক, তোমাকে তৃতীয় শ্রেণীতেই যেতে হবে!

—আমি ডারবান থেকে এই কামরায় বসে আসছি, এই কামরাতেই আমি শেষ অবধি যাব।

—না, তুমি তা যেতে পাবে না। এই কামরা থেকে ভাল কথায় যদি তুমি না নাবো, পুলিশ ডেকে ঘাড় ধরে বের করে দোব!

—বেশ, তাই দাও। স্বেচ্ছায় আমি নাববো না।

কালা-আদমির এতো বড় ঔদ্ধত্য এর আগে আর তারা দেখেনি, রাগে ক্ষিপ্ত হয়ে রেল কর্মচারীটি তখনই পুলিশ ডেকে আনলো। কনষ্টেবলটি মিষ্টার গান্ধীকে ধাক্কা দিয়ে কামরা থেকে নাবিয়ে দিল, এবং সঙ্গের জিনিষপত্র সব প্ল্যাটফর্মের উপর ফেলে দিল। ট্রেন ছেড়ে দিল।

দুঃখে ক্ষোভে অপমানে ক্ষুব্ধ হয়ে কিছুক্ষণ মিষ্টার গান্ধী প্ল্যাটফর্মের উপরেই দাঁড়িয়ে রইলেন। কনকনে হাওয়া তাঁর সারা দেহ কাঁপিয়ে দিল। ছোট হাত-ব্যাগটি নিয়ে ধীরে ধীরে তিনি এসে ঢুকলেন ষ্টেশনের ওয়েটিংরুমে। সে ঘরে কোন আলোর ব্যবস্থা ছিল না, অন্ধকারে পাহাড়ী শীতে মোহনদাস ঠক্ ঠক্ করে কাঁপতে লাগলেন। সারা রাত এক মুহূর্ত তিনি সুস্থির হতে পারলেন না, মনে হোল যেন হিমে সারা দেহ জমে যাবে। অন্যান্য জিনিষের সঙ্গে একটা ওভারকোটও ছিল, কিন্তু জিনিষপত্র সবই তো এখন রেল কর্তৃপক্ষের জিম্মায়। ওভার-কোটটা চাইতে গেলে আবার হয়তো কি অপমান করে বসবে। আকাশ পাতাল ভাবনা নিয়ে মিষ্টার গান্ধী বসে রইলেন। ষ্টেশনের কর্তারা তাঁর খোঁজ নেওয়া দরকার বলেও মনে করলেন না।

সকাল হলেই মিষ্টার গান্ধী রেলের জেনারেল ম্যানেজারের কাছে এক দীর্ঘ টেলিগ্রাম করলেন, শেঠজীকেও সব জানালেন। জেনারেল ম্যানেজার জবাব দিলেন রেলের পুলিশ অন্যায় কিছু করেনি, ওই অবস্থায় তার পক্ষে আর কিছু করার ছিল না, তবে বাকী পথটুকু এবার মিষ্টার গান্ধী যাতে ভালোভাবে যেতে পারেন তার ব্যবস্থা করা হয়েছে!



আর শেঠজী মরিৎস্‌বার্গের ভারতীয় ব্যবসায়ীদের টেলিগ্রাম করে দিলেন।

শেঠজীর টেলিগ্রাম পেয়ে ওখানকার ভারতীয় ব্যবসায়ীরা ষ্টেশনে এসে হাজির হোল। গান্ধিজীর দুঃখের কথা শুনে তারা বললো—এ আর নতুন কথা কি? রেল গাড়ীতে আমরা তৃতীয় শ্রেণী ছাড়া চড়তে পাই না, ষ্টেশনের সাধারণ দরজা দিয়ে আমরা যাতায়াত করতে পারি না, শত শত অপমানের কাহিনী আমাদের জীবনের পাতায় পাতায় লেখা আছে। পরাধীন দেশের কালো মানুষ আমরা বিদেশে ব্যবসা করতে এসেছি, এ সব তো আমাদের সইতেই হবে! আপনি নতুন এসেছেন, কিছুদিন থাকলেই সব দেখতে পাবেন।

তাদের দুঃখের কথার আর শেষ নেই, পরাধীন দেশের মানুষকে স্বাধীন দেশের মানুষ সম্মান দেবে কেন? তার ওপর গায়ের রং যখন কালো! কথায় কথায় সময় কেটে যায়, রাত ২টায় প্রিটোরিয়ার ট্রেন আসে। আগে থেকেই বার্থ রিজার্ভ করা ছিল, রাত্রে আর কোন হাঙ্গামা পোহাতে হোল না, ভোর বেলা মিষ্টার গান্ধী চার্লস টাউনে এসে নাবলেন।

চার্লস টাউন থেকে জেহানেসবার্গ যাবার রেল-পথ নেই, যেতে হয় ঘোড়ার গাড়ীতে। বড় বড় গাড়ী, অনেকটা এখানকার বাসের মত মুখোমুখি দুসারি আসনে যাত্রীরা বসে আর ছাদের উপর বসে কচোয়ান আর কণ্ডাকটার। মিষ্টার গান্ধী একটি গাড়ীর ভিতর উঠে বসতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় কণ্ডাকটার সাহেব বললো—কই দেখি তোমার টিকিট?

গান্ধিজী টিকিট দেখালেন।

সাহেব বললো—এই টিকিট আজকের নয়, কালকের জন্য।

—কিন্তু আজ আমার না গেলে তো চলবে না।

—নেহাৎ যদি যেতেই চাও, ভিতরে বসে যাওয়া তোমার চলবে না। ও সব সাহেবদের জন্য, তুমি গাড়ীর ছাদে যাও।

বিতর্ক বাড়িয়ে কোন লাভ নেই, আবার হয়তো এক হাঙ্গামা বেধে যাবে। কাজেই অপমানটুকু নির্বিবাদে মেনে নিয়ে গান্ধিজী গাড়ীর ছাদেই উঠে গেলেন।

বেলা তিনটে নাগাদ গাড়ী এসে থামলো ছোট একটি সহরে। কণ্ডাকটারের খেয়াল হোল ছাদে বসে খানিকক্ষণ চুরুট টানবে। একটুকরো চট পা-দানের উপর বিছিয়ে দিয়ে সে বললো—এই কুলি এইখানে নেবে বস,—আমি ড্রাইভারের পাশে বসবো।

মিষ্টার গান্ধী প্রতিবাদ তুললেন—তুমি গোড়াতেই আমাকে ভিতরে বসতে দাওনি, অপমান করেছ, আমি মুখ বুঁজে তা সহেছি। কিন্তু তুমি এখন চুরুট খাবে বলে এই জায়গা ছেড়ে দিয়ে আমি তোমার পায়ের কাছে বসবো,—তা আমি বসবো না, তবে ভিতরে গিয়ে বসতে পারি।

কী! একজন কুলির এতো আস্পর্ধা! কণ্ডাকটার মিষ্টার গান্ধীর কান দুটি ধরে আচ্ছা করে মলে দিলে, তারপর ঘাড় ধরে তাঁকে নামিয়ে দিতে গেল। গান্ধিজী প্রাণপণ শক্তিতে কোচ-বাকসের পিতলের রেলিং ধরে বসে রইলেন, হাতের কবজি ভেঙে যায় তাও স্বীকার, তবু তিনি রেলিং ছাড়বেন না। ক্রোধে ক্ষিপ্ত হয়ে কণ্ডাকটার রীতিমত প্রহার সুরু করে দিল।

গাড়ীর যাত্রীরা এতক্ষণ চুপ করে দেখছিল, এবার তারা সাড়া তুললো—মিছামিছি মানুষটাকে মারছ কেন বাপু। ওতো অন্যায় কিছু করেনি।

পাঁচজনের কথায় কণ্ডাকটার গান্ধিজীকে ছেড়ে দিল বটে, কিন্তু চোখ পাকিয়ে বললো—দাঁড়া, একবার ষ্টানডারটনে গিয়ে পৌছাই তারপর তোকে মজা দেখাব।

সন্ধ্যার পর গাড়ী এসে পেঁছালো ষ্টানডারটনে। এইটিই হোল গাড়ী বদল করার আড্ডা, শেঠজীর টেলিগ্রাম পেয়ে ভারতীয় ব্যবসায়ীরা আগে থেকেই এখানে উপস্থিত ছিলেন; তাদের দেখে গান্ধিজী মনে সাহস পেলেন। তাদের সঙ্গে পরামর্শ করে তখনই এক চিঠি লিখলেন গাড়ী-কোম্পানীর এজেন্টের কাছে।

এজেন্ট জবাব দিলেন—অন্যান্য যাত্রীদের মত এবার তুমি গাড়ীর ভিতরে বসেই যাবে। যে লোকটি তোমাকে মেরেছিল সে এবার তোমার গাড়ীতে থাকবে না।

সেই রাতটা এক শেঠজীর দোকানে কাটলো।

পরদিন আবার সেই ঘোড়ার গাড়ী চড়ে রাত্রে জেহানেস্‌বার্গে এসে পৌছলেন।

জেহানেস্‌বার্গ বেশ বড় সহর, গাড়ী থেকে নেমে কোন ভারতীয়ের মুখ দেখতে পেলেন না, মিষ্টার গান্ধী বরাবর গিয়ে গ্রাণ্ড-ন্যাশন্যাল-হোটেলে উঠলেন, বললেন—একদিনের জন্য আমার একখানি ঘর চাই।

ম্যানেজার মিঃ গান্ধীর পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত একবার দেখে নিলে, তারপর বললে —আমাদের কোন ঘর খালি নেই।

সঙ্গে এক ভারতীয় দোকানদারের ঠিকানা ছিল, গান্ধিজী বরাবর তার দোকানে গিয়ে উঠলেন। সেই দোকানদারই বললো যে, এখানকার কোন হোটেলে কালা-আদমিকে জায়গা দেওয়া হয় না, ভারতীয়রা রেলে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকিট কিনতে পারে না। নেতালের চেয়ে এখানে আরো বেশী অসুবিধা···

দক্ষিণ আফ্রিকায় ইংরেজদের চাষ-আবাদের সুবিধার জন্য মজুরের দরকার হয়। দাসপ্রথা তখন উঠে গেছে, জুলুম করে নিগ্রোদের দিয়ে কাজ করানোর উপায় নেই। আর মাইনে দিয়ে যে কাজ করাবে কাফ্রীরা তা করতে চায় না। তাদের সকলেরই চাষ-আবাদ আছে, সাহেব-বাড়ীর চাকরী করতে তারা আসবে কেন?

ইংরাজদের তাই দৃষ্টি পড়লো ভারতবর্ষের উপর। ভারত সরকারের সঙ্গে তারা এক চুক্তি করে এদেশে ভারতীয় মজুর আমদানি করতে সুরু করে। সে আঠারো-শো-ষাট সালের কথা। এই সব মজুরদের ইংরেজরা কুলি বলতো। ক্রমে ক্রমে এই কুলি কথাটি তারা সমস্ত ভারতবাসীর উপরেই প্রয়োগ করতে থাকে—কুলি-উকিল, কুলি-ব্যাপারী, চলতি কথা হয়ে দাঁড়ায়। ভারতভূমির মানুষগুলিকে কুলির জাত ছাড়া তারা আর কিছুই ভাবে না।

মিষ্টার গান্ধী একটি টাইম-টেবিল নিয়ে রেলের সমস্ত নিয়ম-কানুন সেইখানে বসেই পড়ে ফেললেন, তারপর বললেন,—এমন কোন নিয়ম-কানুন তো দেখছি না, যাতে আমাদের ফার্ষ্ট ক্লাশে যাওয়া কেউ আটকাতে পারে? আমি ফার্ষ্ট ক্লাশে যাব।

মিষ্টার গান্ধীর তখন জিদ চেপে গেছে, নিজে ষ্টেশনে গেলেন টিকিট কিনতে।

বুকিং ক্লার্ক ছিলেন সাহেব। গান্ধিজীর মুখের পানে তাকিয়ে তিনি হাসলেন, বললেন—আপনি কালা-আদমি, কালা-আদমিকে প্রথম শ্রেণীর টিকিট দেওয়া হয় না, তবে আমি এখানকার লোক নই; আমি হল্যাণ্ডবাসী, আপনাদের উপর আমার কোন বিদ্বেষ নেই, আমি আপনাকে প্রথম শ্রেণীর টিকিট দেব। তবে একটা কথা, যদি পথে কোথাও গার্ড আপনাকে নেবে যেতে বলে তাহলে আপনাকে নেবে তৃতীয় শ্রেণীতে যেতে হবে কিন্তু। এই টিকিট কেনা নিয়ে পরে আপনি কোন বিতর্ক করতে পারবেন না।

মিষ্টার গান্ধী কথা দিলেন। ভাবলেন জোহানেসবার্গ থেকে প্রিটোরিয়া তো মাত্র আটত্রিশ মাইল পথ, এর মধ্যে আর কি এমন গোলযোগ হবে।

গোলযোগ কিন্তু বাধলো : মাঝ পথে আর্মিষ্টোন ষ্টেশনে গার্ড এসে গান্ধিজীকে বললো—তুমি প্রথম শ্রেণীতে কেন ? তৃতীয় শ্রেণীতে যাওগে—

—প্রথম শ্রেণীর টিকিট রয়েছে আমার কাছে।

—তাতে কিছু যায় আসে না।

গাড়ীতে একজন ইংরাজ যাত্রী ছিলেন, তিনি এবার কথা বললেন—প্রথম শ্রেণীর টিকিট কিনেছে আর তৃতীয় শ্রেণীতে যাবে ? মিছামিছি ভদ্রলোককে হয়রানি করে লাভ কি ?

—তা বলে আপনার মত একজন সাহেবের সঙ্গে একজন কুলি এক গাড়ীতে বসে যাবে ?

—থাক না, আমি তো কোন অভিযোগ করছি না।

—আপনি যদি একজন কুলির সঙ্গে এক গাড়ীতে বসে যেতে চান, আমার বলার কিছু নেই !—বলে গার্ড বিদায় নিল।

বাকী পথটা আর কোন উপদ্রব হোল না।

মিষ্টার গান্ধী ভেবেছিলেন শেঠজী যখন আগে থেকে জানিয়ে রেখেছেন তখন তাঁর এটর্ণির পক্ষ থেকে কেউ-না-কেউ প্রিটোরিয়া ষ্টেশনে নিশ্চয়ই হাজির থাকবে। কিন্তু কোথায় কে ?

একে একে সব যাত্রী ফটক পার হয়ে গেল, সবার শেষে মিষ্টার গান্ধী টিকিট কালেক্টারের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন ; বললেন—আমি এখানে আজ এই প্রথম এলাম, কিছুই চিনি না, আপনার জানাশুনা কোন হোটেলের ঠিকানা দিতে পারেন, যেখানে আমি আজকের রাতটা কাটিয়ে দিতে পারি ?

টিকিট কলেক্টার মিষ্টার গান্ধীর মুখের পানে তাকিয়ে মাথা চুলকে বললো—তাইত !···তাইত !···

পাশেই একজন নিগ্রো দাঁড়িয়েছিল, সে বললো—আপনি আমার সঙ্গে আসুন, আমি আপনাকে এক আমেরিকান হোটেলে পৌঁছে দিচ্ছি, সেখানে থাকার জায়গা পাবেন।

নিগ্রোটি তাকে জনষ্টোন্ ফ্যামিলি হোটেলে নিয়ে গেল, সেখানে কালা-ধলা নিয়ে কেউ মাথা ঘামালো না। হোটেলের কর্ত্তা বললেন—যতদিন খুসি আপনি এখানে থাকতে পারেন, কোন বাধা নেই।

দাদা আবদুল্লার মামলা চলছিল প্রিটোরিয়ার আদালতে, এটর্নী ছিলেন মিষ্টার বেকার।

প্রথম আলাপেই বেকার সাহেব ধর্মকথা পাড়লেন।

মিষ্টার গান্ধী বললেন—আমি হিন্দুর ঘরে জন্মেছি বটে কিন্তু হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে আমার বিশেষ কিছুই পড়াশুনা নেই, অন্য ধর্মের উপর কোন বিদ্বেষও আমার নেই।

বেকার খুসি হলেন, বললেন—বেশ, প্রতিদিন দুপুর একটার সময় আমরা জন-কয়েক বন্ধুবান্ধব মিলে এখানে প্রার্থনা করি, তোমারও নিমন্ত্রণ রইল।

পরদিন মিষ্টার গান্ধী যেতেই বেকার সমবেত বন্ধু ও বান্ধবীদের সঙ্গে তাঁর পরিচয় করিয়ে দিলেন।

প্রার্থনা শেষে সেদিন সকলে মিলে মিষ্টার গান্ধীর মঙ্গল কামনা করলেন—হে প্রভু, আমাদের এই নবাগত বন্ধুটিকে তুমি শান্তি দাও, পাপ থেকে ত্রাণ কর!

এই প্রার্থনা সভাতেই কোট্‌স্ সাহেবের সঙ্গে মিষ্টার গান্ধীর আলাপ হোল। মানুষটি উৎসাহী খৃষ্টান, মিষ্টার গান্ধীকে খৃষ্ট ধর্মের অনেকগুলি বই পড়ালেন। কিন্তু যিশুই যে ভগবানের একমাত্র অবতার—এ কথা কিছুতেই গান্ধীকে মানাতে পারলেন না।

একদিন কোন্ ফাঁকে মিষ্টার গান্ধীর গলায় কন্ঠির মালা দেখে কোট্‌সের চোখ তো কপালে উঠলো!—তোমার গলায় আবার ওটা কি? ওই কুসংস্কারের চিহ্নটা তুমি এখনও রেখেছ? ছিঁড়ে ফেলে দাও—

—না, ওটা থাক্। ওটা আমার মা নিজের হাতে গলায় পরিয়ে দিয়েছিলেন।

—কিন্তু তুমি কি ওই-সব কুসংস্কার বিশ্বাস কর?

—আমি হয়তো বিশ্বাস করি না, কিন্তু মা বিশ্বাস করে আমার গলায় যা আদর করে পরিয়ে দিয়েছিলেন আমি সেটাকে ছিঁড়ে ফেলে দিতে পারি না।

যুক্তিটা কোট্‌সের মনঃপূত হোল না, তিনি অন্য কথা পাড়লেন।

ট্রান্‌স্‌ভালে তখন ভারতীয়দের উপর অনেক কড়া-কড়া আইন জারী হয়েছে। প্রিটোরিয়া ট্রান্‌স্‌ভালেরই রাজধানী। সেখানে ভারতীয়দের ফুটপাতের উপর দিয়ে চলা নিষেধ, রাত ন'টার পর কোন ভারতীয় বাড়ীর বাইরে থাকতে পারবে না, —রাত ন'টার পর পথ দিয়ে 'কুলি' গেলেই তার পাস চাই! আর সেই পাস শুধু তারাই পেতে পারে যারা সাহেব-বাড়ীর চাকর।

মিষ্টার গান্ধী চাকর নন, পাসও নেই।

কিন্তু রাত্রে বেড়ানো তাঁর অনেক দিনের অভ্যাস, ছাড়তে পারেন না। তবে অধিকাংশ দিন কোট্‌স সাহেব তাঁর সঙ্গে থাকেন, ফুটপাতের উপর দিয়েই দুজনে চলা-ফেরা করেন।

একদিন কোট্‌স্ সঙ্গে নেই, মিষ্টার গান্ধী অভ্যাসমত ফুটপাতের উপর দিয়েই যাচ্ছেন। পথের উপরেই ট্রান্‌স্‌ভালের শাসনকর্তা প্রেসিডেণ্ট ক্রুগারের বাড়ী। বাড়ীর দরজায় একজন শান্ত্রী পাহারা দিচ্ছিল। তার নজরে পড়লো একা একজন কুলি ফুটপাতের উপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে, সে আর সইতে পারলো না, ছুটে এসে ধাক্কা দিয়ে বুটের ঠোক্কর মেরে মিষ্টার গান্ধীকে ফুটপাত থেকে নাবিয়ে দিল।

মিষ্টার গান্ধী থ' হয়ে গিয়েছিলেন।

ইতিমধ্যে কোথা থেকে কোট্‌স সেখানে এসে উপস্থিত হয়ে বললেন—গান্ধী, আমি সব দেখেছি; তুমি ওর নামে নালিশ কর, আমি সাক্ষ্য দোব।

মিষ্টার গান্ধী বললেন—ওর তো কোন দোষ নেই, কালা-আদমিদের সঙ্গে যেমন ব্যবহার করা উচিত, ও তাই করেছে।

—ওর সাজা হওয়া উচিত।

—কিন্তু আমি তো ওর নামে নালিশ করতে যাব না। এদেশে ভারতবাসী মাত্রেই যখন কুলি, এবং আইনতঃ খারাপ ব্যবহার পাবার যোগ্য তখন ওই শান্ত্রী বেচারার দোষ কি বল?

কোট্‌স্ তখন মিষ্টার গান্ধীকে ছেড়ে শান্ত্রীর সঙ্গে কথা বলতে সুরু করলেন। কয়েক মিনিটেই শান্ত্রী নিজের দোষ বুঝতে পারলো এবং মিষ্টার গান্ধীর কাছে ক্ষমা চাইল।

মিষ্টার গান্ধী কিন্তু সেদিন থেকে সেই পথে চলাই ছেড়ে দিলেন।

প্রিটোরিয়ায় ভারতীয়-বেশী ছিল না। যাঁরা ছিলেন তাঁদেরকে নিয়ে গান্ধিজী একদিন এক ঘরোয়া সভা করলেন। শেঠ হাজি-মুহম্মদ-হাজি-যুসবের বাড়ীতে সভা বসলো। সভায় ট্রান্‌স্‌ভাল রাজ্যে ভারতীয়দের যে সব দুঃখ কষ্ট সইতে হয় তাই নিয়ে আলোচনা হোল। ভারতীয়দের নিয়ে এক সঙ্ঘ গড়ে তোলার কথাও হোল।

ওখানকার অধিকাংশ ভারতীয়ই ইংরাজী জানতো না, অথচ ইংরাজী না জানলে বিদেশে নানা অসুবিধা। মিষ্টার গান্ধী বললেন, তোমাদের ইংরাজী শিখতে হবে, বিনা পয়সায় আমি তোমাদের ইংরাজী শেখাব।

সেই সভাতেই তিনজন ছাত্র জুটে গেল : এক নাপিত, এক কেরাণী, এক দোকানদার। তবে তারা কেউ গান্ধিজীর কাছে পড়তে আসবে না, গান্ধিজীকে তাদের বাড়ী গিয়ে পড়িয়ে আসতে হবে, তাও আবার তাদের সুবিধামত সময়ে।

গান্ধিজী তাতেই রাজী হলেন।

আটমাস গান্ধিজী তাদের পড়িয়েছিলেন।

এই সভার পক্ষ থেকে গান্ধিজী ভারতীয়দের অবস্থা উন্নত করার জন্য সচেষ্ট হলেন।

প্রথমেই চিঠি লিখলেন রেল-কর্তৃপক্ষের কাছে—কেন ভারতীয়দের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে চড়তে দেওয়া হবে না ?

রেল কর্তৃপক্ষ উত্তর দিলেন—ভালো পোষাক-পরিচ্ছদ থাকলে ভারতীয়রা প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে চড়তে পারবে।

কিন্তু কোনটে ভালো পোষাক তা ঠিক করবে কে ?

যাক্, তবু অধিকারটা যে মানিয়ে নেওয়া গেল সেইটাই বড় কথা।

বছর খানেকের মধ্যেই শেঠজীর মামলা মিটে গেল। গান্ধিজী দেশে ফেরার যোগাড় করলেন।

শেঠজী ডারবানে এক ভোজ-সভা করলেন—গান্ধিজীকে বিদায় দেবার জন্য।

সভার মাঝে একখানি খবরের কাগজ গান্ধিজীর হাতে এসে পড়লো। একটি খবরে ছাপা হয়েছে যে নেতাল ব্যবস্থাপক সভার নির্বাচনে ভারতীয়েরা যে ভোট দিতেন, একটি আইন পাস করে সেই অধিকার থেকে ভারতীয়দের বঞ্চিত করা হচ্ছে।

গান্ধিজী সেই সভার মাঝেই কথা তুললেন। নেতাল রাজ্যে তখন লোকসংখ্যা ছিল—চার লক্ষ জুলু, আশী হাজার ভারতীয় আর চল্লিশ হাজার সাহেব। এই আশী হাজার মানুষের কোন অধিকার থাকবে না, আর চল্লিশ হাজার মানুষ নিজের মনোমত আইন করে যা খুসি তাই করবে! এ ব্যাপারকে রুখতে হবেই!

—কিন্তু রুখবে কে ?

ভারতীয়রা গান্ধিজীকে বললেন, আমরা তো কিছুই ভালো বুঝি না, আর তুমি তো দেশে চললে। তবে তুমি যদি কিছুদিন এখানে থাকো, তোমার কথামত আমরা কাজ করতে পারি।

সমবেত সকলে চারিপাশ থেকে সাড়া তুললো—ঠিক কথা, গান্ধীভাইকে এখানে থাকতে হবে!

গান্ধিজী থাকতে রাজী হলেন।

সেই রাত্রেই ব্যবস্থা-পরিষদে পাঠানোর জন্য এক আবেদন-পত্র লেখা হোল।

পরপর কয়েকটি প্রতিবাদ সভা করা হোল।

শেষে দশ হাজার ভারতীয়ের স্বাক্ষর নিয়ে এক আবেদন পাঠানো হোল বিলাতের উপনিবেশ-সেক্রেটারী লর্ড রিপনের কাছে।

তথাপি নেতালের আইন সভায় আইনটি ঠিক পাস হয়ে গেল।

গান্ধিজী বললেন—আর তো করার কিছু নেই, এবার আমি ভারতে ফিরে যাই!

আবার সেই পুরানো কথা উঠলো—আপনি গেলে কে আমাদের চালাবে?

—কিন্তু এসব করলে আমার খরচ চলবে কেমন করে?

—আপনার খরচ আমরা চালাবো, মাসে মাসে আমাদের সমিতি থেকে আপনি পঁচিশ পাউণ্ড করে পাবেন!

—তা হয় না, জনসেবার কাজে পয়সা নিতে নেই, আমি বরং এখানে ওকালতি সুরু করি, আপনারা আমাকে কিছু কিছু কাজ দিন!

সকলে সানন্দে রাজী হোল।

গান্ধিজী ওকালতি করার জন্য আবেদন করলেন।

বার এসোসিয়েশনে সাড়া পড়ে গেল,—একটা কুলি ব্যারিষ্টার এসে বসবে তাদের মাঝে? একবার একটা কুলিকে ঢুকতে দিলে আর রক্ষা আছে, কুলি উকিল আর কুলি ব্যারিষ্টারে আদালত ছেয়ে যাবে! ধলা আইনজীবিরা এক সঙ্গে আপত্তি জানালো—গান্ধীকে এখানে চেনে কে? যে-গান্ধী ব্যারিষ্টারী পাশ করেছে এই মানুষটিই ঠিক সেই-গান্ধী কিনা, কি করে জানা যাবে? ইত্যাদি…

প্রধান বিচারপতির কাছে কিন্তু এ সব কথা টিকলো না, তিনি বললেন—আইনের চোখে কালা-ধলার কোন পার্থক্য নেই, মিষ্টার গান্ধী এখানে ব্যারিষ্টারী করতে পারেন।

গান্ধিজী নেতাল কোর্টে ব্যারিষ্টারী সুরু করলেন।

তিনমাস পরের কথা।—

একদিন সকালে একজন মাদ্রাজী এসে গান্ধিজীর সামনে পাগড়ী খুলে দাঁড়ালো: জামা কাপড় ছিঁড়ে গেছে, সামনের দুটি দাঁত ভেঙে রক্ত ঝরছে, থর থর করে সে কাঁপছে ও কাঁদছে।

—কি হয়েছে ?—বিস্ময়ে গান্ধিজী জিজ্ঞাসা করলেন।

আগন্তুক নিজের দুঃখের কাহিনী বললো। জাতে সে তামিল, নাম তার বলসুন্দরম্, ডারবানের এক নামকরা সাহেবের সে গিরমিটিয়া কুলি। সামান্য কি একটা দোষ হয়েছিল, তাতেই সাহেব ক্ষিপ্ত হয়ে তাকে এমন মার দিয়েছে যে, তার দাঁত ভেঙে গেছে। এখন যদি গান্ধিজী তার কিছু প্রতিকার করতে পারেন!

—তাতো বুঝলাম, কিন্তু মাথা থেকে পাগড়ী খুললে কেন? পাগড়ী পর—

—আজ্ঞে আপনি মানী লোক······

—আমি তোমাদেরই মত একজন।

এমন কথা বলসুন্দরম্ আশা করে নি, চিরদিন অন্যলোককেই সে সম্মান দেখিয়েছে। সে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল।

গান্ধিজী বললেন—কই পাগড়ী বাঁধো!

বলসুন্দরম্ পাগড়ী বাঁধলো।

তারপর গান্ধিজী তাকে পাঠালেন এক ডাক্তারের কাছে।

বলসুন্দরমের জন্য কতটুকু কি করা যায় সেইটাই হোলো গান্ধিজীর ভাবনা।

আফ্রিকার সাহেবেরা ভারত সরকারের সঙ্গে চুক্তি করে ওদেশে মজুর আমদানী করতো। সর্ত থাকতো যে পাঁচ বছর করে তারা কাজ করবে তারপর তাদের ছেড়ে দেওয়া হবে। চুক্তি কথাটিকে ইংরাজীতে বলে 'এগ্রিমেণ্ট', অশিক্ষিত ভারতবাসীর মুখে-মুখে সেইটাই হয় 'গিরমিটিয়া'।

বলসুন্দরম্ এমনি একজন গিরমিটিয়া মজুর।

গান্ধিজী বলসুন্দরমের মনিবের সঙ্গে দেখা করলেন, বললেন—আপনি যে ভাবে মারধর করেছেন তাতে আপনার নামে যদি আমরা মামলা করি, আপনার সাজা হয়ে যাবে, কিন্তু আমি তা চাই না, আপনি বলসুন্দরমকে ছেড়ে দিন।

সাহেব দেখলেন বেগতিক, বললেন—বেশ আমি ওকে ছেড়ে দোব, আপনি ব্যবস্থা করুন।

এই ব্যবস্থা করার মধ্যেও আবার আর এক হাঙ্গামা আছে। গিরমিটিয়া মজুরেরা এদেশে আসে পাঁচ বছরের চুক্তিতে। এই পাঁচ বছরের আগে তার মুক্তি নেই, এক সাহেব তাকে অন্য সাহেবের কাছে দিতে পারে, কিন্তু মেয়াদ ফুরোবার আগে তাকে ছেড়ে দিতে পারে না।

গান্ধিজী অনেক খুঁজে-পেতে একজন ভালো সাহেব ঠিক করলেন, বলসুন্দরম্ হাত পালটালো।

এই গিরমিটিয়া মজুরদের উপর নেতাল সরকার মাথা পিছু বার্ষিক পঁচিশ পাউণ্ড —প্রায় তিনশো পঁচাত্তর টাকার এক ট্যাক্স্ বসিয়ে দিলে।

এই ট্যাক্স্ বসাবার পিছনে একটা উদ্দেশ্য ছিল। যে মজুরদের ভারতবর্ষ থেকে চুক্তি করে আনা হোত, তারা আর দেশে ফিরতো না। পাঁচ বছর কাজ করার পরে তাদের চুক্তির মেয়াদ শেষ করে তারা স্বাধীনভাবে নেতালে বাস করতে পারতো। দক্ষিণ আফ্রিকার জমি খুব উর্বরা, কম খেটে বেশী ফসল পাওয়া যায়। তারা তখন জায়গা-জমি কিনে চাষ-আবাদ সুরু করতো। নিগ্রোদের সঙ্গে ভারতীয়-দের কারবারও রীতিমত জমে উঠলো। সাহেবদের দোকানে নিগ্রোরা ভাল ব্যবহার পেতো না, চার শিলিংয়ের জিনিষ কিনে সাহেবের হাতে একটি পাউণ্ড দিয়েছে, সাহেব হয়তো খুচরো কিছুই ফেরৎ দিল না, নয়তো দয়া করে চার শিলিং ফেরত দিল। বাকীটা ফেরত চাইলেই লাথি, থাপ্পড়, গালাগালি। কিন্তু ভারতীয়দের দোকানে গেলে সে ভয় নেই, সেখানে ভদ্র ব্যবহার পাওয়া যায়, দরদস্তুর করা যায়। নিগ্রোরা সেই জন্য ভারতীয়দেরই বেশী পছন্দ করে।

নিজেদের ব্যবসা খারাপ হতেই সাহেবদের বিদ্বেষ বাড়ে, ভারতীয়দের সে-দেশ থেকে তাড়াবার জন্য তারা রীতিমত সচেষ্ট হয়ে উঠলো। নেতাল সরকার আইন পাস করে দিল: ভারতীয় কুলিদের চুক্তির মেয়াদ ফুরিয়ে গেলেই, হয় তারা আবার নূতন করে চুক্তি করবে, আর না হয় মাথাপিছু বছরে পঁচিশ পাউণ্ড—প্রায় তিনশো পঁচাত্তর টাকা কর দিতে হবে।

এত বড় একটা অন্যায়কে স্বীকার করে নেওয়া যায় না। গান্ধিজী সমস্ত ভারতীয়কে সঙ্ঘবদ্ধ করে যে সমিতি গড়েছিলেন, তার নাম দিয়েছিলেন—নেতাল ভারতীয় কংগ্রেস। সেই কংগ্রেস এবার এই আইনের বিরুদ্ধে আন্দোলন সুরু করলো।

এই আন্দোলনের রেশটুকু ভারতবর্ষেও এসে পৌছল। লর্ড এলগিন তখন ভারতের বড়লাট, এতটা বাড়াবাড়ি তাঁর ভালো মনে হোল না, তিনি প্রতিবাদ করলেন। নেতাল সরকার করের পরিমাণ কমিয়ে তিন পাউণ্ডে নাবালো।

কিন্তু তিন পাউণ্ড করও তো কম নয়। সাধারণতঃ যদি একটি সংসারে বাপ মা ও দুটি ছেলে মেয়ে থাকে তাহলেই বাপকে বছরে বারো পাউণ্ড কর দিতে হবে।

একজন গরীব লোক শুধু ভারতীয় বলেই মিছামিছি একশত আশী টাকা বছরে কর দেবে কেন ? একেবারে কর তুলে দেবার জন্য আন্দোলন চলতে লাগলো।

এইভাবে তিনটি বছর কেটে গেল, গান্ধিজী এবার কিছুদিনের জন্য দেশে ফিরলেন।

এই সময় বোম্বাইয়ে প্লেগ দেখা দিল।

রাজকোটের মানুষও শঙ্কিত হয়ে উঠলো, স্বাস্থ্যরক্ষা সমিতি গঠিত হোল—বোম্বাইয়ের প্লেগ রাজকোটে যেন সংক্রামিত না হয়।

গান্ধিজী এই দলে যোগ দিলেন।

প্রতি গৃহ পর্যবেক্ষণ করার কথা উঠলো।

গান্ধিজী বললেন—খালি ঘর দেখলেই হবে না। প্রত্যেক বাড়ীর পায়খানা-গুলো আগে দেখতে হবে—ওইখান থেকেই তো রোগ ছড়ায়।

পায়খানা পরিদর্শন সুরু হোল।

ব্রাহ্মণ, ক্ষেত্রী, ছত্রী প্রভৃতিদের পায়খানা দেখতে আপত্তি উঠলো না, কিন্তু ঢেড়বাড়া অস্পৃশ্য বস্তিতে যাবার সময় সবাই বেঁকে বসলো—যাদের ঘরে ঢুকলে স্নান করতে হয়, তাদের পায়খানা দেখতে হবে ?

গান্ধিজী বললেন—কেউ না যায় আমি একাই যাব।

সমিতির আরেকজন সাড়া দিল, বললো—আপনি গেলে আমিও যাব।

দু'জনে গিয়ে ঢুকলেন অস্পৃশ্য পল্লীতে। আজ অবধি সে পাড়ায় কোন ভদ্রলোক ঢোকেনি। তারা তো দু'জনকে নিয়ে কি করবে ভেবে পায় না, বাড়ীর ভিতরে বাহিরে গান্ধিজীকে সব দেখিয়ে দেয়—চারিপাশ গোবর দিয়ে নিকানো ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে,—নগরের অনেক বামুন-বাড়ীর চেয়েও ভালো।

এর আগে গান্ধিজী আর কখনও কোন অস্পৃশ্য পাড়ায় ঢোকেননি।

ইতিমধ্যে গান্ধিজী ঠিক করলেন—দক্ষিণ আফ্রিকার ব্যাপার নিয়ে এদেশে একটা সাড়া তুলতে হবে।

রাজকোটে বসে মাসখানেক ধরে তিনি একখানি ছোট বই লিখলেন। তাতে দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়েরা কি অবস্থায় আছে তাই লিপিবদ্ধ করলেন। দশ হাজার ছেপে বইখানি বিনামূল্যে বিতরণ করলেন যত খবরের কাগজের আপিস আর চিন্তাশীল লোকদের কাছে।

দেশে একটা সাড়া পড়ে গেল।

বইখানির মলাট ছিল সবুজ, লোকে তার নাম দিল 'সবুজ পুঁথি'।

তারপর দেখা করলেন জজ মহাদেব গোবিন্দ রাণাডের সঙ্গে। রাণাডে সব শুনে বললেন—জজ্ বদরুদ্দীন তায়েবজীর সঙ্গে একবার দেখা কর।

গান্ধিজী গেলেন তায়েবজীর কাছে। তায়েবজী বললেন—বোম্বাইয়ের বাঘ স্যার ফিরোজশা মেটার কাছে একবার যাও।

মেটার সঙ্গে গান্ধিজীর কথা হোল মাত্র দু' মিনিট। সেক্রেটারীকে ডেকে মেটা তখনই বোম্বাইয়ে এক জনসভা করার তারিখ ও সময় ঠিক করে ফেললেন।

এদিকে সভা হবার দু'দিন আগে গান্ধিজীর ভগ্নিপতি মারা গেলেন, মনটা বড় বিষণ্ণ, সভায় কি বলবেন কিছুই ঠিক করেননি, অথচ তিনিই সভার প্রধান বক্তা। ফিরোজশার সঙ্গে দেখা করতেই তিনি বললেন—যাই বল না কেন লিখে বলবে, বক্তৃতা লেখা না থাকলে খবরের কাগজে যা খুসি তাই ছেপে দেবে!

সেই দিন রাত এগারোটা অবধি গান্ধিজীকে বক্তব্যটুকু লিখতে হোল।

পরদিন স্যার কাওয়াস্জী-জাহাঙ্গীর-ইন্‌ষ্টিটিউটে সভা বসলো, শত শত ছাত্রের ভীড়। বক্তৃতা পাঠ করতে উঠে গান্ধিজীর মুখ থেকে আর কথা সরে না। ফিরোজশা উৎসাহ দিয়ে বললেন—জোরে পড়!

কিন্তু পড়বে কে? গান্ধিজী তখন কাঁপতে সুরু করেছেন।

কেশবরাও দেশপাণ্ডে এগিয়ে এলেন, বললেন—দাও আমি পড়ি—

কাগজখানি তাঁর হাতে তুলে দিয়ে গান্ধিজী স্বস্তি পেলেন। কিন্তু জনতা চীৎকার করে উঠলো—ওয়াচা পড়ুক! ওয়াচা!

দীন্‌শা এদুলজী ওয়াচা বক্তৃতাটা পড়তে সুরু করলেন।

জনতা স্তব্ধ হয়ে শেষ অবধি শুনলো। পরদিন বোম্বাইয়ের সব কাগজেই সাড়া পড়ে গেল।

গান্ধিজী বোম্বাই থেকে গেলেন পুণায়। লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলকের সঙ্গে দেখা করলেন। তিলক জিজ্ঞাসা করলেন—আপনি গোপাল রাওয়ের সঙ্গে দেখা করেছেন?

—গোপাল রাও কে?

—আমি গোপাল কৃষ্ণ গোখলের কথা বলছি। এখানে দুটি দল আছে, একটি আমার দল 'সার্বজনিক সভা'। আরেকটি গোখলের দল 'দাক্ষিণাত্য সভা'। দুই

দলের মধ্যে বেশ রেষারেষিও আছে। যদি আমার দলের কাউকে সভাপতি করেন তাহলে গোখলের দলের কেউ সেই সভায় আসবে না, আর যদি গোখলের দলের কাউকে সভাপতি করেন তাহলে আমার দলের লোক সেই সভায় যাবে না। সেই জন্যই আপনার সভায় এমন একজন লোককে সভাপতি করতে হবে, যিনি কোন দলের নন্। যেমন ধরুন অধ্যাপক ভাণ্ডারকর।

গান্ধিজী গোখলের সঙ্গে দেখা করলেন।

সব কথা শুনে গোখলে বললেন—লোকমান্য ঠিক কথাই বলেছেন, আপনি ডক্টর ভাণ্ডারকরকে সভাপতি করুন।

ডক্টর ভাণ্ডারকরকে সভাপতি করে পুণায় সভা হোল। এতো লোক সমবেত হয়েছিল যে, সভা-ঘর ছাপিয়ে রাস্তাতেও লোক দাঁড়িয়েছিল।

পুণার পর মাদ্রাজ। 'হিন্দু'র সম্পাদক ডাক্তার সুব্রাহ্মনিয়মের সভাপতিত্বে মাদ্রাজের 'পাচাইয়াপ্পা হলে' বিরাট সভা হোল।

তারপর কলিকাতা।

গান্ধিজী সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করলেন। সুরেন্দ্রনাথ সব শুনে বললেন—আমাদের এই দেশেই এতো অন্যায় অবিচার ঘটছে তারই কোন প্রতিবিধান হয় না, আর সুদূর দক্ষিণ আফ্রিকায় কি হচ্ছে না-হচ্ছে তা নিয়ে সাধারণ লোকের মাঝে সাড়া তোলা খুব কঠিন। দু'দশ জনের সঙ্গে আগে দেখা-সাক্ষাৎ করুন।

গান্ধিজী গেলেন 'অমৃত বাজার পত্রিকার' আফিসে, সেখানে কারুর কোন উৎসাহ দেখা গেল না।

'বঙ্গবাসীর' সম্পাদকের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে গান্ধিজীকে বাইরে বসে থাকতে হোল এক ঘণ্টা। তারপর যখন দক্ষিণ আফ্রিকার কথা পাড়লেন, সম্পাদক মশাই বললেন—আমার এখন এতটুকু অবসর নেই, আপনার কথা এখন শুনতে পারছি না, আপনি আর এক সময় আসবেন।

গান্ধিজী ক্ষুণ্ণ মনে সেখান থেকে বেরিয়ে এলেন।

এবার তিনি গেলেন ষ্টেটস্‌ম্যান আর ইংলিশম্যানের আপিসে। সম্পাদক দু'জনেই গান্ধিজীর সঙ্গে অনেক কথার আলোচনা করলেন, শেষে দীর্ঘ দুটি বিবৃতি ছাপলেন তাঁদের দুই কাগজে।

গান্ধিজী এবার উৎসাহ পেলেন, ঠিক করলেন কলকাতায় একটা সভা করবেন। সবে উদ্যোগ-আয়োজন সুরু করেছেন, এমন সময় তারবান থেকে 'তার' এলো—শীঘ্র আসুন!

কলিকাতায় আর সভা করা হোল না, তিনি ফিরে গেলেন বোম্বাইয়ে এবং সেখান থেকে যাত্রা করলেন দক্ষিণ আফ্রিকায়।

একই দিনে দু'খানি জাহাজ এসে পৌছালো ট্রান্সভালে—'কুরল্যাণ্ড' ও 'নাদেরী'। জাহাজ দু'খানিতে যাত্রী ছিল প্রায় আট শো। যাত্রীরা আসছে বোম্বাই থেকে। বোম্বাইয়ে তখনও প্লেগ হচ্ছে। নেতালের সরকারী ডাক্তার হুকুম জারী করলেন—সবাইকে আরো পাঁচ দিন জাহাজে থাকতে হবে, প্লেগের বীজাণু মানুষের দেহে তেইশ দিন অবধি বেঁচে থাকে। বোম্বাই থেকে আসতে লেগেছে আঠারো দিন, আরো পাঁচদিন তাদের দেখা দরকার।

কিন্তু নেতালে তখন অন্য ব্যাপার চলছে। সাহেবরা শুনেছে গান্ধিজী 'সবুজ পুঁথি' লিখে তাদের নিন্দে করেছেন, ভারতবর্ষে বড় বড় সভা করে তাদের গালি দিয়েছেন। এখন আবার দু' জাহাজ ভর্তি লোক নিয়ে এসেছেন সেই দেশ থেকে। এক সভা করে সাহেবরা ঠিক করলো—জাহাজ থেকে গান্ধীর দলকে নাবতে দেওয়া হবে না।

জাহাজের মালিককে ভয় দেখানো হোল—জাহাজ দু'খানি সে যদি আবার বোম্বাই ফিরিয়ে না নিয়ে যায় তাহলে তার ব্যবসায়ের সমূহ ক্ষতি হবে।

জাহাজের যাত্রীদের কাছে ইস্তাহার পাঠানো হোল—যদি কেউ জাহাজ থেকে নাবে তাহলে তাকে তৎক্ষণাৎ জলে ফেলে দেওয়া হবে।

এই ইস্তাহার দেখে যাত্রীরা কিন্তু ভয় পেল না, তাদের অনেকেই দক্ষিণ আফ্রিকার পুরানো বাসিন্দা, এখানে তাদের বাড়ী আছে, ব্যবসা আছে, এখানে তারা নাববেই।

শেষ অবধি যাত্রীদের জয় হোল। তেইশ দিন পরে সরকারী হুকুম পাওয়া গেল —জাহাজ থেকে যাত্রীরা এবার নাবতে পারে।

জাহাজ ডকে এসে লাগলো, যাত্রীরা নাবতে সুরু করলো, গান্ধিজীও নাববার জন্য তৈরী হচ্ছেন এমন সময় সরকার পক্ষের একজন লোক খবর পাঠালেন—সাহেবদের যত রাগ গান্ধিজীর উপর, গান্ধিজীকে পেলে এখনি হয়তো তারা মেরে ফেলবে। তিনি যেন সন্ধ্যার অন্ধকারে জাহাজ থেকে নাবেন, ডক-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট তাঁকে সঙ্গে করে বাড়ী পৌছে দেবেন।

গান্ধিজী রাজী হলেন।

জাহাজের ক্যাপটেন হাসতে হাসতে বললো—যদি সত্যি ওরা মারপিট করে, আপনাকে জলে চুবিয়ে দেয়—আপনি কি করবেন?

গান্ধিজী বললেন—কিছুই না। ওদের বিরুদ্ধে আমার তো করার কিছু নেই। —ওরা ভাবছে ওরা যা করছে ঠিকই করছে, এই অজ্ঞতার জন্য ওদের প্রতি করুণা করা ছাড়া আর কি করতে পারি? আশা করি ভগবান আমাকে সকল দুঃখ সইবার মত শক্তি দেবেন।

কিছুক্ষণ পরে গান্ধিজীর উকিল-বন্ধু লাফটন সাহেব এসে বললেন—সন্ধ্যার অন্ধকারে নাবা আমি ভালো বলে মনে করি না, কার মনে কি আছে কে জানে, দিনে-দিনে যাওয়াই ভালো।

জাহাজে কস্তুরবা ও ছেলেরা ছিলেন, তাঁদেরকে গাড়ীতে তুলে দিয়ে লাফটনের সঙ্গে গান্ধিজী হাঁটতে সুরু করলেন।

পথে নাবতেই পাগড়ী দেখে একদল ছোকরা গান্ধিজীকে চিনতে পারলো। চীৎকার তুললো—গান্ধী যাচ্ছে, গান্ধী! মার মার!

কয়েকটি বয়স্ক বালক ঢিল ছুঁড়ে মারলো, হৈ-চৈ পড়ে গেল রাস্তার মাঝে।

সামনে পুরা দু'মাইল পথ, এভাবে হেঁটে যাওয়ার বিপদ আছে, লাফটন একখানি রিক্‌সা ডাকলেন। চারিপাশের ছেলেরা রিক্‌সাওলার উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো—গান্ধিজী উঠলেই তারা রিক্‌সা ভেঙ্গে দেবে। রিক্‌সা-ওলা পালিয়ে গেল।

দেখতে দেখতে গান্ধিজীর চারিপাশে শত শত ছেলে বুড়ো জড়ো হয়ে গেল। ভীড় ঠেলে আর অগ্রসর হবার উপায় রইল না। কয়েকজন সাহেব টেনে লাফটনকে দূরে সরিয়ে দিল। তারপর সুরু করলো গান্ধিজীকে প্রহার—পচা ডিম, ইটপাটকেল, কিল, চড়, ঘুসি, লাথি, কিছুই বাদ রইল না।

মারের চোটে গান্ধিজীর মাথা ঘুরে গেল, টলে পড়ে যাচ্ছিলেন, এমন সময় হাতের কাছে একটি বাড়ীর রেলিং পেয়ে চেপে ধরলেন। তখনও মারের বিরাম নেই। নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে, চোখ অন্ধকার হয়ে এলো, হাতেও আর জোর পাচ্ছেন না, এবার বুঝি আর জীবনের আশা নেই!

ডারবানের পুলিশ-সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের স্ত্রী শ্রীমতী আলেকজাণ্ডার যাচ্ছিলেন সেই পথ দিয়ে। গান্ধিজীকে তিনি চিনতেন। ভীড়ের মাঝে গান্ধিজীকে দেখতে পেয়ে এগিয়ে এলেন, পাশে এসে ছাতা খুলে গান্ধিজীকে আড়াল করে ধরলেন। শ্রীমতীকে আঘাত না করে গান্ধিজীকে আঘাত করার উপায় রইলো না। জনতা ক্ষান্ত হতে বাধ্য হোল।

এক ভারতীয় যুবক ব্যাপারটা দেখছিল, এবার সে ছুটে গিয়ে থানায় খবর দিল।

খবর পেয়েই আলেকজাণ্ডার সাহেব পুলিশ নিয়ে এলেন, চারিপাশে পুলিশ

ঘেরাও করে গান্ধিজীকে রুস্তামজীর বাড়ী পৌঁছে দিলেন। গান্ধিজীর সারা দেহ তখন ক্ষত বিক্ষত। জাহাজের ডাক্তার দাদী বরজোর তখন সেখানেই ছিলেন, তিনি গান্ধিজীর শুশ্রূষায় নিযুক্ত হলেন।

এদিকে রুস্তামজীর বাড়ীর সামনে ক্রমশঃই ভীড় জমছে। গোরারা চীৎকার করছে—ভাল চাও তো গান্ধীকে আমাদের হাতে ছেড়ে দাও,...নাহলে বাড়ীতে আগুন দোব,...দোকানে আগুন দোব, গুষ্টিসুদ্ধ পুড়িয়ে মারবো...।

আলেকজাণ্ডার সাহেব নিজে রুস্তামজীর বাড়ীর ফটকে দাঁড়িয়ে ছিলেন, উন্মত্ত জনতার হালচাল তাঁর কাছে ভালো মনে হলো না। ভিতরে গান্ধিজীর কাছে তিনি খবর পাঠালেন,—জনতাকে আর বেশীক্ষণ সামলে রাখা যাবে না। তারা একবার ভিতরে গিয়ে ঢুকলে কিছুই আর আস্ত থাকবে না। বাড়ীতে আগুন লাগিয়েও দিতে পারে। সবদিক রক্ষা করতে হলে এখানে আর একদণ্ডও আপনার থাকা চলবে না। আপনি তৈরী হলেই আমার লোক আপনার পালাবার ব্যবস্থা করে দেবে।

আত্মীয় বন্ধুদের রক্ষার জন্য গান্ধিজী আর দ্বিমত করলেন না। আলেকজাণ্ডার দু'জন ডিটেকটিভকে ভিতরে পাঠিয়েছিলেন; তাদের একজন মুখে কালো রং মেখে ভারতীয় ব্যবসায়ীর পোষাক পরলো। গান্ধিজীকে পরালো এক কনষ্টেবলের পোষাক। যদি আবার কেউ চিনতে পেরে ঢিল ছোঁড়ে, তাই মাথার উপর একটি হেল্‌মেট্ রেখে চারিপাশে মাদ্রাজী পাগড়ী বাঁধলেন। তারপর রুস্তামজীর বাড়ীর পিছনের দরজা দিয়ে বাহির হয়ে, একটি সরু গলি পার হয়ে এক দোকানে গিয়ে ঢুকলেন। দোকানের পিছনের গুদামের ভিতর দিয়ে গিয়ে নাবলেন জনতার মাঝে। জনতার তখন সে দিকে দৃষ্টি ছিল না। সন্ধ্যার অন্ধকারে নির্বিঘ্নে তিনজনে এক মোটরে গিয়ে উঠলেন এবং থানায় এসে পৌঁছুলেন।

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট জনতার সঙ্গে এতক্ষণ হাসি তামাসা করছিলেন, এবার গান জুড়ে দিলেন :

Hang Old Gandhi
On the sour apple tree...

[ বুড়ো গান্ধীকে ঝুলিয়ে দাও, টক আপেল গাছের ওই ডালে। ]

গান্ধী চলে গেছেন খবর পেয়েই তিনি এবার জনতাকে মুখোমুখি প্রশ্ন করলেন—তোমরা কি চাও ?

—আমরা গান্ধীকে চাই।

—তাকে নিয়ে কি করবে ?

—পুড়িয়ে মারবো।

—কেন, তিনি কি করেছেন ?

—সে হিন্দুস্থানে সভা-সমিতি করে আমাদের মিছামিছি গালি দিয়েছে, হাজার হাজার ভারতীয়কে এখানে নিয়ে আসছে।

—কিন্তু তিনি যদি এখন বাইরে না আসেন ?

—তাহলে এই বাড়ীটাই জ্বালিয়ে দোব।

—এখানে তার স্ত্রী ও পুত্রেরা আছেন। আরো অনেক মহিলা ও ছেলেমেয়ে আছেন, তাদেরকে পুড়িয়ে মারতে তোমাদের লজ্জা করবে না ?

—সে তো আপনারই দোষ, আপনি তাকে এনে আমাদের হাতে ছেড়ে দিন, সব মিটে যাক—

আলেকজাণ্ডার হেসে বললেন—কাকে এনে দোব ? গান্ধিজী এবাড়ীতে নেই। অনেক আগেই এখান থেকে পালিয়েছেন তিনি !

—মিছে কথা ! মিছে কথা।

—বেশ, আমার কথায় যদি তোমাদের বিশ্বাস না হয়, তোমরা ক'জন এসে বাড়ীর ভিতর খুঁজে দেখ।

তখনই জনকয়েক বাড়ীর ভিতর ঢুকে পড়লো, রুস্তামজীর বাড়ীর প্রত্যেকটি ঘর তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখলো, তার পর বাইরে এসে জনতাকে বললো—সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের কথাই ঠিক, গান্ধী নেই !

জনতা একে একে প্রস্থান করলো।

বিলাতে এ খবর গেল। চেম্বারলেন তখন ঔপনিবেশিক মন্ত্রী ছিলেন, তিনি নেতাল গবর্মেণ্টের কাছে টেলিগ্রাম করলেন—অপরাধীদের সাজা দিতে হবে।

মিষ্টার এস্‌কম্ব ছিলেন বিচার বিভাগের বড় কর্তা। তিনি গান্ধিজীকে ডেকে বললেন—যারা আপনাকে মেরেছে তাদের মধ্যে যাকে-যাকে আপনি চেনেন তাদের বিরুদ্ধে নালিশ করুন। আমরা আপনাকে সাহায্য করবো।

গান্ধিজী বললেন—তাদের উপর আমার কোন রাগ নেই, দোষ তো তাদের উপরওয়ালাদের। তারা যেমন বুঝিয়েছে এরা তেমনি বুঝেছে। আমি কারুর নামে নালিশ করবো না।

—বেশ, আপনি তাহলে এই কথাগুলোই লিখে দিন, আমি চেম্বারলেন সাহেবকে জানাবো।

গান্ধিজী তখনই লিখে দিলেন।

কাগজে কাগজে যখন এই খবর বেরুলো তখন সাহেবরা সত্যি লজ্জা পেলো, সবাই উন্মত্ত গুণ্ডার দলকে নিন্দা করলো। চারদিন পরে গান্ধিজী থানা থেকে বাড়ী ফিরলেন।

ব্যারিষ্টারী করতে হলে ফিটফাট থাকতে হয়। প্রতিদিন কলার পালটাতে হয়, সার্ট বদলাতে হয়। গান্ধিজীর দু'তিন ডজন সার্ট ও কলার ছিল। কিন্তু তবু কুলায় না। ধোপা ঠিক সময় কখনও কাপড় আনতো না, এক-এক সময় গান্ধিজী অত্যন্ত বিব্রত বোধ করতেন।

শেষে গান্ধিজী ধোলাই বিদ্যার বই কিনলেন। নিজে কাপড় কাচতে শিখলেন। স্ত্রীকেও শেখালেন।

প্রথম বারে যে কলারটি কাচলেন, সেটা এতো বিশ্রী হোল যে আদালতে যেতে না যেতেই বন্ধু ব্যারিষ্টারদের নজরে পড়লো, তারা তো হেসেই আকুল, বললো—তোমার কলার থেকে অতো শাদা-শাদা গুঁড়ো পড়ছে কেন ?

—কলারটা আমি নিজেই কেচেছি কিনা। সবে হাতেখড়ি, ঠিক বুঝতে পারিনি, বেশী মাড় দেওয়া হয়ে গেছে।

—নিজে কাচলে কেন, এদেশে কি ধোপা নেই ?

—নিজে কেচেছি বলেই তো আপনারা এত আনন্দ পেলেন। আর এবার থেকে আমি নিজেই কাচবো ঠিক করেছি, কারণ ধোপারা একটা কলার কাচতে যা মজুরী নেয় তাই দিয়ে একটা নতুন কলার কেনা যায়, তার উপর ধোপারা কোন-দিনই ঠিক সময় কাপড় দেয় না। এবার থেকে আর সে ভয় রইল না।

বন্ধুরা কিন্তু সে কথায় কান দিল না। হাসি তাদের থামলো না।

আরেকবারের ঘটনা।

প্রিটোরিয়াতে গান্ধিজী এক চুল ছাঁটাইয়ের দোকানে গিয়েছিলেন চুল ছাঁটতে।

নাপিতটি সাহেব। গান্ধিজীকে দেখেই সে ঠোঁট উল্টে বললো—কুলিদের চুল আমি ছাঁটি না।

গান্ধিজী ক্ষুণ্ণ হলেন। তখনই একখানি কাঁচি কিনে নিয়ে এলেন। আরসীর সামনে দাঁড়িয়ে নিজের চুল নিজেই ছাঁটতে সুরু করলেন। সামনের চুলগুলো নেহাৎ খারাপ ছাঁটা হলো না, কিন্তু পিছনের চুলগুলো নিয়েই হোল মুস্কিল।

পরদিন কোর্টে গিয়ে টুপি খুলতেই, ব্যারিষ্টার মহলে হাসির ধুম পড়ে গেল।

—আরে গান্ধি, তোমার চুলগুলো অমন হোল কেন? রাত্রে ইঁদুরে খেয়ে গেছে বুঝি!

—সাদা নাপিতে কালো লোকের চুল ছাঁটতে চাইল না। কাজেই নিজের চুল নিজেই ছাঁটলাম!

কিন্তু সে কথায় কি আর হাসি থামে।

আঠারো শো নিরানব্বই সালে বাধলো 'বুয়ার যুদ্ধ'।

দক্ষিণ আফ্রিকায় চারিটি রাজ্য আছে, ট্রান্সভাল, অরিঞ্জিয়া, নেতাল ও কেপকলোনি। এর প্রথম দুইটিতে ডাচদের প্রাধান্য ছিল, আর শেষ দুটি রাজ্যে ছিল ইংরাজ প্রাধান্য। দক্ষিণ আফ্রিকার ওলন্দাজদেরকে বুয়ার বলা হয়। ট্রান্সভালে অনেক সোনার খনি আছে, হীরের খনিও আছে। এই খনিগুলির দখলী স্বত্ব উপলক্ষ্য করেই ইংরাজ ও বুয়ারদের মধ্য লড়াই বাধে।

চারিদিকেই সাজ সাজ রব। উকিল ও ব্যবসায়ী, চাষা ও কেরাণী সবাই লড়াইয়ে চললো।

ভারতীয়দের মধ্যে কোন উত্তেজনা দেখা গেল না, তারা বললো—বৃটিশ ও বুয়ার দুই আমাদের কাছে সমান, ট্রান্সভালে আমাদের যে দুঃখ নেতালেও সেই দুঃখ—ওদের লড়াইয়ে আমাদের মাথা ঘামাবার কিছু নেই।

ইংরাজেরা বললো—তাতো আমরা জানি, তোমরা এদেশে এসেছ পয়সা লুটতে, আমাদের জন্য কিছুই তোমরা করবে না।

সত্যই তো এই সময় একটা কিছু করা উচিত।

গান্ধিজী এক 'এম্বুলেন্স কোর' সংগঠন করলেন। তাতে এগারো-শো ভারতীয় যোগ দিলেন। এদের মধ্যে গিরমিটিয়া কুলি ছিল সাত-শো জন।

প্রথমে সেবাদল কাজ সুরু করলো যুদ্ধের সীমানার বাইরে। কিন্তু ইংরাজেরা যখন একে একে পরাজিত হতে লাগলো, তখন আহতের সংখ্যা এতো বৃদ্ধি পেল যে, সেনাপতি বুলার বলে পাঠালেন—যুদ্ধের সীমার ভিতর যেতে আপনারা বাধ্য নন, তবু যদি তার ভিতর থেকে আহতদের উদ্ধার করে আনার ভার নেন, তাহলে আমরা কৃতজ্ঞ থাকবো।

সেবাদল বিপদের মুখে যাবার জন্য প্রস্তুত ছিল, গুলিগোলার মুখে গিয়েই তারা কাজ সুরু করলো।

যেখানে লড়াই চলছিল সেখানে কোন পাকা রাস্তা ছিল না, সেখান থেকে হাসপাতাল ছিল কুড়ি-পঁচিশ মাইল দূরে। আহতদের ষ্ট্রেচারে শুইয়ে এই পঁচিশ মাইল মাঠের উপর দিয়ে যাতায়াত করতে হোত। সকাল আটটায় যাত্রা স্থরু হোত আর বিকাল পাঁচটায় তারা এসে পৌঁছাত হাসপাতালে। এই সময় ইংরাজ ও ভারতবাসীর মধ্যে বর্ণ বৈষম্যের ভাব ছিল না, সব একাকার হয়ে গিয়েছিল। একদিন দুপুর রোদে যখন দু'দলে পাশাপাশি আহতদের নিয়ে মার্চ করে যাচ্ছে, তৃষ্ণায় গলা শুকিয়ে গেছে, এমন সময় এক ঝর্ণার ধারে এসে তারা থামলো, কোন্ দল আগে জল পান করবে সেই হোল প্রশ্ন।

ভারতীয়েরা বললো—তোমরা আগে খাও!

ইংরাজেরা বললো—না, তোমরা আগে খাও!

একদলের আগে আরেকদল খাবে না, শেষে দু' দলই একসঙ্গে জলে নাবলো।

মাত্র ছ'য় সপ্তাহ এই ভাবে কাজ চলে। সকলেই কাজের প্রশংসা করেন। দলের সাঁইত্রিশ জনকে ভালো কাজের জন্য মেডেল দেওয়া হয়। সার্জেন্ট গান্ধীও একখানি মেডেল পান।

গান্ধিজী এবার ভারতে ফেরার উদ্যোগ করলেন।

নেতালের বন্ধুরা বিদায় অভিনন্দন জানালো, প্রীতির নিদর্শন হিসাবে অনেক দামী দামী উপহার দিল, সোনা রূপা হীরা জহরত কত কি!

গান্ধিজী সারারাত ভেবে ঠিক করলেন—নিঃস্বার্থ ভাবে তিনি দেশবাসীর সেবা করেছেন, এসব উপহার নিজের জন্য তিনি রাখতে পারেন না। ভারতীয়দের সেবার জন্যই এগুলি তিনি কংগ্রেসের হাতে দিয়ে যাবেন।

কিন্তু কাজটা নেহাৎ সহজ হোল না, কস্তুরবা বললেন—এতো টাকার জিনিষ ছেড়ে দিয়ে চলে যাব, তা হয় না। কাল আমাদের কি অবস্থা হবে কেউ বলতে পারে? নিজে তো বৈরাগী হয়েছ, ছেলেগুলোকেও বৈরাগী করে তুলেছ, বউমা'রা ঘরে এলে তাদের গায় তো কিছু দিতে হবে?

—যদি আমি তখন বেঁচে থাকি আর বউমা'রা গয়না চায়, আমি নিজের রোজগারের টাকা থেকেই তখন তাদের গয়না কিনে দোব।

—তুমি আমারই সব গয়না খুলে নিয়েছ, আর বউমা'দের গয়না কিনে দেবে—তুমি বুঝি সেই লোক! আমি গয়না কিছুতেই দোব না, এ সব আমি পেয়েছি, আমার জিনিষ।

—এসব আমায় জন্যই তো পেয়েছ।

—আর আমাকে যে দিনরাত কুলি-মজুরের মত খাটিয়েছ, তার বুঝি কোন দাম নেই ?

কিন্তু শেষে গান্ধিজীর জয় হোল, কস্তুরবা রাজী হলেন। দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়দের সেবার উদ্দেশ্যে উপহার সামগ্রীগুলি তিনি তাদের হাতেই দিয়ে এলেন।

উনিশ-শো-এক সালে কলিকাতায় কংগ্রেস বসলো, সভাপতি হলেন স্যার দীনশা ওয়াচা।

গান্ধিজী এই প্রথম কংগ্রেসে যোগ দিলেন। রিপন কলেজে গান্ধিজীর থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল। কংগ্রেসের আর যে সব কর্মীরা তাঁর সঙ্গে ছিলেন, তাঁদের অপরিচ্ছন্নতা গান্ধিজীর কাছে অসহ্য হয়ে উঠেছিল। ঘরের সামনে বারান্দাতেই তাঁরা প্রস্রাব করতেন, পায়খানা নোংরা করতেন, দুর্গন্ধে সেদিক দিয়ে চলা যেত না।

গান্ধিজী একদিন একজন স্বেচ্ছাসেবককে বললেন—এসব সাফ করার কোন ব্যবস্থা করা যায় না ?

স্বেচ্ছাসেবকটি জবাব দিল—ওতো আর আমাদের কাজ নয়, ও মেথরদের কাজ।

গান্ধিজী তখন নিজেই একটা ঝাঁটা যোগাড় করে নিয়ে সাফ করতে লেগে গেলেন।

কিন্তু সে আর কতক্ষণের জন্য ! দেখতে দেখতে আবার যে-কে সেই।

বিকালবেলা গান্ধিজী কংগ্রেস আপিসে হাজির হলেন, বললেন—আপনাদের যদি কিছু কাজ থাকে আমাকে দিন, আমি কাজ চাই।

—চিঠি পত্র লিখিতে পারবে ?

—যা দেবেন তাই পারবো।

—বেশ তাহলে এই চিঠিগুলো সব দেখে, বাজেগুলো আলাদা করে রাখবে আর যেগুলো দরকারী বলে মনে করবে আমাকে দেখাবে।

গান্ধিজী কাজ করতে বসে গেলেন।

এই হোল কংগ্রেসের কাজে তাঁর হাতেখড়ি।

মহামতি গোখ্‌লের সঙ্গে আলোচনা করে গান্ধিজী ঠিক করেছিলেন দক্ষিণ আফ্রিকা সম্পর্কে একটা প্রস্তাব তিনি তুলবেন এই সভায়। কিন্তু সাবজেক্ট কমিটীর অধিবেশনে রথী-মহারথীদের সামনে তিনি কোন কথাই বলতে পারলেন না,

এদিকে রাত্ত এগারোটা বাজলো। সকলেই উঠে পড়ার জন্ত ব্যস্ত। স্যার ফিরোজ শা বললেন—তাহলে এইখানেই আমাদের সব প্রস্তাব নির্বাচন শেষ হোল।

গোখলে জোর গলায় বললেন—দক্ষিণ-আফ্রিকা সম্পর্কে গান্ধীর একটা প্রস্তাব রয়েছে।

স্যার ফিরোজ বললেন—প্রস্তাবটি আপনি দেখেছেন ?

—নিশ্চয়।

—আপনি সেটা মনোনীত করেছেন ?

—আমার ভালো লেগেছে।

—বেশ, গান্ধী তোমার প্রস্তাবটা আমাদের শুনিয়ে দাও।

গান্ধিজী কম্পিত কণ্ঠে প্রস্তাবটি পড়লেন।

গোখলে সমর্থন করলেন।

প্রস্তাব পাশ হয়ে গেল।

পরদিন যখন সাধারণ সভার মাঝে স্যার দীনশা তাঁর নাম ডাকলেন। তখনতো গান্ধিজীর মাথা ঘুরে গেল। কোন রকমে প্রস্তাবটি পাঠ করে দক্ষিণ আফ্রিকার প্রবাসী ভারতীয়দের সম্পর্কে দু একটা কথা সবে মাত্র বলেছেন এমন সময় বেল বেজে উঠলো, গান্ধিজী সচকিত হয়ে উঠলেন, কিছুই বলা হোল না, ক্ষুণ্ণ মনে তিনি বসে পড়লেন। তবে একটা সান্ত্বনা রইল যে কংগ্রেস তাঁর প্রস্তাব গ্রহণ করেছে।

•

সেবার গান্ধিজী মাস খানেক কলকাতায় রয়ে গেলেন। গোখ্‌লে ছিলেন বড়বাজারে, গান্ধিজী তাঁরই বাড়ীতে অতিথি হলেন।

এই সময় অনেক বড় বড় লোকের সঙ্গে গান্ধিজী দেখা করেন।

রেভারেণ্ড কালীচরণ ব্যানার্জী, জাষ্টিস্ রমেশচন্দ্র মিত্র, স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজা স্যার প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি মনীষীদের সঙ্গে গান্ধিজী দেখা করেন। স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে দেখা করার জন্য বড়বাজার থেকে হাঁটতে হাঁটতে তিনি একদিন বেলুড় মঠে উপস্থিত হন, কিন্তু সেখানে গিয়ে শুনলেন—স্বামিজীর অসুখ, কলকাতার বাড়ীতে তিনি আছেন, কারুর সঙ্গে দেখা হয় না।

চৌরঙ্গী-ম্যান্‌সনে ভগিনী নিবেদিতার সঙ্গে দেখা করলেন, কিন্তু তাঁর জাঁকজমক দেখে থতিয়ে গেলেন।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের সঙ্গে গোখ্‌লে একদিন গান্ধিজীর পরিচয় করিয়ে দিলেন—ডক্টর রায়, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, আটশো টাকা মাইনে পান, নিজের

জন্ত রাখেন মাত্র চল্লিশ টাকা বাকীটা খরচ করেন দেশের কাজে। ঘর-সংসার বলে কিছু নেই ;—চিরকুমার।

গান্ধিজীকে তখন ব্যারিষ্টার বলে চেনার উপায় ছিল না : পরণে আধময়লা কাপড়, একটী পার্শী কোর্ট, খালি পা, মাথায় টিকি। ইনিই যে দক্ষিণ আফ্রিকায় হৈ-চৈ বাধিয়েছেন একথা বললেও সহজে কেউ বিশ্বাস করবে না।

নতুন লোক কলকাতায় এসেছেন, পথ চিনতে কষ্ট হতে পারে, গোখ্‌লে অনেক সময় গান্ধিজীকে এক একজন সঙ্গী দিতেন।

একদিন এক বাঙালী ভদ্রলোকের সঙ্গে গান্ধিজী বেরিয়েছেন পরেশনাথ-মন্দির আর চিড়িয়াখানা দেখতে। ভদ্রলোক গান্ধিজীর বেশভূষা আর চেহারা দেখেই ধরে নিয়েছেন যে তিনি হিন্দি ছাড়া আর কিছুই বোঝেন না। সমস্ত পথটি তাই ভাঙা ভাঙা হিন্দিতে তিনি সব কিছুই গান্ধিজীকে বোঝাতে সুরু করলেন—পরেশনাথের মন্দিরের ইতিহাস আর চিড়িয়াখানার কোন্ জন্তু কোন্ দেশ থেকে এসেছে।

গান্ধিজী শুনে যাচ্ছেন, হাঁ না কিছুই বলেন না।

কিন্তু ফেরবার সময় ট্রামে বেধে গেল গোলযোগ।

গান্ধিজীর সামনের বেঞ্চে একজন সাহেব বসে ছিলেন। তিনি জুতোশুদ্ধ পা তুলে দিলেন গান্ধিজীর বেঞ্চির উপর। গান্ধিজী বারেক সাহেবের মুখের পানে তাকালেন, তারপর এতোটুকুও দ্বিধা না করে পা তুলে দিলেন সাহেবের বেঞ্চির উপর। আর যায় কোথা, সাহেব রীতিমত রেগে উঠে গান্ধিজীকে মারলেন এক লাথি।

আশে পাশে যে সব বাঙ্গালীরা বসেছিল তারা লাফিয়ে উঠলো, সাহেবের সঙ্গে তাদের মারামারি বাধে আর কি! গান্ধিজী হাসিমুখে সবাইকে নিরস্ত করলেন, ইংরাজীতে বললেন—ক্ষমাই পরম ধর্ম। মারকে ভালবাসা দিয়ে জয় করতে হবে। সাহেবটিকে আপনারা ছেড়ে দিন।

ট্রামের মধ্যে দু'চারজন এবার চিনতে পারলো, বললো—আপনিই কি গান্ধিজী?

গান্ধিজী হাসলেন।

অভদ্র ব্যবহারের জন্ত সাহেবকে ক্ষমা চাইতে হোল।

আর যে সঙ্গীটি এতক্ষণ হিন্দি ভাষায় গান্ধিজীকে সব কিছু বোঝাচ্ছিলেন তাঁর লজ্জা রাখার আর জায়গা রইল না।

গান্ধিজী একদিন কালীঘাটের মন্দিরে গেলেন। পশু বলির রক্তারক্তি ব্যাপার তাঁর মনে অত্যন্ত বেদনার সঞ্চার করলো। তিনি আর বেশীক্ষণ দাঁড়াতে পারলেন না। গান্ধিজী বলতেন—সে দৃশ্য তিনি আজ অবধি ভুলতে পারেন নি।

কলিকাতার মনীষীদের সঙ্গে দক্ষিণ আফ্রিকা সম্পর্কে আলোচনা শেষ করে কয়েক দিনের জন্ত গান্ধিজী ব্রহ্মদেশে বেড়াতে যান। সেখান থেকে ফিরে এসেই তিনি গোখলের কাছ থেকে বিদায় নিলেন।

গোখলে এবং আচার্য রায় তাঁকে গাড়ীতে তুলে দিয়ে গেলেন।

গান্ধিজী স্থির করেছিলেন বারাণসী, আগ্রা ও জয়পুর ঘুরে রাজকোটে ফিরবেন। সেজন্ত সঙ্গে নিয়েছিলেন বারো আনা দামের একটি ক্যাম্বিসের ব্যাগ আর তার ভিতর একটি উলের কোট, একখানি কাপড়, একটি সার্ট আর একখানি গামছা। আর গোখলে সঙ্গে দিয়েছিলেন একটি খাবারের কৌটা,—পুরী আর রসগোল্লায় ভরা।

থার্ড ক্লাসে চড়াই গান্ধিজীর জীবনের একটা ব্রত। তিনি বলতেন—থার্ড ক্লাশে চড়লেই দেশের জনসাধারণের অবস্থা ভালো করে বোঝা যায়, তাদের চেনা যায়।

সাধারণতঃ মেল্ ট্রেনের চেয়ে প্যাসেঞ্জার ট্রেনেরই তিনি ছিলেন পক্ষপাতী, ভীড় কম হয়। তবু থার্ড ক্লাশে চাপার দুর্ভোগ তাঁকে কম ভুগতে হয় নি। যখন এদেশে বেশী লোক তাঁকে চিনতো না, তখন অনেক সময় ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাঁকে স্থানাভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছে।

গান্ধিজী বলেছেন—য়ুরোপে থার্ডক্লাস ট্রেনে আমি চড়েছি, সেখানে ফার্ষ্ট ক্লাস আর থার্ড ক্লাশে এতো বিভেদ নেই। দক্ষিণ আমেরিকার থার্ড ক্লাসে শুধু নিগ্রোরাই চড়ে কিন্তু সে থার্ড ক্লাশ এ দেশের চেয়ে অনেক ভালো—গদী-মোড়া আসন আছে, ঘুমুবার জায়গা আছে, কোন কামরায় অতিরিক্ত যাত্রীকে উঠতে দেওয়া হয় না। আর এ-দেশের থার্ড ক্লাশ ভেড়ার গাড়ী, গরু ছাগলকে যেটুকু স্বাচ্ছন্দ দিলে চলে এখানকার যাত্রীকে সেটুকু দিলেই ধন্ত হয়ে যায়। একে ত অতিরিক্ত ভীড়, তার উপর যাত্রীরাও অশেষ নোংরা,—কেউ এখানে পানের পিক ফেললো, কেউ ওখানে সিগারেট ধরালো, চীৎকার, হুড়োহুড়ি, কেউ কারুর সুবিধা দেখে না।

কাশীতে নেবে গঙ্গাস্নান করে গান্ধিজী বিশ্বনাথের পূজা করলেন।

অমন দেশবিশ্রুত মন্দিরে যে শান্ত সমাহিত গাম্ভীর্য থাকা উচিত ছিল, গান্ধিজী কোথাও তা দেখতে পেলেন না। সঙ্কীর্ণ জলসিক্ত পিচ্ছিল গলিতে মানুষের ভীড়, দু'পাশের দোকানীদের হট্টগোল, মন্দির প্রাঙ্গণে ইতস্ততঃ ছড়ানো ফুলের রাশি, সবার উপর কোন ধনীর টাকা দিয়ে চত্বর বাঁধিয়ে দেবার অহঙ্কার মন ভারাক্রান্ত করে।

গান্ধিজী জ্ঞান-বাপি দেখলেন। ( ঔরঙ্গজেব বিশ্বনাথের মন্দির যখন ভেঙে দেন

তখন এই কূপের মধ্যে বিশ্বনাথের শিবটি ডুবিয়ে রাখা হয়েছিল।) এখনকার পাণ্ডার সঙ্গে গান্ধিজীর কিছু বাধে। পাণ্ডা দক্ষিণা চাইলে গান্ধিজী তাকে একটা পাই দেন।

পাইটি ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে পাণ্ডা চীৎকার করে ওঠে—তুই নরকে যা।

—আপনি ব্রাহ্মণ মানুষ, আপনার মুখে কি গালাগালি শোভা পায়! পাইটি যদি না নেন, আমিই নিয়ে যাব।

—যা যা এখান থেকে দূর হয়ে যা। তোর একটা পাইয়ের আমি তোয়াক্কা রাখি ভেবেছিস্?

গান্ধিজী পাইটি কুড়িয়ে নিয়ে চলে আসছেন, এমন সময় পাণ্ডা আবার ডাকলো, বললো—তোর অকল্যাণ করার ইচ্ছা আমার নেই, দেবতার নামে যখন দিয়েছিস, ওই থালায় রেখে যা, তুই ছোট বলে তো আর আমি ছোট হতে পারি না।

সামান্য একটা পাইয়ের লোভ পুরোহিত ছাড়তে পারলেন না দেখে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে গান্ধিজী মন্দির থেকে বেরিয়ে এলেন।

সেখান থেকে গান্ধিজী আনি-বেশান্তের বাড়ী গেলেন।

বোম্বাইয়ে গান্ধিজীর মেজো ছেলে মণিলালের হোল টাইফয়েড। নিউমোনিয়ার একটু রেশ ছিল। সারারাত বিকারে ছেলেটি প্রলাপ বকে। ডাক্তার একদিন বললেন—ক্রমশঃ শরীর দুর্বল হয়ে আসছে, শুধু দুধে আর চলবে না, রোগীকে বলকারক কিছু খেতে দিন—ডিম, মুরগীর সুরুয়া···

—কিন্তু আমরা যে বৈষ্ণব, নিরামিষ খাই?

—তার জন্যে কি, ওটাকে ওষুধ বলে ধরুন না, অসুখ সেরে গেলে না-হয় একটা প্রায়শ্চিত্ত করিয়ে দেবেন।

—না ডাক্তারবাবু সে আমি পারব না। ধর্ম নিয়ে লুকোচুরি খেলা চলে না।

—কিন্তু রোগী যুঝবে কিসের জোরে?

—আপনি যদি কিছু মনে না করেন, আমি একবার জল-চিকিৎসা করে দেখতে পারি। আপনি দিন-কয়েক কোন ওষুধ দেবেন না, প্রতিদিন এসে দেখে যাবেন, অবস্থা ভালো হচ্ছে কি খারাপ হচ্ছে।······

ডাক্তার সম্মত হলেন। ছেলের একশো চার ডিগ্রী জ্বরের উপর গান্ধিজী জল-চিকিৎসা শুরু করলেন। মণিলালকে কোমর অবধি ঠাণ্ডা জলে ডুবিয়ে রাখছেন তিন-মিনিট ধরে। শুধু কমলা লেবুর রস ছাড়া কিছুই খেতে দেন না। কিন্তু তিনদিনেও

জ্বর কমলো না, মাঝে বিকারের ঘোরও ঠিক থাকে। গান্ধিজীর মন ব্যাকুল হয়ে উঠলো, নিজেই কি শেষে দশ বছরের ছেলেটির মৃত্যুর কারণ হবেন?

শেষে গান্ধিজী ভগবানের নাম নিয়ে মণিলালকে ভিজা কাপড় দিয়ে জড়িয়ে রাখলেন। তার উপর দুখানা কম্বল চাপা দিলেন। ভিজে তোয়ালে একখানি রাখলেন মাথার উপর। গায়ের উত্তাপে মণিলালের সারা দেহ পুড়ে যাচ্ছে, আর গান্ধিজী মনে মনে রাম নাম জপছেন।

ছেলের মুখের পানে তাকিয়ে মনের মাঝে অবসাদ ঘনিয়ে এলো, কস্তুরীবাঈকে ছেলের কাছে বসিয়ে তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লেন, চৌপাটির সাগর সৈকতে এসে দাঁড়ালেন, ছেলের কল্যাণ কামনায় বুকের মাঝে তখন দুর দুর করছে।

অস্থির চিত্তে তখনই তিনি আবার বাড়ী ফিরলেন। ঘরে ঢুকতেই মণিলাল বলে উঠলো—বাবা, আমার গা জ্বলে যাচ্ছে, ঘামে সপ্‌সপ্‌ করছে, কম্বলটি খুলে দাও।

গান্ধিজী মণিলালের সর্বাঙ্গ মুছিয়ে দিলেন, বেচারা অঘোরে ঘুমিয়ে পড়লো।

সেদিন থেকে মণিলালের জ্বর কমতে সুরু করলো।

চল্লিশ দিন এই ভাবে অসুখের সঙ্গে যুদ্ধ করার পর মণিলাল নিরাময় হোল। এই ক'দিন সামান্য দুধ আর ফলের রস ছাড়া গান্ধিজী তাকে আর কিছুই খেতে দেননি।

বোম্বাইয়ে রীতিমত পসার জমে উঠেছে এমন সময় দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে টেলিগ্রাম এলো—অবস্থা গুরুতর, চেম্বারলেন এখানে আসছেন, আপনিও আসুন।

গান্ধিজী কয়েকদিনের মধ্যেই জাহাজে চড়ে বসলেন।

দক্ষিণ আফ্রিকায় গিয়ে দেখলেন ভারতীয়দের অবস্থা আগের চেয়ে অনেক শোচনীয় হয়েছে। বুয়োর যুদ্ধের সময় ভারতীয়দের সেবাকার্যে খুসী হয়ে গভর্মেন্ট যে সব প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, সে সবই ভুলে গেছে। এই সম্পর্কে গান্ধিজী নেতালে চেম্বারলেনের সঙ্গে দেখা করলেন। চেম্বারলেন বললেন—আপনার অভিযোগ সবই সত্যি, কিন্তু আমি আপনাদের জন্য বিশেষ কিছু করতে পারবো বলে মনে হয় না। এখানে আপনাদের থাকতে হলে এখানকার সাহেবদের খুসী রাখতে হবে।

গান্ধিজী তবুও আশা ছাড়লেন না। চেম্বারলেনের পিছু পিছু এলেন প্রিটোরিয়ায়, কিন্তু চেম্বারলেন আর গান্ধিজীর সঙ্গে দেখা করলেন না।

গান্ধিজীও ঠিক করলেন, ভারতীয়দের সম্পর্কে একটা কিছু নিস্পত্তি না করে

আফ্রিকা থেকে নড়বেন না। জোহানেসবার্গের কোর্টে তিনি ব্যারিষ্টারী স্থরু করলেন এবং ভারতীয়দের জন্ত একখানি সাপ্তাহিক কাগজ বের করলেন—'ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়ন'।

চারটি ভাষায় কাগজখানি লেখা হোত—গুজরাতী, হিন্দী, তামিল ও ইংরাজী। ( পরে হিন্দী ও তামিল বাদ দেওয়া হয়। ) এই কাগজখানির জন্ত গান্ধিজীকে মাসে মাসে প্রায় বারোশো টাকা নিজের পকেট থেকে খরচ করতে হোত।

এবার গান্ধিজী দক্ষিণ আফ্রিকার গান্ধি-ভাই নামে প্রসিদ্ধ হয়ে উঠলেন।

গান্ধিজীর মনের মাঝে এই সময় একটি বিপ্লব চলছিল। বিবেকানন্দের 'রাজযোগ', পাতঞ্জলির 'যোগস্থত্র' প্রভৃতি বই তাঁর মনের মধ্যে তীব্র ভগবৎপ্রীতি জাগিয়ে তোলে। তিনি নতুন করে গীতা পাঠ করতে স্থরু করলেন।

অবসর কম, কিন্তু আগ্রহ তো কম নয়। গীতার একটি-দুটি শ্লোক কাগজে লিখে স্নানের ঘরের দেয়ালে লটকে দিতেন, যতক্ষণ দাঁতে মাজতেন আর স্নান করতেন সেই শ্লোকটি মুখস্থ করতেন।

এইভাবে গীতার তেরোটি অধ্যায় তিনি মুখস্থ করেন।

গীতার 'অপরিগ্রহ' ও 'সমভাব' গান্ধিজীর মনকে আচ্ছন্ন করে ফেললো। ভোগ করার আকাঙ্ক্ষা ও সঞ্চয়ের ইচ্ছা দমন করার চেষ্টা করলেন। বোম্বাইয়ে থাকার সময় এক বন্ধুর পাল্লায় পড়ে দশহাজার টাকার জীবন-বীমা করেছিলেন, সেই বীমার পলিসি রদ করার জন্ত চিঠি লিখে দিলেন। ভগবানের উপরেই যখন একান্ত নির্ভর তখন স্ত্রীপুত্রকে ভগবানই দেখবেন, সেজন্ত সঞ্চয়ের কোন প্রয়োজন তো নেই!

আত্মীয় ও পরকে সমভাবে দেখার চেষ্টা করলেন।

বড় ভাইয়ের কাছে চিঠি লিখলেন—আমার উপর আর ভরসা রাখবেন না। এতদিন রোজগার করে যা বাঁচাতে পেরেছি তা আপনার কাছে পাঠিয়েছি, এবার থেকে আর তা পাঠাবো না, এখন থেকে যা বাঁচবে জনসেবায় খরচ করবো।

বড় ভাই গান্ধি-ভাইকে ভুল বুঝলেন। তিনি বেশ কড়া উত্তর দিলেন। এবং ভাইয়ের খোঁজ-খবর নেওয়া একেবারে বন্ধ করে দিলেন।

জোহানেসবার্গে এক জার্মান সাহেবের নিরামিষ রেষ্টুরেণ্ট ছিল, গান্ধিজী সেখানে গিয়ে প্রায়ই আহার করতেন। কিন্তু দু'-দশ জনের আহার জুগিয়ে একটি রেষ্টুরেণ্ট চলে না, জার্মান সাহেবটিকে শেষে পাত্তাড়ি গুটাতে হোল। গান্ধিজী তাকে দু-একবার টাকা দিয়ে সাহায্য করেছিলেন বটে, কিন্তু তাতে কী হবে।

তারপরে এক থিওজফিষ্ট মহিলা এসে গান্ধিজীকে ধরলেন—নিরামিষ ভোজীদের জন্ম এক রেষ্টুরেন্ট করবো, টাকা চাই।

গান্ধিজীর মন টললো, নিজের কাছে টাকা ছিল না, এক মক্কেলের কাছ থেকে নিয়ে মেমসাহেবকে দেড় হাজার টাকা ধার দিলেন।

দু-তিন মাস পরেই সে রেষ্টুরেন্ট উঠে গেল। গান্ধিজীকে নিজের পকেট থেকে দেড় হাজার টাকা মক্কেলকে শোধ দিতে হোল।

এই সময় গান্ধিজী নিজের কয়েকটি সাধারণ অসুখের নিজেই চিকিৎসা করেন। সারা দিন লেখাপড়ার কাজ করতে করতে গান্ধিজীর রীতিমত মাথা ধরতে সুরু করলো, তখন তিনি দিনে চারবার আহার করতেন। তাঁর ধারণা, হোল এই মাথা ব্যথার প্রধান কারণ অধিক আহার। একবার করে আহার তিনি কমিয়ে দিলেন, মাথা ধরাও সেরে গেল।

তারপর দেখা দিল কোষ্ঠ-কাঠিন্স। কত জন কত রকম রেচকের ব্যবস্থা দিল। গান্ধিজী কিন্তু রাত্রে পেটের উপর মাটির প্রলেপ দিয়ে শয়ন করার অভ্যাস করলেন, কদিনের মধ্যেই কোষ্ঠ-কাঠিন্স অন্তর্হিত হোল।

•

সেবাই গান্ধিজীর আদর্শ। সেজন্ম সকলকেই তিনি সমভাবে দেখার চেষ্টা করতেন, জাতের কি ধর্মের বিচার করতেন না। তাঁর বাড়ী সকল মানুষের জন্মই খোলা থাকতো।

সাহেবি ধরণের বাড়ী, রাত্রে ঘরের ভিতরেই মলমূত্র ত্যাগের 'কমোড' থাকত। সকালে ঘুম থেকে উঠে প্রত্যেকে নিজ নিজ কমোড্ পরিষ্কার করতো।

একবার পঞ্চমা জাতের একজন ক্রীশ্চান গান্ধিজীর বাড়ীতে এসে উঠলো, নিজেকে কমোড পরিষ্কার করতে হবে বেচারা তা জানতো না। 'পঞ্চমারা' অস্পৃশ্য। কস্তুরবা হিন্দুর ঘরের মেয়ে, তখনও তিনি পুরোপুরি সংস্কার মুক্ত হতে পারেন নি। তিনি অস্পৃশ্যের কমোড সাফ করতে রাজি হলেন না। গান্ধিজী নিজেই সাফ করলেন। কিন্তু অস্পৃশ্যের মলমূত্র স্বামী সাফ করবেন এও কস্তুরবা সইতে পারলেন না। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিতর্ক বেধে গেল।

গান্ধিজী বললেন—আমার বাড়ীতে থাকতে গেলে এসব কাজ হাসিমুখে করতে হবে।

কস্তুরবা বললেন—বেশ, তোমার বাড়ী থেকে চলেই যাব।

—চলে যাব কেন, এখনি যাও—কস্তুরবা'র হাত ধরে গান্ধিজী দরজা অবধি টেনে নিয়ে গেলেন, এখনি পথে বের করে দেব আর কি!

কস্তুরবা কেঁদে ফেললেন, বললেন—এখানে আমি এখন কোথায় যাব? এখানে কি আমার বাপ-মা আছেন, না কোন আত্মীয় আছে? তোমার স্ত্রী হয়েছি বলে তোমার সব অন্যায় অত্যাচার আমাকে সইতে হবে! তোমার লজ্জা করে না, দরজা খোলা, রাস্তার লোক দেখলে কি বলবে?

গান্ধিজী এবার সত্যই লজ্জা পেলেন, দরজাটা বন্ধ করে দিলেন।

পরে অবশ্য গান্ধিজী নিজের আদর্শের মূল কথা কস্তুরবা'কে বুঝিয়ে দেন।

দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়েরা সাহেবদের কাছে অস্পৃশ্য। সহরের বাইরে এদের থাকতে দেওয়া হয়, তাকে বলে কুলি-বস্তি।

জোহানেস্‌বার্গে এমনি একটা কুলি-বস্তি ছিল। মিউনিসিপ্যালিটি সেই বস্তির দিকে মোটেই নজর রাখতো না, বাসিন্দারাও স্বাস্থ্যরক্ষার কোন কথাই জানতো না। বস্তিটি ক্রমশঃ ঘেঞ্জি ও নোংরা হয়ে উঠেছিল।

দেখে-শুনে সাহেবেরা একদিন বললো—ভারতীয়েরা এই বস্তিটাকে নোংরা করে রাখে সমগ্র নগরের স্বাস্থ্য বিষিয়ে দেবার জন্য এবং সাহেবদের জব্দ করার জন্য। এখান থেকে বস্তি তুলে দেওয়া হোক!

মিউনিসিপ্যালিটি নোটিশ দিল—বস্তি ছেড়ে দাও।

নিরানব্বুই বছরের লীজ নিয়ে অনেক ভারতীয় সেখানে বাড়ী করেছিল, তারা বাড়ী-ঘর ছেড়ে দেবে কেন? গান্ধিজীকে ধরে তারা মামলা সুরু করলো।

গান্ধিজী পরপর সত্তরটি মামলা করলেন। একটি ছাড়া সবগুলিই জিতলেন, ভারতীয়েরা বাড়ীর জন্য ক্ষতিপূরণ পেল।

কিন্তু অতো লোক হঠাৎ ঘর বাড়ী ছেড়ে যায় কোথা? নতুন কোন জায়গা না পাওয়া পর্যন্ত তারা সেইখানেই রয়ে গেল।

এই সময় হঠাৎ একদিন সেখানে প্লেগ দেখা দিল।

'ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়নে'র মুদ্রাকর শ্রীযুক্ত মদনজিৎ সেখানে চাঁদা আদায় করতে গিয়েছিলেন। তিনি সেখান থেকে একটুকরো কাগজে লিখে গান্ধিজীর কাছে পাঠিয়ে দিলেন—শীগগীর আসুন, তেইশজনের প্লেগ হয়েছে।

গান্ধিজী অফিসের চারজন কর্মচারীকে নিয়ে সাইকেল চড়ে তখনই ছুটলেন কুলি-বস্তিতে। একজন সাহেব ডাক্তারও এসে উপস্থিত হলেন। তেইশজন রোগীকে একখানি

বাড়ীতে সরিয়ে আনা হোল। তারপর চললো তাদের শুশ্রূষা। সারাটা রাত চার-জনের কেউ এক মিনিট চুপ করে বসতে পেলেন না, ডাক্তারও হিমসিম খেয়ে গেল।

পরদিন সকালে মিউনিসিপ্যালিটি একজন নার্স পাঠিয়ে দিল।

একুশজন রোগী মারা গেল, দু'জন রক্ষা পেল। এই দু'জনকে গান্ধিজী নিজে চিকিৎসা করেছিলেন; এলোপ্যাথি মতে ব্রাণ্ডি না খাইয়ে মাথায় ও বুকে মাটির প্রলেপ দিয়েছিলেন।

ইতিমধ্যে কর্তৃপক্ষ রোগীদের জন্য সহর থেকে সাত মাইল দূরে এক সেবাকেন্দ্র খুললেন। এবং নতুন রোগীদের সেইখানে সরিয়ে দিলেন। সমস্ত বস্তির লোকদের সহর থেকে তেরো মাইল দূরে এক মাঠে তাঁবু ফেলে থাকার ব্যবস্থা করলেন। তারপর প্লেগের বীজাণু সমূলে নাশ করার জন্য সমস্ত বস্তি পুড়িয়ে সাফ্ করে দেওয়া হোল।

এই সময় গান্ধিজী দুটি সাহেবের সংস্পর্শে আসেন—শ্রীযুক্ত এলবার্ট ওয়েষ্ট ও শ্রীযুক্ত পোলক।

ওয়েষ্ট সাহেবের সঙ্গে গান্ধিজীর প্রায়ই দেখা হোত নিরামিষ রেষ্টুরেণ্টে। প্লেগের সময় গান্ধিজী সন্ধ্যাবেলায় রেষ্টুরেণ্টে যাওয়া বন্ধ করে দেন। ওয়েষ্টের সঙ্গে কদিন আর দেখা হয় নি। তার উপর সাহেব শুনেছিলেন গান্ধিজী বস্তিতে গেছেন প্লেগের সেবা করতে। একদিন প্রভাতে সাহেব তো বরাবর গান্ধিজীর বাড়ী এসে হাজির হলেন, বললেন—কদিন আর তোমাকে দেখতে পাই না, আজ তাই খবর নিতে এলাম।

সাহেবের সঙ্গে সেইদিনই গান্ধিজীর দিব্যি বন্ধুত্ব জমে উঠলো, এঁকেই গান্ধিজী পরে ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়ন 'চালাবার' ভার দেন।

আর পোলক সাহেব ছিলেন 'ক্রিটিক' কাগজের সহ-সম্পাদক। প্লেগের সময় গান্ধিজীর সঙ্গে তাঁর দেখা, বললেন—আপনার নাম শুনেছি, অনেকদিন থেকেই আলাপ করার ইচ্ছা ছিল, আজ চাক্ষুষ দেখা হয়ে গেল।

আলাপ আলোচনায় বন্ধুত্ব জমে উঠলো।

ইনিই গান্ধিজীকে রাস্কিনের লেখা 'আনটু দি লাষ্ট' বইখানি পড়ান। এই বইখানি গান্ধিজীর মনের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। এই বইখানিতে গান্ধিজী জীবনের তিনটি সত্য খুঁজে পান—

সবার ভালোই আমার ভালো।

সবাইকার কাজের মূল্যই সমান।

চাষী-মজুরের জীবনই সত্যিকারের সৎ জীবন।

[illegible]

গান্ধিজী উনিশ-শো-চার সনে ডারবান থেকে চৌদ্দ মাইল দূরে 'ফিনিক্সে' প্রায় তিন শো বিঘে জমি কিনে ফেললেন। একটি ছোট ঝরণা ছিল সেই জমিতে আর তারই চারি পাশে ছিল অসংখ্য কমলা লেবু আর আমের গাছ।

এক মাসের মধ্যেই ছাপাখানা রাখার মত একটা প্রকাণ্ড ঘর তৈরী হোল, প্রেসের সরঞ্জাম এসে গেল। ঠিক হোল 'ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়ন' কাগজখানি সেখান থেকেই বেরুবে।

গান্ধিজী অনেক জানা-চেনা ভারতীয় বন্ধুকে ডেকে আনলেন, ফিনিক্সে থাকার জন্ত। তখনও বাড়ী-ঘর কিছুই তৈরী হয় নি, ঘাস-বন সাফ করে তাঁবু খাটিয়ে থাকার ব্যবস্থা হোল।

ফিনিক্স আশ্রম ধীরে ধীরে একটি ছোট গ্রাম হয়ে উঠলো।

কিন্তু ফিনিক্সে গান্ধিজী বেশীদিন থাকতে পারলেন না। কাজের চাপে তাঁকে জোহানেস্‌বার্গে ফিরে আসতে হোল। বাড়ীতে চালচলনের ধারাও তিনি বদলে ফেললেন। বাজার থেকে রুটি কেনা বন্ধ করে দিলেন। শ' খানেক টাকা দিয়ে একটা যাঁতা আনিয়ে গম পেশাই করে রুটি খাবার ব্যবস্থা হোল। গান্ধিজী কস্তুরবা, ছেলেরা, এবং সময় সময় পোলক সাহেবও যাঁতা চালাতেন।

বাড়ীতে একজনমাত্র চাকর ছিল, সে একা সব কাজ করতে পারতো না, বাড়ীর ছেলেরাই তার কাজ করে নিত।

সকালবেলা ঝাড়ুদার এসে পায়খানার ময়লা সাফ করে নিয়ে যেত, কিন্তু পায়খানার আশপাশটা গান্ধিজী ও বাড়ীর ছেলেরা নিজেরাই সাফ করতো।

নানা কাজে ব্যস্ত থাকার জন্ত ছেলেদের রীতিমত লেখা-পড়া শেখাতে পারতেন না। বাড়ী থেকে আফিস ছিল আড়াই মাইল দূরে। প্রতিদিন ছেলেদের সঙ্গে নিয়ে আপিস যেতেন, আপিসে তাদের পড়াশুনার বিশেষ কোন ব্যবস্থা ছিল না। তবে ওই পথটুকু যেতে যে সময়টা পেতেন, ছেলেদের মুখে মুখে শিক্ষা দিতেন। সে জন্তই গান্ধিজীর কোন ছেলেই বিশ্ববিদ্যালয়ের বড় ছাপ কিছু পান নি, তবে সেজন্ত গান্ধিজী কি ছেলেদের মনে কোন ক্ষোভ নেই। (বড়-ছেলে হীরালাল এজন্ত অভিযোগ তোলে বটে, কিন্তু গান্ধিজীর কাছে সে মানুষ হয় নি। তাঁর প্রথম জীবন কাটে ভারতে কাকা ও জ্যাঠার কাছে।)

একদিন কাগজে খবর বেরুলো নেতালে জুলুরা বিদ্রোহ করেছে। সেই বিদ্রোহ দমনের জন্ত সাহেবদের রীতিমত লড়াই করতে হচ্ছে।

গান্ধিজী সেবা করবার জন্ত অনুমতি চাইলেন।

বুয়োর যুদ্ধের সময় তাঁর কাজ দেখে গভর্ণমেণ্ট খুসি হয়েছিলেন, এবার তাঁকে সার্জেণ্ট-মেজর করে দিলেন। মেজর-গান্ধী স্বেচ্ছাসেবক দল নিয়ে এলেন নেতালে।

ব্যাপারটা বিদ্রোহ নয়। যারা জীবনে বন্দুক দেখেনি, যাদের নিজেদের কোন বন্দুক নেই, তারা শিক্ষিত গোরা সৈন্তের সামনে দাঁড়াবে কোন সাহসে? আসল ব্যাপারটা জঘন্ত। জুলুরা অত্যন্ত শান্তিপ্রিয়, সভ্যতার বিলাস তাদের মধ্যে এখনও সংক্রামিত হয়নি। আফ্রিকা উর্বরা দেশ, সামান্ত পরিশ্রম করলেই সেখানে প্রচুর খাবার পাওয়া যায়। সামান্ত মকাইয়ের জাউ একটু নূন দিয়ে খেয়েই তারা খুসি। কিন্তু সাহেবদের লোকের দরকার—বাড়ীর কাজ করার জন্ত চাকর চাই, সোনার খনিতে কাজ করার জন্ত মজুর চাই, কিন্তু যাদের খাওয়া-পরার অভাব নেই তারা পরের চাকরী করতে আসবে কেন? কাজেই খৃষ্টান মিশনারীরা বেরিয়ে পড়লো জুলুদের সভ্য করতে। আর গভর্ণমেণ্ট জুলুদের মাথা পিছু আর ঘর পিছু এমন একটা ট্যাক্স বসিয়ে দিল, যা দেবার জন্ত বেচারাদের চাকরী না করে উপায় রইলো না। সম্প্রতি জুলুদের উপর আবার এক নতুন কর বসানো হয়েছে, একজন জুলু সর্দার তার প্রতিবাদ করেছেন এবং যে কর্মচারীটি কর আদায় করতে গিয়েছিল তাকে বল্লম ছুড়ে মেরেছেন। এই ঘটনাটিকে ফলাও করে বিদ্রোহ বলে প্রচার করা হোল, এবং সৈন্ত গেল সেই বিদ্রোহ ঠাণ্ডা করতে। একদল লোককে ধরে এনে রীতিমত চাবুক মেরে রক্তাক্ত দেহে ফেলে রাখা হোল, আরেকদল লোকের উপর ইচ্ছামত গুলি চালানো হোল।

মেজর-গান্ধী দলবল নিয়ে এই জুলুদের মাঝে এসে দাঁড়ালেন দেবতার আশীর্বাদের মত। অনেক নিগ্রোর ক্ষত তখন পচে দুর্গন্ধ বেরুতে সুরু করেছে। কোন সাহেব নার্স তাদের সেবা করতে চায় নি। গান্ধিজী তাদের সেবা করছেন দেখে অনেক সময় গোরা সৈনিকেরা দূর থেকে টিটকারিও দিতে লাগলো।

একদল মানুষকে এইভাবে সন্ত্রস্ত করে তোলার নীতি তাঁর ভালো লাগেনি, কিন্তু সেবকের তো সে বিচার করা চলবে না!

গোরা সৈনিকদল যে গাঁয়ে যেত গান্ধিজীকেও যেতে হোত তাদের সঙ্গে, নাহলে আহত জুলুদের দেখবে কে? অনেক সময় একজন চল্লিশ মাইল অবধি মেজর গান্ধিকে দলবল নিয়ে মার্চ করে যেতে হয়েছে।

জুলুদের শায়েস্তা করার পর গভর্ণমেণ্ট এবার ভারতীয়দের শায়েস্তা করার

দিকে মন দিলেন। নতুন এক আইন করা হোল : ট্র্যান্সভালে যে সব ভারতীয় আছে, তাদের বয়স আট বছরের বেশী হলেই তাদের সরকারী দপ্তরে নাম লিখিয়ে পাস নিতে হবে। যারা পরোয়ানা নেবে না তারা সেদেশে থাকতে পাবে না, থাকলে জেল বা জরিমানা হবে। পাস নেবার সময় দশআঙুলের ছাপ দিতে হবে, সকলের এই পাস আছে কি না দেখার জন্ত সরকারী পেয়াদা যে কোন বাড়ীর ভিতর ঢুকে তল্লাসী করতে পারবে, এবং ভারতীয়েরা কোন কাজে সরকারী আপিসে গেলে সর্বাগ্রে এই পাস দেখাতে হবে।

ভারতীয়েরা প্রতিবাদ করলো। নানা স্থানে সভা করলো, মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করলো। কিন্তু কিছুতেই কিছু হোল না।

গান্ধিজী বিলাতে গেলেন। দাদাভাই নওরোজীর সঙ্গে দেখা করলেন, তাঁর উপদেশ মত উপনিবেশ-সেক্রেটারী লর্ড এলগিন, ভারতবর্ষের সেক্রেটারী লর্ড মর্লি, আইরিশ পক্ষের নেতা লর্ড রেডমণ্ড এবং পার্লামেন্টের অনেক বিশিষ্ট লোকের সঙ্গে দেখা করলেন। সকলের কাছেই অনেক ভাল কথা শুনে ছ' সপ্তাহ ইংলণ্ডে কাটিয়ে গান্ধিজী আফ্রিকায় ফিরে এলেন।

কিন্তু ইংরাজরা শেষ অবধি কোন কিছুই করলো না।

গান্ধিজী সত্যাগ্রহ স্থরু করলেন।

পাস দেওয়ার আপিসের সামনে রীতিমত পিকেটিং স্থরু হোল। রাস্তা আটকাবার অভিযোগে তাদের গ্রেপ্তার করা হোল, কিন্তু কোন অপরাধ প্রমাণ করতে না পারায় আদালত তাদের ছেড়ে দিল।

এদিকে দু-একজন করে চুপি চুপি প্রায় পাঁচ শো লোক পাস নিল। কিন্তু দশ বারো হাজার বাসিন্দার মধ্যে পাঁচ শো জন তো নগণ্য।

এবার ধরপাকড় স্থরু হোল।

প্রথম গ্রেপ্তার হোল রামসুন্দর। বিচারে তার একমাস জেল হোল, কিন্তু তাতে ভারতীয়েরা ভয় পেলে না।

এবার গান্ধিজী আর তাঁর দলবলের উপর হুকুম হোল, আদালতে হাজির হবার জন্ত।

উনিশ-শো-আটসালের ১০ই জানুয়ারী গান্ধিজীকে দু'মাসের জন্ত জেল দেওয়া হোল।

জোহান্সেস্‌বার্গের জেলখানা। গান্ধিজীর প্রথম কারাবাস।

নিগ্রো ওয়ার্ড। নিরেট লোহার দরজা। উপরে একটি ফুকর ছাড়া ঘরে একটি জানালা অবধি নেই। দরজাটি বন্ধ করে দিলে মনে হয় যেন একটি সিন্দুকের মধ্যে তাদের বন্ধ করা হয়েছে।

সকালেবেলা খাবার এলো—মকাইয়ের জাউ আর একটু নুন।

দুপুরবেলা দু'ছটাক ভাত, দু'ছটাক পাঁউরুটি, আধছটাক ঘি আর একটু নুন।

সন্ধ্যাবেলা মকাইয়ের জাউ আর একটা বড় আলু সিদ্ধ।

অখাদ্য স্বাদ, কোন রকমে সে খাদ্য মুখে তোলা যায় না। একদিন গান্ধিজী জেলের ডাক্তারকে বললেন—আমরা কিছু মশলা পেতে পারি না?

ডাক্তার জিজ্ঞাসা করলেন—জেলখানার কয়েদীদের কোথায় মশলা দেওয়া হয়?

—ভারতবর্ষে দেওয়া হয়।

—এটা ভারতবর্ষ নয়। এখানে মশলা দেওয়া হবে না।

বেশ তাহলে ডাল দিন, স্নায়ুর পুষ্টিকর কিছুই তো আমরা পাই না।

—কয়েদীদের ডাক্তারী তর্ক করতে নেই। সপ্তাহে দুবার সিম সিদ্ধ পাও, তাতেই স্নায়ুর পুষ্টি হবে। বেশী আবদার ভাল নয়।

ডাক্তারের কাছে সুবিধা হবে না দেখে গান্ধিজী সুপারিনটেন্‌ডেন্টকে জানালেন। সুপার বললেন—আপনারা ইচ্ছামত রেঁধে খেতে পারেন, তবে দিনে একবারের বেশী দুবার রান্না করা চলবে না।

রান্না করা তো সুরু হোল, কিন্তু সে আর এক হাঙ্গামা, তরকারী ওজনে কম পাওয়া যেত, তাই নিয়ে প্রতিদিন ঝগড়া।

ওদিকে গান্ধিজীকে ধরতেই ভারতীয়দের মাঝে জিদ চেপে গেছে, তারা দলে দলে জেলে আসতে সুরু করলো। ক্রমশঃই সত্যাগ্রহীর সংখ্যা বাড়তে লাগলো।

তৃতীয় সপ্তাহে সরকার আপোষের কথা বলতে সুরু করলেন। গান্ধিজীকে প্রিটোরিয়ায় জেনারেল স্মার্টসের কাছে নিয়ে যাওয়া হোল, স্মার্টস্‌ বললেন—এখনকার সাহেবরা এমনি এক আইন চাইছে বলে এই আইনটি পাস করানো হয়েছে। তবে অধিকাংশ ভারতীয় যদি স্বেচ্ছায় এই পরোয়ানা গ্রহণ করে, তাহলে আমি কথা দিচ্ছি যে এই আইন রদ হয়ে যাবে। আপনাদের সম্মান বজায় থাকবে।

এর পর আর আপত্তি করার কিছু থাকে না। গান্ধিজী রাজী হলেন। তাঁকে তখনই ছেড়ে দেওয়া হোল।

গান্ধিজীর কাছে তখন একটিও পয়সা নেই। জেনারেল স্মাটসের সেক্রেটারীর কাছ থেকে গাড়ীভাড়া নিয়ে তিনি সেই ট্রেনেই প্রিটোরিয়া থেকে জোহানেস্‌বার্গে ফিরলেন।

রাত এগারোটার সময় জোহানেস্‌বার্গে সভা ডাকা হোল, অতো রাত্রেও সভায় প্রায় হাজার খানেক লোক হোল। গান্ধিজী সবাইকে বুঝিয়ে বললেন আপোষের কথাটা। কিন্তু মীর আলম নামে এক পাঠান প্রতিবাদ তুললো,—আপনিই তো এতদিন বলছিলেন যে দশ আঙুলের ছাপ দিয়ে পাস নেওয়া পাপ।

—এখন আর সেই অবস্থা নেই, এখন আমরা দশ আঙুলের ছাপ দিয়ে পরোয়ানা নিতে পারি।

—অবস্থা কিছুই বদলায় নি, আপনিই শুধু বদলে গেছেন। আমরা শুনেছি জেনারেল স্মাটসের কাছ থেকে পনেরো হাজার পাউণ্ড ঘুষ নিয়ে আপনি আমাদের স্বার্থ বিক্রী করেছেন। আমরা দশ আঙুলের ছাপ দোব না, পাসও নোব না। আমাদের মধ্যে যে প্রথম দশ আঙুলের ছাপ দিতে যাবে তাকে আমি খুন করে ফেলবো।

গান্ধিজী বললেন—এই মিটমাটের জন্য আমিই দায়ী, আমিই সবার আগে যাব পাস আনতে। সেজন্য যদি পাঠান ভাইয়ের হাতে আমাকে মরতে হয়, আমি দুঃখ করবো না। রোগে মরার চেয়ে আমারই এক ভাইয়ের হাতে খুন হওয়া অনেক ভালো। আমাকে মারার পর সে বুঝতে পারবে আমি কোন অন্যায় করিনি।

রাত তিনটের সময় সভা শেষ করে গান্ধিজী বাড়ী ফিরলেন।

দেড়শো জন সত্যাগ্রহীর জেল হয়েছিল, পরদিন সকালে জেনারেল স্মাটসের আদেশে তারা মুক্তি পেল।

উনিশ-শো-আট সালের ১০ই ফেব্রুয়ারী।

সত্যাগ্রহী নেতাদের আজ পাস নেবার দিন।

গান্ধিজীর আপিসের সামনে মীর আলম দাঁড়িয়েছিল, গান্ধিজীকে দেখে সে সেলাম করলো না। সেলাম না করা তার রীতি নয়। গান্ধিজীর কেমন যেন বিসদৃশ ঠেকলো, তবু তিনি বললেন—কেমন আছ?

মীর আলম কটকট করে একবার মুখের পানে তাকালো শুধু, কথার কোন জবাব দিল না।

ইতিমধ্যে, ইয়ুফ মিঞা, থাম্বি নাইডু প্রভৃতি এসে পড়লেন, তাদের সঙ্গে গান্ধিজী বেরিয়ে পড়লেন।

মীর আলম ও তার সঙ্গীরাও পিছু পিছু চললো।

রেজেষ্ট্রি আপিস মাইল খানেকের পথ।

আর কয়েক পা গেলেই আপিসের দরজায় এসে পৌঁছাবেন এমন সময় লম্বা ছ'ফুট দেহ নিয়ে মীর আলম সামনে এসে দাঁড়ালো, বললে—কোথায় যাচ্ছেন ?

—রেজেষ্ট্রি আপিস থেকে পাস আনতে। তুমিও এসো তোমার পাস নিয়ে যাবে।...

দুম্ করে লাঠির এক ঘা এসে পড়লো মাথার উপর। 'হে রাম'—বলে গান্ধিজী ধরাশায়ী হয়ে পড়লেন—জ্ঞানহীন। তার উপরেই চললো লাঠি আর লাথি মারা। সঙ্গীরা মার আটকাতে গেল, পাঠানরা তাদেরকেও রীতিমত পিটিয়ে দিল। একটা সোরগোল পড়ে গেল। পথচারী গোরারা পাঠানদের ধরে ফেললো।

পাশেই ছিল এক সাহেবের আপিস, সেখানে গান্ধিজীকে তুলে নিয়ে যাওয়া হোল।

জ্ঞান হতেই গান্ধিজী জিজ্ঞাসা করলেন—মীর আলম কোথায় ?

—তাকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে।

—তাকে ছেড়ে দিতে হবে।

—সে সব হবে, আপনি আগে সেরে উঠুন।

পাদ্রী রেভারেণ্ড ডোক্ গাড়ীতে করে গান্ধিজীকে নিজের বাড়ী নিয়ে গেলেন।

ডাক্তার এলো। পাঁজরায় চোট লেগেছিল, মলম দিল, মালিশ করে দিল, ঠোঁট কেটে গিয়েছিল, সেলাই করে দিল; কথা বলতে বারণ করে দিল। জলীয় খাদ্য ছাড়া আর কিছু খেতে নিষেধ করলো। হাতের ইসারায় আর শ্লেটে লিখে কাজ চালাতে হোল দিন কয়েক।

গান্ধিজী প্রতিজ্ঞা করেছিলেন—ভারতীয়দের পক্ষ থেকে তিনিই প্রথম দশ-আঙুলের ছাপ দিয়ে সার্টিফিকেট নেবেন। ডোক সাহেবের বাড়ীতে শুয়ে শুয়েই তিনি পরোয়ানা সই করলেন।

তারপর এটর্নি-জেনারেলের কাছে টেলিগ্রাম করলেন,—মীর আলমের বিরুদ্ধে আমি মোকদ্দমা চালাতে চাই না, আশা করি আপনি তাকে ছেড়ে দেবেন।

সরকার মীর আলম ও তার সঙ্গীদের ছেড়ে দিল।

জোহানেস্‌বার্গের সাহেবরা প্রতিবাদ তুললো—গান্ধী নিজে অপরাধীকে মাপ করতে পারেন, কিন্তু পথের উপর দিনদুপুরে গুণ্ডামি করা এ মুলুকে চলবে না। অপরাধীদেরকে সাজা দিতে হবে!

মীর আলমের দলকে পুলিশ আবার পাকড়াও করলো, যে সব সাহেব মারপিট দেখেছিল তারা সাক্ষ্য দিল, বিচারে ওদের ছ'মাস করে জেল হোল।

দিন দশেক গান্ধিজী ডোক সাহেবের বাড়ীতে ছিলেন। এই কদিন তাঁর বাড়ী ধর্মশালা হয়েছিল। কত লোক আসতেন গান্ধিজীকে দেখতে। কখন ময়লা কাপড়-চোপড়-পরা, হাঁটু অবধি ধূলো মেখে, পৌটলা-পুঁটলি কাঁধে আসতো ভারতীয় ফেরীওলা, আবার কখনো আসতো ইস্ত্রি-চোস্ত পোষাক-পরা সরকারের প্রধান মন্ত্রী। ডোক সাহেব ও তাঁর স্ত্রী উভয়তঃ সমান সমাদর জানাতেন। গান্ধিজীর পরিচর্যা করতে কখনও তাঁদের কোন ক্লান্তি দেখা যায় নি, সারাক্ষণ কেউ না কেউ গান্ধিজীর কাছে বসে থাকতেন। রাত্রে ডোক চুপি চুপি দু'তিনবার এসে দেখে যেতেন। তাঁর মেয়ে অলিভ সময় সময় গান্ধিজীকে ইংরাজী ভজন গেয়ে শোনাতেন। নিজের বাড়ীতেও বোধ হয় গান্ধিজী এর চেয়ে বেশী যত্ন পেতেন না।

একটু সুস্থ হলে গান্ধিজী নেতালে এলেন।

সেখানকার ভারতীয়েরা এক সভা ডাকলো। সভার মাঝে নানাজনে নানা প্রশ্ন করলো। কি ভাবে জেনারেল স্মাটসের সঙ্গে মিটমাট হোল গান্ধিজীকে সে সব বুঝিয়ে বলতে হোল। সবাই তাঁর কথা বিশ্বাস করলো না। সভার মাঝে গোলমাল সুরু হয়ে গেল।

বক্তার মঞ্চের উপর এক পাঠান লাফিয়ে উঠলো, তার হাতে এক মস্ত লাঠি।

হুড়োহুড়ি করে ক'জনে সভার আলো নিভিয়ে দিল।

বিপদ বুঝে গান্ধিজীর শুভাকাঙ্ক্ষীরা চারিপাশ থেকে তাঁকে ঘিরে ধরলেন। সভাপতি শেঠ দাউদ মহম্মদ টেবিলের উপর উঠে সবাইকে বোঝাতে লাগলেন।

ইতিমধ্যে কে একজন রিভলভারের একটা ফাঁকা আওয়াজ করলো। পার্শী রুস্তামজী ছুটে গেলেন পুলিশে খবর দিতে।

তখনই পুলিশ এসে পড়লো, গান্ধিজীকে তারা রুস্তামজীর বাড়ীতে পৌছে দিয়ে গেল।

পরদিন গান্ধিজী ফিনিক্সে ফিরে গেলেন, ভারতীয়েরা তাঁকে একা ছাড়লো না। তখনকার বিখ্যাত ভারতীয় মুষ্টিযোদ্ধা জ্যাক্ মুডালী সদলে তাঁকে সঙ্গে করে ফিনিক্সে নিয়ে এলেন এবং দিনে রাতে গান্ধিজীকে চোখে চোখে রাখলেন।

জেনারেল স্মার্টস্ কিন্তু কথা রাখলেন না। এশিয়াটিক আইন রদ না করে, বাধ্যতামূলক করে দিলেন।

গান্ধিজী চিঠি লিখলেন, স্মার্টস্ তার উত্তর দিলেন না।

গান্ধিজী ট্রান্সভালের গবর্মেণ্টের কাছে চিঠি লিখলেন—যদি 'কালা-কানুন' রদ করা না হয়, তাহলে সমস্ত পরোয়ানা জ্বালিয়ে দোব।

গবর্মেণ্ট উত্তর দিল—সরকার মত বদলাতে অক্ষম।

ভারতীয়েরা এক মস্‌জিদের প্রাঙ্গণে সমবেত হোল। পরোয়ানা তারা সঙ্গে এনেছিল, প্রায় দু'হাজার পরোয়ানা সেই সভায় পুড়িয়ে ছাই করা হোল। যতক্ষণ পরোয়ানাগুলি জ্বলো ততক্ষণ সভার লোকেরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাততালি দিল।

এদিকে জেনারেল স্মার্টস্ এশিয়াটিক্ আইনের সঙ্গে আরেক নতুন আইন পাস করিয়ে নিলেন—ইমিগ্রেসন্ রেষ্ট্রিক্‌সন্ এ্যাক্ট। যাতে কোন নতুন ভারতীয় ট্রান্সভালে আর প্রবেশ করতে না পারে তারই ব্যবস্থা করা হোল। স্মার্টস্ বললেন—আমি গান্ধিকে যতটা চিনেছি আর কেউ এমন চেনে না। বসতে পেলে তিনি শুতে চান। তাঁর চালাকি আমরা বরদাস্ত করবো না, তাঁর যা শক্তি থাকে করুন, ভারতীয়দের সম্পর্কে আমরা যে নীতি গ্রহণ করেছি, তাই চালু থাকবে।

গান্ধিজী এই চ্যালেঞ্জ মেনে নিলেন, সত্যাগ্রহ সুরু হোল।

প্রথম সত্যাগ্রহী সোয়াবজী-সাপুরজী আড়াজনীয়া প্রকাশ্য ভাবে ট্রান্সভালে প্রবেশ করলেন। তাঁর বিরুদ্ধে মামলা রুজু হোল, ম্যাজিষ্ট্রেট আদেশ দিলেন—এক সপ্তাহের মধ্যে দেশ ছেড়ে চলে যাও।

সোরাবজী সে-আদেশ মানলেন না, আদেশ অমান্যের অপরাধে তাঁর একমাস জেল হোল।

ভারতীয়েরা এবার বিনা লাইসেন্সে ফিরি করতে লাগলো, বিনা সার্টিফিকেটে ট্রান্সভালে আসতে লাগলো,—রীতিমত আইন অমান্য সুরু হয়ে গেল।

পুলিশ ধরে, মারে, জেল দেয়, কিন্তু আন্দোলন কমে না। চৌদ্দ বছরের ছেলে থেকে ষাট বছরের বুড়ো পর্যন্ত, ধনী গরীব নির্বিচারে জেলে যেতে সুরু করলো। জেলে তাদের কম কষ্ট দেওয়া হোত না—পায়খানা সাফ করা, পাথর ভাঙা, পুকুর কাটা, ঘানি কোপানো, কিছুই বাদ ছিল না। হাতে ফোস্কা পড়েছে, অসহ্য পরিশ্রমে মূর্চ্ছা গেছে, নাগাপ্পন নামে একজন সত্যাগ্রহী জেলের কষ্টে মরে গেল, তবু ভারতীয়েরা পরাজয় মানলো না।

কত লোককে আর জেলে ভরে রাখা যায়? শেষে সত্যাগ্রহীদের ট্রেন বোঝাই করে ট্রান্স্‌ভাল রাজ্যের সীমানা পার করে ছেড়ে দিয়ে আসা হোত।

তবু ভারতীয়দের উৎসাহ কমে না।

সরকার এবার যাকে ধরে তাকেই জাহাজে তুলে দেয়, একেবারে সমুদ্র পার করে ভারতবর্ষে ফেলে দিয়ে আসে। তাদের ছেলে-মেয়ে, জোত-জমি ব্যবসা সেখানেই পড়ে থাকে। তার উপর জাহাজের কষ্ট অপরিসীম—খাওয়ার কোন সু-বন্দোবস্ত নেই, সবাই ডেকের যাত্রী, এই কষ্ট সইতে না পেরে নারায়ণ স্বামী নামে এক সত্যাগ্রহী মারা যায়।

এই নিঃস্ব আগন্তুকদের সম্পর্কে ভারতবর্ষেও আন্দোলন সুরু হয়ে গেল, এবং শেষ অবধি ট্রান্স্‌ভাল গভর্মেণ্টকে এই কৌশল বন্ধ করতে হোল।

এদিকে আবার জেলের ভিতরেও নানা রকম জুলুম সুরু হোল। ডায়াকলুক জেলখানার সত্যাগ্রহীদের জেলার একদিন যা তা অপমান করলো। প্রতিবাদে সত্যাগ্রহীরাও উপবাস সুরু করলো, বললো—হয় এই জেলারকে এখান থেকে বদল করা হোক্, না-হয় আমাদের অন্য জেলে পাঠানো হোক।

সাতদিনেও সরকার তাদের খাওয়াতে পারলো না। শেষ অবধি গভর্মেণ্টকেই হার মানতে হোল, সত্যাগ্রহীদের অন্য জেলে পাঠানো হোল।

ইতিমধ্যে ভারতীয়েরা ঠিক করলো বিলাতে ডেপুটেশন পাঠাতে হবে।

গান্ধিজী ও শেঠ হাজি হাবিব বিলাতে গেলেন। পার্লামেণ্টের সভাপতি ও প্রত্যেকটি সদস্যের সঙ্গে দেখা করলেন। কিন্তু বিশেষ কোন লাভ হোল না।

হাজার হাজার মানুষের দুশ্চিন্তা মাথায় নিয়ে গান্ধিজী জাহাজ থেকে নাবলেন। একদিকে জেনারেল স্মাট্‌স্ ও জেনারেল বোথার গোঁ, দক্ষিণ আফরিকার বিপুল রাজস্ব, আইন কানুন ও পুলিশ, আরেকদিকে কয়েকহাজার ভারতীয়ের মরণপণ সত্যাগ্রহ। কতদিন এই সংগ্রাম চলবে কে জানে! যারা জেল খাটবে তাদের ছেলেমেয়েদের কে খাওয়াবে? তাদের বাড়ী ভাড়া দেবে কে? তা বলে কি শুধু অর্থের জন্যই পরাজয় মানতে হবে?

চিন্তাচ্ছন্ন গান্ধিজী কেপটাউনে নেবেই 'তার' পেলেন—স্যার রতন টাটা বিলাত থেকে পঁচিশ হাজার টাকা পাঠিয়েছেন।

টাকা তো হোল, কিন্তু এই টাকা থেকে যদি প্রত্যেকটি পরিবারকে প্রয়োজন মত সাহায্য করতে হয় তাহলে এ টাকায় আর কতদিন যাবে? সব কটি গৃহস্থকে

একত্র রাখতে পারলে খাই-খরচ কম পড়ে, বাড়ী ভাড়াও কম লাগে। কিন্তু অতোগুলো মানুষকে এক সঙ্গে রাখার মত জায়গা কই? ফিনিক্সে রাখা চলে, কিন্তু, ফিনিক্স্ জোহানেস্বার্গ থেকে অনেক দূর, তিনশো মাইল পথ। ত্রিশ ঘণ্টার রাস্তা! কাছাকাছি কোথাও কিছু পাওয়া যায় না?

জার্মান স্থপতি হার্মান কলেনবেক বললেন—কোন ভাবনা নেই আমি দোব।

জোহানেস্বার্গ থেকে একুশ মাইল দূরে কলেনবেকের ৩৩০০ বিঘা জমি কেনা ছিল, সত্যাগ্রহীদের জন্য তিনি সেটা ছেড়ে দিলেন।

এখানেই গান্ধিজীর নতুন আশ্রম গড়ে উঠলো—টলষ্টয় ফার্ম।

যতদূর চোখ যায় কমলালেবু, আখরোট আর কুলের গাছ, ফলভারে নত হয়ে পড়েছে। ছোট একটি টিলাকে পাশ কাটিয়ে তর তর করে বয়ে চলেছে এক শীর্ণা ঝর্ণার ধারা, চারিপাশে শান্ত প্রকৃতির সমাহিত শ্যামলিমা। বাতাসে পাতায় মর্মর জাগে, সমীরণে ছোঁয়া লাগে প্রকৃতির অনন্ত স্নেহের।

আশ্রমের সম্বল কয়েকটি টিনের ঘর মাত্র। আশ্রমবাসী প্রায় শ'খানেক। হিন্দু মুসলমান পার্শী ও খৃষ্টান। ছেলে বুড়ো স্ত্রী ও পুরুষ। কিন্তু সেজন্য খাওয়া-পরার কোন বাচ-বিচার ছিল না। সকলেই নিরামিষ খেতেন। সকালে ও সন্ধ্যায় ঘরে পেষাই-করা গমের আটা থেকে পাউরুটি তৈরী হোত, তার সঙ্গে থাকতো ভাজা চিনাবাদামের গুঁড়া, আর নারাঙ্গী ছালের মোরব্বা, দুধ ও কফি। দুপুরে ভাত তরকারীর ব্যবস্থা ছিল।

আশ্রমের কোন ঝি-চাকর ছিল না, নিজের কাজ নিজেই করতে হোত। পায়খানা সাফ করা থেকে রান্না করা পর্যন্ত সবই আশ্রমিকদের করণীয় ছিল, যাদের জীবনের একটি ঘণ্টাও চাকর ছাড়া চলেনি এমন সব লোক—প্রাগজী, রায়প্পন, কলেনবেক প্রভৃতিও সানন্দে এই নীতি মেনে নিয়েছিলেন। প্রাগজী তো একদিন ক্লান্তি ও গরমে অজ্ঞান হয়ে পড়েন, তবু তিনি আশ্রম ছাড়েন নি।

দুপুরে আশ্রমিকেরা ছুতোরের কাজ করতো। গ্রামে যেসব কাঠের জিনিষ দরকার হোত তা আশ্রমবাসীরাই তৈরী করে দিত।

আশ্রমে চামড়ার কাজ হোত। কলেনবেক জুতো তৈরী করা শিখেছিলেন, গান্ধিজী ও আর কয়েকজন রীতিমত স্যাণ্ডেল তৈরী করা সুরু করে দিলেন। বন্ধুদের কাছে সেই জুতো বিক্রী করা হোত।

সন্ধ্যাবেলা খোলা মাঠে পাঠশালা বসতো। কিন্তু সারাদিনের পরিশ্রমের পর লেখা-পড়া আর জমতো না, শ্রান্তিতে শিক্ষক ও ছাত্র সবাই ঝিমুতো। গান্ধিজী

ও কলেনবেক বারবার চোখে জল দিয়ে আসতেন, কিন্তু ছাত্রদের মধ্যে সাড়া তোলা মুস্কিল হয়ে পড়তো। অনেক সময় এই তন্দ্রা জয় করবার জন্য তাঁরা ছাত্রদের সঙ্গে খেলাধুলা শুরু করে দিতেন।

আশ্রম থেকে জোহানেস্‌বার্গ ছিল একুশ মাইল দূর। খরচ কমাবার জন্য নিয়ম করা হয়েছিল, এই একুশ মাইল পথ পায়ে হেঁটে যাতায়াত করতে হবে। যারা শহরে যাবার, তারা রাত আড়াইটার সময় বেরিয়ে পড়তো, সকাল আটটা-ন'টা নাগাত পৌঁছে যেত জোহানেস্‌বার্গে, কাজ শেষ করে আবার হেঁটে ফিরে আসতো সেই দিনই। তবে আশ্রমের নেহাৎ জরুরী কোন কাজ থাকলে ট্রেণে যাওয়া চলতো,—অবশ্য তৃতীয় শ্রেণীতে।

আশ্রমিকদের পোষাক ছিল ওখানকার মজুরদের মত—আস্‌মানী রঙের পাৎলুন আর সার্ট।

টলষ্টয় ফার্মে সাপের ভয় ছিল। কিন্তু গান্ধিজীর নীতি অহিংসা, বললেন—সাপ মারা চলবে না।

কলেনবেক বললেন—বেশ সাপের সঙ্গে তা'হলে বন্ধুত্ব করবো।

সাপ সম্পর্কে যতগুলি বই আছে তিনি যোগাড় করলেন ও পড়ে শেষ করলেন। সব রকমের সাপ চিনতে সুরু করলেন, শেষে এক প্রকাণ্ড অজগর ধরে পুষতে লাগলেন। তার চালচলন দেখেন। তাকে নিজের হাতে খাওয়ান। ছেলেমেয়েরা দেখে খুসি হয়, গান্ধিজীও আনন্দ পান। তবু তিনি মাঝে মাঝে বলেন—ওকে ছেড়ে দাও, একটা প্রাণীকে এভাবে আটকে রাখা অন্যায়!

কলেনবেক বললেন—কদিন যাক, তারপর ছেড়ে দেবো।

কিন্তু বেশীদিন গেল না, একদিন খাঁচার দরজা খোলা পেয়ে অজগর কখন কোথায় পালিয়ে গেল।

আশ্রমে যে একেবারেই সাপ মারা হোত না, তা নয়। একদিন কলেনবেকের ঘরে এমন জায়গায় এক বিষধর সাপ দেখা গেল, যেখান থেকে তাকে তাড়ানো যাবে না, ধরাও যাবে না! ছেলেরা গিয়ে তখনই বাপুজীকে ডেকে আনলো, অবস্থা দেখে বাপুজীই আদেশ দিলেন—মেরে ফেল!

আশ্রমে গান্ধিজী নিজেই রোগীদের চিকিৎসা করতেন।

লুটাবনের বয়স প্রায় সত্তর বছর, অনেক দিন ধরে বেচারা হাঁপানি কাশিতে কষ্ট

পাচ্ছে। ডাক্তার বদ্যি বড় কম দেখায় নি। কিন্তু ফল কিছুই হয় নি। শেষে টলষ্টয় ফার্মে এসে বাপুজীকে ধরলো—আমাকে আপনি সারিয়ে দিন।

গান্ধিজী বললেন—এখানে এসে তাহলে দিন কতক থাক, দেখি কি করতে পারি।

প্রতিদিন দুপুরে লুটাবনের রৌদ্র-স্নানের ব্যবস্থা করলেন, তার খাবারের মধ্যে অল্প ভাত ও জলপাইয়ের তেল, মধু, নারেঙ্গী, আঙুর আর কফি। নুন ও মশলা একেবারে বাদ।

সাতদিনের মধ্যে কোন উপকার হোল না। গান্ধিজী জিজ্ঞাসা করলেন—লুটাবন, তুমি কি বিড়ি খাও?

—আগে খেতাম, এ-ই ক'দিন তো খাইনি।

তবু বাপুজীর সন্দেহ যায় না, একদিন রাত্রে সজাগ হ'য়ে থাকেন। দুপুর রাত্রে লুটাবনের কাসি ওঠে। খানিকক্ষণ কাসির পর একটি বিড়ি ধরিয়ে সে খেতে সুরু করলো। গান্ধিজী বাইরের বারান্দায় শুয়েছিলেন, ভিতরে গিয়ে টর্চের আলো ফেললেন লুটাবনের উপর। লুটাবন চমকে উঠলো, বিড়ি ফেলে দিয়ে বাপুজীর পায় ধরলো—আমি আর কখনো বিড়ি খাব না, আপনাকে ঠকিয়েছি, মাপ করুন।

সেইদিন থেকে লুটাবন বিড়ি ছাড়লো।

এক মাসের মধ্যে তার হাঁপানিও সেরে গেল।

•

ষ্টেশন-মাষ্টারের একটি ছেলের টাইফয়েড হোল। ছেলেটির বয়স বছর দুয়েক। মাষ্টার মশাই খুব ভয় পেয়ে গেলেন, বাপুজীর কাছে এলেন—তিনি কিছু করতে পারেন কি না?

গান্ধিজী প্রথমদিন ছেলেটিকে একেবারে অনাহারে রাখলেন।

দ্বিতীয় দিনে মাত্র অর্দ্ধেকটা কলা, আধ চামচ অলিভ-অয়েল আর একটু লেবুর রস দিয়ে মেড়ে খেতে দিলেন। রাত্রে ছেলেটির পেটে মাটির পুলটিশ বেঁধে দিলেন।

এইতেই ছেলেটি ক্রমশঃ আরাম হ'য়ে গেল।

এই সময় কস্তুরবা'র খুব অসুখ করে, ডাক্তার বললো—মাংসের সুরুয়া খেতে হবে।

কস্তুরবা আপত্তি তুললেন, গান্ধিজী বললেন—ডাক্তারবাবু আপনি অন্য কোন ব্যবস্থা দিন।

ডাক্তার বললেন—আমি ওঁকে ইতিমধ্যেই মাংসের হুরুয়া খেতে দিয়েছি।

গান্ধিজী চমকে উঠলেন, বললেন—আপনি অন্যায় করেছেন, সেবার আগে আমাদের বললেন নি কেন?

—রোগীকে বাঁচাবার জন্য যা কিছু করা দরকার আমরা নিজের দায়িত্বেই করি। সেখানে রোগীর মতামতের কোন মূল্য আমাদের কাছে নেই। আপনারা যাই বলুন না কেন প্রয়োজন মত মাংসের হুরুয়া আমি দোবই।

তখন ডাক্তারের বাড়ী থেকে বাপুজী কস্তুরবাকে নিয়ে এলেন। বাইরে ঝিম্ ঝিম্ করে বৃষ্টি পড়ছে, তার মধ্যে ওই রকম রোগীকে নিয়ে রিক্শা ও ট্রেণে করে আশ্রমে ফিরে আসা বড় সহজ ব্যাপার নয়। কস্তুরবা তখন উঠে দাঁড়াতে পারেন না, ষ্টেশনের প্লাটফর্মটি গান্ধিজী তো তাঁকে কোলে করেই পার হলেন। কেবলই ভয় হয় হয়তো এই পরিশ্রমেই রোগী হার্টফেল করবেন।

আশ্রমে এনে জল-চিকিৎসায় গান্ধিজী কস্তুরবাকে আরাম করেন।

বাপুজীর চিকিৎসার ধারা ছিল অভিনব। একবার কস্তুরবার এক অপারেশন হয়, কিন্তু ডাক্তারী চিকিৎসায় শরীর সারে না, শেষে বাপুজী কোন ওষুধ না খাইয়ে শুধু ডাল আর নুন খাওয়া বন্ধ করে দিয়ে কস্তুরবাকে সম্পূর্ণ নিরাময় করে তোলেন।

এই আশ্রমে থাকার সময় গান্ধিজী দুধ খাওয়া বন্ধ করে দেন। রান্না-করা জিনিষ খাওয়া ছেড়ে দেন। শুধু ফল ছাড়া আর কিছুই তিনি খেতেন না। একাদিক্রমে ছ'-বছর পর্যন্ত তিনি ফল খেয়েই ছিলেন, তাতে তাঁর শরীর এতো সবল ছিল যে দৈনিক চল্লিশ মাইল হাঁটা তাঁর কাছে অত্যন্ত সহজ ছিল, একদিন অনায়াসে একান্ন মাইল অবধি হেঁটে গিয়েছিলেন।

টলষ্টয় ফার্ম সুরু করে গান্ধিজী যে ফিনিক্সের আশ্রম ছেড়ে দিয়েছিলেন তা নয়, দুটোতেই তিনি যোগাযোগ বজায় রেখেছিলেন। এই দুটি আশ্রমেই তাঁর সব চেয়ে বড় কথা ছিল মানুষ তৈরী করা। এজন্য আশ্রম-বাসীদের ত্রুটি-বিচ্যুতি তাঁর মনে বড় লাগতো। একবার টলষ্টয় ফার্মে এক দুষ্ট ছেলেকে তিনি কিছুতেই বশে আনতে পারলেন না। সতেরো বছরের জোয়ান ছেলে, কোন কথাতেই কান পাতে না, কারুর না কারুর সঙ্গে প্রতিদিন ঝগড়া বাধাবেই। একদিন গান্ধিজী আর সইতে পারলেন না, হাতের কাছে একটি রুল-কাঠ

ছিল, তুলে নিয়ে বসিয়ে দিলেন এক ঘা। গান্ধিজী কখনো কারুর গায় হাত তোলেন না। মার খেয়ে ছেলেটি কেমন যেন হয়ে গেল, বাপুজীর মুখের পানে তাকিয়ে সে ঝর ঝর ক'রে কেঁদে ফেললো, বললে—আমার অন্যায় হয়েছে, আমি আর কোনদিন কারুর সঙ্গে ঝগড়া করবো না!

ছেলেটির চরিত্র যে তারপর একেবারে বদলে গিয়েছিল, তা নয়। কিন্তু বাপুজীর মনে একটা ধাক্কা লাগলো, জীবনে তিনি কাউকে প্রহার করেননি, প্রহার যে করলেন তার বিশেষ কোন ফলও হোল না, মনের সংযমটাই নষ্ট হোল শুধু।

কিছুদিন পরে ফিনিক্সের আশ্রমে দুটি ছেলের দুষ্টামির কথা তাঁর কানে এলো। এবার বাপুজী ছেলেদুটিকে কোন শাস্তি দিলেন না, আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে নিজেরই প্রায়শ্চিত্তের বিধান করলেন,—আশ্রমের যত কিছু দোষ তার জন্য, তিনিই তো দায়ী। তিনি সাতদিন উপোস করলেন, তারপর দিনে একবার মাত্র আহার করে কাটালেন সাড়ে চার মাস।

আশ্রমের মাঝে বেশ একটা সাড়া পড়ে গেল কিন্তু যতদূর আশা করা গিয়েছিল, ততটা সুফল পাওয়া গেল না। দিনকয়েক বাদে আবার ছেলেদের মাঝে গোলযোগ দেখা দিল, এবং এবার বাপুজী আবার উপবাস সুরু করলেন।

এবার পুরো দু'সপ্তাহ।

এবার আশাতীত ফল পাওয়া গেল, সমস্ত আশ্রমের আবহাওয়া বদলে গেল একেবারে। তবে এবার গান্ধিজী খুব দুর্বল হয়ে পড়লেন।

গোখলে এলেন আফ্রিকায়। বড় বড় রেল ষ্টেশনগুলি সাজানো হোল। বড় বড় সুন্দর কারু-কার্যখচিত তোরণ তৈরী হোল। গোখলেকে এমন সম্মান দেখানো হোল, যা অনেক রাজার ভাগ্যেও সব সময় জোটে না।

প্রথম সভা হোল কেপ্টাউনে।

তারপর ক্লার্কসডর্প ও জোহানেস্বার্গ। সহরের হাজার হাজার লোক সভায় এসেছিলেন। কিন্তু কোথাও কোন গোলমাল হয়নি।

জোহানেস্বার্গের এক সভায় এক গিনি করে টিকিট করা হয়েছিল। তাতেও একখানি চেয়ার খালি যায় নি।

গান্ধিজী গোখলের সেক্রেটারীর কাজ করছিলেন, তিনি বললেন—আপনি মারাঠীতে বলুন, আমি এদের হিন্দিতে তর্জমা করে দোব।

গোখলে তো শুনেই অবাক, বললেন—তোমার মাতৃভাষা গুজরাটী, আর তুমি মারাঠী থেকে হিন্দিতে অনুবাদ করবে! এতো ভালো মারাঠী আর হিন্দি তুমি শিখলে কোথায় বলত?

গান্ধিজী বললেন—মারাঠী আমি ভালো জানি না সত্যি, কিন্তু মারাঠী আমি বুঝতে পারি, আপনি যা বলবেন তার মোটামুটি তর্জমা আমি ঠিক করে দোব, আপনি দেখবেন। আমরা শুধু আপনার মুখ থেকে দেশীয় ভাষা শুনতে চাই, ইংরাজী শুনতে চাই না।

কাজেই গোখলে মাতৃভাষাতেই বক্তৃতা করলেন।

তারপর ভারতীয়দের যতগুলি সভা হয়েছিল সবক'টিতেই গোখলে মারাঠীতে বক্তৃতা করেন।

গোখলে জেনারেল স্মার্টস্ ও জেনারেল বোথার সঙ্গে দেখা করেন। অনেক কথাবার্তা হয়। গোখলে শেষ অবধি তাঁদের প্রতিশ্রুতি আদায় করেন—এক বছরের মধ্যে এসিয়াটিক্ আইন রদ করা হবে, এবং তিন পাউণ্ড করও তুলে দেওয়া হবে।

কিন্তু গোখলে চলে যাবার পর জেনারেল স্মার্টস্ তাঁর প্রতিশ্রুতি রাখলেন না, তার উপর এক মামলায় আদালতের জজেরা ঠিক করলেন—খ্রীষ্টান বিয়েই ঠিক, আর হিন্দু মুসলমান পার্শীদের বিয়ে ভুয়া। এবং তাহলে হিন্দু মুসলমান ও পার্শীদের ছেলে-মেয়েরা আইনতঃ পিতার সম্পত্তি দাবী করতে পারে না।

ভারতীয়দের মধ্যে সাড়া পড়ে গেল,—এ কি?

গবর্মেণ্ট বললো—ঠিক হ্যায়!

মেয়েরা এবার সত্যাগ্রহ সুরু করলো।

প্রথমে সাড়া দিলেন টলষ্টয় ফার্মের এগারো জন মহিলা—তাঁদের দুজনের কোলে দুধের শিশু ছিল।

তারপর এগিয়ে এলো ফিনিক্সের মেয়েরা।

কস্তুরবা'ও ছিলেন তাঁদের মধ্যে। বললেন—আমিও যাব!

গান্ধিজী বললেন বেশ কথা, কিন্তু আদালতে দাঁড়িয়ে যদি কাঁপতে থাক, কিম্বা জেলের কষ্ট সইতে না পারো তাহলে আমার অবস্থাটা কি হবে একবার ভেবে দেখো।

—যদি আমি হার মেনে পালিয়ে আসি তাহলে তুমি আমাকে বাড়ী ঢুকতে দিও

না। তুমি কি ভাব যে তুমি যা সইতে পারো, আমার ছেলেরা যা সইতে পারে আমি তা সইতে পারি না!

—কিন্তু যাবার আগে ভালোমত না ভেবে…

—আমি ভেবে নিয়েছি!

সত্যাগ্রহ স্বরু হয়ে গেল।

একদল মেয়ে পাস না নিয়ে ট্রান্সভালে ঢুকলো, পুলিশ তাদের গ্রেপ্তার করে তিন মাস করে জেল দিল।

মেয়েদের জেলে অত্যন্ত কষ্ট দেওয়া হয়। সেখানকার খাবার কেউ মুখে তুলতে পারতো না, কস্তুরবা একবার আপত্তি জানালে, জেল-সুপার তাঁকে জবাব দিল—এটা হোটেল নয় যে খুসি মত খাওয়া পাবে!

এর উপর ছিল ধোপার কাজ।

তিন মাস পরে যখন মেয়েরা জেল থেকে বেরুলো তখন তাদের চেনা যায় না।

আঠারো বছরের মেয়ে ভালিয়ামা, জ্বর নিয়েই বেরিয়েছিলেন, কদিন পরেই মারা গেলেন। মারা যাবার আগে ভালিয়ামা বলেন—আমি আবার জেলে যেতে রাজী আছি। যদি মরতে হয় দেশের জন্যেই মরবো!…

এই সব অসুস্থ মেয়েদের অনেক সময় বাপুজী একাই ঠেলা-গাড়ী করে ষ্টেশন থেকে আশ্রম অবধি নিয়ে আসতেন। 'ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়ন' কাগজের সম্পাদক স্বামী ভবানীদয়াল লিখেছেন: আমার স্ত্রী জগরাণীকে নিয়ে যখন ষ্টেশনে পৌছালাম, দেখি চটের সার্ট আর চটের হাফ্ প্যান্ট পরণে বাপুজী একটা ঠেলা-গাড়ী নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। গাড়ীতে বিছানা পাতাই ছিল, জগরাণীকে এনে তো শুইয়ে দিলাম। বাপুজী একাই আড়াই মাইল পথ গাড়ী ঠেলে নিয়ে এলেন ফিনিক্স্ আশ্রমে।

নিউকাস্লের কয়লা খনির ভারতীয় মজুরেরা কাজ ছেড়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে মালিকেরা তাদের কোয়ার্টার্স থেকে বের করে দিল, জল বন্ধ করে দিল, জিনিষ-ছুঁড়ে ফেলে দিল পথে। যারা প্রতিবাদ তুললো তাদের রীতিমত প্রহার দিল। এক পাঠান মজুর গান্ধিজীকে পিঠ দেখিয়ে বললো—এই দেখুন, আমাকে কি রকম মেরেছে। আপনি বারণ করেছেন বলেই আমি ছেড়ে দিয়েছি, নাহলে পাঠান কখনও চুপ করে মার খায় না।

গান্ধিজী বললেন—তুমি ভাই ঠিক করেছ, অমনি মনের জোর থাকলে আমরা ঠিক জিতবো।

মুখে তো সাহস দিলেন, কিন্তু হাজার হাজার সর্বহারা মজুরকে রাখেন কোথায়? খাওয়াবেন কি? টাকা কোথায়?

ফাঁকা মাঠে হাজার হাজার মজুর এসে জমায়েৎ হোল।

ভারতীয় ব্যবসায়ীরা রান্না করার বাসন দিল, চাল ডালের বস্তা পাঠিয়ে দিল। যারা কিছু দিতে পারলো না, তারা এলো স্বেচ্ছাসেবক হয়ে সেবা করতে।

গান্ধিজী ঠিক করলেন এদের নিয়েই আইন অমান্ত আন্দোলন সুরু করবেন। মজুরদের ডেকে বললেন—এই সব অন্যায়ের প্রতিকার করার জন্য জেলে যেতে হবে। যারা এগিয়ে যাবে তাদের পিছিয়ে আসা চলবে না। যাদের ভয় করে তারা আগেই ফিরে যাও।

পাঁচ ছ' হাজার হরতালিয়া এক সঙ্গে সাড়া তুল্‌লো—আমরা জেলে যাব!

গান্ধিজী তাদের নিয়ে প্রস্তুত হলেন।

মালিকেরা গান্ধিজীকে ডেকে বললেন—হরতাল বন্ধ করুন।

—আপনারা মাথা পিছু তিন পাউণ্ড কর তুলে নিন্।

—আমরা কি গবর্মেণ্ট?

—গবর্মেণ্ট আপনাদের হাতে, আপনারা অনুরোধ করলে গবর্মেণ্টের না শোনার কোন কারণ নেই।

—এই হরতালের পরিণাম কি আপনি জানেন?

গান্ধিজী হাসলেন।

—এই মূর্খ নির্বোধ মজুরদের যে ক্ষতি হবে, তা কি আপনি দেবেন?

—ক্ষতি হবে জেনেই তো তারা হরতাল করেছে। আত্মমর্যাদা নষ্ট হওয়ার চেয়ে আর যে কি বড় ক্ষতি আছে তাতো জানি না।

গান্ধিজী ভয় পাবার মানুষ নন, সন্ধি হোল না।

হাজার হাজার মজুর পায়ে হেঁটে যাত্রা সুরু করলো, তাদের পথ দেখিয়ে চললেন গান্ধিজী।

দৈনিক কুড়ি পঁচিশ মাইল হাঁটা।

মাথা পিছু পোয়া তিনেক রুটী আর কিছু গুড়। রাত্রে মুক্ত আকাশের নীচে বিশ্রাম।

কদিনের মধ্যেই দলটি ট্রান্সভালের প্রান্তে এসে পৌছালো।

গান্ধিজী জেনারেল স্মার্টসের কাছে টেলিফোন করলেন—আমরা ট্রান্সভালে

ঢুকবো, সার্টিফিকেট নোব না, আইন ভাঙবো। আপনি যদি তিন পাউণ্ড কর রদ করেন তবেই আমরা থামতে পারি, নতুবা আমরা নিরুপায়।

উত্তর এলো—জেনারেল স্মাটস্ আপনার সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখতে চান না, আপনার যা ইচ্ছা হয় করতে পারেন।

আর দ্বিধা রইল না, গান্ধিজী সদলে ভোকস্রষ্টের ঝর্ণা পার হয়ে ট্রান্সভালের সীমানায় পা দিলেন। তাঁর পিছনে এলো হরতালিয়াদের সারি—দু' হাজার সাইত্রিশ জন পুরুষ, একশো সাতাশ জন স্ত্রীলোক, আর সাতান্নটি বালক বালিকা।

সামনেই ছিল অশ্বারোহী পুলিশ, জনতাকে রুখে দেবার জন্য তারা ঘোড়া নিয়ে এগিয়ে এলো, কিন্তু দুঃখ সহ্য করার দৃঢ়তা নিয়ে যারা এগুচ্ছে তাদের পথ রোধ করা তো সহজ নয়! হরতালিয়ারা ঠিক এগিয়ে চললো।

ভোকস্রষ্টের আট মাইল দূরে সেদিন তাঁবু পড়লো। গভীর রাতে সবাই ঘুমুচ্ছে এমন সময় শোনা গেল খট্‌মট্ শব্দ। গান্ধিজীর ঘুম ভেঙে গেল। দেখলেন: লণ্ঠন হাতে নিয়ে সিপাই আসছে।

গান্ধিজী উঠে বসলেন।

পুলিশ অফিসার এসে বললেন—আপনাকে গ্রেপ্তার করতে এসেছি!

—আমি প্রস্তুত। কোথায় যেতে হবে বলুন?

—এষ্টেশনে।

—বেশ চলুন।

পাশেই শুয়ে ছিলেন পি, কে, নাইডু, তাকে জাগিয়ে গান্ধিজী বললেন—হৈ চৈ করার কোন দরকার নেই। তোমাদের অগ্রগতি সমানে চলতে থাকবে। পুলিশ যাকে ধরবে সে ধরা দেবে, বাকী সবাই এগিয়ে চলবে। তুমিই এখন দলের নায়ক!

ভোকস্রষ্টের আদালতে পরদিন গান্ধিজীকে হাজির করা হোল, ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁকে পঞ্চাশ পাউণ্ডের জামিনে মুক্তি দিলেন। কলেনবেক মোটার নিয়ে আদালতের দরজায় তৈরী ছিলেন। মোটার ছুটিয়ে গান্ধিজীকে নিয়ে এলেন হরতালিয়াদের মাঝে!

আবার গান্ধিজীকে গ্রেপ্তার করা হোল ষ্টানডার্টন গাঁয়ে।

দুপুরে গান্ধিজী তখন হরতালিয়াদের মাঝে রুটি বিলুচ্ছিলেন ম্যাজিষ্ট্রেট এসে বললেন—আপনি আমার কয়েদী।

গান্ধিজী হেসে বললেন—আমার তাহলে পদোন্নতি হয়েছে, দারোগার বদলে এবার ম্যাজিষ্ট্রেট নিজেই এসেছেন।

আদালত তখনও চলছিল, গান্ধিজীকে আদালতে নিয়ে গিয়ে এবারও ম্যাজিষ্ট্রেট জামিন দিলেন।

এবারও মোটার তৈরী ছিল। গান্ধিজী ফিরে এলেন তাঁর দলে।

পরদিন বেলফোর্ডে আবার গান্ধিজীকে গ্রেপ্তার করা হোল।

ভাণ্ডিতে গান্ধিজীর বিচার হোল : ন'মাস সশ্রম কারাবাস।

ওদিকে গান্ধিজীর সঙ্গীদেরও পুলিশ গ্রেপ্তার করলো বেলফোর্ডে। সেখানে দুখানি স্পেশ্যাল ট্রেণ তৈরী ছিল। সেই ট্রেণে হরতালিয়াদের ভর্ত্তি করে নেতালে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হোল।

তারা তো প্রথমে ট্রেণে উঠতেই চায় নি, বললো—গান্ধি-ভাইকে আনো, তিনি যদি বলেন তবেই ট্রেণে উঠবো।

মিষ্টার পোলক ছিলেন তাঁদের সঙ্গে, তিনি অনেক বুঝিয়ে বলবার পর তবে তারা ট্রেণে ওঠে।

ভারতীয়দের মধ্যে এবার সাড়া পড়ে গেল, অনেকেই এবার নেতাল থেকে বিনা পাসে ট্রান্সভালে ঢুকতে লাগলো, এবং পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হতে লাগলো।

এদেরই মধ্যে একজন ছিলেন, পঁচাত্তর বয়সের বুড়ো,—হরবৎ সিং। গান্ধিজী একদিন তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন—আপনি জেলে এলেন কেন? আপনার মত বুড়ো লোককে তো আমি জেলে আসতে বলিনি?

হরবৎ বললেন—আপনি স্ত্রীপুত্র নিয়ে জেলে আসতে পারেন, আর আমরা বাইরে পড়ে থাকবো?

—কিন্তু জেলের কষ্ট কি আপনি সইতে পারবেন? আমি বরং আপনাকে মুক্তি দেবার চেষ্টা করি।

—না আমি সেভাবে মুক্তি চাই না, একদিন তো মরতেই হবে, না হয় জেলেই মরবো!

মাসখানেক পরে জেলেই হরবতের মৃত্যু ঘটে।

তাঁর শব নিয়ে ভোকস্রষ্ট সহরে বিরাট মিছিল বেরিয়েছিল।

ওদিকে নিউক্যাসলে হরতালিয়াদের পুলিশ ফিরিয়ে আনলো। মজুরদের কোয়ার্টারের চারিপাশে বেড়া লাগিয়ে জেলখানা তৈরী করলো। এবং সেখানে তাদের কয়েদ করে রেখে জোর করে তাদের দিয়ে খনির কাজ করিয়ে নিতে লাগলো।

যারা কাজ করতে চাইল না, তাদের পিঠে বেত পড়লো। কাউকে আবার

বুটশুদ্ধ লাথিও সইতে হোল। আর গালাগালি তো উপরি পাওনা।

এই অত্যাচারের কাহিনী অন্যান্য খনি অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়লো। ইসিপিঙ্গো, ভেরুলাম, ফিনিক্স্, ভোল্কট প্রভৃতি অঞ্চলের উমজিন্তো মজুরেরা কাজ ছেড়ে বেরিয়ে পড়লো।

মোট ষাট হাজার মজুর ধর্মঘট করলো।

খনি থেকে বেরিয়ে আসার সময় ঘোড় সওয়ার তাদের বাধা দিল।

তারা ফিরে যেতে অস্বীকার করলো।

পুলিশ গুলি চালালো।

অনেকে জখম হোল, দু'চার জন মরলো।

তথাপি হরতাল বন্ধ হোল না। অনেকে খনিতে ফিরলো না, অনেকে ভয়ে পালিয়ে গেল।

এই অত্যাচারের খবর পৌছালো ভারতবর্ষে।

সারা হিন্দুস্থান জ্বলে উঠলো। *

বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জ এক কড়া বক্তৃতা করলেন। বিলাতে ইংরাজদের এবার দৃষ্টি পড়লো দক্ষিণ আফ্রিকার কুব্যবস্থার দিকে। মুখরক্ষার জন্য জেনারেল স্মার্টস্ এক তদন্ত কমিশন বসালেন।

ভারতীয়েরা বললো—সত্যাগ্রহীদের মুক্তি না দিলে তারা কমিশন বয়কট করবে।

কর্তৃপক্ষ গান্ধিজী, পোলক ও কলেনবেককে ছেড়ে দিলেন।

গান্ধিজী বেরিয়ে এসেই স্মার্টস্কে লিখলেন—কমিশনের তিনজন সদস্যের মধ্যে একজন ভারতীয়কে নিতে হবে।

স্মার্টস্ অস্বীকার করলেন।

গান্ধিজী লিখলেন—তাহলে আমরা আবার জেলে ফিরে যাব এবং পয়লা জানুয়ারী আমাদের মার্চ সুরু হবে!

---

* এই সময় অমৃতবাজার পত্রিকা ও বাংলার অন্যান্য কাগজে গান্ধিজীর সত্যাগ্রহের কাহিনী পূর্ণ আকারে প্রকাশ করা হয়। কলেজ স্কোয়ারে এক বিরাট সভা হয়। বিপিনচন্দ্র পাল সভাপতি হন। সভায় অনেক অবাঙালী শ্রোতা থাকায় 'নায়ক'-সম্পাদক পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় হিন্দিতে বক্তৃতা করেন। জিতেন্দ্রলাল ব্যানার্জী এবং আরো অনেকে বক্তৃতা প্রসঙ্গে গান্ধিজীর প্রশংসা করেন। স্থির হয় আফ্রিকায় আর ভারতীয় কুলীদের যেতে দেওয়া হবে না, বড় লাট লর্ড হার্ডিঞ্জ কিছু করছেন না বলে এক প্রস্তাবে তাঁর নিন্দা করা হয়।

গোখলে ভারতবর্ষ থেকে টেলিগ্রাম করলেন—বয়কট করো না, কমিশনে সাক্ষ্য দাও, তাতে আমাদের মুখরক্ষা হবে!

গান্ধিজী ও দীনবন্ধু এণ্ডরুজ জেনারেল স্মার্টসের সঙ্গে দেখা করলেন। স্মার্টস্ বললেন—আপনারা যা চান তাই দোব বলে আমরা ঠিক করেছি, কিন্তু কমিশনের সম্মতি ছাড়া তা দিতে পারবো না!

কাজেই মার্চ ক'দিনের জন্য স্থগিত রাখা হোল।

কমিশন ভারতীয়দের পক্ষে মত দিলেন। তার উপর নূতন আইন তৈরী হোল: ভারতীয়দের মাথা পিছু তিন পাউণ্ড কর থাকবে না, ভারতীয়দের বিবাহ আইনতঃ মেনে নেওয়া হবে, এবং দশ আঙুলের ছাপ দিয়ে আর পাস নিতে হবে না।

আট বছর লড়াই চালিয়ে গান্ধিজী জয়যুক্ত হলেন, জেনারেল স্মার্টস্ ভারতীয়দের মর্যাদা স্বীকার করে নিলেন। দক্ষিণ আফ্রিকার কাজও শেষ হোল।

গোখলে লিখলেন—বিলাতে এসো।

•

প্রথম মহা-যুদ্ধ সুরু হবার মুখে গান্ধিজী বিলাতে এসে পৌঁছলেন। বিলাতে তখন যুদ্ধের বিপুল আয়োজন চলছে। এমন দিনে চুপ করে বসে থাকার মত মানুষ তিনি নন, সমস্ত ভারতীয় ছাত্রদের ডেকে এক সভা করলেন। আশী জন ভারতীয় যুবককে নিয়ে তৈরী হোল এক স্বেচ্ছাসেবকের দল। কর্ণেল ব্যাংকার হলেন তাদের অধিনায়ক আর গান্ধিজী তাদের সভাপতি। ছ'সপ্তাহ ধরে রীতিমত প্রাথমিক চিকিৎসার ক্লাশ বসলো, কস্তুরবাকেও এই ক্লাশে যোগ দিতে হোল। আশী জন স্বেচ্ছাসেবক রীতিমত একটি এম্বুলেন্স ইউনিট গড়ে তুললো।

এদিকে বিলাতে তখন শীত পড়তে সুরু করেছে। গান্ধিজী সে ধাক্কা সহ্য করতে পারলেন না, ডিসেম্বর মাসে তাঁর প্লুরিসি দেখা দিল। প্রথমে চিকিৎসা করলেন ডাক্তার জীবরাজ মেহেতা। বিলাতে তিনি তখন স্নাতক-উত্তর পড়াশুনা করতে গিয়েছিলেন। গান্ধিজীর খাওয়া-দাওয়ার অনেক গোঁড়ামি ছিল, সেই জন্য মেহেতার চিকিৎসায় বিশেষ কোন উপকার হোল না। গান্ধিজী তখন দেখালেন ডাক্তার অলিসনকে। তিনি সব দেখে শুনে পরামর্শ দিলেন—দেশে ফিরে যাওয়াই ভালো, সামনে জানুয়ারী মাস, ইংলণ্ডে বরফ পড়তে সুরু করবে, তখন গান্ধিজী আরো বেশী অসুস্থ হয়ে পড়বেন। ভারতের আবহাওয়া এখানকার চেয়ে অনেক গরম, সেখানে প্লুরিসি তেমন মারাত্মক ভাবে আত্মপ্রকাশ করতে পারবে না!

কথাটি গান্ধিজীর মনে লাগলো। তিনি দেশে ফেরার উদ্যোগ করলেন।

এই সময় শ্রীমতী সরোজিনী নাইডুর সঙ্গে গান্ধিজীর প্রথম পরিচয় হয়। শ্রীমতী সরোজিনী তখন লিসিয়াম নামে এক মহিলা সেবা সমিতিতে স্বেচ্ছাসেবিকার কাজ করছেন। সৈনিকদের জন্য পোষাক তৈরী করা, ব্যাণ্ডেজ করা, প্রভৃতি কাজে শ্রীমতী তখন প্রবাসী ভারতীয় মহিলাদের মধ্যে অগ্রণী। প্রথম পরিচয়েই তিনি গান্ধিজীর সামনে এক গাদা কাপড় এনে ফেলে দিলেন, বললেন—সৈনিকদের জামা হবে সব ছাঁটকাট কাটা আছে, আপনি আপনার স্বেচ্ছাসেবকদের দিয়ে এগুলো সব সেলাই করিয়ে দিন।

সেই থেকেই শ্রীমতীর সঙ্গে গান্ধিজীর বন্ধুত্ব পাকা হয়ে গেল, সরোজিনী তখন ইংরাজী কবিতা লিখে দেশ বিদেশে খুব নাম করেছিলেন, কথা বলার ধরণও ছিল চমৎকার। মহাত্মাজী রহস্য করে তাঁর নাম দিলেন—বুলবুল।

গান্ধিজী দেশে ফিরিলেন।

বোম্বাইয়ের নাগরিকেরা দুটি বড় সভায় গান্ধিজীকে অভিনন্দিত করলো। এক সভায় সভাপতি হন স্যার ফিরোজ শা মেটা অপর সভায় সভাপতি হলেন মহম্মদ আলি জিন্না।

শরীর অসুস্থ, দিন কয়েক গোখলের আশ্রমে বিশ্রাম করার জন্য গান্ধিজী পুণায় এলেন। মহামতি গোখলের সঙ্গে গান্ধিজীর অন্তরের একটা যোগ ছিল।

পুণায় গোখলের আশ্রম—ভারত ভৃত্য সমিতি। অসুস্থ গোখলে তখন আশ্রমেই ছিলেন। গান্ধিজীকে তিনি জানালেন সাদর অভ্যর্থনা।

সেখানে কয়েকটি দিন ভালোভাবেই কেটে গেল। নাম করা কত [illegible]র সঙ্গে সেখানে আলাপ হোল। কত কথা, কত সমস্যা নিয়ে আলোচনা হোল। ভারতের চল্লিশ কোটি মানুষের দুঃখ ও দৈন্যের কত কারণ, কত কাহিনী। গোখলের একান্ত ইচ্ছা ছিল গান্ধিজীকে নিজের আশ্রমে রাখতে। কিন্তু আশ্রমের সকলের সঙ্গে গান্ধিজীর মতের মিল হোল না, গান্ধিজী বললেন—আপনি অনুমতি দিলে, আপনার আশীর্বাদ পেলে, আমি গুর্জর দেশে এমনি এক আশ্রম করি।

গোখলে গান্ধিজীর মনের কথাটা বুঝলেন, বললেন—বেশ, আপনি তাই করুন, সেজন্য যে টাকা দরকার হবে, আমি সংগ্রহ করে দোব!

গান্ধিজী গোখলের কাছ থেকে বিদায় নিলেন। গোখলের শরীর ভালো ছিল না, গান্ধিজীকে ছেড়ে দিতে মনে বড় ব্যথা পেলেন, বিদায় বেলায় গান্ধিজীর সঙ্গে কথা বার্তা বলতে বলতে সভার মাঝেই মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লেন। পাঁচজন ধারাধরি ক'রে

নিয়ে গিয়ে তাঁকে বিছানায় শুইয়ে দিলেন। বিষণ্ণ মনে গান্ধিজী আশ্রম থেকে বাহির হলেন। মহামতির শেষ কথাটা তাঁর মনে গাঁথা হয়ে গেল—বাবা দেশটা আগে ঘুরে-ফিরে দেখে নাও, তারপর সত্যাগ্রহের কথা।

গান্ধিজী ভারত পরিক্রমা করতেই বেরুলেন।

বোম্বাইয়ের লাট গান্ধিজীকে ডেকে পাঠালেন। বললেন—আপনি যদি এখানে কোন আন্দোলন সুরু করেন, তাহলে তার আগে আমার সঙ্গে একবার দেখা করবেন।

গান্ধিজী বললেন—নিশ্চয়ই। আমি সত্যাগ্রহ করার আগে বিরোধী পক্ষের সঙ্গে একটা বোঝাপাড়া করার চেষ্টা করি।

বড়লাট বললেন— আপনি যখনই মনে করবেন তখনই আমার সঙ্গে দেখা করতে পারবেন।

তখন গান্ধিজী ভাবেননি যে, কয়েকদিনের মধ্যেই এই সাক্ষাৎকারের প্রয়োজন হয়ে পড়বে।

গান্ধিজী পুনা থেকে রাজকোট যাচ্ছেন, খুব জ্বর, ট্রেনের মধ্যে বসে বসে কাঁপছেন। বিরামগাঁয়ে ট্রেন এসে থামলো। মতিলাল নামে এক দরজী এসে তাঁর সঙ্গে দেখা করলো। বললো—এখানে শুল্ক আদায়ের জন্য সরকারী লোকেরা যাত্রীদের উপর অত্যাচার করে, মারপিট করে, ঘুষ নেয়, হায়রানি করিয়ে অনেক সময় ট্রেন ফেল করিয়ে দেয়, আপনি এর একটা কিছু প্রতিকারের ব্যবস্থা করুন।

গান্ধিজী কাঁপতে কাঁপতে বললেন—প্রতিকার আমি করতে পারি, তোমরা জেলে যেতে পারবে?

আপনি যদি বলেন যেতে হবে বৈকি!

মতিলাল যা বললো, কাথিয়াবাড়ের গাঁয়ে আরো কয়েক জনের মুখে গান্ধিজী সেই অনাচারেরই পুনরাবৃত্তি শুনলেন।

একটু সুস্থ হয়ে গান্ধিজী সকল তথ্য সংগ্রহ করে দেখা করলেন বোম্বাইয়ের লাট সাহেবের প্রাইভেট সেক্রেটারীর সঙ্গে। সেক্রেটারী সাহেব বললেন—এসব বড়লাটের দপ্তরের ব্যাপার, আমাদের করার কিছু নেই। আপনি দিল্লীর দপ্তরের সঙ্গে কথা-বার্তা চালান। আপনি তো এরই মধ্যে কাথিয়াবাড়ের এক সভায় সত্যাগ্রহ করবেন বলে আমাদের ভয় দেখিয়েছেন।

ভয় দেখানোর কথা কিছু নয়, নিজেদের মর্যাদা সম্পর্কে মানুষগুলিকে সজাগ করে তোলা আমার কর্তব্য, তাই করছি।

—আপনার কি ধারণা, শক্তিমান সরকারকে ভয় দেখিয়ে কাজ করিয়ে নেবেন?

—বৃটিশ গবর্মেন্টের শক্তি আছে সন্দেহ নেই। কিন্তু অন্যায়কে আঘাত করতে হলে সত্যাগ্রহ তার চেয়ে বেশী শক্তিমান।

—দেখা যাক, ফলেন পরিচিয়তে—

গান্ধিজী বিতর্ক তুললেন না, সবিনয়ে বিদায় নিয়ে পরদিনই দিল্লীতে লিখলেন।

ক'দিন পরেই দিল্লীতে গিয়ে বড়লাটের সঙ্গে দেখা করলেন। গান্ধিজীর মুখে সব কথা শুনে লর্ড চেমস্‌ফোর্ড তখনই দিল্লী থেকে টেলিফোন করলেন।—বড়লাটের হুকুমে, বিরাম গাঁও থেকে শুল্ক অফিস উঠে গেল।

গান্ধিজী এলেন শান্তিনিকেতনে।

নিজের একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করার আগে অন্যান্য আশ্রমগুলি একবার দেখে নেবার ইচ্ছা ছিল। সবার উপর ছিল কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হবার ঐকান্তিক আগ্রহ।

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন বয়সে আট বছরের বড়।

গান্ধিজী কবিকে বলতেন—গুরুদেব।

গুরুদেবের বড় ভাই দ্বিজেন্দ্রনাথ তখন বেঁচে ছিলেন, প্রথম পরিচয় হতেই তিনি গান্ধিজীকে নমস্কার জানালেন।

গান্ধিজী সঙ্কুচিত হয়ে উঠলেন, তাড়াতাড়ি প্রণাম করলেন।

বৃদ্ধ দ্বিজেন্দ্রনাথ আবার নমস্কার করলেন।

গান্ধিজী বিব্রত হয়ে আবার প্রণাম জানালেন।

দ্বিজেন্দ্রনাথ আবার নমস্কার করলেন।

গান্ধিজী আরো বিব্রত হয়ে পড়লেন, বললেন—এ আপনি কি করছেন বড়দাদা!

দ্বিজেন্দ্রনাথ হাসলেন, বললেন—আমি আপনাকে চিনতে পেরেছি, আপনি ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ!

উনিশ-শো-পনেরো সালে দ্বিজেন্দ্রনাথ যে কথা উচ্চারণ করেছিলেন, পরবর্তী বত্রিশ বছর ধরে তার সত্যতা বহুবার প্রমাণিত হয়েছে।

শান্তিনিকেতনে গান্ধিজী অধ্যাপক ও ছাত্রদের সঙ্গে মিশে গেলেন, বললেন,—কোন কাজই তো ছোট নয়, আমাদের নিজেদের কাজ আমরা নিজেরাই করবো।

ছেলে মেয়েরা দলে দলে ভাগ হয়ে গেল। কেউ রান্না করে, কেউ জল তোলে, কেউ বাসন মাজে, কেউ-বা পায়খানা সাফ করে। গান্ধিজীও তাদের মধ্যে আছেন।

গুরুদেব তো ভারী খুসি, বললেন—চমৎকার, এমনিভাবে আত্মনির্ভরশীল হতে শিখলে স্বরাজ আপনি আসবে।

গুরুদেবের সান্নিধ্যে গান্ধিজী নিজেকে হারিয়ে ফেলেছিলেন, দুটি প্রখর বেগবতী নদী সঙ্গমে এসে মিশেছিল। কিন্তু এ আনন্দ গান্ধিজীর কপালে সইল না, অকস্মাৎ বজ্রপাত হোল—খবর এলো—গোখলে মারা গেছেন।

সেইদিনই গান্ধিজী ছুটলেন পুণায়।

গোখলের মৃত্যুতে গান্ধিজী মুষ্‌ড়ে পড়লেন। আশ্রম প্রতিষ্ঠা করার কথাটা কিছুদিনের মত চাপা পড়ে গেল, ভারতের পথে-প্রান্তরে, তীর্থ ও জনপদে কয়েকটি দিন তিনি এলোমেলোভাবে ঘুরে বেড়ালেন উদাস মনে।

প্রথমে এলেন কলিকাতায়।

স্বনামধন্য ব্যারিষ্টার ভূপেন্দ্রনাথ বসুর বাড়ীতে তিনি অতিথি হলেন।

গান্ধিজী তখন ফল ছাড়া আর কিছুই খেতেন না। বাড়ীর মেয়েরাও সেজন্য বাজারের সব সেরা ফলটি গান্ধিজীকে খাওয়াতে না পারলে মনে তৃপ্তি পেতেন না। প্রতিদিন মেয়েরা বাজারে গিয়ে দেখে শুনে ফল কিনে আনতেন। তারপর অনেক সময় গভীর রাত অবধি জেগে সেই সব ফল কেটে কুটে ঠিক করে রাখতেন গান্ধিজীর পরদিনকার প্রাতঃরাশের জন্য।

দেখে শুনে গান্ধিজী বড়ই বিব্রত বোধ করতেন, প্রতিবাদ তুলতেন, কিন্তু স্নেহের দাবী প্রতিবাদ মানবে কেন?

কলিকাতা থেকে একদিন বেরিয়ে পড়লেন হরিদ্বারে কুম্ভমেলা দেখবার জন্য।

সেবার কুম্ভমেলায় সতেরো লাখ তীর্থিকের সমাবেশ হয়েছিল। ট্রেনে সেজন্য ভীড় কম হয়নি। কোন যাত্রী-গাড়ীতে উঠতে না পেরে সাহারাণপুরে গান্ধিজী মালগাড়ীতে ওঠেন। তাতে বসবার মত একটু জায়গা হয়েছিল বটে, কিন্তু নড়াচড়ার জো ছিল না।

গরু ছাগলের গাড়ী। মাথার উপর ছাদ নেই। দুপুরের চড়চড়ে রোদ সর্বাঙ্গ জ্বালিয়ে দেয়, তৃষ্ণায় বুক শুকিয়ে ওঠে, কিন্তু জল খাবার জন্য একবার নাবলে আর রক্ষা নাই, আর ওঠবার সুবিধা হবে না। কোন রকমে দুপুরটা কাটিয়ে যখন তিনি হরিদ্বার এসে পৌঁছান তখন মাথা তুলে দাঁড়াবার মত শক্তি নেই।

সতেরো লাখ লোকের ভীড়, চারিপাশ অপরিচ্ছন্নতায় সংক্রামক হয়ে উঠেছে। গান্ধিজী দলবল নিয়ে পায়খানা সাফ করতে সুরু করে দিলেন।

কিন্তু তার আগেই গান্ধিজীর ভারতজোড়া নাম হয়ে গেছে, তাঁর ঝাড়ু হাতে পথে বেরুবার উপায় কই? 'গান্ধি-মহারাজ'কে দেখার জন্য দর্শনার্থীরা সদাসর্বদা তাঁর চারিপাশে ভীড় করে থাকে, স্নান আহারের সময় অবধি তিনি তাদের সঙ্গ থেকে রেহাই পান না।

তারা শুধুই দেখে চলে যায় না, কেউ পায়ের ধূলো কামনা করে, আবার কেউবা দু-চারটে প্রশ্নও তোলে।

হৃষিকেশে এক সন্ন্যাসী গান্ধিজীকে বললেন—আপনি হিন্দু, আপনার মত মানুষের শিখা ও উপবীত না দেখলে দুঃখ হয়! হিন্দু বৈশ্যেরাও তো পৈতা রাখে!

গান্ধিজীরও ছেলেবেলায় পৈতা ছিল। সেই পৈতায় সকল সময় তিনি একটি চাবি ঝুলিয়ে রাখতেন। রাখতে রাখতে পৈতাটি একদিন ছিঁড়ে গেল, সেই থেকে আর নতুন পৈতা কেনাও হয়নি, পরাও হয়নি।

গান্ধিজী বললেন—পৈতা আমি নোব না, যে পৈতা সব হিন্দু ধারণ করতে পারে না, তা আমি আর পরবো না।

সন্ন্যাসী বললেন—বেশ শিখা রাখুন।

গান্ধিজীর মাথায় শিখা ছিল। বিলাত যাবার সময় সেই শিখা তিনি ছেঁটে ফেলেন—সেদেশের সাহেবরা দেখে পাছে হাসে।

গান্ধিজী বললেন—শিখা রাখতে আমার কোন বাধা নেই, যে লজ্জায় একদিন শিখা কেটে ফেলেছিলাম, সে লজ্জাকে আজ আমি জয় করেছি।

সেইদিন থেকে গান্ধিজী আবার শিখা রাখতে সুরু করলেন।

হরিদ্বার থেকে ফিরে এসে আবার গান্ধিজী আশ্রম প্রতিষ্ঠা করার দিকে ঝুঁকে পড়লেন, স্থান নির্বাচন করা নিয়েই উঠলো সমস্যা, সকলেই তাঁকে ভালবাসেন, সকলেই তাঁকে নিজের কাছে টানতে চান।

স্বামী শ্রদ্ধানন্দ জানালেন—হরিদ্বারে আশ্রম করুন।

বাঙ্গালী বন্ধুরা বললেন—বৈদ্যনাথ ধামে আশ্রম করুন।

গুজরাটী বন্ধুরা বললেন—রাজকোটে আশ্রম করুন।

কিন্তু অনেক বিচার বিতর্ক করে গান্ধিজী শেষে আমেদাবাদে আশ্রম করলেন। আমেদাবাদে ধনীর অভাব নেই, প্রয়োজনমত টাকা সংগ্রহের সুবিধা হবে।

কোচরাবে ব্যারিষ্টার জীবনলাল দেশাইয়ের বাংলাটি ভাড়া নিয়ে ১৯১৫ সালের ২৫শে মে আশ্রম সুরু হোল, নাম দেওয়া হোল—সত্যাগ্রহ আশ্রম।

কিছুদিন পরে পুঞ্জাভাই হীরাচাঁদ নামে আমেদাবাদের এক ব্যবসায়ী গান্ধিজীকে সবরমতীর তীরে খানিকটা জমি কিনে দিলেন। নদীর তীর থেকে রাঙামাটীর যে পথটা বরাবর সেন্ট্রাল জেলের সামনে দিয়ে গিয়ে দিগন্তে হারিয়ে গেছে, সেই পথের পাশে নতুন করে আবার আশ্রমের পত্তন করলেন। এটি সবরমতী আশ্রম নামেই জগতে পরিচিত।

দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ভারতীয়দের জয়মাল্য নিয়ে গান্ধিজী ফিরেছিলেন। ওখানে আইন করে হিন্দুদের উপর যেসব অনাচার হচ্ছিল তার একটি সুষ্ঠু প্রতিবিধান করে এসেছিলেন। কিন্তু সেই প্রতিবিধান পাকাপোক্ত করতে হলে এদেশের আইনও কিছুটা বদলানো দরকার—এদেশ থেকে তখনও দক্ষিণ আফ্রিকায় কুলি পাঠানো চ্ছিল, আইন করে সেই প্রথাটি বন্ধ করা দরকার।

কিন্তু তেমন কিছু করতে গিয়ে প্রথমেই বাধা এলো বড়লাটের কাছ থেকে—র্ড হার্ডিঞ্জ ও লর্ড চেমস্‌ফোর্ড তেমন আইন করতে রাজী হলেন না।

বিদেশী বড়লাটের মুখের পানে তাকিয়ে জাতির সম্মানকে বিপন্ন করা যায় না। নেতারা বোম্বাই-এ এক সভা ডাকলেন, সবাই মিলে স্থির করলেন—১৯১৫ সালের ৩১শে জুলাইয়ের মধ্যে এই প্রথা উঠিয়ে না দিলে, ভারতব্যাপী আন্দোলন জাগাতে হবে।

জনমত গঠনের দায়িত্ব নিলেন গান্ধিজী।

ভারত পরিক্রমা সুরু হোল—বোম্বাই থেকে কলিকাতা, লাহোর থেকে মাদ্রাজ।

সি, আই, ডি'রা সজাগ হয়ে উঠলো, সর্বত্র গোয়েন্দাদের দৃষ্টি কেন্দ্রীভূত হোল এই মানুষটির উপর। প্রত্যেক ষ্টেশনেই এক একজন নতুন চেকার গাড়ীতে ওঠে আর জিজ্ঞাসা করে—কই, আপনার টিকিটটা দেখি?

গান্ধিজী টিকিট দেখান, তারা নম্বরটা টুকে নেয়। সব সময়েই তাদের শঙ্কা, আসল মানুষটি কোন্ ফাঁকে তাদের চোখকে ফাঁকি দিয়ে কোথায় নেবে যায়।

কয়েকটা ষ্টেশনে পরপর এমনি হতেই সহযাত্রীরা বিরক্ত হয়ে উঠলো, প্রতিবাদ

করে বললো—এ কি ব্যাপার, একজন ভালোমানুষ লোককে আপনারা এভাবে বিরক্ত করছেন কেন ?

গান্ধিজীকে তখনও সবাই চিনতো না। সাজ-পোষাক দেখে ভেবেছিল, কোন নিরীহ গরীব লোক, তাই উপদেশ দিয়ে বললো—দেখুন মশাই, টিকিট দেখতে চাইলেও আপনি আর কাউকে টিকিট দেখাবেন না।

গান্ধিজী হেসে উত্তর দিলেন—টিকিটটা একবার দেখাতে দোষ কি ? ওদের তো কোন অপরাধ নেই, ওদের উপর যেমন হুকুম হয়েছে ওরা তাই করবে তো !

এদেশে এতদিন গান্ধিজী কাপড় কোট ও পাগড়ী পরতেন—গুজরাটী ভদ্রলোকের পোষাক। এবার তিনি পরিচ্ছদকে আরো সংক্ষেপ করলেন : কোট ছেড়ে সার্ট ধরলেন আর পাগড়ীর বদলে আট আনা দামের এক কাশ্মিরী টুপি মাথায় চড়ালেন, ...এবারকার বেশভূষা হোল অতি গরীব এক গুজরাটী চাষার মত। এই পোষাকে কারুর আর জানবার উপায় রইল না যে এই মানুষটি বিলাত-ফেরৎ পাকা ব্যারিষ্টার।

সেবার সবচেয়ে কষ্ট হয়েছিল লাহোর থেকে দিল্লী যাবার পথে।

ট্রেনে ওঠার উপায় নেই। থার্ডক্লাশে মানুষ গিস গিস করছে, অথচ সেই ট্রেনে না গেলেও নয়। গান্ধিজী প্রতিটি কামরার দরজায় দরজায় ফেরেন, কিন্তু একটি পা রাথার স্থান পান না কোথাও !

তিনি হতাশ হয়ে পড়েছেন এমন সময় একটি কুলি বললো—বাবুজী যদি বারো আনা বক্‌শিষ দেন, তো আপনাকে উঠিয়ে দিতে পারি !

গান্ধিজী রাজী হলেন, বললেন—বেশ দোব !

কুলিটি তখনই ছুটোছুটি করে ট্রেনের গোড়া থেকে শেষ অবধি বার [illegible] দেখে নিল—গান্ধিজীকে যদি কোথাও কোন রকমে তুলে দিতে পারে !

এদিকে তো ট্রেন ছাড়ার বাঁশী বাজলো।

এবার এক কামরার কয়েকজন যাত্রীর দয়া হোল। একজন বললো—যদি সারা পথ দাঁড়িয়ে থাকতে রাজী হন, তাহলে জানালা দিয়ে ভিতরে লাফিয়ে পড়ুন, কোন রকমে দাঁড়াবার স্থান করে দোব !

কুলিটি সাহায্য করলো, গান্ধিজী জানলা টপকে ভিতরে গেলেন।

তারপর বাংকের শিকল ধরে দাঁড়িয়ে রইলেন পাকা দু' ঘণ্টা। ট্রেনের ঝাঁকুনিতে সারা দেহ ঝিম ঝিম করতে লাগলো, মাথা টলতে লাগলো, আর একটু বাদে ঘুরে পড়ে যাবেন হয়তো !

উপরের বাংকে একটি লোক এতক্ষণ শুয়ে ছিল, তার বোধ হয় এবার একটু করুণা হোল, সে কথা পাড়লো—আপনি বসুন না সাধুজী, দাঁড়িয়ে আছেন কেন?

—কোথায় বসি বলুন?

—কতক্ষণ এভাবে দাঁড়িয়ে থাকবেন?

—দাঁড়িয়ে থাকবো বলেই তো উঠেছি—তাছাড়া বসার জায়গাই বা কোথায়?

বসার জায়গা যে সত্যই ছিল না তা নয়, কিন্তু নিজেকে সঙ্কুচিত করার মত ইচ্ছা ছিল না কারুরই।

কথায় কথায় আর একজন জিজ্ঞাসা করলো—আপনার নাম কি সাধুজী?

—মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী।

সকলে চমকে উঠলো—কি বললেন, আপনিই গান্ধিজী?

গান্ধিজী মৃদু হাসলেন।

যারা এতক্ষণ তিনজনের স্থান দখল করে শুয়েছিল তারা এবার ধড়মড় করে উঠে বসলো, তাড়াতাড়ি গান্ধিজীর বসার স্থান করে দিল, বললো—আপনি আমাদের ক্ষমা করুন, আমাদের অন্যায় হয়েছে।

সেবার দিল্লী ও করাচী হয়ে গান্ধিজী আসেন কলিকাতায়। কাশিমবাজারের মহারাজা মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর গৃহে তিনি অতিথি হন।

প্রত্যেকটি সভাতেই দক্ষিণ আফরিকায় কুলি পাঠানোর বিরুদ্ধে জনগণের মধ্যে বিশেষভাবে সাড়া পড়ে যায়।

শেষে ভারত সরকার ব্যাপারটির গুরুত্ব উপলব্ধি করেন। ৩১শে জুলাইয়ের আগেই তাঁরা ঘোষণা করলেন—দক্ষিণ আফরিকায় চুক্তি করে আর মজুর পাঠানো হবে না।

গান্ধিজীর সত্যাগ্রহের সাফল্য এতদিনে সম্পূর্ণ হোল।

কথাটা প্রচারিত হতে দেরী হোল না। ১৯১৬ সালে লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসে রাজকুমার শুকলা নামে এক চাষা এসে গান্ধিজীকে ধরলো। বললো—আপনাকে একবার চম্পারণ যেতে হবে। আমাদের দুঃখ আপনাকে নিজের চোখে দেখতে হবে।

চম্পারণ কোথায় গান্ধিজী তখনও তা জানতেন না। তখনকার মত রেহাই পাবার জন্য বললেন—আচ্ছা, সুবিধামত একদিন গিয়ে দেখবো'খন।

রাজকুমার সহজে ছাড়বার পাত্র নয়, বললো—আপনি একদিনের জন্য গেলেই হবে।

গান্ধিজী ঘাড় নেড়ে বললেন—আচ্ছা! আচ্ছা!

কিন্তু যত সহজে নিষ্কৃতি পাবার আশা তিনি করেছিলেন তত সহজে রাজকুমার তাঁকে ছাড়লো না। গান্ধিজী লক্ষ্ণৌ থেকে গেলেন কানপুরে। রাজকুমার সেখানে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করলো, বললো—এখান থেকে চম্পারণ বেশীদূর নয়, আপনি চলুন!

কলকাতা থেকে পাটনা হয়ে গান্ধিজী এলেন মজঃফরপুরে। সেখানকার সরকারী কলেজের অধ্যাপক আচার্য কৃপালনী দিনকয়েক আগে নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের প্রতিবাদে চাকুরী ছেড়ে দিয়েছিলেন। তিনি এসে গান্ধিজীর সঙ্গে দেখা করলেন। তাঁর মুখ থেকে গান্ধিজী নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের কথা সব শুনলেন: চম্পারণ জেলার চাষীদের দিয়ে প্রতি বিঘা জমি পিছু তিনকাঠা জমিতে জোর করে নীলের চাষ করিয়ে নেওয়া হয়। এর অন্যথা হলে নীলকুঠীর সাহেবদের হাতে তাদের নানা লাঞ্ছনা সইতে হয়। এই প্রথার নাম ছিল 'তিন কাঠিয়া'।

ব্রজকিশোর প্রসাদ, রাজেন্দ্র প্রসাদ, রামনবমী প্রসাদ, গয়া প্রসাদ প্রভৃতি উকিলদের সঙ্গে গান্ধিজীর দেখা হোল মজঃফরপুরে। কথাবার্তা হোল। গান্ধিজী সব শুনলেন, নীলকুঠীর সাহেবদের অত্যাচার কি ভাবে চরম সীমায় এসে পৌঁছেছে। তারপর তার প্রতিকারের জন্য নিজেই গেলেন নীলকুঠী সমিতির সম্পাদকের সঙ্গে দেখা করতে।

সাহেব সম্পাদক বললেন—আমরা জমিদার। চাষারা আমাদের প্রজা। নীলকুঠীর ব্যাপার আমাদের ঘরোয়া ব্যাপার। আপনি বাইরের লোক, আমাদের এই ব্যাপারে আপনি মাথা ঘামাবেন না। তবে আপনার যদি কিছু বলার থাকে আরজী লিখে জানাতে পারেন।

কমিশনার সাহেবের সঙ্গে গান্ধিজী দেখা করলেন। সাহেব ধমক দিলেন, বললেন—আপনি যত শিগগীর পারেন ত্রিহুত বিভাগ ছেড়ে চলে যান।

গান্ধিজী হাসলেন। ভয় পাবার মানুষ ত তিনি নন। হাতীর পিঠে চড়ে পরদিনই তিনি মতিহারি রওনা হলেন।

মাঝপথে পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট এসে দেখা করলেন। এক নোটিশ জারী করলেন গান্ধিজীর উপর—আপনি চম্পারণ ছেড়ে চলে যান।

গান্ধিজী লিখে দিলেন—আমি তদন্ত শেষ না করে এখান থেকে যেতে পারবো না।

আদেশ অমান্যের অপরাধে পরদিন আদালতে হাজির হবার জন্য গান্ধিজীকে সমন দেওয়া হোল।

গান্ধিজী আদালতে হাজির হলেন। বিচারকের কাছে বললেন—আমি আমার অপরাধ স্বীকার করছি, আইনের চেয়ে বিবেক বড়, সেই বিবেকের ডাকে আমি এখানে এসেছি, কাজ শেষ না করে আমি এখান থেকে যেতে পারি না, তার জন্য যদি আমাকে কোন সাজা পেতে হয়, আমি প্রস্তুত আছি।

সাজা কিছুই পেতে হোল না। পরদিনই লাটসাহেবের কাছ থেকে আদেশ এলো—গান্ধিজীর বিরুদ্ধে মামলা তুলে নেওয়া হোক্, এবং তদন্তের কার্যে গান্ধিজীকে সর্বপ্রকারে সাহায্য করা হোক্!

তদন্ত সুরু হোল। আফিস বসলো। অত্যাচারিত কিষাণদের জবানবন্দী নেওয়া সুরু হোল। শত শত কিষাণ প্রতিদিন আসে নিজের কথা বলতে। পাঁচ-সাত জন উকিল অবিরাম লিখে যান, তবু কাজের শেষ হয় না। সামনে একজন পুলিশের গোয়েন্দা সব সময় কাজের তদারক করে।

অত্যাচারের প্রমাণপত্র দিনের পর দিন বেড়ে চললো। নীলকুঠীর মালিকেরা ক্রুদ্ধ আক্রোশে ফুলে উঠতে লাগলো। নানা দিক থেকে তারা গান্ধিজীর বিরুদ্ধাচরণ করতে লাগলো।

কিছুদিন পরে লাটসাহেবের এক চিঠি এলো: অনেক দিন তো হোল, এবার তদন্ত শেষ করুন।

গান্ধিজী লিখলেন—আরো সময় লাগবে। কিষাণদের দুঃখ যতদিন না দূর হয়, ততদিন আমি এখানেই থাকবো।

লাটসাহেব এবার গান্ধিজীকে ডেকে পাঠালেন। বললেন—আমরা এক তদন্ত কমিটি নিযুক্ত করতে মনস্থ করেছি, আপনাকে তার সদস্য হতে হবে।

গান্ধিজী রাজী হলেন।

কমিটি বসলো।

কমিটি কিষাণদের সমস্ত অভিযোগ সত্য বলে মেনে নিল। লাটসাহেব 'তিন কাঠিয়া' প্রথা তুলে দিলেন। নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের রাজত্ব শেষ হোল। সত্যাগ্রহীর জয় হোল!

১৯১৫ সালের নববর্ষ উৎসব। রাজার নামে বড়লাট বাহাদুর নিজের প্রিয়-পাত্রদের নানা খেতাব দিচ্ছেন, তার মধ্যে দেশের জ্ঞানী, গুণী ও জনপ্রিয়দের অদৃষ্টেও দু' একটা পুরস্কার জুটছে—নেহাৎ চক্ষু লজ্জার খাতিরে। সে বছর গান্ধিজী হলেন তেমনি এক ব্যতিক্রম।

লর্ড হার্ডিঞ্জ গান্ধিজীকে 'কাইজার-ই-হিন্দ' পদক দিলেন।

রবীন্দ্রনাথ এর অনেক আগেই এক চিঠিতে গান্ধিজীকে 'মহাত্মা' বলে সম্বোধন করেন।

কিন্তু কবিগুরুর মত সুদূর-প্রসারী দৃষ্টি তখন এদেশে আর কারুর ছিল না, মহাত্মাজীকে তখনও আমরা চিনতে পারিনি, সেইজন্যই 'সত্যাগ্রহ আশ্রম' নিয়ে বাধলো সংঘাত।

আশ্রমে জাতির বিচার ছিল না। অমৃতলাল ঠক্কর—ঠক্কর বাপা—এক অস্পৃশ্য পরিবারকে পাঠালেন আশ্রমে থাকার জন্য—স্বামী, স্ত্রী আর একটি মেয়ে—দুদাভাই, দানিবেন ও লক্ষ্মী।

আশ্রমে অছুৎ! প্রথমেই বাধলো বাড়ীওলার সঙ্গে বিবাদ। আশ্রমে কূয়া ছিল একটি, সেই কূয়া থেকে বাড়ীওলাও জল নিত, সেই জল তোলা নিয়েই উঠলো আপত্তি—অস্পৃশ্যের ছোঁয়া লাগলে কূয়ার জল নষ্ট হয়ে যাবে যে! বাড়ীওলা গালাগালি সুরু করলো, ভয় দেখলো—দুদাভাই কূয়ার কাছে এলেই প্রহার দেবে!

আশ্রমে অছুৎ! সব একাকার! যারা আশ্রমে টাকা দিয়ে সাহায্য করতো, তারা মাথা নেড়ে বললো—না, এসব চলবে না, এ আশ্রমে আর টাকা দোব না!

কিন্তু সত্যাগ্রহী যে-সত্যকে অন্তর দিয়ে গ্রহণ করেন তা' থেকে, অতো সহজে তাঁরা বিচ্যুত হন না। মহাত্মাজী এতটুকু বিচলিত হলেন না। শেষে একদিন আশ্রমের কর্মকর্তা মগনলাল এসে বললেন—টাকা নেই, আসছে মাসে খরচ চলবে না!

গান্ধিজী বললেন—বেশ, সেজন্য চিন্তা কি, এখান থেকে আশ্রম তুলে নিয়ে চল হরিজন মহল্লায়, সেখানে আমরা সবাই মিলে দিন-মজুরী করবো, খরচ চলে যাবে!

আশ্রমের বাসিন্দা ছিলেন পঁচিশ জন। তাঁদের সবাইকে নিয়ে গান্ধিজী হরিজন মহল্লায় উঠে যাবার যোগাড় করলেন। কথাটা জানাজানি হয়ে গেল। যারা ভেবেছিল যে একঘরে করে গান্ধিজীকে জব্দ করবে তারা আসল মানুষটির পরিচয় তখনও পায়নি। গান্ধিজীর বয়স যখন সবেমাত্র বারো বছর তখন একদিন বাড়ীর মেথর উকাকে তিনি ছুঁয়ে ফেলেছিলেন, মা বলেছিলেন—স্নান করতে হবে!

গান্ধিজী স্নান করলেন, কিন্তু একজন মানুষ আরেকজন মানুষকে ছুঁয়ে ফেললে কেন স্নান করতে হবে, তার যথার্থ কারণ কিছু খুঁজে পেলেন না। স্নান সেরে এসে তিনি মাকে বললেন—উকাকে ছুঁলে অন্যায় হয় একথা আমি মানি না!

বারো বছরের ছেলে, যে-সত্য উপলব্ধি করে শুধু মৌখিক প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন,

আটচল্লিশ বছরের প্রৌঢ় সেই সত্যকে কাজে রূপায়িত করে তুলছেন, সামান্য জনকয় লোকের প্রতিবাদে তিনি ভেঙে পড়বেন কেন!

কিন্তু আশ্রম ছাড়তে হোল না, হঠাৎ একদিন দেবতার আশীর্বাদের মত আবির্ভূত হলেন এক শেঠজী, নিঃস্বার্থভাবে মহাত্মাজীর হাতে দিয়ে গেলেন—নগদ তেরো হাজার টাকা, তখনকার মত আশ্রমের খরচ চালাবার জন্য। দাতা নিজের পরিচয়-টুকুও মহাত্মাজীকে জানালেন না।

মহামতি গোখলের মৃত্যু সংবাদ শুনে মহাত্মাজী যেদিন শান্তি-নিকেতন থেকে বিদায় নিলেন, সেদিন দীনবন্ধু চার্লস এণ্ডরুজ বর্ধমান অবধি তাঁর সঙ্গে এলেন। দেশের নানা সমস্যা নিয়ে দুজনের মাঝে নানা আলোচনা হোল, শেষে দীনবন্ধু জিজ্ঞাসা করলেন—এদেশে আপনি কবে সত্যাগ্রহ সুরু করবেন?

—এখন কিছু বলা শক্ত—গান্ধিজী বললেন—তবে গোখলে আমাকে বলেছিলেন 'বছরখানেক ধরে ঘুরে ফিরে সারা দেশটাকে আগে ভালো করে দেখে নাও, তারপর সত্যাগ্রহের কথা', ইতিমধ্যে যেটুকু আমি দেখেছি তাতে আগামী বছর পাঁচেকের মধ্যে কোন আন্দোলন সুরু করা যাবে বলে তো আমার মনে হয় না।

কিন্তু পাঁচ বছরের অনেক আগেই গান্ধিজীকে তিনটি আন্দোলনের নেতৃত্ব নিতে হয়েছিল—চম্পারণ সত্যাগ্রহ, আমেদাবাদের শ্রমিক সত্যাগ্রহ ও খেড়া জেলার কিষাণ সত্যাগ্রহ।

আমেদাবাদে মিলের মজদুরদের মাহিনা ছিল বড় কম। তারা খেয়ে-পরে বাঁচতে পারে মালিকের কাছে এমন মাহিনা দাবী করলো। মালিকেরা তা দিতে রাজী হোল না, শেষে মজুরদের জব্দ করার জন্য তারা মিল বন্ধ করে দিল। তিনচার দিন ধরে চেষ্টা করেও গান্ধিজী কোন মীমাংসা করতে পারলেন না, নিরুপায় হয়ে শ্রমিকদের ধর্মঘট করার নির্দেশ দিলেন। সবরমতীর তীরে বহু প্রাচীন এক গাছের নীচে মিলের তাঁতীদের এক সভা বসলো, গান্ধিজী সেই সভায় চারটি নির্দেশ দিলেন :

কোন অবস্থাতেই শান্তিভঙ্গ করা চলবে না।

যদি কেউ ধর্মঘট না করতে চায় তার উপর জুলুম করা চলবে না।

লোকের কাছে যাচ্ঞা করা চলবে না।

বেশীদিন ধর্মঘট চললে, অন্য কাজ করে রোজকার করা চলবে।

মজদুররা প্রতিজ্ঞা করলো,—ধর্মঘট সুরু হোল।

মিল-মালিকদের পক্ষে দাঁড়ালেন বিরাট ধনী আম্বালাল সরাভাই, আর মজুরদের পক্ষ নিলেন তাঁরই বোন অনস্যূয়া বেন। পথে পথে শ্রমিকদের কুচ্ মিছিল বেরুলো, মিছিলের পুরোভাগে দেখা গেল বল্লভভাই প্যাটেল, শংকরলাল ব্যাংকার আর অনস্যূয়াবেনকে। সারাদিন ধরে নগর প্রদক্ষিণ করে সন্ধ্যাবেলা মিছিল এসে থামতো সেই পুরাণো অশথ তলায়, গান্ধিজীর সামনে মজুরেরা তাদের পুরাণো প্রতিজ্ঞার পুনরাবৃত্তি করতো, সাড়া তুলতো—এক টেক্—এক কথা, প্রতিশ্রুতি মেনে চলবো।

সপ্তাহ দুয়েক কেটে গেল, মিলের মালিকেরা বললো—'চলুক ধর্মঘট, আমাদের কর্মচারীদের সঙ্গে আমরা বোঝাপড়া করবো, বাইরের লোকের মাতব্বরি আমরা শুনবো না।' এদিকে মজুরদের দিন চলা কঠিন হয়ে পড়লো, ঘরে খাবার নেই, হাজার হাজার লোক যে অন্ত কোথাও চাকরী করবে তা-ও জোটানো সম্ভব নয়; ধর্মঘট শেষ অবধি ভেঙে যাবার উপক্রম করলো। গান্ধিজী নিরুপায় হয়ে অনশন সুরু করলেন।

একদিন, দুদিন, তিনদিন অনশন চললো। আমেদাবাদের উৎকণ্ঠা প্রতিধ্বনি তুললো সারা ভারতে। মালিকেরা এবার মাথা নত করলো, একটি মিটমাট করে ফেললো। মজুরদের মাহিনা বাড়াতে তারা রাজী হোল। গান্ধিজী আহার গ্রহণ করলেন।

মালিক ও মজুরের মাঝে সম্প্রীতি ফিরিয়ে আনার জন্ত, মালিকেরা একদিন শ্রমিকদের মাঝে সন্দেশ বিতরণের ব্যবস্থা করলেন। সেই 'এক-টেক' গাছের নীচে মজুরেরা সমবেত হয়েছিল, চাঙারী ভরা লাড্ডু আসতেই তাদের মাঝে ঠেলাঠেলি হুড়োহুড়ি পড়ে গেল—প্রত্যেকেই আগে সন্দেশ পাবার জন্ত সামনে এগিয়ে আসতে চায়। সেই গোলযোগে ধাক্কাধাক্কিতে কত সন্দেশ পায়ের নীচে পড়ে নষ্ট হয়ে গেল। একুশ দিন ধর্মঘট করেও যারা এতটুকু গোলমাল করেনি, ছুটো লাড্ডুর লোভ তারা সামলাতে পারলো না। গান্ধিজী দেখলেন, বুঝলেন যে এরা কত গরীব, জীবনে কোনদিনই এরা একটি লাড্ডু খেতে পায়নি।

সে বছর খেড়া জেলায় ভালো ফসল হয় নি। গবর্মেন্টের আইন আছে, জমিতে সিকি ভাগের চেয়ে কম ফসল হলে খাজনা মকুব করতে হবে। খেড়ার চাষীরা বললো—এবার সিকি ফসলও হয়নি, আমরা খাজনা দিতে পারবো না।

কালেক্টার সাহেব চোখ রাঙিয়ে বললো—বাজে কথা, সিকি ভাগের চেয়ে অনেক বেশী ফসল হয়েছে, খাজনা দিতে হবে।

এই থেকেই বিতর্ক, এই থেকেই বিরোধ। মোহনলাল পাঁড়ে ও শংকরলাল পারিখ গান্ধিজীকে খেড়া জেলায় নিয়ে এলেন, সব দেখে শুনে গান্ধিজী বললেন— কিষাণদের কথাই ঠিক।

লাট সাহেবের কাছে আবেদন করা হোল, কিন্তু কোন ফল হোল না, সরকারী পিয়াদা এসে খাজনা উসুল করার জন্ত কিষাণদের জিনিষ-পত্র ক্রোক করলো, হালের বলদ নীলামে চড়ালো, ক্ষেতের যত ফসল আটক করলো। গান্ধিজী প্রতিবাদ তুললেন—এসব বে-আইনী।

সত্যাগ্রহ সুরু হোল। গান্ধিজীর নির্দেশে সাত আট জন স্বেচ্ছাসেবক নিয়ে মোহনলাল পাঁড়ে মাঠ থেকে পিয়াজের ফসল ঘরে তুলে আনলেন, পুলিশ মোহনলালকে গ্রেপ্তার করে কোর্টে হাজির করলো। পিয়াজ চুরির অভিযোগে মোহনলালের জেল হোল। চাষীদের মাঝে বিপুল উদ্দীপনা দেখা দিল, বিরাট মিছিল করে তারা 'ডুংলি চোর' মোহনলালকে আদালত থেকে জেলের ফটক অবধি পৌছে দিল। মোহনলালের অনুগামী হলেন—বল্লভভাই প্যাটেল, শংকরলাল ব্যাংকার, ইন্দুলাল যাজ্ঞিক, মহাদেব দেশাই ও অনসূয়া বেন।

আন্দোলন ক্রমশঃ ব্যাপক হয়ে দেখা দিল। অবস্থা সুবিধাজনক নয় দেখে, সরকার এবার একটি নিষ্পত্তি করে ফেললেন—যেসব কিষাণের অবস্থা ভালো, তারা যদি খাজনা দেয় তাহলে যারা সত্যিকারের গরীব তাদের খাজনা মকুব করা হবে।

গান্ধিজী এই সর্তে সম্মত হলেন, খেড়া জেলায় সত্যাগ্রহ মিটে গেল।

ইউরোপে তখনও জার্মানীর সঙ্গে লড়াই চলছে। বড়লাট দিল্লীতে মাতব্বরদের এক সভা ডাকলেন—যুদ্ধ সম্মেলন। বড়লাট বললেন—আজ সমগ্র বৃটিশ সাম্রাজ্য বিপন্ন, এই বিপদের দিনে নিজেদের ভিতরের সব বিরোধ ভুলে গিয়ে যুদ্ধে সাহায্য করাই ভারতবাসীর কর্তব্য।

গান্ধিজীও সেই সম্মেলনে নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন। বড়লাটের কথাটি তাঁর মনে লাগলো, সৈন্ত সংগ্রহ করে দিতে তিনি রাজী হলেন। বেরিয়ে পড়লেন পথে।

প্রথমেই গেলেন খেড়া জেলায়। চাষারা তাঁর কথা শুনে প্রশ্ন করলো—আপনি তো অহিংসায় বিশ্বাস করেন, তাহলে আমাদেরকে লড়াইয়ে যেতে বলছেন কেমন করে? যুদ্ধ তো অহিংসা নয়। ইংরাজ সরকার আমাদের জন্ত এমন কি ভালো করেছে যে তাদের জন্ত আমরা প্রাণ দিতে যাব?

গান্ধিজী বোঝালেন—এই দুর্দিনে সাহায্য করলে ইংরাজদের অনুকম্পা আমরা পাব, তাছাড়া অস্ত্র ব্যবহার করতেও শিখবো, আত্মরক্ষার জন্য তা প্রয়োজন।

কিন্তু এই যুক্তিতে কোথাও তেমন সাড়া পাওয়া গেল না। কিন্তু গান্ধিজী যা সত্য বলে গ্রহণ করেছেন, তার জন্য প্রাণপাত করতেও তিনি প্রস্তুত। প্রতিদিন কুড়ি মাইল করে তিনি ঘুরতেন,—এক সভা থেকে আরেক সভায়, এক গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে। ঘুরতে ঘুরতে স্বাস্থ্য একেবারে ভেঙে পড়লো। মাঝে মাঝে আমাশয় হতে লাগলো। তার উপর হোল খাওয়া-দাওয়ার অনিয়ম। গান্ধিজী মুগের ডাল খেতে খুব ভালবাসতেন, একদিন কস্তুরবা' একবাটি মুগের ডাল দিলেন তাঁকে খেতে। আমাশয়ের উপর মুগের ডাল। খাবার ঘণ্টা খানেক পর থেকেই পেটের যন্ত্রণা সুরু হোল। তারপরেই দেখা দিল দাস্ত। গাঁয়ে চিকিৎসার কোন ব্যবস্থা নেই, গান্ধিজী তাড়াতাড়ি ফিরে এলেন শহরে। কিন্তু তখন আর তাঁর উঠে দাঁড়াবারও সামর্থ্য নেই,···দিনে ত্রিশ চল্লিশবার করে দাস্ত হচ্ছে।

ডাক্তার বললেন—ইঞ্জেকশন দিই।

গান্ধিজী বললেন—না, আমি এই ধরণের চিকিৎসা পছন্দ করি না, ইঞ্জেকশন দেওয়া চলবে না।

ডাক্তার আর কি করেন, খাবার ওষুধ দিয়েই চিকিৎসা চালাতে লাগলেন, কিন্তু রোগ উত্তরোত্তর বৃদ্ধির দিকেই চললো। শেষে দুর্বলতা একদিন এমন অবস্থায় এসে পৌছালো যে সকলেই তাঁর জীবনের আশা ছেড়ে দিলেন। আত্মীয় বন্ধুদের খবর দেওয়া হোল। ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মাথার কাছে গীতাপাঠ সুরু করলেন।

এক বন্ধুর কি খেয়াল হোল, তিনি ডাক্তার কেলকারকে নিয়ে এলেন। কেলকার শুধু বরফ বুলিয়েই অনেক রোগ সারাতেন, তাই লোকে তাঁকে বলতো, 'বরফের ডাক্তার'। কেলকার সব দেখে শুনে বললেন—বেশ, আমি শুধু বরফ বুলিয়েই আপনাকে সারিয়ে দোব।

গান্ধিজীর সর্বাঙ্গে বরফ বুলানো সুরু হোল। শরীর স্নিগ্ধ হোল। যাতনা যেন অনেকটা উপশম হয়েছে বলে মনে হোল। কয়েক দিনের মধ্যেই দুর্বলতা কেটে গেল, গান্ধিজী বিছানা থেকে উঠে, পাঁচ দশ মিনিট চলাফেরা করতে পারলেন। ডাক্তার কেলকার বললেন—এবার আপনি দু-একটা করে ডিম খান, দেহে বল পাবেন, তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে উঠবেন!

গান্ধিজী বললেন—আমিষ তো আমি খাই না।

কেলকার বললেন—ডিম তো ফলের মত।

কিন্তু সে যুক্তি গান্ধিজীর কাছে পুরাণো হয়ে গেছে।

গান্ধিজী বায়ু-পরিবর্তনের জন্ত মাথেরানে গিয়ে রইলেন দিন মাসেক। ডাক্তার দালাল ছিলেন সঙ্গে, বললেন—দুধ না খেলে একেবারে সুস্থ সবল হতে পারবেন না।

গান্ধিজী বললেন—দুধ আমি খাই না, বেশী দুধ পাবার জন্ত গরু মোষকে ফুঁকা দেওয়া হয়, তার প্রতিবাদে আমি দুধ খাওয়া বন্ধ করেছি।

—বেশ, গরুর দুধ না খান, ছাগলের দুধ খান, ছাগলকে তো ফুঁকা দেওয়া হয় না।

ছাগল দুধে আপত্তি করার কিছু নেই, গান্ধিজী ছাগ-দুধ খাওয়া সুরু করলেন। ক্রমে দেহে একটু সামর্থ্য হোল, সম্পূর্ণ নিরাময় করার জন্ত ডাক্তার দালাল গান্ধিজীর দেহে একটি অস্ত্রোপচার করলেন। অবিচ্ছিন্ন বিশ্রামের জন্ত গান্ধিজী এলেন সবরমতী আশ্রমে।

সবরমতীর তীরে সত্যাগ্রহ আশ্রম।

আমেদাবাদ ষ্টেশন থেকে দু-ক্রোশ পথ। সবরমতী নদী পার হয়ে বরাবর উত্তর মুখে যে পথটি চলে গেছে, সেই পথের দু'পাশে সাড়ে তিনশো বিঘা জমি নিয়ে এই আশ্রম। আশ্রমের পূর্বে সবরমতী নদী। এই নদীর তীরেই একটি বড় কুটীরে মহাত্মাজী থাকতেন।

এখানে প্রথমে সামান্ত একটি তাঁবু ফেলে মহাত্মাজী সর্বপ্রথম আশ্রমের পত্তন করেন, আজ সেখানে লোকজন বাড়ীঘরে ভরে গেছে।

এই আশ্রমটী সম্পর্কে মহাত্মাজীর বাঙালী সেক্রেটারী কৃষ্ণদাসজী লিখেছেন:

'মহাত্মাজীর কুটীরের সম্মুখে একটি বড় খোলা বারান্দা। রাত্রিতে তিনি (গান্ধিজী) বার মাস ঐ খোলা বারান্দায় শয়ন করিয়া থাকেন। শীতকালেও রাত্রিতে তিনি সেই উন্মুক্ত স্থানে নিদ্রা যান। তাঁহার মুখে শুনিয়াছি রাত্রিতে শয্যা হইতে যদি তিনি আকাশ দেখিতে না পান তাহা হইলে তাঁহার নিদ্রা হয় না এবং গভীর নিশীথে আকাশের তারার দিকে চাহিয়া থাকা, তাঁহার এক বহু পুরাতন অভ্যাস। বারান্দার দক্ষিণ পার্শ্বে মহাত্মাজীর বসিবার ঘর। দিনের বেলা তিনি এই ঘরে বসিয়া কাজকর্ম করেন···কুটীরে আরও চারিখানি ঘর আছে।

'মহাত্মাজীর কুটীরের ঈষৎ দক্ষিণে নদীকূলে কিছু উন্মুক্ত পরিষ্কার স্থান খোলা পড়িয়া আছে। সেখানে প্রত্যহ প্রাতে ব্রাহ্ম মুহূর্তে এবং সন্ধ্যার সময় আশ্রমের সকল নরনারী ও বালক-বালিকা একত্রিত হইয়া তান-লয়-সংযোগে সুমধুর ভগবৎ-নাম-কীর্তন ও সমস্বরে সুর করিয়া গীতার শ্লোক আবৃত্তি করিয়া থাকেন।

……সম্মুখে খরস্রোতা নদী এবং উপরে দিগন্তবিস্তৃত আকাশ ; তাহাতে কৃষ্ণ-পক্ষের বা শুক্লপক্ষের চন্দ্র কখনও প্রাতে কখনও সন্ধ্যায় সেই প্রার্থনার স্থান জ্যোৎস্নাবিস্তৃত করিয়া প্রার্থনার স্বাভাবিক মাধুর্য ও গাম্ভীর্য আরও শতগুণ বর্ধিত করিয়া দেয়।…

'আশ্রমের পূর্বভাগে আশ্রমবাসীদের বাসোপযোগী অন্যান্য কুটীর কিছুদূর অন্তর অন্তর আছে। তদ্ব্যতীত তাঁতশালা, চরকা বিভাগ, গোশালা এবং অনেক কৃষিজমিও আছে।…

'আশ্রমের সকলকেই শরীর যাত্রার নিমিত্ত কিছু না কিছু শারীরিক কাজ করিতে হয়। এখানকার সুপণ্ডিত শিক্ষকেরাও ইঁদারা হইতে জল তুলিয়া কাঁধে ভার বাঁধিয়া সেই জল নিজেদের ঘরে লইয়া যান। ধোপার কাজ, বাসন মাজা ইত্যাদি সমস্ত নিজেদের হাতে সকলকে করিতে হয়। এদিকে ভোর চারিটার সময় নিদ্রাভঙ্গের ঘণ্টা বাজিলে শয্যাত্যাগ করিয়া প্রাতের প্রার্থনায় এবং সন্ধ্যার সময় ঘণ্টা বাজিলে সন্ধ্যার প্রার্থনায় যোগ দিতে হয়।…

'ব্রাহ্মমুহূর্তে নিদ্রাভঙ্গের ঘণ্টা বাজিয়াছে…উষারাণী তখনও রাত্রির কোলে নিদ্রিতা…খরস্রোতা নদীর কুলুকুলু শব্দ অস্পষ্ট সঙ্গীত ধ্বনির ন্যায় শোনা যাইতেছে। সহসা সেই ধ্বনির তালে তাল মিলাইয়া শতকণ্ঠে প্রার্থনার গান ধ্বনিত হইয়া উঠিল—

প্রাতর্ভজামি মনসো বচনামগম্যম্।
বাচো বিভান্তি নিখিলো যদনুগ্রহেণ॥
যন্নেতি নেতি বচনৈর্নিগমা অবোচুঃ।
তং দেবদেবমজমচ্যুতমাহুরগ্রম্॥

[ যিনি মন এবং বাক্যের অগোচর, যাঁহার অনুগ্রহে সমস্ত বাক্য প্রকটিত হয় ; 'নেতি' 'নেতি' বলিয়া বেদসকল যাঁহার বর্ণনা করে ; যাঁহাকে দেবতাদিগেরও দেবতা, জন্মরহিত, অচ্যুত এবং আদিপুরুষ আখ্যা দেওয়া হয় তাঁহাকে আমি এই প্রাতঃকালে ভজনা করিতেছি। ]

ইহার পর গান করিয়া পৃথ্বী বন্দনা, সরস্বতী বন্দনা, গুরু বন্দনা, বিষ্ণু বন্দনা ও শিব বন্দনা করা হইলে নিজের শুভ কামনা…'আমি রাজ্যও চাহি না, স্বর্গও চাহি না, মুক্তি চাহি না, কেবল দুঃখতপ্ত প্রাণীদিগের আর্তিনাশ কামনা করি। প্রজাগণের কল্যাণ হউক। পৃথিবীর রাজন্যবর্গ ন্যায়মার্গ অবলম্বন করিয়া পৃথিবী পরিপালন করুন, সর্বদাই গো-ব্রাহ্মণের শুভ হউক, এবং সমস্ত লোক সুখী হউক, ইহাই কামনা করি।'

নমস্তে সতে তে জগৎকারণায়।
নমস্তে চিতে সর্বলোকাশ্রয়ায় ॥
নমোঽদ্বৈততত্ত্বায় মুক্তিপ্রদায়।
নমো ব্রহ্মণে ব্যাপিনে শাশ্বতায় ॥
ত্বমেকং শরণ্যং ত্বমেকং বরেণ্যম্।
ত্বমেকং জগৎকারণং স্বপ্রকাশম্ ॥
ত্বমেকং জগৎকর্তৃপাতৃ প্রহর্তৃ।
ত্বমেকং পরং নিশ্চলং নির্বিকল্পম্ ॥

[ সৎ স্বরূপ জগতের কারণ যিনি, তাঁহাকে নমস্কার করিতেছি। চিৎস্বরূপ সর্বলোকের আশ্রয় যিনি, তাঁহাকে নমস্কার করিতেছি। মুক্তিদাতা অদ্বৈততত্ত্ব যিনি, তাঁহাকে নমস্কার করিতেছি। সর্বব্যাপী শাশ্বত সত্যস্বরূপ ব্রহ্মকে নমস্কার করিতেছি।

'তুমিই একমাত্র শরণের পাত্র, তুমিই একমাত্র বরেণ্য; তুমিই জগতের পালক এবং স্বপ্রকাশ; তুমিই জগতের একমাত্র সৃষ্টি স্থিতি এবং সংহারকর্তা, তুমিই একমাত্র সৃষ্টির অতীত, নির্বিকল্প পুরুষ। ]

'ইহার পর গায়ক তোমাকে শুনাইয়া দিবেন—'হে মানব! তুমি একাকী এ জগতে বিচরণ করিতেছ না; সমস্ত জগতের সহিত তোমার একত্ব সম্বন্ধ রহিয়াছে। সে একত্ব কি করিয়া তুমি জীবন্তভাবে উপলব্ধি করিতে পারিবে তাহার চেষ্টা কর। কর্মের সূত্র দিয়া জীবন পবিত্র করিতে হইবে, এবং পবিত্রতা অর্জন করিলেই জীবনের দ্বন্দ্ব মিটিয়া যাইবে। ভিতরে দ্বন্দ্বশূন্য হইলেই বস্তুতঃ তুমি জগতের সহিত এক হইয়া যাইবে। সেইজন্য শাস্ত্রগ্রন্থ হইতে তোমাকে সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক কর্মের ব্যাখ্যা শুনাইয়া দেওয়া হইল। এই শিক্ষালাভ করিয়া যাও, সমস্ত দিন কর্মে ব্যাপৃত থাক এবং ঐ শিক্ষা জীবনে প্রতিফলিত করিতে চেষ্টা কর। কর্ম ভিন্ন এক মুহূর্ত তুমি অবস্থান করিতে পার না ও পারিবে না। কর্মই তোমাকে উদ্ধার করিবে; আবার কর্মই তোমাকে নিরয়গামী করিতে পারে। বিভিন্ন কর্মের দোষগুণ তোমাকে শুনাইয়া দেওয়া হইল। এই উপদেশ হৃদয়ে ধারণ করিয়া দিবসের কর্মকে নিয়ন্ত্রণ কর।'

'এইভাবে আশ্রমের দিনের কার্য আরম্ভ হইয়া গেল।......

'দিনান্তে...আবার প্রার্থনার আহ্বান শুনিতে পাইবে।......জগৎপতির গুণবর্ণনা বাজিয়া উঠিল: জগতের যিনি অধিপতি, যিনি সকলেরই আশ্রয়, যাঁহার বিহনে

কিছুই বর্তমান থাকিতে পারে না—আমাদিগের সকলের ভক্তি, শ্রদ্ধা, আকর্ষণ ও ভালবাসা তাঁহারই চরণে অর্পিত হউক। ব্রহ্মা, বরুণ, ইন্দ্র, রুদ্র, মরুৎ প্রভৃতি দিব্য স্তবের দ্বারা যাঁহার স্তব করেন; সমস্ত উপনিষদ্ সামগানের দ্বারা যাঁহার গুণগান করেন; ধ্যানাবস্থিত ও তদ্‌গত মন যোগীরা যাঁহাকে দর্শন করিয়া থাকেন এবং সুরাসুরেরাও যাঁহার অন্ত জানেন না, সেই দেবতা তোমাকে আমি নমস্কার করিতেছি।

'অতঃপর শাস্ত্রের পবিত্র শ্লোক মধুর কণ্ঠে সমস্বরে আবৃত্তি করিয়া তোমাকে শুনাইয়া দেওয়া হইবে: যদি শান্তির আকাঙ্খা কর, তাহা হইলে তোমাকে বাসনা ও কামনা জয় করিতে হইবে, সমস্ত বাসনাকে অন্তরে সমাহিত করিতে হইবে।... শ্রান্তি কেবল নিদ্রাতেই নিবারিত হইবে না। কারণ শারীরিক শ্রান্তিই একমাত্র শ্রান্তি নয়। দিবসের কর্মের ভিতর দিয়া তুমি কত ব্যাহবস্তুর সংস্পর্শে আসিয়াছ। তাহাতে তোমার চিত্ত কত প্রকারে উদ্বেলিত হইয়াছে; সেই সমস্ত ঝাড়িয়া মুছিয়া যদি তুমি শুদ্ধ হইতে পার, তবেই তোমার খাঁটি বিশ্রাম লাভ হইবে। স্থিতপ্রজ্ঞের আদর্শ সম্মুখে রক্ষা করিয়া তোমাকে কার্যে ব্রতী হইতে হইবে এবং উন্মার্গগামী বহিরীন্দ্রিয় সকলকে সংযত করিয়া 'প্রজ্ঞা' ফুটাইয়া তুলিতে হইবে। সমুদ্র মধ্যে যেমন সমস্ত নদনদীর জল প্রবেশ করে, সেইরূপ যাহার বাসনা ও কামনা বহির্মুখী না হইয়া নিজের অন্তরেই সমাহিত হয়, তিনিই শান্তি প্রাপ্ত হন, কামনাবশ লোক তাহা লাভ করিতে পারে না।

'আমরা যদি সকাল ও সন্ধ্যার এই উপাসনা, প্রার্থনা ও শিক্ষা বাদ দেই, তাহা হইলে মহাত্মার জীবনের স্বপ্ন...তাঁহার সমস্ত কার্যের গূঢ় অর্থাদির কিছুরই কোন সন্ধান পাইব না।" *

আশ্রমে গান্ধিজীর দৈনিক কর্মসূচী ছিল:

রাত চারটের আগে গাত্রোত্থান।

পাঁচটা থেকে ছ'টা অবধি প্রার্থনা।

সাড়ে ছটার সময় প্রাতঃরাশ—আধসের ছাগলের দুধ ও ফল, ২০টি মনাক্কা বা আঙুর ও দুটী কমলা লেবু।

সাড়ে আটটা অবধি চিঠিপত্র লেখা।

সাড়ে এগারোটার সময় স্নান।

---

* মহাত্মা গান্ধীজীর সঙ্গে সাত মাস

বারোটার সময় ভোজন—আখনের ছাগলের দুধ, কিছু ফল, ছাগল-দুধের ঘিয়ে ভাজা ছোট ছোট পাঁচ ছ'খানি ভকৃরি ( গুজরাটী রুটি )।

আধ ঘণ্টা খবরের কাগজ পাঠ।

দেড়টার সময় ত্রিশ চল্লিশ মিনিট নিদ্রা।

বিকাল তিনটা থেকে দর্শনার্থীর ভীড়। চরকা কাটা ও আলোচনা।

সূর্য্যাস্তের পূর্বে ভোজন—দুধ ও ফল।

সন্ধ্যা সাতটায় প্রার্থনা। প্রার্থনা শেষে আশ্রমিকদের দৈনিক কাজের হিসাব গ্রহণ।

সান্ধ্য প্রার্থনার শেষে তিনহাত লম্বা একগাছি বাঁশের লাঠি নিয়ে হন হন করে খানিকটা পথ তিনি ঘুরে আসতেন। ঘুরতে ঘুরতে কখন-বা এসে দাঁড়াতেন জানা-চেনা প্রতিবেশীর দ্বারে, হাসি মুখে জিজ্ঞাসা করতেন কে কেমন আছে, ছোট ছেলেটির পিঠে একটি মৃদু চাপড় মেরে শিশুর মত আনন্দে উপ্‌ছে পড়তেন—কবে অতীতের কোন দিনে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হয়তো একদিন বিদুরের দ্বারে এসে এম্‌নি হাসি মুখে দাঁড়িয়েছিলেন, এ যেন তারই প্রতিবিম্ব, যুগযুগান্তরের কাল-সমুদ্র পারে আবার তার প্রতিচ্ছায়া পড়েছে।

যুদ্ধ শেষ হোল। ভারতবাসীকে সুযোগ সুবিধা দেওয়া দূরের কথা, ইংরাজ-সরকার নতুন আইন করে সাম্রাজ্য গঠনে মন দিলেন, নতুন আইন তৈরী করলেন—রাউলাট আইন। আইনের খসড়া পড়েই গান্ধিজী চমকে উঠলেন,—যে কোন লোককে সামান্য সন্দেহ হলেই পুলিশ গ্রেপ্তার করবে, নির্বাসন দেবে, কর্তারা ইচ্ছা করলে যে কোন জায়গায় সৈন্য বসিয়ে অত্যাচার চালাতে পারবে!

তখনই গান্ধিজী চিঠি লিখলেন বড়লাটের কাছে, কিন্তু বড়লাট তার কোন উত্তর দিলেন না। মন ভারী হয়ে উঠলো, ইংরাজদের কাছ থেকে তিনি অনেক কিছু আশা করেছিলেন, সেই আশা-ভঙ্গের বেদনা চিত্তকে উদ্বেল করে তুললো। গান্ধিজী চুপ করে বসে থাকতে পারলেন না। শরীর তখনও ভালো করে সারেনি, বেশীক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলে পা কাঁপে, জোরে কথা বললে বুকের মধ্যে ঢিপ্‌ ঢিপ্‌ করতে থাকে। সেই অবস্থাতেই গান্ধিজী গেলেন দিল্লীতে।

ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে দর্শকদের আসনে এসে বসলেন, রাউলাট আইনের বিতর্ক শুনলেন, ভোটের জোরে আইন পাস হয়ে গেল দেখলেন, একটি কথাও বললেন না, ধীর মন্থর পদে বাহির হয়ে এলেন। মাথার মধ্যে তখন চিন্তার ঝড় বইছে।

সেইদিনই তিনি রওনা হলেন মাদ্রাজের ট্রেণে।

সারারাত ভালো করে ঘুমুতে পারলেন না, জানালা দিয়ে বাইরের ঘন কালো অন্ধকারের পানে তাকিয়ে তিনি আশার আলো খুঁজছিলেন হয়তো। ভাবতে ভাবতে শেষ রাত্রের ঠাণ্ডা হাওয়ায় কখন যেন চোখে তন্দ্রা নেমে এসেছিল, কত কি স্বপ্ন দেখে সে ঘুম টুটে গেল। মাদ্রাজে নেমে রাজাগোপালাচারীকে কথায়-কথায় তিনি বললেন—কাল রাত্রে ট্রেণে একটা স্বপ্ন দেখলাম, কি দেখলাম জানো? কে যেন আমাকে বলছে—'এই আইনের প্রতিবাদে সারা দেশ জুড়ে এক হরতাল কর্।' আমিও ভেবে দেখলাম, প্রতিবাদ করতেই হবে।

গান্ধিজী নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করলেন, নেতারা তাঁকে সমর্থন করলেন, দেশবাসীর কাছে গান্ধিজী নির্দেশ জানালেন—রাউলাট আইনের প্রতিবাদে ৩০শে মার্চ হরতাল করতে হবে। সেদিন সবাই উপবাস করে আত্মশুদ্ধি করবে এবং সমস্ত করণীয় কাজ বন্ধ রাখবে।

৩০শে মার্চ দিল্লীতে সাড়া পড়ে গেল, জুম্মা মসজিদ থেকে এক বিরাট মিছিল বেরুলো। স্বামী শ্রদ্ধানন্দ মিছিলের আগে-আগে যাচ্ছিলেন, ফৌজ এসে পথ রোধ করে দাঁড়ালো। গোরা সৈন্য বেয়োনেট তুলে ধরলো স্বামীজীর বুকের উপর, কিন্তু স্বামীজী অত্তো সহজে ভয় পাবার মত মানুষ ছিলেন না। নেপোলিয়নের মত জামার বোতামগুলি খুলে দিয়ে এগিয়ে গেলেন। পুলিশ মিছিলের উপর গুলি চালালো, পাঁচজন গুলি খেয়ে মরলো।

তারপর গুলি চললো লাহোরে।

গুলি চললো অমৃতশহরে।

গান্ধিজী এলেন বোম্বাইয়ে, সেখানে স্বয়ং সুরু করলেন আইন অমান্য আন্দোলন। তাঁরই লেখা 'হিন্দ্-স্বরাজ' ও 'সর্বোদয়' বই দু'খানি গবর্ণমেন্ট বাজেয়াপ্ত করেছিল, সেই বই দুখানি ছাপিয়ে প্রকাশ্য রাজপথে বিক্রী করতে বেরুলেন গান্ধিজী, সরোজিনী নাইডু ও আরো অনেকে। এক একখানি বইয়ের দাম চার আনা, কিন্তু কেউ কেউ পঞ্চাশ টাকা দিয়েও এক একখানি বই কিনেছে। পকেটে যা থাকতো তা-ই সে দিয়ে দিত।

কিন্তু পুলিশ কাউকেই গ্রেপ্তার করলো না। কৈফিয়ৎ দিল—বই দুখানির যে সংস্করণ পুলিশ বাজেয়াপ্ত করেছিল, এটি সে সংস্করণ নয়, এ সংস্করণ নতুন করে ছাপা হয়েছে, এ বই বেচলে আইন অমান্য হয় না।

গান্ধিজী রওনা হলেন অমৃতশহরে।

দিল্লীর পঞ্চাশ মাইল আগে পালওয়াল ষ্টেশনে পুলিশ এসে হুকুম জারী করলো—যাওয়া চলবে না, ফিরে যান!

গান্ধিজী বললেন—তা হয় না, আমাকে যেতেই হবে!

পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করলো। মথুরায় এনে সারারাত তাঁকে হাজতে আটকে রাখলো। তারপর তাঁকে বোম্বাইয়ে এনে ছেড়ে দিল। গান্ধিজীকে গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে পিধুনীতে তখন এক সভা বসেছে, এমন সময় সভার মাঝে গান্ধিজী এসে দাঁড়ালেন, জনতা সোল্লাসে সাড়া তুললো—বন্দেমাতরম্! মহাত্মাজীকে পুরোভাগে রেখে তারা সহর প্রদক্ষিণ করতে বেরুলো।

ক্রফোর্ড বাজারের কাছে অশ্বারোহী পুলিশ এসে দাঁড়ালো, বললো—ভীড় হঠাও! কিন্তু জনতা তখন পুলিশের সে হুকুম মানার জন্ত প্রস্তুত ছিল না। বল্লম হাতে ঘোড়-সওয়ার ভীড়ের ভিতর দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল। বল্লমের খোঁচায় ও ঘোড়ার পায়ের তলায় পড়ে বহু লোক আহত হোল। হুড়াহুড়ি ও আর্তনাদে চারি-পাশ বীভৎস হয়ে উঠলো।

গান্ধিজী এমন ব্যাপার কল্পনাও করতে পারেন নি। তিনি খোলা মোটারে বসে ছিলেন ঠনঠন করে পুলিশের বল্লম তাঁর মোটারের গায়ে এসেও লাগলো, তিনি বিমূঢ় হতবাক হয়ে গেলেন। কিন্তু মুহূর্তেকেই তাঁর সম্বিৎ ফিরে এলো, তিনি তখনই ছুটলেন পুলিশ কমিশনারের কাছে। কমিশনার সাহেব সহজাত অহঙ্কারে বললেন—আমি যা করেছি, কিছুই অন্যায় করিনি!

ফিরে এসে গান্ধিজী চৌপাটীতে এক সভা করলেন, বললেন—অহিংস থাকাই সত্যাগ্রহের প্রধান নীতি। জনসাধারণ কথায় ও কাজে যেন অহিংস থাকে, না হলে দেশব্যাপী সত্যগ্রহ চালানো আমার পক্ষে সম্ভব হবে না!

কিন্তু জনগণ রুদ্ধ আক্রোশ সংযত করতে পারলো না, আমেদাবাদে গোলযোগ ঘটলো। নড়িয়াডে জনতা রেল-লাইন উপ্‌ড়ে ফেললো, বিরাম গাঁয়ে একজন সরকারী কর্মচারী খুন হোল। সরকার আমেদাবাদে সামরিক আইন জারি করলো। গান্ধিজী ছুটে এলেন আমেদাবাদে, সবরমতী আশ্রমে সভা ডাকলেন, সত্যাগ্রহীদের দোষ কাথায় বুঝিয়ে দিলেন, যারা হাঙ্গামা বাধিয়েছে তাদের পুলিশের হাতে আত্মসমর্পণ করতে বললেন, আর শত্রু-মিত্রের সমস্ত দোষত্রুটির প্রায়শ্চিত্ত করার জন্ত সবাইকে একদিন উপবাস করার নির্দেশ দিলেন। নিজে উপবাস করলেন তিন দিন। আমেদাবাদে শান্তি ফিরে এলো।

বোম্বাইয়ের নামকরা দৈনিক পত্রিকা "বোম্বে ক্রনিক্‌ল্"। সত্যাগ্রহের সংবাদ

ছাপার জন্ত বোম্বাই গবর্মেণ্ট কাগজখানির প্রকাশ বন্ধ করে দিলেন। সম্পাদক হর্নিম্যানকে পুলিশ গ্রেপ্তার করলো। কাগজখানি যে কোম্পানী থেকে বেরুতো তাদের আরো দু'খানি কাগজ ছিল, মাসিক 'নবজীবন' আর সাপ্তাহিক 'ইয়ং ইণ্ডিয়া।' যৌথ কোম্পানী, পরিচালকবর্গ এই সরকারী অন্যায়কে মেনে নিতে পারলেন না, তাঁরা গান্ধিজীর কাছে এসে বললেন—কাগজ দু'খানি আপনাকে চালাতে হবে!

গান্ধিজী বললেন—কিন্তু ব্যবসাদারী কাগজ আমি চালাবো না, বিজ্ঞাপন আমি ছাপবো না।

পরিচালকদের তখন জিদ্ চেপে গেছে, বললেন—আপনার হাতে ছেড়ে দিলাম, আপনি যা করবেন তাতেই আমরা রাজী!

গান্ধিজী সম্পাদক হলেন। গুজরাতী 'মাসিক নবজীবন' সাপ্তাহিক হয়ে গেল, ইংরাজী 'সাপ্তাহিক ইয়ং ইণ্ডিয়া' পাক্ষিক পত্রিকা হোল। কাগজ দু'খানি হোল গান্ধীবাদের মুখপত্র। বিপ্লবী ভারত ইয়ং ইণ্ডিয়ার প্রত্যেকটি শব্দ আগ্রহ সহকারে প্রণিধান করতে লাগলো।

হিন্দুদের নববর্ষের উৎসব ১লা বৈশাখ, পাঞ্জাবের পথ প্রান্তর রক্তে লাল হয়ে গেল। অমৃতশহরের জালিয়ানওয়ালা বাগের এক সভায় মিলিটারী গুলি চালিয়ে নরনারী শিশু ও বৃদ্ধকে নির্বিচারে হত্যা করলো। গুজরানওয়ালায় প্লেন থেকে বোমা ফেলা হোল, চাষাদের উপর প্লেন থেকে মেশিন গান চার্জ করলো। পথের উপর নাগরিকদের বুকে হাঁটানো হোল, মেয়েদের নগ্ন করে পথ দিয়ে মার্চ করানো হোল। খবর শুনে গান্ধিজী স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। দীনবন্ধু এণ্ডরুজ পাঞ্জাবে যাবার পথে গ্রেপ্তার হলেন, বড়লাট বাহাদুরের পরোয়ানা জারী হোল—কোন কংগ্রেসী নেতার পাঞ্জাবে যাওয়া চলবে না!

রবীন্দ্রনাথ আর সইতে পারলেন না, 'স্তার' উপাধির সনদ বড়লাটের কাছে ফেরৎ পাঠালেন।

গান্ধিজীও তাঁর 'কাইজারই-হিন্দ' পদক ফেরৎ দিলেন।

দু' মাস পরে গান্ধিজী ও কংগ্রেস নেতাদের পাঞ্জাবে যাবার অনুমতি মিললো। কংগ্রেসীরা তদন্ত-সভা বসালেন। মিলিটারীদের অত্যাচারের নমুনা দেখে গান্ধিজী হতবাক হয়ে গেলেন। সব চেয়ে বেশী মর্মান্তিক হোল সরকারী নীতি। যে সব কর্মচারীরা অকথ্য অনাচার করেছিল, পাঞ্জাব গবর্মেণ্ট তাদের সব অপরাধের দায়

থেকে অব্যাহতি দিয়েছেন, পাঞ্জাবের লাটবাহাদুর তাদের প্রশংসা করে বলেছেন—'তোমরা ঠিক করেছ, আমার পূর্ণ সমর্থন আছে!'

সব দেখে শুনে গান্ধিজী বললেন—অহিংসার পথে স্বাধীনতা পেতে হলে, ভারতকে এক সহস্র কেন, বহু সহস্র নরনারীর হত্যাকে নির্লিপ্তভাবে গ্রহণ করতে হবে, ফাঁসী যাওয়াকে প্রত্যেক ভারতবাসীর জীবনের দৈনন্দিন ব্যাপার বলে গ্রহণ করতে হবে!

তদন্ত সভার বিবৃতি পড়ে সারা ভারত চঞ্চল হয়ে উঠলো।

কংগ্রেসীরা জালিয়ানওয়ালাবাগের স্মৃতিরক্ষার কথা তুললেন, চাঁদা তোলার ভার পড়লো গান্ধিজীর উপর। চাঁদা তুলতে গান্ধিজী ছিলেন অদ্বিতীয়, অনেক টাকা তিনি তুললেন কিন্তু শেষ অবধি বাধলো মতামতের সংঘাত—হিন্দুরা স্মৃতিরক্ষার জন্য যা করতে চায়, মুসলমানদের তা পছন্দ হয় না, শিখেরা আবার বলে অন্যরকম। টাকাটা শেষ অবধি ব্যাঙ্কেই রয়ে গেল।

ভারতের আকাশে ঝড়ের পূর্বাভাস দেখা দিল। গান্ধিজী বললেন—ভারত-সরকারের মাথার ঠিক নেই। আমাদেরও চিত্তের স্থিরতা নষ্ট হবার উপক্রম করেছে। কিন্তু আমি আপনাদের বলছি হিংসাকে প্রতিহিংসা দিয়ে জয় করা যায় না, অহিংসা দিয়ে হিংসাকে জয় করতে হবে। আমরা যদি মাথা ঠিক রেখে চলতে পারি তাহলে আমরাই পরিণামে জয়ী হব! 'জুলুম করতে করতে জালিম খুদ বেখুদ থক্ যায়গা'—অত্যাচার করতে করতে অত্যাচারী নিজেই একদিন পরিশ্রান্ত হয়ে পড়বে।

গান্ধিজী কংগ্রেসের কর্মসূচী তৈরী করলেন:

সরকারী খেতাব বর্জন করতে হবে।
সরকারী ভোজসভায় যাওয়া চলবে না।
সরকারী চাকরী করা চলবে না।
সরকারী ইস্কুলকলেজ বর্জন করতে হবে।
সরকারী আদালত ছাড়তে হবে।
ব্যবস্থা পরিষদ থেকে বেরিয়ে আসতে হবে।
বিদেশী জিনিষ বর্জন করতে হবে।
অস্পৃশ্যতা ছাড়তে হবে।
জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে হবে।
স্বদেশী জিনিষ ব্যবহার করতে হবে।
সালিশী আদালত বসাতে হবে।

মাদক সেবন বন্ধ করতে হবে।

হিন্দু মুসলমানের বিরোধ ছাড়তে হবে।

ঘরে ঘরে চরকা চালাতে হবে।

—তাহলেই একবছরের মধ্যে আমাদের স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত হবে।

সারা ভারতে সাড়া পড়ে গেল—বাংলা থেকে বোম্বাই, পাঞ্জাব থেকে মাদ্রাজ—শতশত কংগ্রেসকর্মী গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে, পল্লীর নিভৃত কোণে জীর্ণ কুটিরে অনাহারগ্রস্ত শীর্ণ হাতে চরকা তুলে দিলেন, মৃত্যুমুখী পঙ্গুর মনে এসে জাগলো নব-জীবনের আকাঙ্ক্ষা, নতুন দিনের আলো এসে লাগলো মুমূর্ষুর চোখে ; কুড়ি লাখ চরকা ঘুরতে লাগলো ভারতের নরনারীর হাতে।

এই চরকার একটা ইতিহাস আছে।

আমাদের নির্মম দারিদ্র্য ও নিরক্ষরতা গান্ধিজী সর্বপ্রথম প্রত্যক্ষ করেন চম্পারণে। নীলকুঠির মজুরদের দৈনিক আয় : পুরুষদের দশ পয়সা, মেয়েদের ছ'পয়সা, আর বালকের তিন পয়সা। যে, দিনে মাত্র চার-আনা পয়সা রোজগার করতে পারে সে তো নিজেকে রীতিমত একজন ভাগ্যবান বলে মনে করে। অনেকেরই একখানির বেশী দু'খানি কাপড় নেই। একবার এক গাঁয়ে গান্ধিজীর চোখে পড়লো কয়েকটি রমণী অত্যন্ত ময়লা কাপড় পরে দাঁড়িয়ে আছে, কস্তুরবা তাদের জিজ্ঞাসা করলেন—তোমরা কাপড় কাচো না কেন ? এমন কাপড় পরলে অসুখ করবে যে ?

মেয়েরা উত্তর দিল—আমাদের আর তো কাপড় নেই, এটা যে কাচলে পরবো কি ?

তাদের অবস্থা ভালো করে দেখার জন্য কস্তুরবা' তাদের বাড়ী গেলেন,—তাদের কাপড় তো দূরের কথা, দ্বিতীয় জিনিষটি অবধি নেই।

এই মানুষগুলির অন্ন-বস্ত্রের জন্য সত্যই কিছু করা যায় কি না, সেই কথা ভাবতে ভাবতে গান্ধিজীর মনে চরকার কথা উঠলো, কিন্তু তখন চরকা সম্বন্ধে গান্ধিজীর কোন স্পষ্ট ধারণা ছিল না। চম্পারণ থেকে ফিরে এসে গঙ্গাবেন নামে এক মহিলা কর্মীর সঙ্গে এই সম্পর্কে তিনি আলোচনা করলেন। গঙ্গাবেন ছিলেন সত্যিকারের সমাজ-সেবিকা। পড়াশুনা বেশীদূর করেননি, কিন্তু মন ছিল সত্যিকারের শিক্ষিতের মত সংস্কার মুক্ত। অস্পৃশ্যতা তিনি মানতেন না, রোদে পোড়া, জলে ভেজা গ্রাহ্য করতেন না, সর্বত্র নির্ভয়ে চলাফেরা করতেন, প্রয়োজনমত ঘোড়ার পিঠেও চড়তেন।

গঙ্গাবেন প্রতিশ্রুতি দিলেন—চরকা সম্পর্কে সঠিক খোঁজ খবর নিয়ে তিনি গান্ধিজীকে জানাবেন।

ক'দিন পরে গঙ্গাবেন খবর দিলেন—বরোদা রাজ্যের বিজাপুরে তিনি চরকার সন্ধান পেয়েছেন, তুলোর পাঁজ পেলে কাটুনীরা সুতা কেটে দিতে পারে।

গান্ধিজী মাসিক পঁয়ত্রিশ টাকা মাহিনা দিয়ে ধুনুরী রাখলেন, তুলো ধুনে পাঁজ তৈরী করে সুতা কাটা চললো, তাঁতীরা কাপড় বুনতে লাগলো। বিজাপুরের খাদি অল্প দিনেই সারা দেশে প্রসিদ্ধি লাভ করলো।

ইতিমধ্যে মগনলাল গান্ধী চরকা কাটার কারিকুরী সব শিখে নিলেন, তারপর চরকা চালাবার ব্যবস্থা করলেন সবরমতী আশ্রমে। মগনলাল প্রথম যে খদ্দর বোনালেন, তার খরচ পড়লো গজ প্রতি পনেরো আনা। মোটা চটের মত কাপড়। এই কাপড়কে মিহি ও সর্বজন গ্রাহ্য করার জন্য গান্ধিজী বোম্বাই থেকে দু'জন ভালো চরকা-চালিয়েকে খুঁজে বের করলেন। তারা বললো—মিহি সুতা আমরা কেটে দোব, কিন্তু আটাশ তোলায় এক সের বলে ধরতে হবে।

আটাশ তোলা দেড় পোয়ার চেয়ে কম, দেড় পোয়াকে এক সের বলে ধরা চলে না। গান্ধিজী বুঝলেন ঠকছেন, তবু তিনি তাইতেই রাজী হলেন। গান্ধিজীর ঘরে চরকা চলতে সুরু করলো। চরকার ঘর্ঘর শুনতে শুনতে গান্ধিজীর মনে নতুন আশা জেগে উঠলো, দারিদ্র্য-মুক্ত স্বাবলম্বী ভারতের দূরাগত সঙ্গীত তাঁর কানে ঝঙ্কার তুললো। গান্ধিজী গঙ্গাবেনকে চিঠি লিখলেন—পঁয়তাল্লিশ ইঞ্চি বহরের একজোড়া খদ্দরের কাপড় বুনে আমাকে পাঠিয়ে দাও, মিলের কাপড় আমি আর পরবো না।

গঙ্গাবাঈ কাপড় বুনে নিয়ে নিজেই এলেন গান্ধিজীর কাছে, সঙ্গে এলেন তাঁর স্বামী লক্ষ্মীদাস।

গান্ধিজী সেইদিন থেকে খদ্দর ধরলেন। কাটুনিদের কাছে বসে বসে শিখে নিলেন চরকা কাটতে, বললেন—আমি সবাইকে চরকা কাটতে বলছি, এই চরকা কোটি কোটি ভারতবাসীকে অন্নের সংস্থান করে দেবে।

মোটা খদ্দর দেখে সৌখীন ভদ্রলোকেরা নাক সিটকালো। গান্ধিজী বললেন—আমরা যদি আমাদের বুড়ো অকেজো বাপ-মাকে বা আমাদের অকর্মণ্য ছেলেমেয়েকে মেরে ফেলি তবে তো আমাদের অনেক খরচ বেঁচে যায়। কিন্তু তাতো আমরা মারিই না, বরং যথাসম্ভব খরচ পত্র করে তাদের আমরা পালন করি।...খদ্দরের কাপড় হয়তো একটু মোটা হয়, কিন্তু ক্রমশঃ সুতা কাটতে কাটতে আমাদের হাত দিয়েই খুব মিহি সুতা বের হবে। ঢাকার মসলিনের মত পাতলা কাপড় আজ

অবধি পৃথিবীতে তৈরী হয়নি, মনে রেখো সেই সুতা আমাদের দেশের লোকের হাতেই কাটা।

বোম্বাইয়ের কলওয়ালারা গান্ধিজীকে ডেকে বললো—বিলিতী কাপড়ের আমদানী বন্ধ করতে হলে এদেশের দরকার মত আরো বেশী কাপড় তৈরী করতে হবে, কেননা লোকে দিশি কাপড় না পেলে বিলিতী কাপড় কিনবেই। সেইজন্য বিলিতী কাপড় বয়কট করার আগে, স্বদেশী কাপড় তৈরীর ব্যবস্থা করতে হবে, আপনি এদেশে আরো কাপড়ের মিল বাড়াবার ব্যবস্থা করুন।

গান্ধিজী ছিলেন মিল ও বড় কারখানার বিরোধী। মিলে কম লোক বেশী লোকের কাজ করে, তাতে অনেক লোক বেকার হয়ে যায়, উপরন্তু যারা কারখানায় কাজ করে তাদের মনুষ্যত্ব নষ্ট হয়ে যায়। গান্ধিজী মিল-মালিকদের বললেন—মিল-বাড়ানো আমার কাজ নয়, আমি চাই বেকার গরীবদের হাতে কাজ দিতে, আমি চরকা ও তাঁত চালাবার ব্যবস্থা করছি!

—চরকা!—মিলওলার মুখে বিদ্রূপের হাসি ফুটে উঠলো—এই যন্ত্রের যুগে আপনার চরকা চলবে তো? দেখুন চেষ্টা করে!

গান্ধিজীও হাসলেন, বাজে লোকের বাজে কথায় টলবার মত মানুষ তিনি নন্!

•

১৯২০ সালে কলিকাতায় কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন বসলো। গান্ধিজী অসহযোগের কথা তুললেন। কথাটা সকলের মনঃপূত হোল, তিনমাস ধরে এই সম্পর্কে নেতারা ভাবলেন, আলোচনা করলেন, বিতর্ক তুললেন, শেষে তিনমাস পরে নাগপুর কংগ্রেসে সারা ভারতের নেতারা গান্ধিজীর প্রস্তাবই গ্রহণ করলেন। সর্বত্র অসহযোগের সাড়া পড়ে গেল:

বাংলায় কাজ সুরু করলেন—দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন, নেতাজী সুভাষচন্দ্র, ডক্টর প্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষ, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ প্রভৃতি।

বিহারে কাজ সুরু করলেন—ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ…

উৎকলে কাজ সুরু করলেন—গোপবন্ধু দাস, গোপবন্ধু চৌধুরী…

যুক্তপ্রদেশে কাজ সুরু করলেন—পণ্ডিত মতিলাল, পণ্ডিত জহরলাল, গণেশশঙ্কর বিদ্যার্থী, রফি আমেদ কিদোয়াই…

কাশীতে কাজ সুরু করলেন—ডাক্তার ভগবান দাস, শিবপ্রসাদ গুপ্ত…

দিল্লীতে কাজ সুরু করলেন—হাকিম আজমল খাঁ, ডাক্তার আনসারী…

পাঞ্জাবে কাজ সুরু করলেন—লালা লজপৎ রায়, ডাক্তার কিচলু, ডাক্তার সত্যপাল, স্বামী শ্রদ্ধানন্দ, ভাই পরমানন্দ…

করাচীতে কাজ সুরু করলেন—চৈৎরাম গিদোয়ানী, জয়রামদাস দৌলতরাম…

বোম্বাইয়ে কাজ সুরু করলেন—ওমর শোভানী, শেখ ছোটানী…

গুজরাটে কাজ সুরু করলেন—বিঠলভাই প্যাটেল, বল্লভভাই প্যাটেল…

মহারাষ্ট্রে কাজ সুরু করলেন,—ডাক্তার কেলকার, শঙ্কররাও দেও, জোগৎকার, সেনাপতি বাপাৎ…

মধ্যপ্রদেশে কাজ সুরু করলেন—ডাক্তার নারায়ণ ভাস্কর খারে, মাধব শ্রীহরি আনে, অভয়ঙ্কর…

মাদ্রাজে কাজ সুরু করলেন—চক্রবর্তী রাজগোপালাচারী, ডক্টর পট্টভি সীতারামিয়া, ইয়াকুব হাসান…

মহিলাদের মধ্যে কাজ সুরু করলেন—কস্তুরবাঈ, স্বরূপরাণী নেহেরু, সরোজিনী নাইডু, বাসন্তী দেবী…

গান্ধিজী তাঁর সংগ্রামের নীতি ব্যাখ্যা করে লিখলেন—এই পৃথিবীতে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম ছাড়া কিছুই সফল হয় নাই,…বুদ্ধ তাঁহার সংগ্রাম শত্রুর শিবিরেও সঞ্চারিত করেছিলেন, ফলে ব্রাহ্মণের আধিপত্য মাথা নত করেছিল। মন্দিরে যারা বেসাতি করছিল খৃষ্ট তাদেরকে তাড়িয়ে দিলেন, ভণ্ডামির নিন্দা করলেন…ইহাই হোল প্রত্যক্ষ সংগ্রামের রূপ। এঁদের প্রত্যেকের সংগ্রামের পশ্চাতে ছিল অপার করুণা।…বল-প্রয়োগে পাপকে পরাভূত করার কোন অধিকার আমাদের নেই। সকল বিপদ তুচ্ছ করে পাপের সংসর্গ ত্যাগের দ্বারাই আমাদের পাপের প্রতিরোধ করতে হবে। এবং শত্রুর মধ্যে যখন অনুতাপের লক্ষণ দেখা যাবে, তখনই তাকে সস্নেহে বুকে জড়াবার জন্য দু'হাত মেলে ধরতে হবে…

ইংরাজদের উদ্দেশ্যে গান্ধিজী লিখলেন—ইংরাজ সরকারের বিশ্বাসঘাতকতা সরকারের প্রতি আমাদের সকল বিশ্বাস ভেঙে দিয়েছে। কিন্তু বৃটিশের সৎসাহসের উপর আমার এখনও বিশ্বাস আছে। ভারতবর্ষ এখন কেবল মানসিক বলই দেখাতে পারে, দেখাতে পারে অসহযোগ আত্মত্যাগ। আমি যন্ত্রণা সহেই আপনাদের জয় করতে পারি।…

ভারতের নগরে নগরে গান্ধিজী ঘোষণা করলেন—সবাই এক হয়ে নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করলে, এক বছরের মধ্যেই স্বরাজ আসবে!

ভারতবাসীর মনে কে যেন সোনার কাঠি ছুঁইয়ে দিল, উৎবহ চঞ্চল তরুণ কর্মীর

দল ছ'মাসের মধ্যে সারা দেশে পঞ্চাশ লাখ সভ্য করে ফেললো। ঘরে ঘরে ঘুরতে লাগলো চরকা, হাতে হাতে ঘুরতে লাগলো তকলি। বিলিতী কাপড়ের বহ্নুৎসব সুরু হোল, সর্বত্র হরতাল ও মদের দোকান পিকেটিং নিত্যকার ব্যাপার হয়ে দাঁড়ালো। দিকে দিকে আগুন জ্বলে উঠলো।

বিলিতী কাপড়ের বহ্নুৎসব সুরু করলেন গান্ধিজী স্বয়ং। দীনবন্ধু এণ্ড্রুজ গান্ধিজীকে লিখলেন—ধ্বংসকে জাতীয়তাবাদের নীতি বলে গ্রহণ করলে অন্যায় হবে। মানুষের শ্রমের ফসলকে ধ্বংস করা পাপ। এই কাপড়গুলো ভস্মীভূত না করে গরীবদের মাঝে বিতরণ করলেই বোধ হয় ভালো হোত। আমি নিজে খদ্দর পরি, কিন্তু আপনার এই নীতিকে সমর্থন করা সংগত হবে কি না তাই ভেবে বিব্রত হয়ে পড়েছি।

গান্ধিজী উত্তর দিলেন—বৃটিশ শাসকদের ভারতীয়েরা ইতিপূর্বেই ঘৃণা করতে সুরু করেছে। সেই ঘৃণাকে আমি অন্যদিকে সরিয়ে দিয়েছি,—ইংরাজ থেকে ইংরাজী দ্রব্যে। ইংলণ্ডের প্রতি ঘৃণা প্রকাশের জন্য মালগুলি পোড়ানো হয়নি, ভারত যে ইংলণ্ডের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করতে বদ্ধ পরিকর হয়েছে, তারই সংকেত হিসাবে এগুলি পোড়ানো হয়েছে। এই বিষাক্ত জিনিষগুলি গরীব দুঃখীদের দিলে ভুল হোত। গরীবদেরও আত্মসম্মান-জ্ঞান আছে!

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন বিলাতে, তিনি ইস্কুল কলেজ বর্জন সমর্থন করতে পারলেন না, লিখলেন—ছাত্রেরা ত্যাগ স্বীকার করিবে, কিন্তু কিসের জন্য? পূর্ণতর কোন শিক্ষার জন্য নয়, অশিক্ষার জন্য।···আমি আমার গৃহের চারিদিকে প্রাচীর তুলিবার সময় গৃহের বাতায়ন পথগুলি রুদ্ধ করিতে চাহি না। সকল দেশের সংস্কৃতির হাওয়া যথাসম্ভব মুক্তভাবে আমার গৃহে বহিয়া আসুক, আমি তাহাই চাই।···কিন্তু এই ঝড়ে আমি উড়িয়া যাইতে রাজী নই।···কারাগারের ধর্ম আমার নহে।···জাতির বিভিন্ন-শক্তির কেবল নিজেদের মধ্যেই সহযোগিতা করিলে চলিবে না, সহযোগিতা করিতে হইবে জাতিতে জাতিতে, দেশে দেশে। ভারতের জাগরণ সমগ্র বিশ্বের জাগরণের সহিত একই সূত্রে আবদ্ধ।···

গান্ধিজী উত্তর দিলেন—আমার চারিদিকে যখন খাদ্যের অভাবে মানুষ মরছে, তখন আমার কর্তব্য হোল বুভুক্ষুকে অন্ন দান করা। ভারতবর্ষ সেই গৃহ, যাতে আগুন লেগেছে। এ ক্ষুধায় মরছে, কারণ খাদ্য কিনবার মত মানুষের হাতে কাজ নেই।···আজ যে লাখ লাখ মানুষ পশুরও অধম হয়ে মরছে, তাদের কথা আমাদের

ভাবতেই হবে। ক্ষুধাই একমাত্র যুক্তি যা ভারতবর্ষকে চরকার দিকে টেনে এনেছে।... আমি কবীরের গান গেয়েও পীড়িত ক্ষুধার্তদের বিন্দুমাত্র স্বস্তি দিতে পারিনি।... প্রত্যেককেই সুতা কাটতে হবে। অন্যের মত রবীন্দ্রনাথও সুতা কাটুন, তিনি তাঁর বিলিতী পোষাক পুড়িয়ে ফেলুন। তা-ই আজ কর্তব্য। আগামী কালের ব্যবস্থা বিধাতা করবেন। যেমন গীতা বলেছে—ন্যায় পালন কর!

কিন্তু মানবতার দিক থেকে কবিগুরুর সঙ্গে গান্ধিজীর আদর্শের কোন অমিল ছিল না। গান্ধিজী বলেন—আমার কাছে দেশপ্রীতি হোল মানবপ্রীতি। মানুষকে ভালবাসি তাই আমি দেশকেও ভালবাসি। অন্য দেশকে বাদ দিয়ে আমার দেশপ্রীতি নয়, ভারতের মঙ্গলের জন্য ইংলণ্ড কিংবা জার্মানীকে আমি আঘাত করতে পারি না।

গান্ধিজী ভারত পরিক্রমা করতে বেরুলেন। পাটনা, এলাহাবাদ, বেনারস গৌহাটী, তেজপুর, নওগাঁ, যোড়হাট, ডিব্রুগড়, শিলচর, শ্রীহট্ট, চট্টগ্রাম, বরিশাল, কলিকাতা, মেদিনীপুর, মাদ্রাজ, কুম্ভকোণম্, ত্রিচিনপল্লী, মাদুরা, কয়মবেটোর, বোম্বাই,...সর্বত্রই শত সহস্র জনতার সমাবেশ, একস্থানে তিনটি চারটি করে সভা, মানপত্রদান, তিলক স্বরাজ্য ফাণ্ডের জন্য টাকা সংগ্রহ...কখনো ট্রেনে, কোথাও বা মোটারে। পথের দু'পাশে ছুটন্ত মোটারে গম্যমান গান্ধিজীর একবার দর্শন পাবার জন্য ঘন্টার পর ঘন্টা অপেক্ষ্যমান নরনারী, আবার কোথাও-বা যে লাইন দিয়ে ট্রেন যাচ্ছে সেই লাইনের দু'পাশে দুপুর রাতেও জয়ধ্বনি উঠছে—মহাত্মা গান্ধিকি জয়!

বাহান্ন বছরের বৃদ্ধের কাজের বিরাম নেই, সভার পর সভায় তিনি ঘোষণা করছেন—চরকা চালাও, অস্পৃশ্যতা ভুলে যাও, মদ খাওয়া ছাড়ো, স্বদেশী জিনিষ ব্যবহার কর, এক বছরের মধ্যেই স্বাধীনতা আসবে!

শীর্ণ বৃদ্ধের ক্ষীণ কণ্ঠে কি অমোঘ উদ্দীপনা ছিল জানি না, প্রতিটি সভায় হাজার হাজার বিলিতী কাপড়ের বহ্ন্যুৎসব হোল, খদ্দরের বিজয়-রথ এগিয়ে চললো শহর থেকে গ্রামে, ধনীর প্রাসাদে ও শতভগ্ন চাষীর গৃহকোণে।

সসারামের পথে মোটার ছুটছিল।

সহসা এক মাঠের মাঝখানে গান্ধিজীর মোটরের টায়ার ফেটে গেল। গান্ধিজীকে মোটার থেকে নামতে হোল। টিপ্ টিপ্ করে বৃষ্টি পড়ছে, মহাত্মাজী সঙ্গীদের নিয়ে এক গাছতলায় এসে দাঁড়ালেন।

আটদশ হাত দূরে আরেক গাছ তলায় ছাতা মাথায় দিয়ে এক বৃদ্ধা দাঁড়িয়েছিলেন,

কোন রকমে লাঠিতে ভর দিয়ে ধীরে ধীরে বুড়ী এগিয়ে এলেন দলটির সামনে, জিজ্ঞাসা করলেন—বাবা, মহাত্মা গান্ধী কে? এই পথ দিয়ে তাঁর যাবার কথা ছিল, তিনি কি আপনাদের মধ্যে আছেন?

গান্ধিজী নিজেই তাঁর কথার জবাব দিলেন—কেন তুমি তাঁকে খুঁজছ?

বুড়ী বললেন—বাবা, আমার বয়স হয়েছে ১০৪ বছর। চোখে ভাল দেখতে পাই না। সমস্ত তীর্থ পর্যটন করেছি, বদরিকাশ্রমেও গেছি, বাড়ীতে নারায়ণ প্রতিষ্ঠা করে প্রতিদিন সকাল সন্ধ্যা দেবতার পূজা অর্চনা করি। কিন্তু বাবা সাক্ষাৎ দেবতার দেখা কখনো পাইনি! শুনেছি আমাদের যেমন রাম-অবতার কৃষ্ণ-অবতার হয়ে গেছেন তেমনি গান্ধীঅবতার হয়েছেন, তাঁর এই পথ দিয়ে আজ যাবার কথা, তাঁকে দেখে একবার জীবন সার্থক করতে চাই!

বৃদ্ধার চোখ ছল ছল করে উঠলো। অস্পষ্ট দৃষ্টি তিনি তুলে ধরলেন গান্ধিজীর মুখের পানে। সে মুখে বুড়ী কি দেখলেন কি জানি, আর কিছু জিজ্ঞাসা করার দরকার হোল না, আকাঙ্খিতকে তিনি চিনে নিলেন, আরেকটু কাছে এগিয়ে এসে নিরীক্ষণ করে দেখে শ্রান্ত কণ্ঠে বুড়ী জিজ্ঞাসা করলেন—বাবা, ভোগের তৃষ্ণা দূর হবে কিসে?

—তৃষ্ণা?—গান্ধিজী হেসে বললেন—ভোগের তৃষ্ণা থাকলে মুক্তি হবে কি করে?

বুড়ী হয়তো আরো দু'একটি তত্ত্ব কথা জিজ্ঞাসা করতো, কিন্তু গান্ধিজী কথার মোড় ফিরিয়ে দিলেন, জিজ্ঞাসা করলেন—আপনার যে এতো বয়স, কি আহার করেন?

বুড়ী বললেন—বারো বছর বয়সে বিধবা হয়েছি, তখন থেকেই হবিষ্যি আর উপবাসের নিয়ম মেনে চলছি, আগে দিনে একবার ফলমূল খেতাম, আজকাল আর তা'ও খাইনা, দিনে একবার শুধু দূর্বাঘাসের সরবৎ খাই। এখন আর ভালো করে চলতে পারি না, শুধু আপনার দর্শন পাবার জন্য কোন রকমে এখানে এসে সকাল থেকে দাঁড়িয়ে আছি!

কিন্তু এই মাঠের মাঝখানে গান্ধিজীর সঙ্গে এই বৃদ্ধার দেখা হবার কথা নয়, মোটার থামবার কোন কারণই ছিল না—শুধু টায়ার ফাটার জন্যই। তাও টায়ার ফাটলো এই অপেক্ষমান বৃদ্ধার দশ বারো হাত দূরে। আরেকটু দূরে হলে তো বৃদ্ধা ততটা এগিয়ে যেতে পারতেন না। গান্ধিজীর সঙ্গে তাঁর দেখাও হোত না। একি তাহলে বিশ্বনিয়ন্তার নির্দেশ? ভক্তের অন্তরের একান্ত আকর্ষণ! কতবছর আগে জানি না, পম্পা সরোবরের তীরে অনার্য-কন্যা শবরী এমনিভাবেই একদিন শ্রীরামচন্দ্রের পথের পানে তাকিয়েছিলেন, একবার মাত্র মহাপুরুষের দর্শনমানসে। গান্ধিজীও কি তবে সত্যই ঈশ্বর-আশ্রিত পুরুষ—এই যুগের শ্রীরামচন্দ্র!

বৃদ্ধার সঙ্গে কয়েক মিনিট কথা বলার পর পিছনের মোটার এসে পড়লো, গান্ধিজী সেই মোটারে চলে গেলেন। মাঠের সীমান্তে অপস্রিয়মান মোটারখানির পানে বৃদ্ধা ছলছল চোখে তাকিয়ে রইলেন, তারপর দুহাত কপালে ঠেকিয়ে প্রণাম জানালেন গান্ধিজীর উদ্দেশে।

দক্ষিণ ভারতে তখনও খদ্দরের তেমন প্রচার হয়নি। এ সম্পর্কে দাক্ষিণীদের মধ্যে রীতিমত সাড়া তোলার জন্য গান্ধিজী একমাস শোকের বেশ ধারণ করার সিদ্ধান্ত করেন।

মাদুরায় তিনি মস্তক মুণ্ডন করলেন।

পরদিন প্রত্যুষে কড়াইকুডিতে টুপী ও জামা কাপড় ছেড়ে একহাত বহরের সামান্য একটুকরো খদ্দর পরলেন, আর জামার পকেটে যে জিনিষগুলি রাখতেন তা রাখার জন্য একটি ছোট খদ্দরের ঝোলা করে নিলেন। আর গায়ে দিলেন একখানি ছোট খদ্দরের চাদর।

যাঁরা মহাত্মাজীকে একান্ত আপনার জন বলে মনে করতেন তাঁদের চোখে এই অর্ধ-নগ্ন বেশ অত্যন্ত বেদনা-দায়ক হয়ে উঠলো।

বৃদ্ধ মৌলানা আজাদ সোবানী মহাত্মাজীর সঙ্গে সঙ্গে ঘুরছিলেন, তিনিও আচকান-ফেলে ফতুয়া গায় দিলেন, পায়জামা বদলে পরলেন জানু অবধি এক খাটো লুঙ্গি, টুপী পরা ছেড়ে দিলেন।

বরোদার প্রাক্তন দেওয়ান বৃদ্ধ আব্বাস তায়েবজী বোম্বাইয়ে গান্ধিজীকে এই বেশে দেখে বললেন—মহাত্মাজী এবার নিজেও পাগল হয়েছেন, অপরকেও পাগল করার বেশ ফন্দী বের করেছেন।

বিহারের মৌলানা আবদুল বারি বললেন—জানু এইরূপ নগ্ন রাখা আমাদের শাস্ত্র-বিরুদ্ধ।

গান্ধিজী চাদর দিয়ে পা ঢেকে হেসে বললেন—আচ্ছা, আচ্ছা, আভি তো হুয়া!

মালব্যজী দুঃখ করে বললেন—আপ্‌নে এ কেয়া সুরু কিয়া!

মাসখানেক পরে অধ্যাপক কৃপালনী তাঁর আশ্রম থেকে একখানি খদ্দরের ধুতি বুনিয়ে এনে গান্ধিজীকে উপহার দিলেন, বললেন—এইখানি আপনি পরবেন।

সবাই আশা করেছিল একমাস পরে আবার গান্ধিজী বড় কাপড় পরবেন।

গান্ধিজী কাপড়ের সুতাগুলি ভালো করে পরীক্ষা করে দেখে হেসে উত্তর দিলেন—আমার ষাট কোটি টাকার কাপড়ের দরকার, একখানি ধুতিতে কি হবে? যত-

ক্ষণ সে-ই কাপড় না হয়, ততক্ষণ আমি এতো বড় কাপড় কি করে পরি ? আমাকে এখানি ছিঁড়ে নেংটি করে পরতে হবে !

মহাত্মাজী কি চান তা এই কথাটি থেকেই বুঝতে পারা যায়।

বোম্বাইয়ের ক'জন অধ্যাপক গান্ধিজীকে এসে জিজ্ঞাসা করেন—ছুটীর দিনে তাঁরা কি করবেন ?

গান্ধিজী বললেন—ধুনো, কাটো, বুনো,
কাটো, বুনো, ধুনো
বুনো, ধুনো, কাটো !

গান্ধিজী শুধু উপদেশই দেননি, নিজেও প্রতিজ্ঞা করলেন—দিনে অন্ততঃ আধঘণ্টা করে তিনি চরকা কাটবেন ! মৃত্যুর দিন পর্যন্ত তিনি এই প্রতিজ্ঞা পালন করে গেছেন।

অন্ধকার রাত। জোড়হাট থেকে ডিব্রুগড় যাবার লাইন, ঝিকি ঝিকি করে এগিয়ে চলেছে ছোট গাড়ী—গান্ধিজীর স্পেশ্যাল।

হঠাৎ প্রচণ্ড এক ধাক্কা খেয়ে থর থর করে ট্রেণখানি কেঁপে উঠলো, থমকে দাঁড়ালো। লাইনের উপর দু'খানি বগী দাঁড়িয়েছিল, স্পেশ্যাল ট্রেণের সঙ্গে তার ধাক্কা লেগেছে। তেমন গুরুতর কিছু হয়নি, বগী দু'খানি সামনে রেখেই ইঞ্জিন আবার ধীরে ধীরে অগ্রসর হোল।

মাইল দুয়েক যাবার পরে, আবার ট্রেণ থেমে গেল। গার্ড ছুটে এসে ড্রাইভারকে বললো—গান্ধিজীর কামরাখানি ছিল সবার শেষে, কোন এক সময় পথের মাঝেই সেখানি ছেড়ে গেছে।

যার জন্য স্পেশ্যাল তিনিই গাড়ীতে নেই !

তখনই ট্রেণখানি আবার পিছন দিকে ছুটলো।

মাইলখানেক যাবার পর গান্ধিজীর বগীখানি চোখে পড়লো। অন্তরঙ্গেরা দৌড়ে গিয়ে উঠলেন তাঁর কামরায়। গান্ধিজী সবাইকার উদ্বেগ দেখে খিল খিল করে হেসে উঠলেন, বললেন—তোমরা যে আবার ফিরে আসবে তা ভাবিনি। আমি ভাবছিলাম হয়তো পিছন থেকে আর এক খানি ট্রেণ এসে ধাক্কা মেরে আমার কামরাখানি ফেলে দেবে !

অথচ সেজন্য যে গান্ধিজীর মনে কোন দুর্ভাবনা দেখা দিয়েছিল, তাঁর মুখ দেখে তা মনে হোল না, তিনি পরম নিশ্চিন্তমনে ভগবানের চরণে সব কিছু সমর্পণ করে, একান্ত নির্লিপ্তের মত কামরার একপাশে শুয়েছিলেন।

তিলক স্বরাজ্য ফাণ্ডের টাকা তোলার ভার ছিল, গান্ধিজীর উপর। কথা ছিল অন্ততঃ এক কোটি টাকা তুলে দিতে হবে। গান্ধিজী সেজন্য প্রত্যেক সভাতেই হাত পাততেন—টাকা দাও!

গান্ধিজী তখন দক্ষিণ ভারতের এক ছোট শহর গেলেন। ডাক্তার বরদারাজুলু এলেন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে। তাঁর সঙ্গে সাত আট বছরের একটি ছোট মেয়ে। মেয়েটির হাতে ছিল কয়েকগাছি সোণার চুড়ী। কথায় কথায় রহস্য করে গান্ধিজী ডাক্তারকে বললেন—যে দেশের লোকেরা খেতে পায় না, সেই দেশের মেয়ের হাতে অতোগুলি সোণার চুড়ী কেন?

মেয়েটি ইংরাজী জানে না, ডাক্তার তাকে গান্ধিজীর কথা বুঝিয়ে দিলেন। মেয়েটি চুপ করে এতক্ষণ গান্ধিজীর মুখের পানে তাকিয়েছিল, এবার হাসিমুখে হাতের চুড়ী ক'গাছি খুলে মহাত্মাজীর হাতে তুলে দিল। মহাত্মাজী হেসে সেগুলি ফেরৎ দিলেন। মেয়েটি কিন্তু তা আর ফেরৎ নিলে না, বললো—বাপুজী, ও-গুলো আপনার কাছেই রাখুন।

আট বছরের ছোট্ট একটি মেয়ের মনে গান্ধিজীর মুখের সামান্য একটি কথা এমন গভীর ভাবের ঝঙ্কার তুলেছিল যে, সোণার কয়েক গাছি চুড়ী মাটির ঢেলার মত বিলিয়ে দিতে তার এতটুকু দ্বিধা হয়নি।

ট্রেণ কোন ষ্টেশনে এসে থামলেই গান্ধিজী জানালা দিয়ে হাত বাড়িয়ে দিতেন, বলতেন—টাকা দাও! ভিক্ষা চাই!

যার পকেটে যা থাকতো মহাত্মাজীর হাতে তুলে দিত, এক হাত ভরে গেলে গান্ধিজী আরেক হাত বাড়িয়ে দিতেন।

অনেক সভায় উদ্যোক্তারা নিজেরাই টাকার তোড়া তাঁকে উপহার দিত। কলিকাতায় গরুর গাড়ীর গাড়োয়ানরা শ্রদ্ধানন্দ পার্কের এক সভায় দশ হাজার টাকার একটি তোড়া তাঁকে দেয়।

সভার মানপত্রগুলিও তিনি সভার মাঝেই নীলাম করে বিক্রী করে দিতেন।

কোন ছেলে তাঁর স্বাক্ষর পাবার জন্য অটোগ্রাফের খাতা এগিয়ে ধরলেই গান্ধিজী হাত পাততেন—আগে পাঁচটি টাকা চাই!

এইভাবেই কয়েক মাসের মধ্যে গান্ধিজী এক কোটি পনেরো লক্ষ টাকা সংগ্রহ করেছিলেন।

বরিশালে একদল পতিতা এলো গান্ধিজীর সঙ্গে দেখা করতে, গান্ধিজী তাদের

জিজ্ঞাসা করলেন—বরিশাল একটি ছোট সহর, এখানে আর কতজন পতিতা আছে? আট দশ জন হবে?

—আজ্ঞে না, সাড়ে তিনশো ঘর পতিতা থাকে এই শহরে।

—সাড়ে তিনশো ঘর!—মহাত্মাজী চমকে উঠলেন, বললেন—ছি ছি, বরিশালকে ধিক্!

দু' ঘণ্টা তিনি পতিতাদের সঙ্গে কথা বললেন, পরে এদের সম্বন্ধে তিনি ইয়ং ইণ্ডিয়াতে লিখলেন—বরিশালের অনুপাতে হিসাব করলে সারা ভারতে পতিতার সংখ্যা হবে প্রায় সাড়ে দশ লাখ। দেশের জন্য এরা যদি সন্ন্যাসিনী হয়, এবং চরকা কাটতে ও তাঁত বুনতে সুরু করে, তাহলে মাথা পিছু একটাকা হিসাবে ভারতে দৈনিক সাড়ে দশ লাখ টাকা আয় হতে পারে। কিন্তু কে এদের উদ্ধারের দায়িত্ব গ্রহণ করবে?

অনেক সভায় স্বেচ্ছাসেবকেরা জনতাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারতো না। উল্লসিত জনতা অনেক সময় তাঁর পায়ের ধূলা নেবার জন্য এমন তৎপর হয়ে উঠতো যে গান্ধিজীর বক্তৃতা করা অসম্ভব হয়ে পড়ে, দু' এক স্থানে তাঁর পা অবধি রক্তাক্ত হয়ে যায় তিনি অনেক কষ্টে আত্মরক্ষা করেন। আবার অনেক সভা শেষ করে জনতার হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্য গান্ধিজীকে রীতিমত দৌড়াতে হয়।

এবারকার ভারত পরিক্রমায় গান্ধিজী সব চেয়ে খুশি হন চট্টগ্রামে এসে। চট্টগ্রামে তখন ব্যাপক ধর্মঘট চলছিল। আসামের চা বাগানের কুলিরা ধর্মঘট করে, চাঁদপুরে তাদের উপর সৈন্য দিয়ে অমানুষিক অত্যাচার চালানো হয়, তার প্রতিবাদে ওখানকার সমস্ত রেল ও ষ্টীমার কর্মচারীরা কাজ বন্ধ করে। গান্ধিজী একটা মীমাংসা করার চেষ্টা করেন। এখানকার কর্মীদের মধ্যে যে শৃঙ্খলা ও নিষ্ঠা তাঁর চোখে পড়ে সারা ভারতে আর কোথাও তেমনটি দেখেননি।

•

অহিংসা নীতি ভারতে সর্বজন গ্রাহ্য করে তোলার জন্য গান্ধিজীকে কম কষ্ট পেতে হয়নি। সারা ভারতের নেতারা একটার পর একটা সভা করেছেন। রাত্রি এগারোটা-বারোটা অবধি একাদিক্রমে আলোচনা চলে, দুর্বল দেহ নিয়ে মাঝে মাঝে গান্ধিজী শ্রান্ত হয়ে পড়েন, রাত্রে শোবার সময় সেক্রেটারীকে বলেন—বুকে তেল মালিশ করে দাও!

তেল মালিশ করলে অনেকটা সুস্থ বোধ করেন, শ্রান্ত কণ্ঠে বলেন—একদম থক্ গিয়া, কেত্‌না বরদাস্ত করু!

কিন্তু সংগ্রামের শেষ না হলে তো সেনাপতির বিশ্রাম নেই।

কখন-বা তন্দ্রাচ্ছন্ন কণ্ঠে উচ্চারণ করতেন—শ্রীরাম! শ্রীরাম!!

গীতাখানি মাথার কাছে থাকে, আর তারই সঙ্গে থাকে এক ঝোলার মধ্যে একটি রুদ্রাক্ষের মালা। সকাল বেলা বিছানা তোলার সময় দেখা যায় রুদ্রাক্ষের মালাটি বালিশের পাশে পড়ে আছে, কিন্তু কেউ কখনও তাঁকে জপ করতে দেখেননি।

অহিংসার নীতি পৃথিবীর ইতিহাসে অভিনব। অহিংসা প্রয়োগ করে কোন জাতি যে স্বাধীনতা চাইতে পারে তা অতীব বিস্ময়কর। এই সম্পর্কে গুজরাট বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কোন অধ্যাপক গান্ধিজীকে জিজ্ঞাসা করেন—বাপুজী, আপনি অহিংসা প্রতিরোধের পন্থা কি করে আবিষ্কার করলেন? জগতের ইতিহাসে কোথাও তো অহিংস-সংগ্রামের কথা নেই।

গান্ধিজী বললেন—দক্ষিণ আফরিকায় মীর আলম যখন আমাকে প্রহার করে তখনই এই কথা আমার মনে প্রথম উদয় হয়।

—আশ্চর্য! কেউ মারলে আমারও তাকে প্রহার করতে ইচ্ছা করে। কেউ অনিষ্ট করলে আমি কি করে তার ইষ্ট চিন্তা করবো, তখন তো প্রতিশোধ নিয়েই আমার আনন্দ!

গান্ধিজী বললেন—তোমার সে রকম মনে হয়, তার কারণ তোমার বড় অভিমান। আমার সে অভিমান নেই, তাই আমার চিন্তাধারা ভিন্ন!

তবু তখনকার দিনে এদেশবাসী সাহেবেরা গান্ধিজীকে কি চোখে দেখতো তার পরিচয় পাওয়া যায় ট্রেণের দুটি কাহিনী থেকে:

গান্ধিজী লাহোর যাচ্ছেন।

রাত ন'টার সময় দিল্লীতে এসে ট্রেণ থেমেছে। পাশের কামরায় ছিলেন গান্ধিজীর সেক্রেটারী কৃষ্ণদাস এবং অন্তরঙ্গ কয়েকজন। হঠাৎ কোথা থেকে এক ইংরাজ রাজপুরুষ সঙ্গে এক গুর্খা সৈনিক নিয়ে এসে চড়া গলায় হুকুম দিল—তোমরা সব এ কামরা থেকে নেবে যাও!

কৃষ্ণদাস আপত্তি তুললেন।

সাহেব তো রেগে লাল, বললো—নাব্‌বে না, আচ্ছা নাবো কি না দেখাচ্ছি!

কিন্তু গান্ধিজীর সেক্রেটারী লালমুখ দেখে ভয় পাবার মানুষ নন। সাহেবের সঙ্গে কথা কাটাকাটি চললো। সাহেব কথায় না পেরে উঠে রেলের এক সাহেব অফিসারকে ডেকে আনলো। এবার হয়তো রেলের পুলিশ ডাকবে!

এমন সময় দেবীদাস গান্ধী এসে পড়লেন। কামরার মধ্যে উঠে তিনি বললেন—আমরা গান্ধিজীর চাকর!

সাহেব দু'জন চমকে উঠলো। রেলের অফিসারটি জিজ্ঞাসা করলো—মিষ্টার গান্ধী কি এই ট্রেণেই ভ্রমণ করছেন?

দেবীদাস মাথা নাড়লেন।

সাহেবের কথার সুর বদলে গেল, বললো—তাহলে সব ঠিক আছে, আর কোন গোল নেই, আপনারা বসুন!

সাহেব দু'জন আর দাঁড়ালেন না, তখনই সরে পড়লেন।

মনে মনে গান্ধিজীকে সাহেবরা কতটা ভয় করতো এই ঘটনাটি থেকেই তা বোঝা যায়।

আরেক দিনের কথা—

লামডিং থেকে চট্টগ্রাম—অহিংসা ও অসহযোগের বাণী প্রচার করতে করতে গান্ধিজী ভারত পরিক্রমা সুরু করেছেন।

গান্ধিজীর বগীখানি একটি মালগাড়ীর পিছনে জোড়া। যে ট্রেণে যাবার কথা ছিল সে গাড়ী আগেই চলে গেছে, তাই এই ব্যবস্থা। আগের গাড়ীতে যারা তাঁকে দেখতে পায়নি, পরের গাড়ীর জন্য তারা অপেক্ষা করছে। চারিপাশের জঙ্গল আর দুর্ভেদ্য পাহাড়ের মাঝে প্লাটফর্মের উপর এতো জনতার ভীড় দেখলে বিস্ময় জাগে। মহাত্মাজীকে একবার দর্শন করতে পেলেই তারা খুসি, সানন্দে তারা জয়ধ্বনি তোলে—মহাত্মা গান্ধিকী জয়!

লাট সাহেবের স্পেশ্যাল দাঁড়িয়েছিল এক ষ্টেশনে—আসামের লাট সাহেব যাচ্ছেন লামডিং। চকচকে ঝকঝকে ট্রেণখানি, চারিপাশে বন্দুকধারী সিপাই। কিন্তু মানুষ সে দিকে ফিরেও তাকায় না, সবাই তাকিয়ে আছে মালগাড়ীর পিছনে কদর্য তৃতীয় শ্রেণীর কামরাখানির পানে।

লাট সাহেবের আর কত সহ্য হয়, অন্য সময় হলে হয়তো সিপাইকে হুকুম দিয়েই বসতেন—গুলি চালিয়ে ভীড় হঠাও! গান্ধিজীর সামনে তো তা করা সম্ভব নয়, তিনি নিজের গাড়ীখানিই ষ্টেশন থেকে খানিক দূরে রাখার আদেশ দিলেন! গান্ধিজীর জয়ধ্বনি তার বুকে এসে বাজছে প্রতি মুহূর্তে। জনগণের সঙ্গে যাদের মনের যোগ নেই, জনগণকে তাঁরা সইতে পারবেন কেন!

লাট সাহেবের ট্রেণ দূরে সরে গেল, গান্ধিজী তখন কামরার সামনে দাঁড়িয়ে জনতাকে হাসি মুখে নমস্কার করছেন।

## আমাদের গান্ধিজী

গান্ধিজী নির্দেশ দিলেন—যুবরাজ ভারতে আসছেন, সেদিন তাঁকে বয়কট করতে হবে। যেদিন যে শহরে তিনি যাবেন সেদিন সে শহরে হরতাল করা হবে!

কিন্তু বোম্বাইয়ের ধনী পার্শীরা ও সরকারী কর্মচারীরা এই নির্দেশ মানলো না। যুবরাজকে তারা সম্বর্ধনা জানালো। জনসাধারণ ক্ষেপে গেল, উৎপীড়ন সুরু করলো—টুপি কেড়ে নিল, ট্রাম পুড়িয়ে দিল, মোটার ভেঙ্গে দিল!

শেষে রীতিমত দাঙ্গা বেধে গেল।

বেলা একটা নাগাদ গান্ধিজী নিজে বেরুলেন—জোড়াপুকুরে তখন প্রচণ্ড হাঙ্গামা চলছিল, গান্ধিজী সেখানে গিয়ে দাঁড়ালেন, জনতা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। দু'জন পুলিশ পথের উপর অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল, গান্ধিজী তাদের হাসপাতালে পাঠাবার ব্যবস্থা করলেন।

বেলা পাঁচটার সময় আবার গান্ধিজীকে বেরুতে হোল। ভিণ্ডি বাজারে প্রায় কুড়ি হাজার লোক জড়ো হয়েছে। কারুর গায়ে সাহেবী পোষাক দেখলেই তারা তাকে প্রহার করছে। গান্ধিজী সেখানে উপস্থিত হতেই ভীড় সরে গেল, চারিপাশের অবস্থা দেখে গান্ধিজী বিচলিত হয়ে পড়লেন।

পরদিন হাংগামা চরমে গিয়ে উঠলো। কংগ্রেসকর্মী ও নেতারা দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়লো হাংগামা থামাবার জন্য। যেখানে ভীড় সেখানেই দেখা গেল গান্ধী-টুপী। কর্মীরা শান্তির জন্য জীবন বিপন্ন করতেও কিন্তু বোধ করলেন না। কতজন জনতার মার খেয়ে ক্ষত বিক্ষত হোল, দু'জন কর্মী প্রাণ বিসর্জন দিল! কিন্তু তথাপি শহর শান্ত হোল না।

গান্ধিজী সারারাত ঘুমুতে পারলেন না। চিন্তার ঝড় বহে যাচ্ছে। হিংসার বীভৎসতা অহিংস চিত্তকে আলোড়িত করছে। চারিপাশের দুর্যোগময় অন্ধকারের মাঝে তিনি শান্তির আলো খুঁজে পাবার চেষ্টা করছেন। অন্ধকারের মাঝে চোখ মেলে তিনি তাকিয়ে আছেন। হঠাৎ কি যেন মনে হোল, রাত তিনটের সময় বিছানা ছেড়ে উঠে তিনি লিখতে সুরু করলেন—গত দু'দিন স্বরাজের যে নমুনা আমি দেখলাম, তার পূতিগন্ধ আমি আর সইতে পারছি না…ঐক্য স্থাপনের উপরেই ভারতের স্বাধীন জীবন নির্ভর করছে।…হিন্দু মুসলমান যদি পরস্পরকে শত্রুরূপে দেখে তাহলে তারা পরমেশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করছে বলে বুঝতে হবে।…এই দু'দিনের বিরাট হত্যাকাণ্ডে মুসলমানরাই অগ্রণী ছিল, এতে আমার প্রাণে বড় আঘাত লেগেছে।…যতদিন না আবার সদ্ভাব স্থাপিত হয় ততদিন আমি খাদ্য ও পানীয় ত্যাগ করলাম ; মাত্র জলগ্রহণ করে জীবন ধারণ করবো।

সকাল হতে না হতেই গান্ধিজীর অনশনের খবর বোম্বাইয়ে ছড়িয়ে পড়লো। গান্ধিজীর জীবন রক্ষার জন্ত কর্মী ও নেতারা অবিশ্রান্তভাবে ঘুরতে লাগলেন শহরের সর্বত্র। মহাত্মাজীর কাছে খবর আসতে লাগলো—পয়ধুনী শান্ত…ঘোবিত্তলাও শান্ত…মদনপুরা শান্ত…ভিণ্ডিবাজার শান্ত…

শংকরলাল ব্যাংকার হাত জোড় করে কাঁদতে কাঁদতে অনুনয় করলেন—বাপুজী, দোহাই তোমার, আমরা প্রাণপণে দাঙ্গা থামাবার চেষ্টা করছি, তুমি আহার গ্রহণ কর!

দলে দলে যুবক এসে বাড়ীর সামনে ভীড় করলো, সাড়া তুললো—মহাত্মাজী, উপবাস ভঙ্গ করুন!

উপবাসের তৃতীয় দিনে শহরে শান্তি ফিরে এলো।

আরো দুদিন দেখে, পঞ্চম দিনে চৌপাটীর এক সর্বদলীয় সভার মাঝে সকাল সাড়ে আটটার সময় গান্ধিজী আহার গ্রহণ করলেন—কয়েকটি আঙুর আর একটিমাত্র কমলা লেবু।

কংগ্রেসের বৈঠক বসলো।

আমেদাবাদের কংগ্রেসীরা গান্ধিজীকে সার্বভৌম ক্ষমতা দিল—অসহযোগ আন্দোলন চালাবার পূর্ণ নেতৃত্ব।

সভা শেষে গান্ধিজী প্রত্যেকটি কর্মীর শিবিরে শিবিরে গিয়ে বুঝিয়ে দিলেন—কি ভাবে আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে, কি হবে আন্দোলনের ধারা…

তারপর গান্ধিজী বড়লাটকে জানালেন—সাতদিনের মধ্যে সমস্ত কংগ্রেস কর্মীর মুক্তি চাই, জরিমানার টাকা ও বাজেয়াপ্ত সম্পত্তি ফেরৎ দিতে হবে। মতামত প্রকাশ করার স্বাধীনতা চাই, দমন-নীতির আমূল পরিবর্তন করতে হবে, অন্যথা সরকারী নীতির প্রতিবাদে বোম্বাই প্রদেশের বরদৌলি তালুকে তিনি আইন অমান্য আন্দোলন সুরু করবেন। (১৪০খানি গ্রাম ও ৮৭০০০ বাসিন্দা নিয়ে এই জেলা)।

বড়লাট উত্তর দিলেন—শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করা সকল দেশের গবর্মেণ্টেরই অবশ্য কর্তব্য। আইন অমান্য করার ফলে যে অরাজকতার সৃষ্টি হবে তা দমন করতে বৃটিশ গবর্মেণ্ট বদ্ধ পরিকর!

গান্ধিজী লিখলেন—আমরা চাই স্বরাজ। আমরা চাই সরকার জনসাধারণের ইচ্ছার কাছে মাথা নত করুক, আমরা আর অশান্তি চাই না।

লর্ড বার্কেনহেড বিলাত থেকে চোখ রাঙালেন—যদি আমাদের সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব

এক ঝুড়ি ফল আর একটি চরকা ছিল গান্ধিজীর সঙ্গে।

জেল স্থপারিনটেণ্ডেণ্ট বললো—চরকা আর ফলের ঝুড়ি কাছে রাখা চলবে না।

গান্ধিজী বললেন—স্থতো কাটা আমার একটি ব্রত। সবরমতী জেলে আমাকে স্থতো কাটতে দেওয়া হয়েছে।

স্থপার বললো—য়েরোড়া সবরমতী নয়।

ওয়ার্ডাররা চরকা নিয়ে গেল, মহাত্মাজীও আহার ত্যাগ করলেন।

গান্ধিজী বললেন—আমি প্রতিজ্ঞা করেছি প্রতিদিন অন্ততঃ আধঘণ্টা করে স্থতো কাটবো, স্থতো কাটা বন্ধ করতে হলে খাওয়াও বন্ধ করতে হবে, কাজেই আমাকে আহার ছাড়তে হয়েছে।

একদিন গান্ধিজী উপবাসেই রইলেন। স্থপার দেখলেন ব্যাপার সহজ নয়। তখনই চরকা ফেরৎ দেবার আদেশ দিলেন।

জেলে একটা পরিদর্শক কমিটি থাকে, সপ্তাহে একদিন তারা কয়েদীদের হাল-চাল দেখতে আসে। য়েরোড়া জেলের কমিটি একদিন গান্ধিজীকে দেখতে এলেন। তাদের মধ্যে একজন পাদরী ছিলেন, গান্ধিজী তাঁকে বললেন—আমার সহকর্মী শঙ্করলাল ব্যাংকারকেও আমারই সঙ্গে গ্রেপ্তার করে এই জেলেই এনে রাখা হয়েছে। বেচারা অসুস্থ, স্নায়বিক দুর্বলতায় ভুগছে। তাকে আমার কাছে থাকতে দিলে ভালো হয়, বেচারাকে আমি দেখাশুনা করতে পারি।

পাদরী অবজ্ঞাসূচক মুখভঙ্গী করলো, গান্ধিজীর কথার জবাব দেওয়া দরকার বলে মনে করলো না।

একজন পরিদর্শক আবার টিপ্পনি কাটলো—যত সব আহম্মুখির কথা!

মহাত্মাজী মনে বড় আঘাত পেলেন। মনে পড়লো শঙ্করলালের মাকে। ক'মাস আগে তিনি মারা গেছেন। মৃত্যুকালে গান্ধিজীর হাতে ছেলেটিকে সঁপে দিয়ে তিনি বলেছিলেন—আপনার মত মানুষের হাতে ছেলেটিকে রেখে যাচ্ছি, বিদায় বেলায় এইটাই আমার সব চেয়ে বড় সান্ত্বনা।

কিন্তু আজ! দুর্বল, রুগ্ন শঙ্করলালের জন্য তিনি এতটুকু স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করতে পারলেন না। মানুষ কত অক্ষম! তার সামর্থ্য কত সীমাবদ্ধ! রৌদ্রদগ্ধ আকাশের পানে তাকিয়ে গান্ধিজী শুধু একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললেন।

জেলের জীবনে কোন বৈচিত্র্য নেই:

ভোর চারটের সময় ঘুম থেকে ওঠেন।

আনারি খেয়ে দুটো অবধি চলে জোর আবৃত্তি।

প্রভাতী আলো স্পষ্ট হয়ে উঠলে সুরু করেন পড়াশুনা। পুরো দু' ঘণ্টা চলে পড়াশুনা। মাঝে অবশ্য খাবার জন্ত খানিকটা সময় যায়।

তারপর চার ঘণ্টা চলে তুলো ধোনা, পাঁজ তৈরী করা আর সুতো কাটা।

তারপর কোন এক সময় সন্ধ্যার অন্ধকার চারিপাশ কালো করে দেয়। তিপান্ন বছরের বৃদ্ধ চশমা খুলে হাত গুটিয়ে বসেন। কেউ তাঁর কক্ষে একটা আলো দেয় না। নিঃসঙ্গ রাষ্ট্রনায়ক অন্ধকার কারাকক্ষে বসে কত কি ভাবেন। জানা চেনা কত মুখ ভেসে উঠে চারিপাশের কালো যবনিকার ওপর। চল্লিশ কোটি নর-নারীর দুঃখ ভীড় করে আসে তাঁর মনে। সীমাহীন অন্ধকারের মাঝে বসে মহাভারতের মহাস্থবির আলোর দিশা খোঁজেন হয়তো।

ঢং ঢং করে রাত্রি আটটার ঘণ্টা পড়ে, মহাত্মাজীর সমাধি টুটে যায়। ধীরে ধীরে তিনি রাত্রির প্রার্থনা আবৃত্তি করে শুয়ে পড়েন।

মহাত্মাজী যতই আত্মস্থ ও নির্বিরোধী হোন না, জেলের ব্যবহার মাঝে মাঝে তাঁকে উত্যক্ত করে তোলে।

একবারকার ঘটনা সম্পর্কে তিনি নিজেই লিখেছেন :

'সকল কয়েদীর মত আমারও কাপড় চোপড় ঝাড়িয়া কোন দ্রব্য দেহে লুকানো আছে কিনা দেখিয়া লওয়া হইত। প্রতি সন্ধ্যায় এই প্রকার নিয়ম মত 'ঝাড়তি' লওয়া হইত। আমি কখনও আপত্তি করি নাই। তখন আমার দেহে 'কচ্ছ' (ছোট বস্ত্র) ছাড়া আর কিছুই থাকিত না। তবু জেলার আমার কোমর ও কোমরের নীচের ভাগ স্পর্শ করিয়া পরীক্ষা করিতেন। একবার তো তিনি আমার কম্বল ও অন্যান্য জিনিষ উঠিয়ে উপর. নীচে করিয়া দেখিলেন। জুতা পায়ে দিয়া আমার জলের বাসন স্পর্শ করিলেন। আমার অসহ্যবোধ হইল। তাঁহার সম্পর্কে রিপোর্ট করিব কি না সে বিষয়ে ভাবিতে লাগিলাম। রিপোর্ট করিলে তিনি খুব বকুনি খাইতেন। কিন্তু আমি রিপোর্ট না করাই স্থির করিলাম।'

আরেকবার গান্ধিজীর একখানি ছুরির দরকার—রুটি কাটতে হবে, নেবু কাটতে হবে। তিনি সুপারিটেণ্ডেণ্টকে জানালেন—একখানি ছুরি দিন, নাহলে রুটি খাওয়া ও নেবু খাওয়া বন্ধ করে দিতে হবে।

কিন্তু জেলের আইনে ছুরি এক মারাত্মক অস্ত্র এবং কয়েদীর কাছে ছুরি রাখা বিপদজনক।

বিপন্ন হয়ে উঠে, যদি আমরা ভারত ছেড়ে চলে আসলো এই ভাবে বারবার কলহতা হয়ে নানারূপ দাবী করা হতে থাকে, তবে ভারতবর্ষ ইংরাজদের সঙ্গে পেরে উঠবে না, কারণ ইংরাজেরা সর্বাপেক্ষা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ জাতি। তারা আবার একবার ভারতের জবাব দেবার জন্য তাদের সমস্ত শক্তি ও সংকল্পকে নিয়োগ করবে।

গান্ধিজীও তার স্পষ্ট জবাব দিলেন—বৃটিশ সিংহ যদি আমাদের উপর তার রক্তাক্ত থাবা মারতে থাকে, তবে তার সঙ্গে আমাদের আপোষ মীমাংসা কি করে সম্ভব? বৃটিশ সাম্রাজ্য শোষণ ও পশুশক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, বিধাতা বলে যদি কেউ থাকেন তবে তা কখনও টিঁকে থাকতে পারে না।···১৯২০ খৃষ্টাব্দে যে যুদ্ধ আরম্ভ হয়েছে সে যুদ্ধ শেষ পর্যন্ত চলবে। আমি কেবল ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি যে, শেষ পর্যন্ত অহিংস থাকবার মত প্রচুর দীনতা ও পর্যাপ্ত শক্তি যেন ভারতের থাকে।

কর্মীদের কাছে গান্ধিজী শোনালেন মহত্তর সংগ্রামের রণ-কৌশল—অহিংসা ও দ্বেষহীন অন্তরে শত্রুর আঘাতকে বুক পেতে নিতে হবে, কিন্তু প্রতিঘাত হানা চলবে না। দুর্বল চিত্ত লোকের জন্য এ সংগ্রাম নয়।

ঝড়ের পূর্বাভাস দেখা দিল, সারা ভারতের আকাশ থম্ থম্ করতে লাগলো।

বৃহত্তর সংগ্রাম কিন্তু এলো না। যুক্ত প্রদেশের গোরক্ষপুর জেলায় এক বীভৎস ঘটনা ঘটে গেল। চৌরীচৌরায় এক শোভাযাত্রা বেরিয়েছিল। পুলিশ শোভাযাত্রীদের উপর গুলি চালায়। জনতা ক্ষেপে ওঠে। পুলিশের গুলি বারুদ ফুরিয়ে যাবার পর তারা পুলিশের পিছনে তাড়া করে, থানা ঘেরাও করে আগুন লাগিয়ে দেয়। দারোগা ও একুশজন পুলিশ জীবন্ত দগ্ধ হোল। গান্ধিজী মুহ্যমান হয়ে পড়লেন। 'ইয়ং ইণ্ডিয়া'তে লিখলেন—শয়তান বাধা দিল,···আমার মাথা হেঁট হোল···বরদৌলিতে অবিলম্বে যে ব্যাপক আইন অমান্য হবার কথা ছিল, আমি তা বন্ধ করার কথা ঘোষণা করলাম।

চৌরীচৌরার জন্য গান্ধিজী নিজেকেই দায়ী করলেন, আত্মশুদ্ধির জন্য পাঁচদিন উপবাস করলেন। ভারতের জন-সমাজ বিস্মিত হোল, ক্ষুব্ধ হোল। লালা লাজপৎ রায়, পণ্ডিত মতিলাল, হরদয়াল নাগ, ডাক্তার মুঞ্জে প্রভৃতি নেতারা নির্মম সমালোচনা করলেন। গান্ধিজী উত্তরে বললেন—এ আমার অন্তরের উপলব্ধি, অন্তর্যামীর নির্দেশ।

দিল্লীতে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সভা বসলো। গান্ধিজী নিজের নীতির ব্যাখ্যা করে বললেন—যদি বলপ্রয়োগের দ্বারাই আমরা স্বাধীনতা লাভ করতে চাই, তবে আসুন, আমরা অহিংসা ত্যাগ করে যথাসম্ভব হিংসাত্মক উপায় গ্রহণ করি, তাই

পুতুলের মত, সত্যের মত, এবং প্রকৃতিস্থের মত হবে, তখন কেউ আমাদের ভণ্ড বলে অভিযোগ করতে পারবে না।

সাধারণ কিন্তু গান্ধিজীর চিত্তের গভীরতা বুঝলো না, গান্ধিজীর জনপ্রিয়তা কমে গেল। গান্ধিজী ফিরে গেলেন সবরমতী আশ্রমে।

বড়লাট দেখলেন গান্ধিজীকে গ্রেপ্তার করার এই সুযোগ।

১৯২২ সালের ১০ই মার্চ গবর্মেন্ট গান্ধিজীকে গ্রেপ্তার করে। আটদিন পরে আদালতে তাঁর বিচার হয়। সরকার পক্ষের উকিল মহাত্মাজীর বিরুদ্ধে যে সব অভিযোগ করেন, তার মধ্যে ইয়ং-ইণ্ডিয়া কাগজে তিনটি রাজদ্রোহ মূলক প্রবন্ধই অন্যতম :

Tampering with loyalty
The puzzle and its solution
Shaking the manes.

সরকার পক্ষ যা বললো গান্ধিজী সে সবই মেনে নিলেন, বললেন—আমি একজন তাঁতি, কাপড় বোনাই আমার পেশা···তবে যে অপরাধের জন্য আমাকে ধরেছে, মুক্তি পেলে সেই অপরাধই আমি আবার করবো। সুতরাং আমাকে যেন সর্বোচ্চ দণ্ড দেওয়া হয়।

আমেদাবাদের সেসন জজ, মিষ্টার ব্রুমফিলড বিচারক ছিলেন। মহাত্মাজীকে ছ'বছর জেল দিয়ে তিনি বললেন—আমার জীবনে আপনার মত লোককে কখনও বিচার করিনি ভবিষ্যতে আর কখনও করবো না। আপনার দেশের লোকের কাছে আপনি একজন বরেণ্য দেশপ্রেমিক, আপনার শত্রু পক্ষও আপনাকে উচ্চ আদর্শের মহৎ সজ্জন বলে বিশ্বাস করে। তবু আমি আপনাকে সাধারণ মানুষ হিসাবেই বিচার করতে বসেছি। আপনি নিজেই আপনার অপরাধ স্বীকার করেছেন। আপনাকে যদি তিলকের শ্রেণীভুক্ত করি, তাহলে আমার মনে হয় আপনি তা অযৌক্তিক বলে মনে করবেন না···যদি ভারতবর্ষে ঘটনার স্রোত কোনদিন এমনভাবে বদলে যায়, যার ফলে ছ'বছর পূর্ণ হবার আগেই আপনি মুক্তি পান, তাহলে আমার চেয়ে আর কেউ বেশী খুসি হবে না।

গান্ধিজী হেসে বললেন—লোকমান্য তিলকের সঙ্গে নিজের নাম যুক্ত হওয়ায় আমি শ্রেষ্ঠ সম্মান ও অতুল গৌরবের অধিকারী হলাম। এই দণ্ডাদেশ আমি লঘু বলে মনে করি।

সেদিন শনিবার, দু'দিন মহাত্মাজীকে সবরমতী জেলেই রাখা হোল। সোমবার দিন স্পেশাল ট্রেনে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হোল যেরোড়া জেলে।

একবার দেখা করতে চাই। আমার বিশ্বাস, বুঝিয়ে বললে ওরা বুঝতে পারবে এবং ওদের চাবুক মারার আর দরকার হবে না। আমি কয়েদী হিসাবে এই অনুমতি চাইছি না, মানুষ হিসাবে মানুষকে সেবা করার জন্য এই অনুমতি চাইছি। আশা করি কর্তৃপক্ষ এতে আপত্তি করবেন না।

কিন্তু কর্তৃপক্ষ আপত্তি জানালো।

তবু সহজে হাল ছেড়ে দেবার মানুষ মহাত্মাজী নন। কদিন ধরে শুধুই লেখালেখি চললো। শেষে গান্ধিজী জানালেন—অনুমতি না পেলে আমি এমন কোন একটা কর্মপথ গ্রহণ করতে বাধ্য হব যার ফলে কর্তৃপক্ষ নানা ঝঞ্ঝাটে পড়বেন। তবে তেমন কিছু না করাই আমার ইচ্ছা।

এদিকে কয়েদীরাও অন্নজল গ্রহণের কোন লক্ষণই প্রকাশ করে না।

কর্তৃপক্ষ এবার অনুমতি দিলেন।

জেলের সুপার, মেজর জোন্স ও ইনেসপেক্টার জেনারেল মিষ্টার গ্রিফিথ গান্ধিজীকে সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন তাদের ওয়ার্ডে। দীর্ঘ তেরোদিন উপবাস করে মুলসিপেটার কয়েদীরা তখন শীর্ণ ও ম্লান হয়ে গেছে। মুখ শুকিয়ে গেছে, কিন্তু মন দুর্বল হয়নি। তাদের মধ্যে দু'জন ছিলেন গান্ধিজীর সহকর্মী : দেব ও দস্তানে। তারা ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে এসে গান্ধিজীকে প্রণাম করলো। মহাত্মাজী দুজনকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন, তাদের মাঝে বসে সুরু করলেন তাদের বোঝাতে।

দেব ও দস্তানে বললো—সুপার আমাদের উপর অন্যায় করেছেন তিনি ক্ষমা না চাওয়া পর্যন্ত আমরা অন্নজল গ্রহণ করবো না।

মেজর জোন্স বললেন—বেশ, আপনারা যদি আমাকে বুঝিয়ে দিতে পারেন যে আমার অন্যায় হয়েছে তাহলে আমি অবশ্যই ক্ষমা চাইব।

মহাত্মাজী দু' পক্ষের মাঝে একটা বোঝাপড়া করে দিলেন, কয়েদীরা অনশন ত্যাগ করলো। জেল কর্তৃপক্ষও এক নতুন আদেশ জারী করলেন যে জেল-কর্মচারীকে আক্রমণ করা ছাড়া আর কোন দোষে কোন কয়েদীকে বেত মারা চলবে না।

মনটা নিশ্চিন্ত হলো, আবার রুটিন মতো পড়াশুনা সুরু করলেন মহাত্মাজী।

এই সময়কার কথা নিয়ে মহাত্মাজী লিখেছেন : চুয়ান্ন বছরের ভগ্ন দেহ নিয়ে চব্বিশ বছরের জোয়ানের মত পড়তে বসে গেলাম…প্রতিটি মিনিটের হিসাব রাখতাম।

গান্ধিজী প্রায় দু'বছর জেলে ছিলেন। এই সময়ে তিনি ৮৫ খানি ইংরাজি বই,

৩১ খানি গুজরাটি বই, ৬ খানি হিন্দি বই, ৫ খানি উর্দু বই এবং ২৬ খানি মারাঠি বই পড়েন। ধর্মের বই পড়তেই তিনি বেশী ভালবাসেন, হিন্দি ও গুজরাটী ভাষায় রামায়ণ পড়লেন তিনখানি: বাল্মিকী রামায়ণ, তুলসীদাসী রামায়ণ ও গিরিধরকৃত রামায়ণ। গীতা পড়লেন তিনখানি: লোকমান্যের গীতা-রহস্য, শখুরামের গীতা ও শ্রীঅরবিন্দের গীতা, ২৪ খানি উপনিষদের মারাঠি ভাষ্য পড়লেন। তারপর পড়লেন ম্যাক্‌স্‌মুলারের উপনিষদ ও শ্রীঅরবিন্দের উপনিষদ। তাছাড়া, মহাভারত, শ্রীমদ্‌-ভাগবৎ, বঙ্কিমচন্দ্রের কৃষ্ণচরিত্র, বিবেকানন্দের রাজযোগ, বাইবেল প্রভৃতিও পড়লেন। গভীর ধর্মপুস্তকগুলির মাঝে মহাত্মাজী যখন অন্তরের উপলব্ধিকে স্বচ্ছ করে তুলছিলেন, তখন আবার ছোট ছেলেমেয়েদের উপযোগী অনেক হাল্কা বইও তিনি পড়েছিলেন। লুসিয়ানের লেখা 'ট্রিপ-টু-দি মুন,' 'টম ব্রাউন্‌স্‌ ইস্কুল ডেজ্‌', 'ডাক্তার জেকিল এণ্ড মিষ্টার হাইড', কিপলিংয়ের 'জঙ্গল বুক' জুলভার্ণের 'ড্রপ ফ্রম দি ক্লাইড্‌স্‌' একদিকে পড়েছেন, আরেকদিকে পড়েছেন এইচ-জি-ওয়েল্‌সের 'আউটলাইন্‌স্‌ অফ হিষ্ট্রি', রবীন্দ্রনাথের 'প্রাচীন সাহিত্য', 'মুক্তাধারা, নৌকা ডুবি, আবার মিশরকুমারীর গুজরাটী অনুবাদ।

ইতিহাস, প্রবন্ধ ও জীবনী সম্পর্কে ভালো বই যা তিনি হাতের কাছে পেয়েছেন, তাই পড়েছেন।

হিন্দি মাসিকপত্র 'সরস্বতী' তাঁর কাছে নিয়মিত ভাবে পৌছাতো, বোম্বের 'টাইম্‌স্‌ অফ ইণ্ডিয়া', কলকাতার 'মডার্ণ রিভিউ', গুজরাটী 'বসন্ত' ও 'সমালোচক' প্রভৃতি পত্রিকা পাবার জন্য তিনি আবেদন করেন। কিন্তু সে আবেদন অগ্রাহ্য করা হয়। মহাত্মাজী বলেন—কয়েদীদের কতকগুলি অধিকার আছে—হাওয়া, জল, খাদ্য ও বস্ত্রের অধিকার। মনের খোরাক পাবার অধিকারও আমাদের আছে। সেই দিক থেকে এই পত্রিকাগুলি পাওয়াটা আমি উপযুক্ত খাদ্য পাওয়া বলে মনে করি।

জেলের কর্তারা উত্তর দিলেন—আমরা কিছুই করতে পারি না, উচ্চতর কর্তৃ-পক্ষের আদেশ অনুযায়ী সিদ্ধান্ত করা হয়েছে।

গান্ধিজী এ সম্পর্কে আর বেশী ঔৎসুক্য দেখাননি।

মহাত্মাজী শুধুই পড়তেন না, অবসর মত কিছু কিছু লিখতেনও, কয়েক মাসের মধ্যে ছেলেদের জন্য গুজরাটী ভাষায় তিনি একখানি পাঠ্যপুস্তক শেষ করলেন, দেখে শুনে ছাপবার জন্য বইখানি তিনি পাঠিয়ে দিলেন।

কিন্তু বইখানি শেষ অবধি জেল ফটক পার হতে পারলো না। ইনেসপেকটার জেনারেল কর্ণেল ডালজিয়েল বইখানি গান্ধিজীর কাছে পাঠিয়ে দিলেন। জানালেন,—

সুপার অনেক ভেবে চিন্তে শেষে একখানি পেনসিল-কাটা ছুরি দিলেন। তবে কথা রইল যে ছুরিখানি গান্ধিজীর কাছে থাকবে না, থাকবে ওয়ার্ডারের কাছে, দরকার মত ছুরিখানি চেয়ে নিয়ে ব্যবহার করতে পারবেন এবং প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলা ওয়ার্ডার ছুরিখানি জেলারের কাছে জমা দেবেন, আবার সকালবেলা চেয়ে আনবেন আপিস থেকে।

এখানকার জেলের সবচেয়ে বড় ঘটনা ঘটেছিল মুলসিপেটার কয়েদীদেরকে নিয়ে।

তখন ফেব্রুয়ারী মাস। শীতের আমেজ প্রভাতী দীপ্তিকে কুয়াসাচ্ছন্ন করে রেখেছে। গান্ধিজী উপাসনা শেষ করে সবেমাত্র তাঁর পুঁথি-পত্র পেতে বসেছেন এমন সময় একটা আর্ত চীৎকার কানে এসে বিঁধলো; গান্ধিজী চঞ্চল হয়ে উঠলেন, কান পেতে শুনলেন—চাবুক মারা হচ্ছে! চাবুক মারছে!!

মহাত্মাজী তাকিয়ে রইলেন বাইরের পানে। তাঁর আঁধার কুঠ্‌রীর সামনে দিয়েই কায়েদীদের যাতায়াতের পথ। কিছুক্ষণ পরেই সেই পথ দিয়ে ওয়ার্ডাররা ফিরলো, সঙ্গে চার পাঁচজন কয়েদী। বয়স কম, পরণে চটের পোষাক। পিঠ খোলা। সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে ধীরে ধীরে তারা চলেছে, প্রতিটি পদক্ষেপ ব্যথা-কাতর।

মহাত্মাজীকে তারা নমস্কার করলো।

গান্ধিজী প্রতি-নমস্কার জানালেন।

তাদের পিছনে দেখা দিল আরেকজন, তার পায়ে আবার বেড়ী লাগানো, পা টেনে টেনে সে চলছে। সে-ও মহাত্মাজীকে নমস্কার করলো।

মহাত্মাজী আর থাকতে পারলেন না, কয়েদীর সঙ্গে কথা বলা জেলের নিয়ম নয়, তবু তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—আপনি কে?

—আমি মুলসিপেটার লোক।

—যাদের চাবুক মারা হোল তাদের আপনি জানেন?

—সকলকেই জানি। তারা সবাই মুলসিপেটার লোক।

পদে পদে কয়েদী ক'জন দেয়ালের আড়ালে দৃষ্টির বাইরে চলে গেল। গান্ধিজী কিন্তু কিছুতেই মন স্থির করতে পারলেন না।

জেলের ভিতরকার কোন খবরই চাপা থাকে না। ওয়ার্ডার আসতেই তার মুখে গান্ধিজী সব কথা শুনলেন: মুলসিপেটার সব কজনই স্বদেশী করে জেলে এসেছে। প্রত্যেকেই বেপরোয়া, কর্তাদের আদেশমত সব সময় মাথা নত করতে পারে না, কথায় কথায় কর্তাদের সঙ্গে তাদের ঠোকাঠুকি বাধে। কর্তারা সব সময়েই

তাদের উপর বিরূপ। এবার তারা রীতিমত কাজ করতে চায় না এই অজুহাতে জেল সুপারিনটেণ্ডেন্ট মেজর জোন্স তাঁদের বেত মারার হুকুম দিয়েছেন।

বিকাল বেলা খবর এলো এই আদেশের প্রতিবাদে আঁধারকুঠুরীর সমস্ত কয়েদীরা হরতাল করেছে।

তখনই গান্ধিজী মেজর জোন্সের কাছে লিখলেন: ওদের সঙ্গে আমাকে একবার দেখা করার অনুমতি দিন, ওদের বুঝিয়ে ব্যাপারটা আমি মিটিয়ে ফেলবার চেষ্টা করবো।

সুপার জানালেন: আপনার শুভেচ্ছার জন্য ধন্যবাদ, কিন্তু কয়েদীদের মধ্যে পরস্পরে দেখা করতে দেওয়া জেল-আইনের বিরোধী।

মহাত্মাজী কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন, তারপর ওয়ার্ডারের মুখে জয়রাম-দাসের কাছে খবর পাঠালেন—মুলসিপেটার কয়েদীদের সঙ্গে দেখা হলে বলবেন, যে সত্যিকারের সত্যাগ্রহীরা জেলে এসে দৈনিক কাজ করতে অস্বীকার করতে পারেন না।

মহাত্মাজীর অনুরোধ জয়রামদাসের কাছে আদেশ। তিনি মুলসিপেটার কয়েদীদের সঙ্গে দেখা করে গান্ধিজীর নির্দেশ জানিয়ে দিলেন।

কিন্তু জেলের আইন ভাঙ্গার জন্য জয়রামদাসকে সাজা দেওয়া হোল।

মহাত্মাজী সুপারকে লিখলেন—আমিই জয়রামদাসকে জানিয়েছিলাম, শাস্তি আমারই প্রাপ্য।

সুপার উত্তর দিলেন—আপনি আইন অমান্য করেননি। সে জন্য আপনাকে সাজা দিতে পারি না। যিনি বে-আইনী কাজ করেছেন তাকেই শাস্তি দিয়েছি।

কিন্তু এর পরেই মহাত্মাজীকে জেলের এক প্রান্তে ইউরোপীয়ান ওয়ার্ডে বদলী করা হোল। এখানকার ঘরগুলি বেশ বড় বড়। বেশী আলো হাওয়ারও ব্যবস্থা আছে। ঘরের সামনে এক টুকরো বাগানও আছে। তবে এখানে আর কোন কয়েদীর মুখ দেখার উপায় নেই। ওয়ার্ডার আর ফালতু (চাকর) ছাড়া একেবারেই নিঃসঙ্গ।

তবে জেলে কোন খবরই চাপা থাকে না। ওয়ার্ডার এসে একদিন বললো—আজ আবার মুলসিপেটার একজন কয়েদীকে বেত মারা হয়েছে।

ক'দিন পরে আবার ছ'জনকে বেত মারা হোল। এবার মুলসিপেটার সব কয়েদী একযোগে উপবাস সুরু করলো।

গান্ধিজী আবার সুপারকে লিখলেন—আমার বড় কষ্ট হচ্ছে, আমি ওদের সঙ্গে

কয়েদীরা যখন জেল খাটে সেই সময় তাদের কোন বই প্রকাশ করতে দেওয়া হয় না।

য়েরোড়া জেলে গান্ধিজী ছিলেন ৮৬৭৭ নং কয়েদী। একজন কয়েদী ওয়ার্ডার, আর একজন ফালতু ( চাকর ) সারাদিন তাঁর কাছে থাকতো। গান্ধিজীর ওপর নজর রাখা আর সেবা করা এই দুই ছিল তাদের কাজ।

দু'তিন মাস পর ওয়ার্ডার ও ফালতু বদল হোত। যে যেমন লোকই আসুক, মহাত্মাজী তার সঙ্গে বন্ধুর মত ব্যবহার করতেন। মহাত্মাজী কাউকে চলনসই লেখাপড়া শেখান, কেউ শেখে ভালো করে সুতো কাটতে, আবার কেউ বা প্রার্থনার সময় গান্ধিজীর সামনে বসে রাম নাম শুনতো।

সন্ধ্যাবেলা এদের সঙ্গে বসে বসে গান্ধিজী গল্প করতেন। কয়েদী জীবনের নানা সুখদুঃখের কাহিনী ওরা বলে যেত। এক এক জন দশবারো বছর করে জেল খাটছে, জেলের ভিতরকার অনেক তথ্যই তাদের নখদর্পণে। এই সম্পর্কে গান্ধিজী লিখেছেন : যদি জেলের সমস্ত মাটি দু'ফুট খুঁড়ে ফেলা হয়। তাহলে, বসুন্ধরা কয়েদীদের অনেক গুপ্ত কাহিনী প্রকাশ করে দেবেন—অনেক চামচ, ছুরি, বাসন, সাবান, সিগারেট বেরিয়ে পড়বে···

গান্ধিজীর মত মানুষ সরল ভাবে চাইলে 'মডার্ণ রিভিউ'এর মত একখানি মাসিক পত্রিকা পাবেন না। কিন্তু দুষ্ট কয়েদী গোপনে সিগারেট অবধি সংগ্রহ করতে পারে।

গান্ধিজী ছিলেন বিশেষ শ্রেণীর কয়েদী, প্রতি তিনমাসে একখানি করে চিঠি জেলের বাইরে পাঠাতে পারতেন আর একবার দেখা করতে পারতেন বাইরের লোকেদের সঙ্গে।

কিন্তু জেলের কর্তারা সব সময় এই নীতি মানতেন না। অনেক সময় গান্ধিজীর চিঠি বাইরে পাঠাতে তারা অস্বীকার করতেন।

দেখা করার ব্যাপারেও কর্তৃপক্ষ খামখেয়ালীর পরিচয় দিতেন। একবার কস্তুরবা'কে জেলের দরজা থেকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়···পণ্ডিত মতিলাল ও হাকিম আজমল খাঁ দেখা করার অনুমতি পাননি।

তবে বিশেষ শ্রেণীর কয়েদী বলে আহারাদির কিছু সুবিধা গান্ধিজী পেয়েছিলেন। দু'সের ছাগলের দুধ, কমলা লেবু, কিস্‌মিস্‌ প্রভৃতি তাঁকে দেওয়া হোত।

কিন্তু অন্যান্য যে সব সহকর্মীরা জেলে আছেন তাঁরা যখন আহারাদির কোন সুবিধা পান না, শুধু গান্ধিজীকে এই সুবিধে দেওয়া হয়, জেনে শুনে মহাত্মাজী তো,

দু'মুখো নীতি মানতে পারেন না। তিনি আপত্তি জানিয়ে কমলা লেবু ও কিস্‌মিস খাওয়া ছেড়ে দিলেন।

স্বাস্থ্যরক্ষার জন্ত ওই সব খাত্তের প্রয়োজন ছিল। ত্যাগ করার ফলে উত্তরোত্তর তাঁর শরীর কাহিল হয়ে পড়লো। দু'মাসের মধ্যে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন। অন্ত্রের পীড়া; সামান্ত কিছু আহার করলেই পেটে ব্যথা ধরে, কোন রকমেই এতটুকু সুস্থির হতে পারেন না; দেখে শুনে ডাক্তাররা বললেন—এপেনডিসাইটিস্।

একদিন ব্যথা এতই অসহ্থ হয়ে উঠলো যে সেই রাত্রেই পুনার সেস্থন হাসপাতালে মহাত্মাজীকে স্থানান্তরিত করতে হোল।

কর্ণেল ম্যাডক বললেন—এখনই অপারেশন করতে হবে।

সবে অপারেশন আরম্ভ হয়েছে এমন সময় হাসপাতালের ইলেকট্রিক গেল বিগড়ে—অপারেশন থিয়েটার অন্ধকার হয়ে গেল।

কখন আলো জলবে ঠিক নেই, চুয়ান্ন বছরের এক বৃদ্ধকে অপারেশন টেবিলের উপর বেশীক্ষণ ফেলে রাখাও যায় না। একেই তিনি দুর্বল তার উপর বেশী রক্তপাত হলে হয়তো আর জ্ঞান ফিরে আসবে না।

ডাক্তাররা তখনই হারিকেনের ব্যবস্থা করলেন। সেই স্তিমিত আলোকে কর্ণেল ম্যাডক অপারেশন শেষ করলেন।

ইলেকট্রিক আবার যখন জললো তার অনেক আগেই কাজ শেষ হয়ে গেছে, ততক্ষণ ফেলে রাখলে সে যাত্রা মহাত্মাজী রক্ষা পেতেন না।

দুর্বল গান্ধিজী আরো দুর্বল হয়ে পড়লেন। কদিন পরে ৭ই ফেব্রুয়ারী গভর্ণেন্ট তাঁকে মুক্তি দিল। তখনও কারাবাসের দু'বছর পূর্ণ হয়নি।

গান্ধিজী তখন চলতে পারেন না, জোরে কথা বললে কষ্ট হয়।

গান্ধিজী এলেন জুহুর সমুদ্রতীরে। সেই শরীরেই তিনি সুরু করলেন নবজীবন ও ইয়ং ইণ্ডিয়ার সম্পাদনা। পত্রিকা দু'খানিতে ধারাবাহিকভাবে তাঁর আত্মজীবনী বেরুতে সুরু হোল—'সত্যের পরীক্ষা'। এই আত্মকথা তিনি জেলে বসে লিখেছিলেন গুজরাটী ভাষায়, তার ইংরাজী অনুবাদ করেন মহাদেব দেশাই ও প্যারীলাল, তার উপর চোখ বুলিয়ে নেন মীরা বেন [ মিস্ স্লেড ]।

ইতিমধ্যে কংগ্রেসী নেতাদের মাঝে মতবিরোধ দেখা দিল, একদল বললেন যেমন অসহযোগ চলছে চলুক, আরেকদল বললেন—বড়লাটের দরবারে (কাউনসিল) ঢুকে গভর্ণমেন্টকে সব কাজে বিব্রত করে তুলতে হবে। দু'দলই এলেন গান্ধিজীর কাছে। অনেক বিচার বিতর্ক করেও মতের মিল হোল না। শেষে গান্ধিজী

বললেন—প্রত্যেকেই যেন নিজ নিজ বিশ্বাস অনুযায়ী গঠন মূলক কাজ করে চলেন।

হিন্দুমুসলমান একত্রে অসহযোগ সুরু করেছিল, গান্ধিজী ঘোষণা করেছিলেন—হিন্দু পার্শী খৃষ্টান ইহুদী আমরা যা'ই হই না কেন, আমরা যদি একটিমাত্র 'নেশন' হিসাবে বেঁচে থাকতে চাই, তবে আমাদের একজনের স্বার্থকে সকলের স্বার্থ করে তুলতে হবে। কেবলমাত্র গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করতে হবে দাবীটি ন্যায়সঙ্গত কিনা।

কিন্তু এই ঐক্য বেশী দিন স্থায়ী হোল না, ১৯২৪ এর শেষ দিকে দেশের সর্বত্র হিন্দুমুসলমানে দাঙ্গা বেধে গেল—জব্বলপুর, নাগপুর, গুলবর্গা, এলাহাবাদ, লখনৌ, সাহাজানাবাদ, দিল্লী, কোহাট···সর্বত্র। কোহাটের দাঙ্গা চরমে গিয়ে উঠলো। চার হাজার হিন্দুকে ভিখিরীর বেশে কোহাট ছেড়ে পালাতে হোল। গান্ধিজী এই দুর্যোগের জন্য নিজেকে দায়ী করলেন, বললেন—আমি যদি ভালো হই, তাহলে আমার কাছে যারা আছে তারা কোন অন্যায় করতে পারে না। যদি কেউ অন্যায় করে, তাহলে বুঝতে হবে যে আমার ভালবাসার এমন জোর নেই যে তাকে অন্যায় থেকে দূরে রাখি। সেই দোষ আমার মনের। মন থেকে সেই দোষ দূর করতে হলে প্রায়শ্চিত্ত করে মনকে পবিত্র করতে হবে। উপবাস করাই হোল সেইদিন থেকে সব চেয়ে ভালো উপায়।

গান্ধিজী একুশ দিনের জন্য উপবাস সুরু করলেন। সেই দুর্বল দেহে তিন সপ্তাহ উপবাস সহ্য হবে কি করে তাই ভেবে সমগ্র দেশে বিশেষ উৎকণ্ঠা দেখা দিল। ভারতের চারি প্রান্ত থেকে সকল ধর্মের নেতারা দিল্লীতে সমবেত হলেন, মৌলানা মোহম্মদ আলির বাড়ীতে ঐক্য সম্মেলন বসলো, সাতদিন ধরে আলাপ আলোচনা করে তাঁরা গান্ধিজীর কাছে প্রতিশ্রুতি দিলেন—সাম্প্রদায়িক শান্তি রক্ষার জন্য তাঁরা আপ্রাণ চেষ্টা করবেন। দেশবাসীর কাছে তাঁরা আবেদন জানালেন—প্রত্যেকেরই নিজ নিজ ধর্মকাজ করার অধিকার আছে, সেজন্য বিরোধ করার কিছু নেই।

কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন বসলো বেলগাঁওয়ে। গান্ধিজী হলেন সভাপতি। অতি অল্প কথায় জাতিকে নির্দেশ দিলেন কি করতে হবে—স্বরাজ পেতে হলে তিন দিকে আমাদের কাজ করতে হবে: চরকা প্রবর্তন, হিন্দুমুসলমানের ঐক্য স্থাপন ও অস্পৃশ্যতা বর্জন। স্বরাজের মূলকথা হবে: সাবালকদের ভোট দেবার অধিকার থাকবে, মাদক দ্রব্য নিষিদ্ধ করা হবে, উচ্চ কর্মচারীদের বেতন কমানো, ভাষায়

ভিত্তিতে প্রদেশ গঠন করা, বিদেশীদের একচেটিয়া ব্যবসা করার অধিকার খর্ব করা, সরকারী কাজে বর্ণভেদ দূর করা, ধর্মের স্বাধীনতা, মাতৃভাষায় প্রাদেশিক গভর্মেণ্টের কাজ চালানো ও হিন্দী হবে ভারতের রাষ্ট্রভাষা।

কংগ্রেসের এই নীতি জনগণের মনে পৌঁছে দেবার জন্য গান্ধিজী আবার ভারত পরিক্রমা করতে বেরুলেন। পথে ও প্রান্তরে, পল্লী ও নগরে গান্ধিজীর বাণী ধ্বনিত হোল—অস্পৃশ্যতা ছাড়তে হবে, ধর্মের বিরোধ ভুলতে হবে।...

দক্ষিণ ভারত। ধর্মের চেয়ে এখানে জাতি বড়। ব্রাহ্মণেরা 'পারিয়ার' ছায়া ছুঁলে স্নান করে।

গান্ধিজী বললেন—অস্পৃশ্যতা জয় করতে হবে, আমাদের ভাইদের আমাদের মাঝে গ্রহণ করতে হবে, তবেই জগতের সঙ্গে প্রীতি স্থাপনের শক্তি জন্মাবে, জগতের সেবা করার অধিকার জন্মাবে, একাজে স্বার্থ বা লাভের কথা কিছু নেই, এটি ধর্ম। ......ছেলেবেলায় যখন উকাকে ছুঁয়ে স্নান করেছি, তখন বার বার একটি কথাই মাঁকে জিজ্ঞাসা করেছি—'উকাকে ছুঁলে কি অন্যায় হবে? উকাকে ছুঁতে বারণ কর কেন?'...অস্পৃশ্যতা বলে হিন্দু ধর্মে কিছু আছে বলে আমি বিশ্বাস করি না, হিন্দুরা অস্পৃশ্যতাকে স্বীকার করে নিয়ে মহাপাপ করেছে। যতদিন হিন্দুরা মনে করবে যে, আরেকজন হিন্দুকে স্পর্শ করলে পাপ হয় ততদিন স্বরাজ আসবে না। যুধিষ্ঠির সঙ্গী কুকুরটিকে ছেড়ে স্বর্গে যেতে রাজী হননি, যুধিষ্ঠিরের বংশধরেরা অস্পৃশ্যদের বাদ দিয়ে স্বরাজ পাবার আশা করে কেমন করে?... আমরা আমাদের ভাইয়ের উপর অবিচার করছি, চোখ রাঙিয়ে তাদের প্রণাম করতে বাধ্য করছি, কোন মেথর ট্রেণে উঠলে তাকে কামরা থেকে বের করে দিচ্ছি, ইংরাজেরা আমাদের সঙ্গে এর চেয়ে বেশী আর কি করেছে। এই দুর্নীতি থেকে এখনই আমাদের মুক্ত হওয়া দরকার—একজনকে যখন আমরা আঘাত করছি, তখন আরেকজনের কাছ থেকে আঘাতের প্রতিকার চাওয়া যায় না। অস্পৃশ্যতা বজায় থাকতে স্বরাজের কথা ভাবা চলে না।

ভাইকমে ছোটজাতের হিন্দুরা রাজপথ দিয়ে চলতে পারতো না। গান্ধিজী বললেন—মানুষ সবাই সমান, এপথ সবাইকার পথ, সবাই এই পথ দিয়ে চলতে পারবে!

হরিজনেরা সেই পথ দিয়ে সুরু করলো অভিযান।

পুলিশ পথের মুখে অস্পৃশ্যদের রুখে দিল।

অচ্ছুৎরা হাতজোড় করে বললো—আমাদের এই পথ দিয়ে যেতে দিন্!

পুলিশ তার উত্তর দিল লাঠি চালিয়ে।

কিন্তু অস্পৃশ্যেরা পিছু হটলো না, ভয় পেলে না, শান্তভাবে হাতজোড় করে আবার বললো—আমাদের যেতে দিন.!

কিন্তু পুলিশ তাদের পথ ছাড়লো না। সত্যাগ্রহীরাও চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

প্রচণ্ড রোদ মাথার উপর দিয়ে চলে গেল, ঝম্ ঝম্ করে বৃষ্টি নাবলো, পথে হাঁটু সমান জল জমে গেল, পূবের সূর্য পশ্চিমে অস্ত গেল, তখনও সত্যাগ্রহীরা পুলিশের সামনে হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে আছে, শান্তকণ্ঠে তাদের সেই এক মিনতি—আমাদের যেতে দিন!

অবশেষে পুলিশ পথ ছেড়ে দিল, ধৈর্য, বিনয় ও অহিংসা দিয়ে সত্যাগ্রহীরা জয়ী হোল।

গাঁয়ে সভা বসেছে। হাজার হাজার মানুষের ভীড় গিস্ গিস্ করছে।

গান্ধিজী এলেন বক্তৃতা করতে। মঞ্চের উপর উঠে দেখলেন—ভীড়ের বাইরে এক কোণে একদল লোক বসে আছে, জনতা থেকে খানিক তফাতে, খানিক দূরে। সভার এক মাতব্বরকে ডেকে গান্ধিজী জিজ্ঞাসা করলেন—ওরা কারা? ওরা ওখানে বসে কেন?

—আজ্ঞে ওরা অস্পৃশ্য—মেথর!

—মেথর বলে ওরা তোমাদের কাছে বসতেও পাবে না?

মাতব্বরদের মুখে কোন উত্তর জোগালো না।

—এই সভায় যদি ওদের জায়গা না হয়, তাহলে আমারও জায়গা হবে না—বলে গান্ধিজী মঞ্চ থেকে নেবে এলেন, সভা পার হয়ে বরাবর গিয়ে বসলেন সেই মেথরদের মাঝে।

গান্ধিজী বললেন—আবার যদি আমার এই পৃথিবীতে জন্ম হয়, তাহলে যেন এই হরিজনদের মাঝেই জন্মাই। সাত কোটি লোককে শত শত বছর ধরে অচ্ছুৎ করে রেখে যে পাপ আমরা করেছি, সেই ঘৃণা ও অন্যায় নিজের জীবনে ভোগ করে আমি সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে চাই।

যারা ঘটা করে অস্পৃশ্যদের দূরে সরিয়ে রেখেছিল সেদিন তাদের মুখে আর কথা জোগালো না।

আরেক দিনের কথা।

মহাত্মাজী আসছেন। ষ্টেশনে অসম্ভব ভীড়। ট্রেন থেকে নামামাত্রই হাজ হাজার কণ্ঠে চীৎকার উঠলো—মহাত্মা গান্ধি কী জয়! স্বাধীন ভারত কি জয় বন্দেমাতরম্!

গান্ধিজীকে প্রণাম জানাবার জন্ম সবাই উৎসুক—ঠেলাঠেলি। একপাশে দাঁড়িে ছিল এক মেথর, ভীড়ের চাপে মানুষটি পড়ে যায় আর কি। ঝাঁটাটি হাত থেকে পড়ে গেল, কোন রকমে সে আত্মরক্ষা করলো। মেথর সে, সবাই তাকে ছুঁয়ে ফেলেছে, একান্ত অপরাধীর মত সে ভয়ে জড়সড়!

গান্ধিজীর চোখ সব দিকে। ধীরে ধীরে তিনি এগিয়ে এলেন মেথরটির পাশে, ঝাঁটাটি কুড়িয়ে দিলেন তার হাতে। মেথরটির দু'চোখ সেদিন অশ্রুসজল হয়ে উঠেছিল কি না কে জানে!

আড়াই হাজার বছর আগে এক তথাগত তাদেরই কোন্ পূর্বপুরুষকে মানব সেবার 'মহত্তর' ধর্মে দীক্ষিত করেছিলেন, সেই অপরাধে শত শত বছর সনাতনীরা তাদের 'মেথর' নামে অবজ্ঞা করেছে, আরেক তথাগত সেই ঝাঁটাই আবার তার হাতে তুলে দিলেন। তার মনের উপর থেকে মুছে গেল সব গ্লানি, সেবার মহত্তম রূপ নতুন করে ধরা পড়লো তার চোখে। সার্থক হোল সে।

সবাই সমান, সবাই ভাই—মহাত্মাজী এই সত্য উপলব্ধি করতেন অন্তর দিয়ে। এ যে তাঁর কত বড় বিশ্বাস তাঁর পরিচয় পাওয়া যায় পুরীতে।

পুরীর মন্দির, জগন্নাথ দেবের মন্দির। পুরীধাম শ্রীক্ষেত্র। এখানে অন্নের বিচার নেই, কেউ কারুর উচ্ছিষ্ট খেলে জাত যায় না। মন্দির দ্বারে দর্শনার্থীকে ঝাঁটা মারা হয়—দেবদর্শনের আগে সমস্ত আত্মাভিমান ত্যাগ করে আসতে হবে! কিন্তু সাম্যবাদী শ্রীক্ষেত্রেও অস্পৃশ্যদের মন্দিরে ঢুকতে দেওয়া হয় না। গান্ধিজী মনে বড় ব্যথা পেলেন, প্রতিজ্ঞা করলেন—যতদিন না মন্দিরের ভিতর হরিজনদের ঢুকতে দেওয়া হয় ততদিন তিনি নিজেও ঢুকবেন না।

কস্তুরবা' ছিলেন সঙ্গে। হিন্দু ঘরের মেয়ে, মন্দিরের পাশে থেকে দেবদর্শনের লোভ সংযত করা তাঁর পক্ষে সহজ নয়। একদিন তিনি লুকিয়ে জগন্নাথদেবকে দেখে এলেন।

কেমন করে জানিনা, কথাটা মহাত্মাজীর কানে উঠলো, তিনি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হলেন, কস্তুর'বার সঙ্গে বাক্যালাপ অবধি বন্ধ করে দিলেন। তিনি যে অন্যায়ের বিরুদ্ধে

প্রতিবাদ করেছেন, তাঁর সহধর্মিণীরও তাতে পূর্ণ সমর্থন থাকা উচিত! ক্ষুব্ধ আবেগে গান্ধিজীর মুখখানি কালো হয়ে উঠলো। কস্তুরবা নিজের দুর্বলতা বুঝতে পারলেন, ামীর কাছে ক্ষমা চাইলেন, গান্ধিজীর মুখে হাসি ফুটে উঠলো।

*

ভারতের সাত কোটি অস্পৃশ্যকে মহাত্মাজী নতুন নাম দিয়েছেন—হরিজন—গবানের আপনার জন। এদের জন্য সত্যিকারের ভালো কিছু করার চেষ্টায় হাত্মাজী ১৯৩৩ সালে 'হরিজন-সেবক-সঙ্ঘ' প্রতিষ্ঠা করেন এবং 'হরিজন' নামে এক নি কাগজও প্রকাশ করেন, তিনবার উপবাস করেন এবং সবরমতী আশ্রমটি রিজনদের সেবাতেই উৎসর্গ করেন। এক মেথরের মেয়েকে গান্ধিজী নিজের মেয়ের চ সবরমতী আশ্রমে প্রতিপালন করেছিলেন।

*

দক্ষিণ ভারত থেকে গান্ধিজী কলিকাতায় এলেন।

রোটারী ক্লাবের সভায় গান্ধিজী বললেন—যন্ত্রকে আমি ঘৃণা করিনা। যে চরকা তে আমি সবাইকে বলি, সে-ই চরকাও তো একটি যন্ত্র। তবে যে যন্ত্র অনেককে ০।করে মাত্র কয়েকজনকে বড়লোক করে তোলে, সে যন্ত্রকে আমি চাই না। কোটি কোটি ভারতবাসীকে যে যন্ত্র খেতে দেবে, সে যন্ত্রকে আমি নিশ্চয়ই চাইব।...বড় বড় কয়েকটি যন্ত্রের সাহায্যে কয়েকজন মাত্র লোক সমস্ত লোকের পিঠে চেপে সেছে। যন্ত্র যেমন কাজ করে সেই কাজগুলি মানুষকে নিজের হাতে করে নিতে বে। আর এইভাবে সেই কয়েকজন লোককে পিঠ থেকে নাবিয়ে দিয়ে সকলের াথে সমান করে দিতে হবে। নিজেকে নিজে গড়ে তুললে বঞ্চকদের দল আপনা থকেই সরে যাবে।

লেনিন ও গান্ধিজী জনসাধারণের জীবনধারা একই পরিণতিতে পৌছে দিতে ান, তবে দারিদ্র্যলুপ্তির পথ দু'জনের ভিন্ন। লেনিন দেখেছেন রক্তাক্ত বিপ্লবের থ, আর গান্ধিজী দেখেছেন অহিংস স্বাবলম্বনের পথ। লেনিন বিপ্লবকে ত্বরান্বিত রেছেন সমষ্টিগত অস্ত্রশক্তির দ্বারা, আর গান্ধিজী বিপ্লবকে ত্বরান্বিত করেছেন ক্তিগত ভাবে আত্মস্থ উপলব্ধির দ্বারা, চরকা চালিয়ে জনগণের সাচ্ছন্দ্য বিধান করা নিনের কাছে হাস্যকর, গুলি চালিয়ে বিপক্ষকে নিশ্চিহ্ন করা গান্ধিজীর কাছে নব-ধর্ম বিরোধী। কিন্তু দু'জনেই নিজ পরিধির মধ্যে অসামান্য সাফল্য অর্জন রছেন।

গান্ধিজী গেলেন দুর্জয়লিঙে। অসুস্থ দেশবন্ধু তখন 'স্টেপ্‌ এসাইডে' স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের আশায় নিরবচ্ছিন্ন বিশ্রাম করছিলেন, গান্ধিজী সেইখানেই কয়েকটি দিন কাটালেন। কাজের গুরুভার আর রইল না, হাস্য পরিহাসের ভিতর দিয়ে দিনগুলি লঘু হয়ে উঠলো।

দেশবন্ধু গান্ধিজীকে শ্রদ্ধা করতেন, তাঁর নীতির উপর যথেষ্ট বিশ্বাস করতেন, কিন্তু শুধু গঠনমূলক কাজের ভিতর দিয়েই যে ইংরাজদের করায়ত্ব করতে পারা যাবে এ বিশ্বাস তাঁর ছিল না, সংগ্রামকে সর্বাত্মক করার জন্য তিনি স্বরাজ্যদল প্রতিষ্ঠা করেন, এদের উদ্দেশ্য ছিল কাউন্সিলে ঢুকে গবর্মেন্টকে সব কাজে বিব্রত করা। গোঁড়া গান্ধীবাদীরা এই মতকে স্বীকার করতে রাজী হননি। এই নিয়ে ১৯২২ সালে গয়া কংগ্রেসে কর্মীদের মতামত নেওয়া হয়, তাতে গান্ধীবাদীরা পান ১৭৪০ ভোট আর দেশবন্ধুর দল পান ৯৮০ ভোট। দেশবন্ধু হেরে গেলেন কিন্তু পরাজয় মানলেন না, গান্ধিজী জেল থেকে বেরুবামাত্র, তিনি জুহুতে গিয়ে এই সম্পর্কে গান্ধিজীর সঙ্গে আলোচনা করলেন, দেশবন্ধু বললেন—আমি জানি কৌনসিলে ঢুকলেই স্বরাজ আসবে না, কিন্তু যা আমাদের অগ্রগতিকে ব্যাহত করছে তা ধ্বংস করতে হবে। স্বরাজ্যদল সেই ধ্বংসকার্য সম্পূর্ণ করবে!

গান্ধিজী অনুমতি দিলেন, স্বরাজ্যদল কাজ সুরু করলো। দেশবন্ধু জাতির কাছে আবেদন জানালেন—স্বরাজ্যদলের জন্য নিজ নামে আমি চল্লিশ হাজার টাকা ঋণ করেছি, আপনারা জানেন আজ আমি কপর্দকহীন। বারবার ঋণ করা যায় না, আর বিনা অর্থে জাতীয় সংগ্রামও পরিচালনা করা যায় না। কত অর্থ আপনারা থিয়েটার, বায়োস্কোপ ঘোড়দৌড়, সিগারেটে ব্যয় করেন, সেই পয়সা হচ্ছে ... কিছু বাঁচাতে পারেন, দান করলে আপনাদের কোন অসচ্ছলতা হবে না,......আমেরিকা চীন জাপান প্রভৃতি দেশে আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ প্রচারিত হচ্ছে, আমাদেরও সেইরূপ সংগঠন দরকার। কিন্তু সমস্ত কাজ চালাবার অর্থ কোথায়! আপনারা যদি সকলে মিলে সেই ভার বহন না করেন, আমি একা কি করে পারি! ব্যবসা না ছাড়লে আমিই সমস্ত অর্থ দিতে পারতাম, কিন্তু আজ যে আমি দরিদ্র অক্ষম কপর্দকহীন! আমি তো ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে আপনাদের সামনে উপস্থিত হইনি, আমি চাই ভারতের মুক্তির জন্য আপনাদের প্রদেয় শুল্ক। এ কাজ তো আমার একার নয়!

কিন্তু কাজ বেশীদূর এগিয়ে নিয়ে যাবার আগেই দেশবন্ধুকে কর্মক্ষেত্র থেকে বিদায় নিতে হোল।

দুর্জয়লিঙ্গ থেকে চলে আসার সাতদিন পরেই গান্ধিজীর কাছে 'তার' এলো—দেশবন্ধু নেই!

গান্ধিজী মুহ্যমান হয়ে পড়লেন, চোখের সামনে ভেসে উঠলো দেশবন্ধুর উজ্জল দুটি চোখ, বিশ্বাসদৃপ্ত কথা—মহাত্মাজী, আমার মন বলছে, আমরা বিরাট কিছু করতে পারবো—উই আর ইন্ ফর সাম্‌থিং বিগ্!

মনে পড়লো কদিন আগের হাস্তমুখর দেশবন্ধুকে। দু'জনে মুখোমুখি বসে আছেন, বাসন্তী দেবী এসে বললেন—'ছাগল দুধ দিচ্ছে না!'

গান্ধিজী বললেন—ছাগলের আত্মসম্মান জ্ঞান দেখে আমি খুসি হয়েছি!

দেশবন্ধু হেসে টিপ্পনী করলেন—ছাগলেরা আপনার সঙ্গে অসহযোগ করছে!

অন্তরে নতুন করে প্রতিধ্বনি তুললো বিদায় বেলার শেষ কথাগুলি (৭ই জুন '২৫), ইজিচেয়ারে শুয়ে দেশবন্ধু বলছেন—সকল জাতির মধ্যে সমভাব রাখতে হলে, এক অহিংসা ছাড়া উপায় নেই। এ জাতি অহিংসা ছাড়া কিছুতেই গড়ে উঠতে পারে না। আমার দৃঢ় ধারণা হয়েছে যে, শাঠ্যের বা মিথ্যার সাহায্যে কোন বড় কাজ হয় না, হতে পারে না।...গঙ্গার তীরে একটি আশ্রম করে থাকার ইচ্ছে আমার বরাবরই; দেখি কি হয়!...

দেশবন্ধু চলে গেলেন, তাঁর সেই আশ্রম করার ইচ্ছা অসম্পূর্ণ ই রয়ে গেল। শ্মশানে বহ্নিমান চিতার পানে তাকিয়ে গান্ধিজী স্তব্ধ হয়ে বসেছিলেন, দেশবন্ধুর এই কথাগুলিই তাঁর মনের মাঝে দোলা দিচ্ছিল হয়তো, হয়তো একনিষ্ঠ অন্তঃরঙ্গকে হারিয়ে মন উদ্বেল হয়ে উঠছিল, ব্যথায় বিপর্যস্ত হয়ে পড়ছিল। সর্বভূক্ লেলিহান বহ্নিশিখার পানে তাকিয়ে মহাকালের নির্মম বিলুপ্তিকে তিনি উপলব্ধি করতে চাই-ছিলেন হয়তো!

চিতাগ্নি নিভে গেল, গান্ধিজী বন্ধু-কৃত্য স্থির করে ফেলেছেন, দুর্বার কর্মক্ষমতা নিয়ে তিনি আত্মপ্রকাশ করলেন বাংলার জনসাধারণের কাছে, ভিক্ষার ঝুলি পেতে বললেন—টাকা দাও! দেশবন্ধুর ত্যাগকে স্মরণীয় করে রাখার—তাঁর স্মৃতিকে শ্রদ্ধা জানাবার দায়িত্ব যে আমাদের!

তিনমাসের মধ্যে গান্ধিজী দশ লাখ টাকা সংগ্রহ করলেন, সেই টাকা দিয়ে দেশবন্ধুর বাড়ীতে বিরাট চিত্তরঞ্জন সেবা-সদনের ভিত্তি স্থাপিত হোল।

গান্ধিজী বাংলাদেশ ছাড়লেন। কিন্তু এই বিরাট প্রদেশের ছ'কোটি অধিবাসীর কল্যাণ নিয়ন্ত্রণের ভার দিয়ে যাবেন কার উপর? দেশবন্ধুর আদর্শকে কে সাফল্যের পথে নিষ্ঠার সঙ্গে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে? স্বার্থপর নেতৃত্ববিলাসীদের ভীড় থেকে

একনিষ্ঠ ত্যাগী দেশ-হিত ব্রতী যতীন্দ্রমোহনকে চিনে নিতে গান্ধিজীর দেরী হোল না। চাঁদপুর ধর্মঘটের সময় দেশপ্রিয়ের কার্যক্রমের সঙ্গে তিনি পরিচিত হয়েছিলেন, তাঁকে তিনি মনোনয়ন করলেন প্রদেশের নেতৃত্বে—প্রাদেশিক কংগ্রেসের সভাপতি, কাউনসিলে স্বরাজ্যদলের নেতা, এবং কলিকাতার মেয়র। এই ত্রিমুখী কণ্টক-মুকুটের মর্যাদা দেশপ্রিয় আমরণ রক্ষা করেছিলেন।

স্বরাজ্যদলে মতভেদ দেখা দিল্। কেউ বা দলত্যাগ করলেন, কেউ বা হলেন লাট সাহেবের মন্ত্রী।

গান্ধিজী প্রত্যেককে ডেকে পাঠালেন আশ্রমে। সভা বসলো, কিন্তু মতের মিল হোল না।

গান্ধিজী কংগ্রেসকর্মীদের জন্য আঠারো দফা কর্মসূচী স্থির করলেন:

১। খদ্দর: গান্ধিজী বলেন—'খদ্দর আমার কাছে একতার, অর্থ-উপার্জ্জনের স্বাধীনতার ও সকল মানুষের সমান অধিকারের প্রতীক। 'চরকা কাটার মূল কথা হচ্ছে দেশকে স্বাবলম্বী করে তোলা। আমাদের দেশে বছরে ১০০০ কোটি গজ কাপড়ের দরকার, আগে এর সবটাই আমাদের দেশে তৈরী হোত, কিন্তু ইংরাজেরা এদেশে চরকা নষ্ট করে দেয়। তখন তাঁতীরা দিশী সুতা না পেয়ে বিলিতী সুতায় কাপড় বুনতে সুরু করে, কোটি কোটি টাকার সুতা বিলাত থেকে কেনা হয়। শেষে তাঁতীদের বুড়ো আঙুল কেটে দিয়ে তাঁত চালাবার ব্যবস্থাও নষ্ট করা হোল, বাধ্য হয়ে তখন এদেশের লোক বিলিতী কলে বোনা কাপড় কিনতে সুরু করলো। হিসাব নিয়ে দেখা গেল, ১০০০ কোটি গজ কাপড়ের মধ্যে আমাদের দেশে তৈরী হচ্ছে মাত্র ২৫০ কোটি গজ—মিলে ১৫০ কোটি গজ আর তাঁতে ১০০ কোটি গজ। বাকী ৭৫০ কোটি গজ কাপড় আমরা কিনছি বিলাত থেকে। এই কিনতে গিয়েই আমাদের গরীব দেশ বছরে বছরে আরো বেশী গরীব হয়ে পড়ছে। এই টাকাটা দেশে রাখার জন্য মহাত্মাজী দেশবাসীর হাতে চরকা তুলে দিলেন, বললেন—'প্রত্যেক লোকেরই দিনে অন্ততঃ আধ ঘণ্টা চরকা কাটা উচিত।' সকলকেই তিনি খদ্দর পরতে অনুরোধ করলেন। খদ্দরের দাম যদি মিলের কাপড়ের চেয়ে বেশীও হয়, তবু। এক টাকার মিলের কাপড় কিনলে টাকাটার বেশীর ভাগ মিলওয়ালারা পায়, কিন্তু এক টাকার খদ্দর কিনলে টাকাটার বেশীর ভাগ পায় চাষী, কাটুনী আর তাঁতী। তাতে গরীব লোকেরা কিছু পয়সা পায়, অনাহারের হাত থেকে বাঁচে। গান্ধিজী নিজেও দিনে

অন্ততঃ আধঘণ্টা চরকা কাটতেন। নিজের-হাতে-কাটা সুতায় কাপড় বুনে তিনি পরতেন।

২। বনিয়াদি শিক্ষা : আমাদের দেশের ছেলেমেয়েদের যেভাবে শিক্ষা দেওয়া হয়, তা বদলাতে হবে। তাদের হাতে কলমে এমনভাবে শিক্ষা দিতে হবে, যাতে বড় হলে তারা আত্মনির্ভরশীল হতে পারে। (এই নিয়ে গান্ধিজী হরিজন পত্রিকায় কয়েকটি প্রবন্ধ লেখেন ; তা নিয়ে এদেশের চিন্তাশীল শিক্ষাবিদদের মাঝে আলোচনা হয়। ১৯৩৭ সালের অক্টোবর মাসে ওয়ার্ধায় শিক্ষাবিদদের এক সম্মেলন ডেকে গান্ধিজী তাঁর পরিকল্পনার কথা তাঁদের কাছে পেশ করলেন। শিক্ষাবিদেরা সেই পরিকল্পনা কার্যকরী করার জন্য এক কমিটি করলেন—ডক্টর জাকির হোসেন হলেন তার সভাপতি, আহ্বায়ক হলেন আর্যনায়কম, আর আট জন সদস্য রইলেন—গুলাম সেইদাই, কে টি শা, বিনোবা ভাবে, কাকা কালেলকার, কিশোরলাল মশরুওয়ালা, জে সি কুমারাপ্পা, শ্রীকৃষ্ণ দাস জাজু ও শ্রীমতী আশা দেবী। এঁরা দু' মাস আলোচনা করে শিক্ষা পদ্ধতির খুঁটিনাটি সব ব্যাপার পরিষ্কার করে খসড়া তৈরী করে ফেললেন। গান্ধিজী সেই খসড়া দেখে খুসি হলেন, বললেন—এই শিক্ষাপদ্ধতি গাঁয়ের ছেলে-মেয়েদের মাঝে একটা বিপ্লব এনে দেবে। এ শিক্ষাধারা পশ্চিম থেকে ধার করা নয়।…ভারতের কয়েকজন শ্রেষ্ঠ শিক্ষাবিদ অনন্যমনা হয়ে এই শিক্ষাপদ্ধতি তৈরী করেছেন। সাত বছর মাত্র ছাত্রদের ইস্কুলে রাখা হবে, তার মধ্যে তারা পৃথিবীর ইতিহাসের সঙ্গে পরিচিত হবে, মাতৃভাষা রীতিমত লিখতে, পড়তে ও বুঝতে শিখবে, ইংরাজী শেখার বালাই নেই, গাঁয়ের ছেলেমেয়েরা মাতৃভাষা মারফৎ লেখাপড়া শিখবে, এবং তারই সঙ্গে দেশের সমাজ ও রাজনীতি আর নিজের পরিবেশের সঙ্গে পরিচিত হবে। উদ্ভিদতত্ত্ব ও জীবতত্ত্ব সম্পর্কে মোটামুটি জ্ঞান থাকবে। পাঠ্য পুস্তক শেষ করেই চাকরী খুঁজতে না বেরোয় সেজন্য হাতের কাজ শিখতে হবে প্রত্যেককেই—সুতাকাটা, তাঁত বোনা, ছুতোরের কাজ, চাষের কাজ, বাগান ও ফলের আবাদ, চামড়ার কাজ, কাগজ তৈরী করা প্রভৃতি…গাছতলার বসে পড়ানো চলবে। ইস্কুলের কোন খরচ থাকবে না, মাষ্টার মশাইও হবেন গাঁয়ের লোক, ছেলেরা হাতের কাজ করে যে সব জিনিষ তৈরী করবে তাই বাজারে বেচে যা পাওয়া যাবে তা থেকেই মাষ্টার মশায়ের মাইনে দেওয়া হবে, গবর্মেন্টের পানে টাকার জন্য তাকিয়ে থাকতে হবে না। পড়তে পড়তে তারা রোজগার করবে। সাত বছরে এক একটি ছাত্র উপার্জন করবে ৬০৮/১০। এক একজন শিক্ষকের কাছে ত্রিশ জনের বেশী ছাত্রছাত্রী থাকবে না। ত্রিশজন ছাত্র সাত বছরে উপায় করবে—৬০৮/১০ × ৩০ = ১৮২৫৲।

মাষ্টার মশাইয়ের মাইনে হবে মাসিক ২৫৲ বছরে ৩০০৲ সাত বছরে ২১০০৲ টাকা।

আয় ১৮২৫৲ টাকা, ব্যয় ২১০০৲, বাকী ২৭৫৲ টাকা বেশী খরচ পড়বে। সাত বছরে ত্রিশজন ছেলেকে লেখা পড়া শেখাতে ২৭৫৲ টাকা খরচ করা এমন বেশী কিছু নয়। দিনে সাড়ে পাঁচ ঘণ্টা ইস্কুল বসবে তার মধ্যে তিন ঘণ্টা কুড়ি মিনিট শেখানো হবে হাতের কাজ। ইস্কুলের রুটিন হবে:

| | |
|---|---|
| হাতের কাজ | ৩ ঘণ্টা ২০ মিনিট |
| গান বাজনা, ছবি আঁকা ও অঙ্ক | ৪০ মিনিট |
| মাতৃভাষা ... ... | ৪০ মিনিট |
| সমাজ বিজ্ঞান ও সাধারণ জ্ঞান ... | ৩০ মিনিট |
| ব্যায়াম ... ... | ১০ মিনিট |
| বিরাম ... ... | ১০ মিনিট |
| ইস্কুল বসবে মোট | ৫ ঘণ্টা ৩০ মিনিট |

হাতের কাজ বলতে ইস্কুলের ছাত্রছাত্রীদের চরকা কাটার দিকেই গান্ধিজী বেশী আগ্রহ দেখান।

পরীক্ষার ব্যাপারটাও ভালো, সাত বছর বাদে এক একটি ছাত্র দিনে ৮ ঘণ্টা করে ছ'মাস কাজ করে, দৈনিক চার আনা করে রোজগার দেখাতে পারবে সে-ই পাস, তার সঙ্গে অবশ্য লেখাপড়ার কথাটাও দেখতে হবে।

ওয়ার্ধায় বসে এই পরিকল্পনা করা হয় বলে এর নাম 'ওয়ার্ধা শিক্ষা পদ্ধতি'। হরিপুরায় কংগ্রেসের বৈঠকে এই পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা হয়। কংগ্রেসে প্রস্তাব গৃহীত হয়:

(১) বিনা ব্যয়ে জাতির মাঝে ব্যাপকভাবে শিক্ষা প্রচার করতে হবে।

(২) মাতৃভাষাই হবে শিক্ষার বাহন।

(৩) পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে ছাত্রছাত্রীদের হাতের কাজ শেখানো হবে, যে বিদ্যা অর্থকরী হবে।

১৯৩৯ সালে কংগ্রেসী মন্ত্রীরা ব্যাপকভাবে এদিকে আন্দোলন শুরু করেন, আটটি প্রদেশে এই পদ্ধতির ইস্কুল খোলা হয়। সব চেয়ে বেশী শিক্ষা কেন্দ্র খোলা হয়, বিহারে —১৪,২৪০টী। তারপরেই মাদ্রাজে ৬৬০টী। কিন্তু কাজ ভালো হয় যুক্ত প্রদেশে সেখানে ২,৩০,০০০ অশিক্ষিতকে লেখাপড়া শেখানো হয়।

এই শিক্ষালয় গুলির উদ্দেশ্য সম্পর্কে গান্ধিজী বলেন—"গাঁয়ের ছেলেরা গাঁয়ের

ইস্কুলে গাঁয়ের শিক্ষকদের কাছেই শিক্ষা লাভ করবে, বাইরের কোন কৃত্রিম বন্ধন তাদের স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশের প্রতিবন্ধক হবে না।" )

৩। বয়স্কদের শিক্ষা : আমাদের দেশে একশো জনের মধ্যে দশজন মাত্র কোন রকমে নাম সই করতে পারে। বয়স্কেরা অধিকাংশই অশিক্ষিত। তাদেরকে শেখাতে হবে লেখাপড়া, জানাতে হবে আমাদের কি ছিল, বিদেশীরা আমাদের ভাত কাপড় সুখশান্তি কিভাবে লুটে নিচ্ছে, কিভাবে আবার আমরা আমাদের সমৃদ্ধি ফিরিয়ে আনতে পারি।

৪। কুটীর শিল্প : গাঁয়ের ঘরে ঘরে ছোট ছোট শিল্প গড়ে তুলতে হবে। গাঁয়ে সাবান তৈরী হবে, কাগজ তৈরী হবে, দেশলাই তৈরী হবে, চামড়া পাকানো (ট্যানিং) হবে, ঘানিতে তেল তৈরী হবে, ঘি তৈরী হবে, গম ভাঙতে হবে যাঁতায়, ধান ভাঙতে হবে ঢেঁকীতে। সব কিছুর জন্য যেন শহরের পানে তাকিয়ে থাকতে না হয়। গাঁয়ের লোকেরা নিজ নিজ গাঁয়ের তৈরী জিনিষই যথাসম্ভব কিনবে। প্রত্যেকটি গ্রাম স্বাবলম্বী হয়ে উঠবে।

৫। ছাত্র : ছাত্রেরা সুতা কাটবে, খদ্দর পরবে, দলাদলি করবে না, দেশের উন্নতি সম্পর্কে পড়াশুনা করবে, রোগীর সেবা করবে, অশিক্ষিতদের লেখাপড়া শেখাবে, ছোট জাতিকে ভাই বলে মনে করবে, অন্য ধর্মের লোককে বন্ধু বলে ভাববে, রাষ্ট্র-ভাষা হিসাবে হিন্দী শিখবে, ছাত্রীদের বোনের মত দেখবে, সময় ঠিক রেখে চলতে শিখবে।

৬। জাতি ও ধর্ম : হিন্দু মুসলমান খৃস্টান পার্শী—সব মিলেমিশে থাকতে হবে।

৭। অস্পৃশ্যতা : ছোট জাতের সঙ্গে মিশতে হবে, তাদের উন্নতি করতে হবে, তাদের ভাই বলে নিজেদের মাঝে ডেকে নিতে হবে।

৮। নেশা : মদ, তাড়ি, আফিং, গাঁজা প্রভৃতি নেশা দেশ থেকে একেবারে বিদায় করতে হবে।

৯। গ্রাম : ভারতে সাত লাখ গ্রাম আছে, প্রত্যেকটি গ্রামকে স্বাস্থ্যকর করে তুলতে হবে।

১০। স্বাস্থ্য : সৎ চিন্তা, উপযুক্ত পরিশ্রম, মুক্ত বায়ু সেবন, ঋজু হয়ে দাঁড়ানো, সোজা হয়ে বসা, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা প্রভৃতির দিকে বিশেষ লক্ষ্য রেখে স্বাস্থ্যের উন্নতি করতে হবে।

১১। নারী : মেয়েদের শিক্ষা দিতে হবে, পুরুষের সঙ্গে সমান অধিকার দিতে হবে।

১২। কিষাণ: এদেশে ত্রিশ-বত্রিশ কোটি মানুষ চাষ আবাদ করে, তাঁদের ঠিকমত শিক্ষিত করে তুলতে হবে, তাদের স্বাধীনতার কথাটি ঠিকমত বুঝিয়ে দিতে হবে।

১৩। মজদুর: যারা কারখানায় কাজ করে তাদের সঙ্ঘবদ্ধ করতে হবে, সঙ্ঘ তাদের জন্য পাঠশালা খুলবে, হাসপাতাল করবে, স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থা করবে এবং প্রয়োজন হলে মালিকদের বিরুদ্ধে লড়বে।

১৪। আদিবাসী: এদেশে কোল-ভীল গোণ্ড সাঁওতাল প্রভৃতি পাহাড়ী জাতির মানুষ আছে প্রায় দু'কোটি, তাদের উপযুক্তভাবে শিক্ষিত করে তুলতে হবে।

১৫। কুষ্ঠ ও যক্ষ্মা: এদেশে লাখ লাখ লোক কুষ্ঠ ও যক্ষ্মায় ভোগে, তাদের নিরাময় করার ব্যবস্থা করতে হবে।

১৬। টাকা পয়সা: সকলের টাকা পয়সা সমান হওয়া দরকার। অহিংস কার্য-ধারার ভিতর দিয়ে বড়লোকদের সকলের সাথে সমান করে দেবার চেষ্টা করতে হবে, ধনীদের মন বদলে দেবার চেষ্টা করতে হবে।

১৭। রাষ্ট্রভাষা: ভারতের সব লোক যাতে সব লোকের সঙ্গে কথা বলতে পারে সেজন্য একটি রাষ্ট্রভাষার দরকার, হিন্দী হবে সেই রাষ্ট্রভাষা। এই ভাষা শেখবার ও সকলকে শেখাবার চেষ্টা করতে হবে।

১৮। মাতৃভাষা: প্রত্যেকেই নিজের মাতৃভাষা ভালো করে শিখবে। মাতৃ-ভাষার উন্নতি করতে হবে, মাতৃভাষার মধ্যমে শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।

গান্ধিজী বলেন এই আঠারো দফা নীতি দেশের সর্বত্র কার্যকরী করতে পারলেই সত্যিকারের স্বাধীনতা আমাদের হাতে এসে পড়বে।

গান্ধিজী ছিলেন সবরমতী আশ্রমে।

তাঁর দীর্ঘদিন অবর্তমানে আশ্রমিকদের মধ্যে কিছু কিছু শৈথিল্য দেখা দিয়েছিল, গান্ধিজীর কাছে তা ধরা পড়তে দেরী হোল না, কিন্তু দোষের জন্য অপরকে বকাবকি করা গান্ধিজীর নীতিবিরুদ্ধ। গান্ধিজী বিশ্বাস করতেন যারা তাঁর আশেপাশে থেকেও সত্য ও শৃঙ্খলা মেনে চলতে পারে না, তাদের দুর্বলতার জন্য তিনিই দায়ী, কারণ প্রীতি ও ব্যক্তিত্ব দিয়ে তিনি তাদের মনে প্রভাব বিস্তার করতে পারেন নি। নিজের এই অক্ষমতাকে জয় করার জন্য প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজন, আত্মশুদ্ধি হলে পরিবেশও শুদ্ধ হবে।

আশ্রমিকদের চিত্ত শুদ্ধির জন্য গান্ধিজী সাতদিন অনশন করলেন।

নাগপুর কংগ্রেসে গান্ধিজী মাত্র পাঁচ মিনিট বক্তৃতা করলেন, তিনি বলেন—জনগণের মধ্যে বিপ্লবের উৎসাহ যখনই দেখবো, তখনই আমি আইন অমান্য আন্দোলন সুরু করবো !

কংগ্রেসের অধিবেশন দেখতে এসেছিলেন মার্কিন পাদরী রেভারেণ্ড হোমস্‌, মাথায় ছিল খদ্দরের গান্ধী টুপী, বক্তৃতামঞ্চে উঠে তিনি বললেন—গান্ধিজীকে আমি কোন বিশেষ দেশের বাসিন্দা বলে মানতে রাজী নই, গান্ধিজীকে আমি বিশ্বের মানবতার প্রতিভূ বলে মনে করি ! পাশ্চাত্য সভ্যতা আজ ভুলপথে অগ্রসর হচ্ছে, অর্থ ও শক্তির সাধনায় আজ আমরা কলুষিত। বিশ্বের সম্পদ লুঠ করার জন্য যুদ্ধের পর যুদ্ধ ঘনিয়ে আসছে, এইভাবেই হয়তো সভ্যতা একদিন ধ্বংস পাবে। এমন দিনে গান্ধিজী এক নতুন পথের নির্দেশ দিয়েছেন। প্রীতি ও সত্যের যে ইঙ্গিত তিনি দিচ্ছেন, জগতের কল্যাণের জন্য তা অনুসরণ করা আমাদের অবশ্যকর্তব্য !

বৃহত্তর সংগ্রামের উদ্দেশ্যে জাতিকে সংঘঠন করার জন্য গান্ধিজী প্রত্যক্ষ রাজনীতি ছেড়ে সংগঠনের কাজে মন দিলেন।

কিন্তু শান্তিপূর্ণ পরিবেশের মধ্যে কাজ করার মত অবসর তিনি পেলেন না, ভারতের অনেকস্থানে এলোমেলোভাবে হিন্দু-মুসলমানে দাঙ্গা হতে লাগলো। মনের দুঃখে কলিকাতার শ্রদ্ধানন্দ পার্কের এক সভায় তিনি বলেছিলেন—দেশের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য হিন্দু-মুসলম্মানের মধ্যে খুনোখুনি করার প্রয়োজন হয় তাহলে আমরা যেন তা মানুষের মতই করি, সেজন্য যেন কারুর কাছে কোন সহানুভূতির আশা না রাখি !

কিন্তু দাঙ্গা যারা করে তাদের কাছ থেকে মনুষ্যত্ব আশা করা যায় না, তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ দেখা যায় স্বামী শ্রদ্ধানন্দ ও গণেশশঙ্কর বিদ্যার্থীর হত্যা ব্যাপার।

স্বামী শ্রদ্ধানন্দ ছিলেন, শুদ্ধি-আন্দোলনের প্রবর্তক। রোগে তিনি শয্যাশায়ী ছিলেন, এক যুবক এসে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চাইল, পরক্ষণেই অনুমতির অপেক্ষা না রেখেই তাঁর সেবককে গুলি করে, রোগীর ঘরে গিয়ে ঢুকলো, এবং রুগ্ন স্বামিজীকে গুলি করে হত্যা করলো। হত্যাকারী এই মুসলমান যুবকটি সম্পর্কে গৌহাটি কংগ্রেসে গান্ধিজী বলেন—তাকে আমি খুনী বলবো না, খুনী হচ্ছে তারা যারা পিছনে থেকে এদের মত লোককে উত্তেজিত করে !

কিন্তু তবু এই ধরণের কাপুরুষতা বন্ধ হয়নি। দু'বছর বাদে কানপুরের দাঙ্গা থামাতে গিয়ে গণেশশঙ্কর বিদ্যার্থী নিখোঁজ হন। ইনি ছিলেন যুক্ত প্রদেশের কংগ্রেস সভাপতি। দাঙ্গায় বহু পরিবারকে তিনি রক্ষা করেন, সেইজন্যই দাঙ্গাকারীরা

এ'কে শুধু খুন করে। পাঁচদিন পরে যখন এঁর মৃতদেহ উদ্ধার হয় তখন আর চেনবার উপায় নেই, হাতের উল্কি ও পকেটের কাগজপত্র দেখে তবে তাঁকে চেনা যায়।

এই সব ঘটনার বীভৎসতা সমগ্র ভারতকে আচ্ছন্ন করে ফেললো, কিন্তু তখনও পাকিস্তানের 'প্রত্যক্ষ সংগ্রামের' রূপ দেশবাসীর কাছে অপ্রত্যক্ষ ছিল।

১৯২৬ সালে চীনারা গান্ধিজীকে আমন্ত্রণ করলো, মহাচীন ভ্রমণের জন্য।

গান্ধিজী বললেন—যাবার আমার একান্ত ইচ্ছা, কিন্তু সুবিধা করে উঠতে পারছি না।

গান্ধিজী সিংহল যাবার আমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন।

সিংহলীরা বৌদ্ধ। গান্ধিজীও অহিংসার সত্যদ্রষ্টা মহাপুরুষ। সিংহলীরা কয়েক বছর ধরে চেষ্টা করছিল মহাত্মাজীকে তাদের দেশে নিয়ে যাবার জন্য। কিন্তু কাজের চাপে বাপুজী অবসর পাচ্ছিলেন না।

১৯২৭ সালে গান্ধিজী চাঁদার খাতা নিয়ে বেরুলেন। নিখিল ভারত চরকা সঙ্ঘের জন্য টাকার দরকার। সিংহলীরা বললো—আসুন আমরাও টাকা দোব!

নভেম্বর মাসে গান্ধিজী সিংহলে গেলেন। সঙ্গে ছিলেন কস্তুরবা, মহাদেব দেশাই ও কালেলকার।

সিংহলের লাটসাহেব ও কলোম্বোর ম্যাজিষ্ট্রেট থেকে সুরু করে চা বাগানের সামান্য মজুর অবধি মহাত্মাজীকে অভ্যর্থনা করার জন্য চেষ্টার ত্রুটি রাখেনি। খাদির জন্য যে ভিক্ষার ঝুলি তিনি পেতেছিলেন, সিংহলের পঁয়তাল্লিশ লাখ অধিবাসী সে জন্য সানন্দে ছিয়াশী হাজার টাকা চাঁদা দেন। কে কত বেশী টাকা দিতে পারে তা নিয়ে সেখানে যেন একটা রীতিমত প্রতিযোগিতা চলে। কাণ্ডিতে জন কয়েক বড়-লোক দেয় চার হাজার টাকা; জাফ্‌নার এক কলেজের মেয়েরা দেয় এক হাজার এক্‌শো এগারো টাকা, কুড়িজন সাধারণ নাপিত দেয় চারশো টাকা, আবার বাদুল্লার একজন মজুর সামান্য আটটি টাকা মাত্র দেয়।...

মহাত্মাজী বলেন—বড়লোকের কাছ থেকে আমি টাকা নিই, আবার গরীবের কাছ থেকে পয়সা নিতে আমার আরো বেশী আনন্দ হয়। একজন গরীব সামান্য যে তামার পয়সাটি বা যে আনিটি আমাকে দেয়, আমার কাছে একজন বড়লোকের দেওয়া একখানি দশ টাকার নোটের মতই তার দাম।

সিংহল প্রকৃতির লীলাভূমি। কলোম্বোর সহর ছাড়িয়ে মোটার যখন পল্লীর পথ

ধরে, চারিপাশের সৌন্দর্যে চোখ জুড়িয়ে যায়। দু'পাশে রবার আর দারুচিনির বন, পিছনে পাহাড়ের গায় ছড়িয়ে পড়েছে মস্ত বিস্তারী চা-বাগান, পাহাড়ের পর পাহাড়ের সারি গিয়ে মিশেছে মেঘের গায়ে দিগন্তে। ঊষার স্বপ্নালোক যখন পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে আসে দেবদারু বনের মাথায়, রঙমহলের দুয়ার খোলে একটির পর একটি। আবার যখন সূর্যাস্তের শেষ রশ্মিরেখা আকাশের গায় বর্ণচ্ছটার বৈচিত্র্য ফুটিয়ে তোলে, সোণার লঙ্কা অপরূপ স্বপ্নপুরীতে রূপান্তরিত হয়। গান্ধিজী মুগ্ধ হয়ে যান, নিজেকে হারিয়ে ফেলেন, এই মাটীর ধরণীর উপর আবার নতুন করে আকর্ষণ জাগে। তিনি দেখেন আর ভাবেন, একটা প্রশ্নই শুধু বার বার তাঁর মনে জাগে—প্রকৃতিদেবী এই যে সৌন্দর্যের মন্দির গড়ে রেখেছেন, এর মাঝেই ঈশ্বরের ঐশ্বর্য মানুষ খুঁজে পেতে পারে, তবু কেন ইট, কাঠ, পাথরের নকল মন্দির গড়ে মানুষ তারই মাঝে ভগবানকে খুঁজে বেড়ায়।

কিন্তু এমন সুন্দর দেশেও মানুষের এতটুকু স্বস্তি নেই। এখানেও সাহেবরা বড় বড় চা-বাগান, রবারের কারখানা আর গ্রাফাইটের খনির মালিক হয়ে বসে আছে। লাখ লাখ মাদ্রাজী আর সিংহলী মজুর দিনরাত সেখানে দেহপাত করে দৈনিক আট দশ পয়সা পায়। তাতে কোন রকমে আধ-পেটা খাওয়া চলে! শীতের দিনে একটা জামা কেনার পয়সাও থাকে না। অভাব অনটনকে ভোলার জন্য তারা মদ খেতে সুরু করে। দেহের উপর এতো অত্যাচার সয় না, খাটতে খাটতে ফুসফুসটা ক্রমশঃ দুর্বল হয়ে যায়, শীর্ণ দেহটা সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে। বুকের পাঁজরগুলো এক একটি করে গোনা যায়। তারপর একদিন স্বচ্ছন্দে তারা মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে।

মদ খাওয়াটা সিংহলে অত্যন্ত ব্যাপক। ইংরাজরা সিংহলীদের এই অভ্যাসটা ভালোভাবেই আয়ত্ত করিয়েছে। যার ফলে সিংহলের বারো কোটি টাকা রাজস্বের মধ্যে এক কোটির উপর আদায় হয় মদ ও তাড়ি বিক্রীর লাভ থেকে। তার উপর বিলাতী মদের দাম হিসাবে কয়েক কোটি টাকা যায় বিলাতে।

হট্টনে মজুরদের এক সভায় মহাত্মাজীর চারিপাশে যে সব মজুর এসে দাঁড়ালো তাদের সকলেরই মুখে মদের গন্ধ। মহাত্মাজীর বক্তৃতা শেষ হতে না হতেই একজন নেশার ঝোঁকে চীৎকার জুড়ে দিল—গান্ধিজী কি জয়! গান্ধিজী কি জয়!!

মাতাল চীৎকার করে আর নাচে।

মহাত্মাজী মনে বড় আঘাত পেলেন। তার পর কয়েকটি সভায় সিংহলীদের কাছে

তিনি নিবেদন করলেন—আইন করে মদ খাওয়া বন্ধ করে দেওয়াই মানুষের পবিত্র কর্তব্য।

এই সম্পর্কে ইস্কুল কলেজের ছেলেদেরও বিড়ি সিগারেট খেতে তিনি নিষেধ করেন। গান্ধিজী বলেন—ধূমপানে শ্বাস দুর্গন্ধ হয়…বুদ্ধি ধোঁয়াটে হয়…ডাক্তারেরা বলেন তামাক খাওয়ার অভ্যাস থেকেই অনেক সময় ক্যানসার নামক রোগ জন্মায়। বিড়ি সিগারেট খাওয়া কেন? ওটা তো কিছু খাদ্য নয়। বিড়ি সিগারেট খাওয়া বন্ধ কর। ভারতবর্ষে লাখ লাখ লোক দরিদ্র, নিরন্ন। বিড়ি সিগারেট বন্ধ করায় যে পয়সা বাঁচে তা তাদের জন্য আমার কাছে পাঠিয়ে দিও।

নানা সঙ্ঘ নানাভাবে গান্ধিজীকে অভ্যর্থনা জানায়। মাতারায় মোটার ড্রাইভারদের এক ইউনিয়ন শ'খানেক মোটার গাড়ী সাজিয়ে মহাত্মাজীকে নিয়ে এক শোভাযাত্রা বের করে ফেললো।

সুদৃশ্য হয়েছিল বিদ্যোদয় কলেজের সভা। এখানে পাঁচশত গৈরিকধারী বৌদ্ধ ভিক্ষু গান্ধিজীকে ঘিরে ঐক্যকণ্ঠে আশীষবাণী উচ্চারণ করেন। মহাত্মাজীকে তাঁরা বৌদ্ধ ধর্মের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিভূ বলে মনে করেন।

সিংহলের জনসাধারণ গান্ধিজীকে সাক্ষাৎ বুদ্ধ অবতার বলে ধরে নিয়েছিল। যে পথে গান্ধিজীর মোটার যেতো সে পথের দু'পাশে জনতাকে নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন হয়ে উঠতো। সবাই একবার দর্শন পেতে চায়। অনেক সময় এই জনতা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য পথে দাঁড়িয়ে-থাকার টিকিট বিতরণ করা হোত। যার টিকিট থাকতো না তাকে দাঁড়াতে দেওয়া হোত না।

এদের মন জানার জন্য মহাদেব দেশাই সভার এক মজুরকে ডেকে একদিন জিজ্ঞাসা করলেন—কেন এখানে এসেছ?

মজুরটির পাশে এক মজুর-রমণী দাঁড়িয়েছিল, সে ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলে উঠলো—তুমিই বা এখানে এসেছ কেন বাপু?

আরেকজন মজুর বললো—জানেন না আপনি? আমরা আমাদের দেবতাকে দেখতে এসেছি।

—তোমাদের দেবতা? তিনি কে?

—গান্ধিজী গো, গান্ধিজী!

—তিনি যে চাঁদা চাইছেন সেই চাঁদা দিয়েছ?

—নিশ্চয়ই! একদিনের মজুরী দশ আনা দিয়েছি।

—অতো টাকা নিয়ে গান্ধিজী কি করবেন বলত ?

—তা তিনি যাই করুন—কোন ভালো কাজই করবেন নিশ্চয়।

মজুরটি তাড়াতাড়ি ভীড় ঠেলে এগিয়ে গেল মহাত্মাজীকে একবার ভালো করে দেখার জন্য।

শুধু অশিক্ষিত মজুর নয়, রীতিমত শিক্ষিতদের মনেও এই বিশ্বাস প্রভাব বিস্তার করেছিল। অনেকে মনে করেন মহাত্মাজী ধর্মাশোকের পুত্র মহেন্দ্রেরই হয় তো নবজন্ম। তিরানগামার বৌদ্ধ স্ত্রী-সভা তাঁকে যে মানপত্র দেন, তার প্রথমেই লেখা ছিল—অনেক শতাব্দীর পর আবার আপনার পবিত্র চরণ এই দেশের মাটি স্পর্শ করেছে···

পথের মাঝে কতবার নরনারী ও যুবকের দল মোটার থামিয়ে তাঁকে সভার মাঝে টেনে নিয়ে গেছে।

স্বাক্ষর-শিকারীদের ঔৎসুক্যও কম ছিল না। কত খাতা যে সামনে এসে পড়তো। সব খাতাতেই গান্ধিজী সই করতেন। তবে খাতার মালিককে তার আগে একটি প্রতিজ্ঞা করতে হোত—আমি সর্বদা খদ্দর পরবো।

মহাত্মাজীর সঙ্গে খদ্দরের অনেক কাপড়-চোপড় থাকতো। কৌতূহলীদের কাছে সেগুলি হোত প্রদর্শনী, প্রয়োজন মত আবার বিক্রীও করা হোত। এই খদ্দরের পরিচয় দিতে গিয়ে সিংহলী তামিল সঙ্ঘের সভায় মহাত্মা বলেন—এই খাদি তৈরী হয় নিখিল ভারত চরকা সঙ্ঘে। আমি এই সঙ্ঘের সভাপতি। একজন কোটিপতি এর ধনাধ্যক্ষ, তাঁর নাম যমুনালাল বাজাজ। এর সম্পাদক শঙ্করলাল ব্যাঙ্কার। এই এই সঙ্ঘের ভিতর দিয়ে ভারতের নানাস্থানে পনেরো শো গ্রামে কাজ হচ্ছে। এই সমস্ত গ্রামে অন্ততঃ পঞ্চাশ হাজার কাটুনি চরকা কাটার কাজ পায়, তাদের মধ্যে হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান ও অন্যান্য জাতি ধর্মের লোকও আছে। আগে বছরে তিনমাস তাদের কোন কাজই ছিল না, এখন চরকা কেটে তারা দৈনিক এক আনা দু' আনা রোজগার করে। এই কাটুনি ছাড়াও কয়েক হাজার তাঁতি আছে যারা কাপড় বোনে, ধোপা আছে যারা ধোয়, রংরেজ ও ছাপাইকারও আছে যারা খাদির উপর রং ফলায়।··এই কাজের হিসাব-পত্তর রাখার জন্য হাজারখানেক কেরানী আছে তারা মাসিক কুড়ি থেকে চল্লিশ টাকা মাহিনা পায়। দু'চার জন এমনও আছেন যাঁরা পঁচাত্তর টাকা থেকে আড়াইশো টাকা পর্যন্ত উপায় করেন। তা ছাড়া একদল স্বেচ্ছা-সেবক আছেন, যারা বিনা স্বার্থে শুধু মানুষের সেবা করার জন্যই কাজ করে যান।·· গত বছর আমরা কুড়ি লাখ টাকার খাদি তৈরী করে বিক্রী করেছি। এবং আমি আশা

রাখি টাকা আর কর্মী পেলে ভারতের সাতলাখ গ্রামে আমার এই সেবার প্রচেষ্টা আমি ছড়িয়ে দিতে পারবো। আমি এইটিকেই আমার দেশের সব চেয়ে বড় সমবায় প্রতিষ্ঠান বলে মনে করি।…

বাদুল্লায় এক জনসভায় প্রশ্ন উঠে—চরকার অন্তর্নিহিত বাণী কি?

মহাত্মাজী বলেন—নিরন্ন নর-নারী, যাদের কোন কাজ নেই, চরকা তাদের বলে: আমাকে চালাও, অন্ততঃ এক মুঠো খাবার জুটবে। এ হোল চরকার অর্থনৈতিক বাণী। চরকা কারুর মুখের গ্রাস কেড়ে নেয় না, সকলকেই সৎভাবে পরিশ্রম করতে শেখায়, আত্মনির্ভরতা শেখায়,—এই হোল চরকার শিক্ষা ও সাধনা। …চরকা সরল জীবন যাত্রার প্রতীক, যে যন্ত্রযুগের সাধনা আজ জগৎবাসীকে অভিশপ্ত করেছে, মানুষকে ঈশ্বরের কাছ থেকে বহুদূরে টেনে এনেছে, চরকা তার বিরুদ্ধে অভিযান করেছে—নতুন শক্তি সৃষ্টি করছে।…

তিন সপ্তাহ মহাত্মাজী সিংহলে ছিলেন। কত সভায় যে তাঁকে যেতে হয়েছিল তার হিসাব নেই।

কত মানুষ ক্রোশের পর ক্রোশ হেঁটে একবার তাঁকে চোখের দেখা দেখতে এসেছে।

এই কটি দিন যাঁরা মহাত্মাজীর সঙ্গে সঙ্গে ফিরেছিলেন, বিদায়ের বেলা তাঁরা অনেকেই চোখের জল রাখতে পারেন নি। মহাত্মাজীকে জাহাজে তুলে দেবার সময় চারিপাশ থেকে শুধু সাড়া উঠেছিল—আপনি আবার একবার আসবেন, ধীরে সুস্থে নিশ্চিন্ত মনে দিন কতক এখানে কাটিয়ে যাবেন!

কিন্তু নিশ্চিন্ত হবার মত অবসর বিধাতা গান্ধিজীর অদৃষ্টে লেখেননি।

মাংগালোরে গান্ধিজী বক্তৃতা করছেন, দিল্লী থেকে বড়লাটের চিঠি এসে পড়লো—৫ই নভেম্বর আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাই!

গান্ধিজী সেইদিনই যাত্রা করলেন। মাংগালোর থেকে হাজার মাইল পথ অতিক্রম করে দিল্লীতে বড়লাটের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। বড়লাট লর্ড আরুইন গান্ধিজীর হাতে একখানি চিঠি দিলেন—বিলাত থেকে চিঠিখানি এসেছে। চিঠি নয়, একটি ঘোষণাপত্র। ভারতবাসীকে কতখানি স্বাধীনতা দেওয়া যায় তাই বিচার করার জন্য সেখান থেকে একদল সাহেবকে পাঠানো হচ্ছে স্যার জন সাইমনের সঙ্গে।

সেইখানেই ঘোষণাপত্রটি পড়ে গান্ধিজী জিজ্ঞাসা করলেন—এই জন্যই কি আমাকে ডেকেছিলেন?

আরুইন বললেন—হ্যাঁ।

এই একখানি চিঠি দেবার জন্য হাজার মাইল দূর থেকে একজন মানুষকে ডেকে আনার কোনও প্রয়োজন হয় না, একখানি খামে ভরে পাঠিয়ে দিলেই চলতো। কিন্তু গান্ধিজী সেজন্য কোন অসন্তোষ প্রকাশ করলেন না, বড়লাটের মুখের পানে তাকিয়েই তিনি বুঝতে পারলেন যে বিলাত থেকে এই রকম নির্দেশ ছিল।

সাইমন কমিশন এলো। সারা ভারত কমিশনকে বয়কট করলো। লালা লাজপৎ, পণ্ডিত জহরলাল প্রভৃতি নেতারা পুলিশের হাতে মার খেলেন। পণ্ডিত জহরলাল বললেন—স্বাধীনতাই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য।

গান্ধিজী 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' পত্রিকায় এই সম্পর্কে লিখলেন—কংগ্রেস বছরের পর বছর নানা প্রস্তাব গ্রহণ করে কিন্তু সে-সব প্রস্তাব কার্যকরী করার সামর্থ্য কংগ্রেসের নেই। এতে কংগ্রেস অবনমিত হচ্ছে!

তথাপি কংগ্রেসের বার্ষিক সভায় জহরলাল ও সুভাষচন্দ্র স্বাধীনতার প্রস্তাবই তুললেন। গান্ধিজীকেই প্রস্তাবটির খসড়া করতে হোল: 'বৃটিশ গবর্ণমেণ্টকে একবছর সময় দেওয়া হোল, ১৯২৯য়ের ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে যদি ভারতভূমিকে স্বায়ত্তশাসন না দেওয়া হয় তাহলে কংগ্রেসীরা ভারতব্যাপী আন্দোলন স্থুরু করবে।'

কিন্তু এ সম্পর্কে জহরলাল ও সুভাষচন্দ্রের দলকে তিনি সতর্ক করে দিলেন—স্বাধীনতার ফাঁকা কথা বললে চলবে না। কথাটিকে কার্যকরী করার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। স্বাধীনতা কঠিন বস্তু, শুধু কথার ফাঁকি নয়!

সেইজন্যই ক'দিন পরে য়ুরোপ থেকে যখন নিমন্ত্রণ এলো দেশ ভ্রমণের জন্য, গান্ধিজী তখন উত্তর দিলেন—অন্তর থেকে কোন সাড়া পাচ্ছি না, আগামী সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হচ্ছি, এখন দেশ ছেড়ে চলে গেলে দেশবাসীর কাছে অপরাধী হতে হবে।

বাপুজী আবার ভারত পরিক্রমা স্থুরু করলেন, গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে স্বাধীনতার আহ্বান জানালেন জনতাকে,—স্বাধীনতার জন্য প্রস্তুত হও, খদ্দর পরো, অস্পৃশ্যতা ভোলো, নেশা ছাড়ো…

সভায় সভায় বিলিতী কাপড়ের ধ্বংস যজ্ঞ হতে লাগলো, খদ্দরের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য গান্ধিজী সভায় সভায় হাত পাতলেন, শুধু অন্ধ্রপ্রদেশেই ছ'সপ্তাহের মধ্যে তিনি দু' লাখ সত্তর হাজার টাকা সংগ্রহ করলেন।

কলকাতার এক সভায় বস্ত্রযজ্ঞ করার জন্য গান্ধিজীর নামে সরকার অভিযোগ তুললো। গান্ধিজী কদিনের জন্য গিয়েছিলেন ব্রহ্মদেশে, ফিরে আসতেই কলকাতার

আদালতে তাঁকে হাজির হতে হোল, শেষ অবধি জরিমানা হোল একটাকা—বিচারের একটা প্রহসন হোল মাত্র।

বরদৌলি তালুকের প্রজারা সর্দার প্যাটেলকে আমন্ত্রণ জানালো, সেখানে সত্যাগ্রহ আন্দোলনের নেতৃত্ব করার জন্য।

প্যাটেল এলেন গান্ধিজীর কাছে—আশীর্বাদ চাই!

বরদৌলিতে খাজনাবন্ধের আন্দোলন সুরু হয়ে গেল। গবর্ণমেন্ট সেখানকার প্রজাদের খাজনা বাড়িয়ে দিয়েছিল,—২০৲।৩০৲ টাকা। গরীব চাষীদের সামর্থ্য ছিল না, তারা আপত্তি তুললো, কিন্তু সরকার তাদের কথায় কান দিল না। প্রজারা নিরুপায় হয়ে খাজনা দেওয়া বন্ধ করে দিল।

বোম্বাইয়ের লাটসাহেব ঘোষণা করলেন—বরদৌলিতে এই কৃষক অভিযান ধ্বংস করার জন্য যদি প্রয়োজন হয় বৃটিশ সরকারের সমস্ত শক্তিকে নিয়োগ করা হবে!

বরদৌলিতে পাঠান সৈন্য আমদানী করা হোল, অনাচার অত্যাচার চরমে গিয়ে উঠলো কিন্তু চাষীদের নত করতে পারলো না, ছেলেরা মুখে মুখে ছড়া তৈরী করলো—সভায় সভায় তারা গান ধরলো—

Pathans to the right of them
Pathans to the left of them
Pathans to the front of them
Police at the tail of them
Marched the Buffalo Brigade!

( ডাইনে পাঠান, বাঁয়ে পাঠান, পাঠান আছে সামনে, পুলিশ চলে পিছনে, মহিষ বাহিনী চলেছে মার্চ করে। )

কেন্দ্রীয় পরিষদের সভাপতি বিঠলভাই প্যাটেল বড়লাটকে চিঠি লিখলেন—এখনই উপযুক্ত ব্যবস্থা না হলে আমি সভাপতিত্ব ছেড়ে সত্যাগ্রহ করতে যাব!

এবার গবর্ণমেন্টকে মাথা নোয়াতে হোল, জজ সাহেবের উপর ভার দেওয়া হোল, তদন্ত করার জন্য, শেষ অবধি প্রজাদের দাবীই স্বীকৃত হোল, গান্ধিজীর অহিংস নীতিই জয়যুক্ত হোল।

দেশবাসী প্রত্যক্ষ দেখলো—আত্মবিশ্বাস থাকলে সত্য জয়যুক্ত হবেই!

কংগ্রেস আন্দোলনের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে: অবস্থা ঘোরালো হয়ে উঠছে দেখে

বড়লাট লর্ড আরুইন ছুটলেন বিলাতে। বিলাত থেকে ফিরে এসে তিনি বললেন—ভারতকে ধীরে ধীরে স্বায়ত্তশাসনের পথে এগিয়ে দেওয়াই আমাদের লক্ষ্য।...

মহাত্মাজী তার উত্তরে বললেন—বৃটিশ সরকারের যদি সত্যি কিছু দেবার সদিচ্ছা থাকে তাহলে আমরা আলোচনা চালাতে রাজী আছি।

বড়লাট গান্ধিজীকে ডেকে পাঠালেন, তাঁর সঙ্গে নিমন্ত্রিত হলেন পণ্ডিত মতিলাল, বিঠলভাই প্যাটেল, স্যার তেজবাহাদুর সাপ্রু ও জিন্না। পুরো তিনটি ঘণ্টা আলাপ আলোচনা চললো, কিন্তু কোন মীমাংসা হোল না। গান্ধিজী ইয়ং ইণ্ডিয়ায় মন্তব্য করলেন—আলোচনার জন্য বড়লাটকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি, আমাদের অবস্থাটি কি তা' আমরা এখন বুঝতে পারছি...

চার্চিল সাহেব ওদিকে বিলাতে চীৎকার তুললেন—ভারতবাসীকে স্বায়ত্ত শাসন দেওয়া অন্যায় অপরাধ বলে গণ্য হবে!...

গান্ধিজী তার উত্তরে বড়লাটের কাছে এক খোলা চিঠি লিখলেন, তাতে তিনি ভারতবাসীদের জন্য এগারোটি দাবী জানালেন :

১। মদ খাওয়া বন্ধ করতে হবে।

২। জমির খাজনা অর্ধেক করতে হবে।

৩। লবণের কর তুলে দিতে হবে।

৪। রাজবন্দীদের ছেড়ে দিতে হবে।

৫। সি-আই-ডি বিভাগ তুলে দিতে হবে।

৬। আত্মরক্ষার জন্য ভারতবাসী অস্ত্র রাখতে পারবে।

৭। টাকার দাম বিদেশে এক শিলিং চার পেন্স করতে হবে।

৮। সৈন্য রাখার খরচ অর্ধেক কমাতে হবে।

৯। বড় চাকরীর মাইনে কমাতে হবে।

১০। বিদেশী কাপড়ের উপর মোটা হারে শুল্ক বসাতে হবে।

১১। 'কোষ্টাল-প্যাসেজ-রিজার্ভেসন-বিল' পাস করতে হবে।

চিঠিখানি ইয়ং ইণ্ডিয়ায় প্রকাশিত হোল, তারই একখানি নকল গান্ধিজী দিলেন মিষ্টার বোমানজীর হাতে, বিলাতে গিয়ে প্রধান মন্ত্রী র‍্যামসে ম্যাকডোনাল্ড্‌কে দেবার জন্য।

কিন্তু বৃটিশ সরকার সে পত্রের কোন উত্তর দেওয়া দরকার বলে মনে করলেন না।

ভারতের পশ্চিম প্রান্তে সবরমতীর আকাশে ঝড়ের কালো মেঘ পুঞ্জীভূত হয়ে উঠলো।

সবরমতী আশ্রমের শীর্ণ সন্ন্যাসীর কপালে জাগলো চিন্তার রেখা। চল্লিশ কোটি নরনারীর অন্নবস্ত্রের স্বাচ্ছন্দ্য, মানুষের মত বেঁচে থাকার আকাঙ্খা, কোন্ পথে সার্থক হয়ে উঠবে তাই তিনি ভাবতে বসলেন। সত্য ও অহিংসার পথই তাঁর পথ সেই পথেই মৃত্যুঞ্জয়ী অমৃতের সাধনা করতে হবে। মৃত্যুভয়াল কালবৈশাখীর সামনে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে হবে, অসত্যকে সত্য দিয়ে জয় করতে হবে, অন্যায়কে আঘাত করতে হবে, ভয় পেলে তো চলবে না। সন্ন্যাসীর তৃতীয় নয়ন উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো, সত্যসেবীর আত্মনিবেদন ভারতের আকাশে বাতাসে মূর্চ্ছনা তুললো—'অন্য জাতির স্বাধীনতা অর্জনের নীতি ভিন্ন হতে পারে, কিন্তু ভারতবাসীর কাছে একটি মাত্র পথ খোলা আছে, তা অহিংস অসহযোগের পথ, স্বরাজলাভের জন্য তোমরা সেই মন্ত্রের উদ্গাতা হও, ঈশ্বর তোমাদের সাহস দিন, শক্তি দিন, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে তোমরা যেন সর্বস্ব পণ করে অবতীর্ণ হতে পার।'

মহাত্মাজী বড়লাটের কাছে চিঠি লিখলেন—

বন্ধু, ভারতের বুকে বৃটিশ শাসন একটি অভিশাপ। এই শাসন ব্যবস্থা আমাদের দাসজাতিতে পরিণত করেছে। আমাদের কৃষ্টির মূলে আঘাত করেছে, আমাদের ধর্মনীতিকে অবনত করেছে।...আপনার নিজের কথাই ধরুন। আপনি মাসিক মাহিনা পান একুশ হাজার টাকা, অথচ ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রীর বেতন মাসিক পাঁচ হাজার চারশো টাকা মাত্র। এক একজন ইংরাজের দৈনিক আয় দু' টাকা—আর প্রধান মন্ত্রী পান দৈনিক ১৮০৲ টাকা। এদিকে আমাদের দেশে এক একজনের দৈনিক আয় মাত্র দু' আনা আর আপনার বেতন দৈনিক সাত শো টাকা।...এই পদ্ধতির অবিলম্বে পরিবর্তন দরকার।...বৃটিশ শাসনে যেসব দুর্নীতি পুঞ্জীভূত হয়েছে তা দূর করার জন্য আমি আপনাকে অনুরোধ করছি। কিন্তু আমার এই অনুরোধ যদি আপনার অন্তর স্পর্শ করতে না পারে তাহলে আগামী ১১ই মার্চ তারিখে আমার আশ্রমিক সহকর্মীদের নিয়ে আমি লবণ আইন অমান্য করার জন্য অভিযান করবো। আপনি মনে করলে তার আগেই আমাকে গ্রেপ্তার করতে পারেন কিন্তু আমি আশা করি হাজার হাজার কর্মী আমার আরব্ধ কাজকে সম্পূর্ণ করার জন্য এগিয়ে আসবে।...এ সম্পর্কে যদি আপনি ঘরোয়াভাবে আলোচনা করতে চান, আমি রাজী আছি।...

চিঠিখানি বড়লাটের কাছে নিয়ে গেলেন গান্ধী আশ্রমের এক ইংরাজ যুবক—রেজিন্যাল্ড্ রেণল্ড।

বড়লাট উত্তর দিলেন—গান্ধিজী এমন এক কার্যক্রম ঠিক করেছেন, যার ফলে জনসাধারণের শান্তি বিপন্ন হবে, এজন্য আমি দুঃখিত…

'ইয়ং ইণ্ডিয়াতে' মহাত্মাজী লিখলেন—আমি নতজানু হয়ে অন্নভিক্ষা চাইলাম, কিন্তু আমাকে পাথর ছুঁড়ে মারা হোল…লাটসাহেবের উত্তর দেখে আমি মোটেই বিস্মিত হইনি।…জনসাধারণের যে শান্তির কথা তিনি বলেছেন তা জেলখানার শান্তি। ভারতবর্ষ একটা বিরাট জেলখানা ছাড়া আর কিছু নয়। যে শোকাবহ শান্তি জাতির বুকের উপর চেপে বসেছে, সেই শান্তিকে ভঙ্গ করাই আমার পবিত্র কর্তব্য বলে আমি মনে করি।

ইংরাজী ১৯৩০ সালের ১২ই মার্চ। সকাল সাড়ে ছ'টার সময় একষট্টি বছরের বৃদ্ধ সবরমতীর নদীতীরে এসে দাঁড়ালেন। পরণে কটিবাস, হাতে একগাছি লাঠি, সঙ্গে উনআশীজন আশ্রমিক অনুচর,—ষোল বছরের ছেলেও সে দলে আছে, তাঁতী আছে, পিওন আছে, রঙ-কর আছে, সম্পাদক আছে, গো-পালন বিশেষজ্ঞ আছে, সংস্কৃত-পণ্ডিত আছে,—সর্বজাতির সর্বশ্রেণীর সমন্বয় ঘটেছে।

মহিলারা বললেন—আমরাও যাব!

গান্ধিজী বললেন—না, তা হবে না, মেয়েরা সামনে থাকলে গবর্মেণ্ট আমাদের উপর নির্মম হতে ইতস্ততঃ করবে। শত্রুর কঠোরতা আমি দুর্বল করে ফেলতে চাই না, সেইজন্যই প্রথম অগ্রগামী দলে আমি মেয়েদের রাখতে চাই না!

সোণালী রোদ সামনের ধূসর পথকে উজ্জ্বল করে তুললো, চল্লিশ কোটি জনগণের স্বাধীনতার আকাঙ্খা নিয়ে মহাত্মাজী দাণ্ডির পথে মহা-অভিযান সুরু করলেন, বললেন—লবণের শুল্ক যদি না তুলতে পারি, তাহলে আর আমি ফিরবো না, আমার দেহ সাগরের বুকে ভাসবে!

পিছনে চললেন উনআশীজন নির্ভীক সৈনিক। হাতে এক একগাছি লাঠি, কাঁধের থলিতে ঝুলছে নিত্য প্রয়োজনীয় দু-একটি জিনিষ। তিনজন তিনজন করে এক এক সারি। পরণে শুভ্র খদ্দরের উপর প্রভাতী সূর্যের অরুণালোক রক্তিম আভায় বিচ্ছুরিত হচ্ছে, বিদ্রোহের উপক্রমণিকাকে জানাচ্ছে আশীর্বাদ। দৃঢ় তাদের পদক্ষেপ, চোখে তাদের আত্মবিশ্বাসের দীপ্তি। সেই দীপ্তির প্রতিফলন উদ্ভাসিত হোল সমবেত অগণিত নরনারীর মনে, তারা সাড়া তুললো—গান্ধিজীকি জয়!

গান্ধিজী বললেন—সত্যাগ্রহীর পরাজয় নেই, জয়ী আমরা হবই, ভগবান আমার সহায়…

দেশ-বিদেশ থেকে এলো অভিনন্দন, এলো উৎকণ্ঠা পূর্ণ শুভেচ্ছা :

জার্মানী থেকে এক ডাক্তার লিখলেন—সুদূর জার্মাণীতে প্রতি প্রভাতে ও প্রতি সন্ধ্যায় এক অতি সাধারণ আস্তিক পরমেশ্বরের চরণে আপনার শুভকামনা করছে···

আমেরিকা থেকে পাদরী হোম্‌স লিখলেন—ভগবান আপনাকে রক্ষা করুন···

দীর্ঘ দুশো মাইল পথ। কখনো গাছের ছায়ায় শীতল, কখনো প্রান্তরের দীর্ঘশ্বাসে প্রখর। স্বাধীনতার তীর্থযাত্রীরা এগিয়ে চলেছেন গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে জেতালপুর···নবগাঁ···নড়িয়াদ···বোরসাদ·· ব্রোচ্‌···ভাটগাঁ···সুরাট···জালালপুর·· মহামানবের যাত্রাপথের রুক্ষতা, গ্রামবাসীরা জল ঢেলে স্নিগ্ধ করে। ঘরে ঘরে তেরঙা নিশান ওড়ায়, পুষ্পাকীর্ণ করে দেয় পথরেখা, পথের দু'পাশে এসে দাঁড়ায় নীরব শ্রদ্ধায়, যুগাবতারের দীর্ঘজীবন কামনা করে পূত চিত্তে। হাত জোড় করে মহামানব এগিয়ে চলেন, স্মিত হাস্যে জনতাকে অভিনন্দিত করে বলেন—খদ্দর পর, নেশা ছাড়ো, স্বাধীনতার সংগ্রামে সত্যাগ্রহী হও, অহিংসাই আমাদের পথ।...

দিকে দিকে সাড়া জাগে, আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা স্বেচ্ছাসেবক হবার জন্য অগ্রগামী হয়।

পণ্ডিত মতিলাল বললেন—শ্রীরামচন্দ্রের লঙ্কা অভিযানের মত দাণ্ডি অভিযান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র বললেন—বাইবেলে পড়েছি ইস্‌রেলাইট্‌রা মোজেসের নেতৃত্বে এমনি ভাবেই একদিন পথে বাহির হয়েছিল।

কংগ্রেস সভাপতি পণ্ডিত জহরলাল বললেন—দীর্ঘপথ অতিক্রম করে মহামানব এগিয়ে চলেছেন, মহাতীর্থযাত্রী একখানি যষ্টি মাত্র হাতে নিয়ে গুজরাটের ধূলিধূসর পথ পদব্রজে অতিক্রম করছেন, দৃষ্টি তাঁর স্বচ্ছ, পদক্ষেপ দৃঢ়···

মহাত্মাজী দৈনিক পনেরো মাইল পথ অতিক্রম করেন।

গান্ধিজী বলেন—ভগবানের আশীর্বাদ থাকলে আমি এই দীর্ঘপথ পদব্রজেই যেতে পারবো। আমার মনে হচ্ছে আমি অমরনাথ কিংবা বদরীনারায়ণের তীর্থযাত্রা করেছি···আজকের চেয়ে পবিত্র তীর্থযাত্রা আমার কাছে আর কিছু নেই।

অনুগামী দু-তিনজন পথের মাঝে অসুস্থ হয়ে পড়েন, কিন্তু পিছু হটার মত মন নিয়ে তাঁরা পথে বাহির হন নি। তাঁদের জন্য গরুর গাড়ীর ব্যবস্থা হোল।

প্রতি সোমবারে মৌন-দিবসে গান্ধিজী বিশ্রাম করতেন।

চব্বিশ দিন পরে গান্ধিজী দাণ্ডির সাগর সৈকতে এসে দাঁড়ালেন।

পরদিন প্রত্যূষে প্রার্থনা সভায় মহাত্মাজী বললেন—বৃটিশ শাসন ভারতের আর্থিক, সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক ধ্বংস এনে দিয়েছে। এই শাসন ব্যবস্থাকে আমি অভিশাপ বলে মনে করি। এই শাসনব্যবস্থাকে ধ্বংস করতে আমি বাহির হয়েছি···আমরা কাউকে হত্যা করার জন্য পথে বাহির হইনি, কিন্তু এই অভিশাপকে নিশ্চিহ্নভাবে মুছে ফেলা আমাদের ধর্ম।···

শত সহস্র সশ্রদ্ধ নরনারীর সামনে মহাত্মাজী সাগর থেকে জল তুলে এনে লবণ তৈরী করতে বসলেন, উন-আশীজন আশ্রমিক তাঁর অনুগমন করলো। চারিপাশ থেকে সাড়া উঠলো—মহাত্মা গান্ধিকী জয়!

ভারতের ইতিহাসে সে এক স্মরণীয় দিন।

এই লবণ-আইন-অমান্যের পিছনে একটা ইতিহাস আছে:

শ'খানেক বছর আগে অবধি এদেশের মাল বিলাতে বিক্রী হোত। কিন্তু বিলিতী মালের কোন চাহিদা এদেশে ছিল না। এদেশ থেকে জাহাজ ভর্তি করে জিনিষ যেত বিলাতে, আর সেই জাহাজ ফিরে আসতো খালি। শূণ্য জাহাজ সমুদ্রে চলে না, তাই জাহাজের ভার ঠিক রাখার জন্য বিলাত থেকে জাহাজে মাটী বোঝাই করে আনা হোত! গঙ্গা থেকে কালিঘাটের মন্দির অবধি একটি খাল ছিল, জাহাজে আনা সেই মাটি ফেলে ফেলে খালটি বুঁজিয়ে দেওয়া হোল। তারই নাম হয়েছে এখন চৌরঙ্গী রোড। কিন্তু মাটি আনা তো আর লাভের ব্যবসা নয়, এমন কিছু আনতে হবে যা এদেশে বিক্রী করে দু' পয়সা পাওয়া যায়। সাহেবরা ঠিক করলো মাটির বদলে লবণ আনা হবে। কিন্তু দেশী লবণ শস্তায় বিক্রী হয়, বিলিতী লবণ লোকে কিনবে কেন? ইংরাজরা তখন এদেশের রাজা হয়ে বসেছে, আইন কানুন সবই তো তখন নিজেদের হাতে। তখনই তারা আইন করে দেশী লবণের উপর কর বসিয়ে দিল। কর দিতে গিয়ে দেশী লবণের দাম বেড়ে গেল, বিলিতী লবণ সস্তায় বাজারে বিক্রী হতে লাগলো। এথেকে সরকারের দু'দফা আয় হতে লাগলো, এক দফা লবণ বেচে আরেক দফা কর আদায় করে। বছরে এ থেকে নেহাৎ কম টাকা হয় না, শুধু ১৯২৫ সালের হিসাব থেকেই দেখা যায় ইংরাজ সরকার এদেশে বিলিতী লবণ বিক্রী করে এক কোটি বায়াত্তর লক্ষ মণ, আর দেশী লবণের উপর কর আদায় করে দশ কোটি টাকা।

লবণ মানুষের নিত্যকার প্রয়োজনীয় খাদ্য, তার উপর এইভাবে কর বসানো

অন্যায়। এদেশের মানুষ বড় গরীব, লবণ কিনে খাবে অনেকেরই এমন অবস্থা নয়। সমুদ্রের তীরে যারা থাকে তাদেরকেও লবণ কিনে খেতে হয়। সমুদ্র তটে লবণের দানা পড়ে থাকলেও কুড়িয়ে নেবার অনুমতি নেই। পাছে কেউ সেভাবে লবণ সংগ্রহ করে, তাই সাগর তটে পাহারা মোতায়েন আছে। লবণ সংগ্রহ করলেই গ্রেপ্তার হতে হবে। আইনের নামে গরীবদের উপর অত্যাচার ছাড়া এ আর কিছু নয়। এই অন্যায়ের বিরুদ্ধেই গান্ধিজী আঘাত করলেন—লবণ সত্যাগ্রহ।

গান্ধিজী ঘোষণা করলেন—দেশের জন্য রাজদণ্ড ভোগ করতে যারা প্রস্তুত, তারা নিজ নিজ সুবিধা অনুযায়ী আইন অমান্য করে লবণ তৈরী করতে পারে!

গান্ধিজী আরও বললেন—১৯২০ সালে জাতিকে আহ্বান করেছিলাম অসহযোগের সংগ্রামে, সে আহ্বান ছিল প্রস্তুতির আহ্বান। আবার আজ আমি আহ্বান জানাচ্ছি—এ আহ্বান শেষ সংগ্রামের আহ্বান—চরম নিষ্পত্তির আহ্বান!

সারা ভারতের বুকে তড়িৎ প্রবাহ বহে গেল। সর্বত্র লবণ তৈরী হতে লাগলো। ১৪৪ ধারা জারী করেও জনসভা বন্ধ করা গেল না। মদের দোকানে ও বিলিতী কাপড়ের দোকানে স্বেচ্ছাসেবকরা ধর্ণা দিতে সুরু করলো। তাড়ি তৈরী চিরদিনের মত বন্ধ করার ইচ্ছায় গাঁয়ে গাঁয়ে হাজার হাজার তালগাছ কেটে ফেলা হোল। যারা প্রত্যক্ষভাবে সত্যাগ্রহে যোগ দিতে পারলো না, তারা বে-আইনী লবণ কিনে আন্দোলনকে নৈতিক সমর্থন জানালো। এক এক পুরিয়া বে-আইনী লবণ যে কোন দামে বিক্রী হতে লাগলো। কেবলমাত্র বোম্বাই শহরের পথে লবণ বিক্রী করে শ্রীযুক্তা কমলাদেবী চট্টোপাধ্যায় একাই ত্রিশ হাজার টাকা সংগ্রহ করেন। এক পুরিয়া লবণ পাঁচশো টাকাতেও বিক্রী হয়েছিল।

এলাহাবাদে কংগ্রেস সভাপতি পণ্ডিত জহরলাল গ্রেপ্তার হলেন।

কলিকাতায় দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন গ্রেপ্তার হলেন।

বোম্বাইয়ে রামদাস গান্ধী গ্রেপ্তার হলেন।

দিল্লীতে দেবদাস গান্ধী গ্রেপ্তার হলেন।

করাচিতে জয়রামদাস দৌলতরাম পুলিশের গুলিতে আহত হলেন।

পেশোয়ারে জনতার সঙ্গে সৈনিকদের খণ্ডযুদ্ধ ঘটে গেল।

আসমুদ্র হিমাচলের অহিংস জনগণ গুলি ও লাঠির আঘাতে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠলো।

গান্ধিজী বললেন—আজ সারা ভারতের বুকে যে অনাচার চলছে পাঞ্জাবের ডায়ার সাহেবের অত্যাচার সে তুলনায় কিছুই নয়। জনসাধারণ আজ তাদের কর্তব্য

পরিষ্কার বুঝতে পারছে। কষ্ট সহ্য করার মহান অনুভূতি নিয়ে জনসাধারণকে সরকারের এই সঙ্ঘবদ্ধ গুণ্ডামির সম্মুখীন হতে হবে!

গান্ধিজীর নির্দেশ, নব ভারতের বেদমন্ত্র। চল্লিশ কোটি নরনারী নতুন অনুভূতিতে চঞ্চল হয়ে উঠলো।

গান্ধিজী স্থির করলেন এবার তিনি ধরসনার লবণ গোলা দখল করবেন। কিন্তু চুপিচুপি কোন কাজ করা তাঁর রীতি নয়, বড়লাটকে চিঠি লিখে জানালেন তাঁর ইচ্ছা:

বন্ধু, বিধাতার নির্দেশ পূর্ণ হোক, সহকর্মীদের নিয়ে আমি ধরসনার যাবার সংকল্প করেছি। লবণ গোলা অধিকার করাই আমার উদ্দেশ্য…আমার এই অভিযান ব্যর্থ করতে হলে (১) আপনাকে লবণ আইন তুলে দিতে হবে, না হলে (২) আমাকে ও আমার অনুগামীদের গ্রেপ্তার করতে হবে, অথবা (৩) নিছক গুণ্ডামির দ্বারা প্রত্যেকটি সত্যাগ্রহীর মাথা ভেঙে দিতে হবে। আমি আশা করি গবর্মেণ্ট সত্যাগ্রহীদের সঙ্গে সভ্যতা-সম্মত ব্যবহার করবেন…অনেক ক্ষেত্রে জনসাধারণের উপর বর্বরোচিত ব্যবহার করা হয়েছে…সত্যাগ্রহের নীতি হিসাবে কর্তৃপক্ষ যত বেশী নিপীড়ন চালাবেন, সত্যাগ্রহী ততবেশী অত্যাচার সইবার জন্য প্রস্তুত হবে। স্বেচ্ছায় চরম দুঃখ ভোগ করতে পারলে সাফল্য সুনিশ্চিত।…হিংসাকে জয় করার একমাত্র পন্থা হোল অহিংসা। আমি আশা রাখি ভগবান ভারতবাসীকে জ্ঞান ও শক্তি দেবেন, যেন হিংসা ও প্রলোভনের বিরুদ্ধে তারা দাঁড়াতে পারে।…আপনি যদি লবণ তৈরী করার বিধি নিষেধ না তুলতে পারেন তাহলে আমি আমার অভিযান আরম্ভ করতে বাধ্য হব!

কিন্তু, যেদিন অভিযান সুরু হবার কথা তার পূর্ব রাত্রে করাদীতে রাত পৌণে একটার সময় সৌরাষ্ট্রের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট, ত্রিশ জন সশস্ত্র পুলিশ নিয়ে এসে গান্ধিজীর ঘুম ভাঙালেন। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব গান্ধিজীর মুখের উপর হাত-বিজলীর আলো ফেলে জিজ্ঞাসা করলেন—আপনার নাম মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী?

—আপনি আমাকে চান, বেশ, অনুগ্রহ করে আমাকে মুখহাত ধোবার সময় দিন!

ম্যাজিষ্ট্রেট গান্ধিজীকে সময় দিলেন। দাঁত মাজতে মাজতে গান্ধিজী জিজ্ঞাসা করলেন—ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব, আমাকে কোন অভিযোগ গ্রেপ্তার করলেন? ১২৪ ধারা নাকি?

—না, ১২৪ ধারা নয়, আমি একটা লিখিত আদেশপত্র পেয়েছি।

—কিছু যদি মনে না করেন, আদেশ পত্রটা আমাকে একবার পড়ে শোনান।

ম্যাজিষ্ট্রেট আদেশ পত্রটি পড়ে শোনালেন—১৮২৭ সালের ২৫ আইনে গান্ধিজীকে গ্রেপ্তার করা হোল।

একটা বাজলো, গান্ধিজী তাঁর কয়েকটি দরকারী জিনিষপত্র ঝোলায় ভরলেন, কাগজপত্রগুলি দিলেন স্বেচ্ছাসেবকদের হাতে তারপর বললেন—প্রার্থনার জন্য ক' মিনিট সময় দিন!

দশ মিনিট প্রার্থনা করে সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে রাত্রি ১টা ১০ মিনিটে গান্ধিজী পুলিশের লরীতে উঠে বসলেন। অন্ধকারের বুকে লরীখানি অদৃশ্য হয়ে গেল।

গ্রেপ্তারের আগে গান্ধিজী দেশবাসীর উদ্দেশ্যে এক বিবৃতি দিয়ে যান:

স্বরাজ আসবেই! ভারতবাসীকে অপরিমেয় ত্যাগ স্বীকার করতে হবে। অপরকে আঘাত না করে নিজেকে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত করতে হবে, তাহলেই ভারতবাসী তার আদর্শকে জগৎসমক্ষে তুলে ধরতে পারবে। আমার গ্রেপ্তারের পর আমার সহকর্মীরা যেন হতাশ না হন। আমি কেউ নই, সকলের মধ্যে যে অন্তর্যামী আছেন তিনিই এই সংগ্রামের নিয়ন্তা; তাঁর উপর বিশ্বাস রেখে আমরা অগ্রসর হব। আমাদের সেই এক পথ—গাঁয়ের সবাই লবণ তৈরী করবে···মেয়েরা, মদ, আফিং ও বিলিতী কাপড়ের দোকানে ধর্ণা দেবে···আবালবৃদ্ধ বণিতা সুতা কাটবে···বিলিতী বস্ত্র পোড়াতে হবে···কাউকে অস্পৃশ্য মনে করলে চলবে না···হিন্দু, মুসলমান, পার্শী ও খৃষ্টানরা পরস্পরকে আলিঙ্গন করবে···ছাত্রেরা সরকারী ইস্কুল ছাড়বে, কর্মচারীরা সরকারী চাকুরী ছাড়বে, সবাই জনসেবায় আত্মনিয়োগ করবে, তাহলেই স্বরাজলাভ সহজ হবে।···

পুলিশ-লরী এলো ষ্টেশনে, সেখান থেকে বোম্বের ট্রেন ধরা হোল। ট্রেনের জন্য যখন তাঁরা ষ্টেশনে অপেক্ষা করছেন সেই সময়টুকুতে বিলাতের 'লণ্ডন টেলিগ্রাফ' কাগজের রিপোর্টার আসমীড-বার্টলেট সেখানে ছিলেন, তিনি লেখেন—নাটকের একটি দৃশ্য আমরা অভিনয় করছি। ঈশ্বর প্রেরিত এক মহাপুরুষকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। ভারতের কোটি কোটি নরনারী তাঁকে অবতার বলে মনে করে। কে বলতে পারে, শতবর্ষ পরে হয়তো এই মানুষটিকেই ত্রিশকোটি লোক ভগবান বলে পূজা করবে। বন্দী গান্ধিজীর সঙ্গে ট্রেন ধরার জন্য ষ্টেশনে দাঁড়িয়ে আছি। মহামানবকে বন্দী করে আমার সামনে দিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, মনের মাঝে কোথায় যেন একটা অস্বস্তি অনুভব করছি।···

সেখান থেকে বরিভ্‌লি অবধি ট্রেনে, তারপর মোটারে য়েরোড়া কারাগার।

সারা ভারত গান্ধিজীর গ্রেপ্তারের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলো।

কলিকাতা বোম্বাই পুণায় হরতাল হোল, সুদূর পল্লীগ্রামেও তার প্রতিধ্বনি উঠলো। হাবড়া পঞ্চাননতলায় জনতা একখানি ট্রেণ থামিয়ে দিল, পুলিশ গুলি চালিয়ে তাদের পনেরো জনকে জখম করলো। শোলাপুরে পঞ্চাশ হাজার মজদুর এক মিছিল বের করলো, ছ'টি পুলিশ-চৌকি পুড়িয়ে দিল, গুলি খেয়ে মরলো পঁচিশ জন, জখম হোল একশো জন। গাড়োয়ালি সৈন্যরা সীমান্ত প্রদেশে নিরস্ত্র জনগণের উপর গুলি চালাতে অস্বীকার করলো।

সুমাত্রা থেকে পানামা, দক্ষিণ আফরিকা থেকে ফ্রান্স, জার্মানী, আমেরিকা সর্বত্র প্রতিবাদ উঠলো। আমেরিকা থেকে ১০২ জন পাদরী বিলাতের প্রধান মন্ত্রী রামসে ম্যাকডোন্যাল্ডের কাছে টেলিগ্রাম করলেন—গান্ধিজীর সঙ্গে ঘরোয়াভাবে মিটিয়ে ফেলুন। দুর্যোগ থেকে মানবসমাজকে রক্ষা করুন।...

কিন্তু সাম্রাজ্যবাদ অহমিকাময়, জনমতের কাছে মাথা নত করা তাদের রাজনীতি নয়, মানবতা ও মনুষ্যত্ব বলে কোন কথা তাদের অভিধানে নেই!

তিনি গ্রেপ্তার হবার পর কি করতে হবে সে সম্পর্কে গান্ধিজী আগেই নির্দেশ দিয়ে ছিলেন—আইন অমান্য সুরু করার পর আমার গ্রেপ্তার সুনিশ্চিত।... আমার গ্রেপ্তারের পর ভারতের স্বাধীনতা লাভের উদ্দেশ্যে যারা অহিংসায় আস্থাবান, তাঁরা সক্রিয় কর্মনীতি গ্রহণ করবেন, বর্তমান পরাধীনতার কাছে মাথা নত করবেন না... আমার পর সারা ভারতে কে নেতৃত্ব করবেন জানি না, কিন্তু সহকর্মীদের উপর আমার যথেষ্ট বিশ্বাস আছে।...পৃথিবীর সর্বত্রই গণ-আন্দোলন নেতা সৃষ্টি করে, এ ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটবে না।...আইন অমান্য আন্দোলন একবার সুরু করলে যে পর্যন্ত একজন মাত্র কর্মীও জেলের বাইরে থাকবে, কি জীবিত থাকবে, সে পর্যন্ত আন্দোলন বন্ধ করা চলবে না। সত্যিকারের সত্যাগ্রহীর স্থান হবে, হয় জেলখানায়, নাহয় আন্দোলনের মাঝে, অথবা স্বরাজ আসতে পারে এমন কোন গঠনমূলক কাজে।

শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু স্বেচ্ছাসৈনিকদের নিয়ে ধরসনার দিকে অগ্রসর হলেন, উচ্চস্বরে তিনি ঘোষণা করলেন—মহাত্মাজীর শীর্ণ ও রুগ্ন দেহকে পাষাণ প্রাচীরের আড়ালে আবদ্ধ করলেই আন্দোলন থেমে যাবে না। তাঁর নির্দেশ তিনি রেখে গেছেন, এই নির্দেশই প্রাণবন্ত হয়ে জনগণের চিন্তা ও কর্মধারাকে প্রভাবান্বিত করবে, স্বেচ্ছাচারী সরকারের কোন নির্দেশই সে শক্তিকে শৃঙ্খলিত করতে পারবে না।

## আমাদের গান্ধিজী

গান্ধিজীর আরব্ধ কাজ সম্পূর্ণ করতে এগিয়ে এলেন আড়াই হাজার স্বেচ্ছাসৈনিক, চারিদিক থেকে ধরসনার লবণগোলা আক্রান্ত হোল। পুলিশও নির্মমভাবে পুরো দুটি ঘণ্টা তাদের উপর লাঠি চালিয়ে গেল, একজনকে খুন করলো, জখম করলো, দুশো নব্বুই জনকে।

সেই দৃশ্যের বর্ণনা করে ডেলি-হেরাল্ডের জর্জ-স্লোকাম্ব লেখেন—এক পাহাড়ের উপর দাঁড়িয়ে আমি দেখছিলাম; স্বজাতীয় শাসকদের নির্মম কর্মতৎপরতা দেখে ইংরাজ হিসাবে আমার মাথা হেঁট হয়ে গেল···

হাজার হাজার মানুষ আঘাত পেলো কিন্তু প্রতিঘাত করলো না। বিলাতের ফ্রি-ম্যান কাগজের ওয়েব মিলার লিখলেন—ধরসনার মত দৃশ্য আমি জীবনে কখনও দেখিনি, মাঝে মাঝে এতো করুণ হয়ে উঠছে যে চোখ ফিরিয়ে নিতে হয়। সবচেয়ে বিস্ময় লাগছে স্বেচ্ছাসেবকদের নিষ্ঠা, গান্ধিজীর অহিংসা নীতিকে তারা মনপ্রাণ দিয়ে গ্রহণ করেছে···

গান্ধিজী বিশ্বাস করতেন অহিংসা ও ভ্রাতৃত্ব দিয়ে শত্রুর মনকেও বদলে দেওয়া যায়। আর সারা ভারতবর্ষ বিশ্বাস করে গান্ধিজীকে, সেই বিশ্বাস মৃত্যুভয়ের চেয়েও বড় হয়ে দেখা দিয়েছিল, সেইজন্যেই পুলিশ ও মিলিটারীর লাঠি ও বেয়োনেটকে উপেক্ষা করে আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছিল সারা ভারতের গ্রামে ও সহরে, ধনীর প্রাসাদ থেকে দরিদ্রের ভগ্ন কুটীরে।

যে মাসে কংগ্রেসের বৈঠক বসলো, নেতারা মন্তব্য করলেন—গান্ধিজী যে মহা অভিযান সুরু করেছেন, তার জন্য আমরা তাঁকে অভিনন্দিত করছি। আমরা আইন অমান্য আন্দোলনে বিশ্বাস করি, এবং পূর্ণ উদ্যমে এই সংগ্রাম চালিয়ে যাবার পক্ষপাতী···

সরকার সর্বশক্তি নিয়োগ করে এই আন্দোলনকে অঙ্কুরেই বিনাশ করতে চেয়েছিল কিন্তু গান্ধিজীর ব্যক্তিত্বকে ও আন্দোলনের বৈশিষ্ট্যকে তাঁরা অস্বীকার করতে পারে নি। বোম্বাইয়ের লাটসাহেব একসময় মন্তব্য করেছিলেন—গান্ধিজী অহিংসা নিয়ে যে পরীক্ষা সুরু করেছেন, পৃথিবীর ইতিহাসে এতোবড় পরীক্ষা আর হয়নি। তিনি ব্যর্থ হলেন বটে তবে আর এক ইঞ্চি অগ্রসর হতে পারলেই তিনি সফলকাম হতেন।

কিন্তু ওই এক ইঞ্চি অগ্রসর হতে না পারলেও, গান্ধিজীর অনুগামীরা যতটা অগ্রসর হয়েছিলেন তারই একটা মোটামুটি হিসাব করলে দেখা যায়ঃ

বোম্বাইয়ে ত্রিশ কোটি টাকার বিলিতী কাপড় কংগ্রেসীরা আটক করে।

মদ গাঁজা আফিং সিদ্ধি প্রভৃতি মাদক দ্রব্যের বিক্রী এতো কমে যায় যে, কর বাবদ যাট লাখ টাকা ক্ষতি হয়।

বনকর বাবদ ষোল লাখ টাকা ক্ষতি হয়।

রাজস্বের সাড়ে পাঁচ লাখ টাকা লোকসান হয়।

বরদৌলির চাষীরা খাজনা না দিয়ে সমস্ত ফসল পুড়িয়ে দিয়ে বরোদা রাজ্যে চলে যায়।

এ বছর কংগ্রেসের কোন বার্ষিক অধিবেশন বসলো না। সব নেতারা জেলে। দেশের বুকে বিপ্লবের বহ্নিশিখা। রাজ-কাজ প্রায় অচল।

এই দুর্যোগের মধ্যে সাংবাদিক জর্জ স্লোকাম্বের চেষ্টায় স্যার তেজ বাহাদুর সাপরু ও মুকুন্দরাম রাও, জয়াকর, গান্ধিজী ও বড়লাটের মধ্যে মিটমাটের আলোচনা সুরু করলেন। জেলে বসেই নেতাদের পরামর্শ চললো। নৈনী জেলে যাঁরা ছিলেন তাঁদের নিয়ে আসা হোল গান্ধিজীর কাছে য়েরোড়া জেলে। কিন্তু শেষ অবধি কোন নিষ্পত্তিই হোল না। কংগ্রেসের প্রধান সর্ততেই বড়লাট রাজী হলেন না—রাজবন্দীরা মুক্তি পেলে না।

কংগ্রেসীদের বাদ দিয়েই বিলাতে গোলটেবিল বৈঠক বসলো। ভারত সরকার তাদের প্রিয়পাত্রদের সেখানে পাঠালেন। ন' সপ্তাহ ধরে নানা আলোচনা চললো, কিন্তু ভারতবাসীর মনে তার কোন প্রভাবই পড়লো না।

সম্রাট ঘোষণা করলেন—ভারতের ইতিহাসে নতুন পরিচ্ছেদ সুরু হোল···কংগ্রেস কর্মীদের সহযোগিতার পথ প্রশস্ত করা হবে···

কদিন পরেই বড়লাট ত্রিশ জন কংগ্রেসী নেতাকে বিনা সর্তে ছেড়ে দিলেন। কংগ্রেসী প্রতিষ্ঠানের উপর যে সব বিধি-নিষেধ ছিল তা'ও তুলে নিলেন।

পণ্ডিত মতিলাল মুমূর্ষু অবস্থায় পড়েছিলেন এলাহাবাদে, গান্ধিজী ও নেতারা আগে গেলেন সেখানে। রঞ্জন-রশ্মি পরীক্ষা করার জন্য মতিলালকে নিয়ে যাওয়া হোল লখনৌ। গান্ধিজীও গেলেন তাঁর সঙ্গে। কয়েকদিনের মধ্যেই মতিলাল মারা গেলেন। শোকাচ্ছন্ন গান্ধিজী অশ্রু-সজল চোখে সাংবাদিকদের কাছে বললেন—আমার মানসিক অবস্থা সাধারণ একজন বিধবার চেয়েও হীন। একজন বিধবা বৈধব্যের পবিত্রতা দিয়ে স্বামীর স্মৃতিকে শ্রদ্ধা জানাতে পারে, সে সুযোগটুকুও তো আমার নেই। মতিলালের মৃত্যুতে আমি যা হারালাম তা আর ফিরে পাব না। আজ কোন গিরিগুহার অন্তরালে আত্মগোপন করতে ইচ্ছা করে···

এলাহাবাদে জন-সাধারণের উদ্দেশ্যে গান্ধিজী বলেন—মতিলাল দেশের জন্য সর্বস্ব

দিয়ে গেছেন, তাঁরই আদর্শ সামনে রেখে সর্বস্ব দিতে না পারলেও আমরা যেন দেশের স্বাধীনতার জন্য যথাসর্বস্ব দান করি…

পণ্ডিত মতিলাল তাঁর বিরাট প্রাসাদ 'আনন্দ-ভবন' দেশের কাজে দান করে যান, সেখানেই কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় কার্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়।

দেশের আবহাওয়া তখনও শান্ত হয়নি। পুলিশের জুলুম তখনও চলছে।

গান্ধিজী বিলাতের 'নিউজ ক্রনিকেলে' লিখলেন—পুলিশের অত্যাচার আগের মতই চলছে। নিরীহ লোক মার খাচ্ছে। বিনা বিচারে সম্ভ্রান্ত লোকদের বাড়ীঘর জিনিষপত্র ক্রোক হচ্ছে। সেদিন এক মিছিলে মেয়েদের চুলের মুঠি ধরে বুট সুদ্ধ লাথি মারা হয়েছে। এই অবস্থা চলতে থাকলে কংগ্রেসীদের পক্ষে শান্তিপূর্ণ আবহাওয়া সৃষ্টি করা অসম্ভব।

এই সম্পর্কে বড়লাটের সঙ্গে মুখোমুখি কথা বলার জন্য গান্ধিজী এক চিঠি লিখলেন—আপনার সঙ্গে মুখোমুখি একবার কথা বলতে চাই!

বড়লাট রাজী হলেন, গান্ধিজী লর্ড আরুইনের সঙ্গে দেখা করলেন।

পনেরো দিন ধরে আলাপ আলোচনা চললো।

চার্চিল সাহেব এইসময় বিলাতের এক সভায় টিপ্পনী কাটলেন: মিড্‌ল-টেম্‌পেলের ব্যারিষ্টার দুর্দান্ত প্রকৃতির মিষ্টার গান্ধী, প্রাচ্যের এক ফকির সেজে অর্ধ নগ্ন বেশে লাট সাহেবের প্রাসাদে প্রবেশ করছে—এদৃশ্য ভাবলেও মনে শঙ্কা জাগে, বমনোদ্রেক হয়। একদিকে তিনি এখনও আইন অমান্য অভিযান সংগঠন ও পরিচালনা করছেন আরেক দিকে সম সর্তে সম্রাটের প্রতিনিধির সঙ্গে সন্ধির আলোচনা চালাচ্ছেন… আন্তরিকতাপূর্ণ কথা বলার পক্ষে এ এক বিস্ময়কর পরিবেশ—একদিকে বিদ্বেষপূর্ণ ধ্বংসকামী গোঁয়ার ধর্মচারী, আরেকদিকে ভারতের রাজ প্রতিনিধি। আমাদের বলা হচ্ছে আলোচনা 'মধুর' হচ্ছে।…

গুজব রটলো—আরব সাগরের 'কুড়িয়া-মুড়িয়া' দ্বীপে কংগ্রেসী নেতাদের নির্বাসিত করা হবে।

গান্ধিজী বিবৃতি দিলেন—অতীতের কথা ভেবে বৃটিশের ভুলভ্রান্তি বিচার করে কোন লাভ নেই। নিজের অন্তরের পানে তাকানোই লাভজনক। আমাদের ব্যবস্থা আমরা করলে, বৃটিশেরা নিজেদের ব্যবস্থা নিজেরাই করতে পারবে। আমাদের ত্রুটি ও দুর্বলতা অনেক। আমাদের অক্ষমতার জন্য বৃটিশের উপর দোষারোপ করি কেন? সাম্প্রদায়িক সমস্তার সমাধান করতে না পারলে স্বাধীনতা লাভ অসম্ভব। সমস্যা সমাধানের দুটি মাত্র পথ আছে—অহিংসার রাজকীয় পথ এবং হিংসার পথ।

পনেরো দিন ধরে আলোচনা করে বড়লাট গান্ধিজীর শর্তে রাজী হলেন :

রাজনৈতিক বন্দীদের ছেড়ে দেওয়া হবে।

সব ক'টি অর্ডিন্যান্স তুলে দেওয়া হবে।

লবণ প্রস্তুতের স্বাধীনতা দেওয়া হবে।

শান্তিপূর্ণ বয়কটে বাধা দেওয়া হবে না।

এবং গান্ধিজী রাজী হলেন বিলাতে যে দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠক বসবে, তাতে ভারতের পক্ষে কথা বলার জন্য তিনি বিলাতে যাবেন।

এই চুক্তি সম্পর্কে দেশবাসীর কাছে গান্ধিজী বললেন—এতে কোন্ পক্ষ জয়ী হয়েছে তা বিচার করা সম্ভব নয়। আমি বলি দু'পক্ষই জয়ী হয়েছে। তবে কংগ্রেসের একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য আছে, সেই লক্ষ্যে না পৌঁছানো অবধি জয়ের প্রশ্নই ওঠে না।...

কংগ্রেসের লক্ষ্য ছিল ভারতের স্বাধীনতা—স্বরাজ।

এই স্বরাজ-পাওয়া সম্পর্কে গান্ধিজী সত্যই কি ভাবেন সেই সম্পর্কে জনকয়েক সাংবাদিক পরের দিন গান্ধিজীকে কয়েকটি প্রশ্ন করেন :

সাংবাদিক—আপনি আপনার জীবদ্দশার মধ্যে পূর্ণ স্বরাজ পাবার আশা রাখেন কি ?

গান্ধিজী—আমি দৃঢ়চিত্তে সেই লক্ষ্যের পানেই তাকিয়ে আছি। আমি এখন ইংরাজদের মত নিজেকে বাষট্টি বছরের যুবক বলে মনে করি।

সাংবাদিক—স্বরাজ না পেলে কি আপনি সবরমতী আশ্রমে ফিরে যাবেন না ?

গান্ধিজী—না। পূর্ণ স্বরাজ লাভের ব্রত উদ্‌যাপিত না হওয়া পর্যন্ত আশ্রমে গিয়ে আমি থাকবো না।

সাংবাদিক—'পূর্ণ স্বরাজ' সম্বন্ধে আপনার ধারণা কি ?

গান্ধিজী—পূর্ণ স্বরাজের ভিত্তি হবে পূর্ণ সাম্য। সেই সাম্য সম্বন্ধে জনসাধারণের কোন ধারণা নেই। সাম্য বলতে আমি বুঝি বিলাতের ডাউনিং-স্ট্রীট ভারত শাসনের কেন্দ্র না হয়ে দিল্লী কেন্দ্র হবে।...বৃটিশ বাস্তববাদী জাত, স্বজাতির স্বাধীনতা তারা ভালবাসে, তারা আরেক পদ অগ্রসর হবে যখন তারা অপরের স্বাধীনতা স্বীকার করে নেবে। ভারতকে সমান অধিকার দেবার সময় যদি কখনও আসে, তাহলে আমি জানি, বৃটিশেরা বলবে যে এইটাই তারা চিরদিন চেয়েছিল।

সাংবাদিক—ইংরাজেরা অন্য দেশ শাসন করুক এই কি পছন্দ করেন।

গান্ধিজী—আমার পছন্দ করার কোন প্রশ্ন ওঠে না। আমি শুধু নিজের দ্বারাই শাসিত হতে চাই।

সাংবাদিক—বৃটীশ পতাকাতলে 'পূর্ণ স্বরাজ' লাভ কি আপনি পছন্দ করেন?

গান্ধিজী—না, বর্তমান পতাকা আমি মেনে নিতে রাজী নই। যদি সম্ভব হয় একটি সাধারণ পতাকা চলতে পারে। প্রয়োজন হলে পৃথক পতাকা করতে হবে।

সাংবাদিক—হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য আসতে কি বহু বছর লাগবে?

গান্ধিজী—আমার তা মনে হয় না। হিন্দু-মুসলমান জনসাধারণের মধ্যে কোন অনৈক্য নেই। যে অনৈক্যকে আমরা এতো বড় বলে গণ্য করছি তা উপরের স্তরের। এই উপরের স্তরের মানুষগুলিই ভারতের রাজনীতিক মনোভাবের প্রতিভূ।

সাংবাদিক—'পূর্ণ স্বরাজ' পাবার পর আপনি কি জাতীয় সৈন্যবাহিনী তুলে দেবেন?

গান্ধিজী—আদর্শবাদী হিসাবে বলবো 'হ্যাঁ'। কিন্তু আমার জীবদ্দশায় আমি তা দেখতে পাব বলে মনে হয় না। কোন সৈন্যবাহিনী না রাখার মত অবস্থায় পৌঁছাতে ভারতবাসীর বহু বৎসর লাগবে।···

সাংবাদিক—অদূর ভবিষ্যতে বলশেভিকরা ভারত আক্রমণ করতে পারে বলে কি আপনি মনে করেন?

গান্ধিজী—না, সে ভয় আমার নেই।

সাংবাদিক—বলশেভিক নীতি ভারতে বিস্তার লাভ করছে বলে কি আপনি শংকিত?

গান্ধিজী—ভারতবাসীকে অতো দুর্বল বলে আমি মনে করি না।

সাংবাদিক—বলশেভিকবাদের মধ্যে ভালো কিছু আছে বলে আপনি মনে করেন?

গান্ধিজী—ভালো যদি কিছু থাকে, ভারতবাসী তা গ্রহণ করতে ইতস্তত: করবে না।

সাংবাদিক—আপনি ভবিষ্যৎ গবর্মেণ্টে প্রধান মন্ত্রী হতে রাজী আছেন?

গান্ধিজী—না। যাদের মনের যৌবন আছে, হাতে শক্তি আছে তাদের জন্য সে পদ রিজার্ভ থাকবে।

সাংবাদিক—যদি জনসাধারণ আপনাকে চায়?

গান্ধিজী—আমি তাহলে আপনাদের মত সাংবাদিকদের আড়ালে লুকাবো।

জনৈক মার্কিন সাংবাদিক—পূর্ণ স্বরাজ পাবার পর আপনি কি কল-কারখানা তুলে দেবেন?

গান্ধিজী—মোটেই না। বরং আমেরিকা ও বৃটেনে বেশী কলকব্জার অর্ডার দোব।

সাংবাদিক—আপনি কি বিশ্বাস করেন যে অহিংসা আন্তর্জাতিক জটিলতার সমাধান করতে পারবে ?

গান্ধিজী—আমি বিশ্বাস করি অহিংসা তা পারবে। ভারতবর্ষ এবং অন্যান্য দেশে সৈন্য হয়তো থাকবে, কিন্তু মনোভাব বদলে যাবে। জাতিগুলি সৈন্য বাহিনীর চেয়ে আলাপ আলোচনার উপর বেশী আস্থা রাখবে। সৈন্য বাহিনী শেষে দর্শনীয় বস্তু হয়ে দাঁড়াবে, ঠিক পুতুলের মত, অতীতের একটা শেষ চিহ্নের মত, জাতির রক্ষক হিসাবে নয়।

এই প্রশ্ন উত্তরের ভিতর দিয়ে সাধারণের কাছে গান্ধিজীর নীতি স্বচ্ছ হয়ে উঠলো।

গান্ধি-আরুইন চুক্তির সর্তগুলি বিভিন্ন প্রদেশের লাট সাহেবেরা ঠিকমত মেনে নিল না। চারিদিক থেকেই পুলিশের অনাচারের খবর আসতে লাগলো।

অবস্থা চরমে উঠলো, লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার বিচার নিয়ে। সাণ্ডার্স সাহেবের হত্যার ব্যাপারে ভগৎসিং, রাজগুরু ও শুকদেবের ফাঁসীর হুকুম হয়েছিল। গান্ধিজী বড়লাটের সঙ্গে দেখা করলেন, অনেক আলোচনা করলেন, এঁদের প্রাণদণ্ড মকুব করার জন্য চেষ্টার কোন ত্রুটি রাখলেন না।

কিন্তু বড়লাট বাহাদুর গান্ধিজীর অনুরোধ রাখলেন না। ওই তিনজনের চুপি চুপি ফাঁসী দেওয়া হোল।

করাচিতে তখন কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন হবার উদ্যোগ হচ্ছে, এমন সময় খবর ছড়িয়ে পড়লো। সারা ভারতের তরুণেরা ক্ষুব্ধ হয়ে উঠলো, করাচি থেকে বারো মাইল দূরে গান্ধিজী ট্রেণ থেকে নাবতেই করাচির ছেলেরা কালো নিশান দেখিয়ে বিক্ষোভ প্রকাশ করলো, গান্ধিজীকে তারা উপহার দিল কালো ফুলের তোড়া। সুভাষবাবুকে সভাপতি করে 'নওজোয়ান সভার' বৈঠক বসলো, তারা বললো—গান্ধিজী ভুল করেছেন, ইংরাজদের সঙ্গে সন্ধি করা চলে না।

ভগৎ সিংয়ের দলের ফাঁসীর সম্পর্কে চরম নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত কংগ্রেসের বৈঠক বসার কোন প্রয়োজন নেই, মনে করে 'নওজোয়ানেরা' কংগ্রেসের অধিবেশনের বিরোধী হয়ে দাঁড়ালো। দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন ও অন্যান্য নেতারা অনেক চেষ্টা করে তাদের শান্ত করলেন, গান্ধিজী সুভাষ বাবুকে ডেকে পাঠালেন নিজের কাছে।

কংগ্রেসের অধিবেশন বসলো বটে, কিন্তু তরুণদলের কাছে গান্ধিজীর জনপ্রিয়তা কমে গেল, ইংরাজের সঙ্গে তখনই একটা বোঝাপড়া করার জন্য তখন সারা দেশ চঞ্চল।

গান্ধিজীও গবর্মেন্টের এই শঠতায় কম ক্ষুণ্ণ হন নি, কিন্তু চল্লিশ কোটি নরনারীর শুভাশুভ তাঁর উপর নির্ভর করছে, উত্তেজনার বশে হঠাৎ কিছু করে ফেলা তো তাঁর সাজে না। বাহিরে বিশেষ কোন ভাবান্তর প্রকাশ পেল না, মনের ব্যথা মনে রেখে, বোম্বাইয়ে তিনি আরুইনের সঙ্গে দেখা করলেন, আরুইন বিলাত যাচ্ছিলেন, গান্ধিজী বন্ধুভাবেই তাঁকে বিদায় অভিবাদন জানালেন।

নতুন বড়লাট এলেন লর্ড উইলিংডন। নতুন করে সরকারী জুলুম সুরু হোল—ধরপাকড়, লাঠিবাজী! গান্ধিজী ক্ষুণ্ণ হলেন, বড়লাটকে তিনি জানিয়ে দিলেন—দেশের বর্তমান অবস্থায় তাঁর পক্ষে গোল টেবিল বৈঠকে যোগ দিতে যাওয়া সম্ভব নয়, সরকার আরুইনের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছে।

টিকিট কাটা হয়েছিল, মহাত্মাজী, সরোজিনী নাইডু ও পণ্ডিত মালব্য তা বাতিল করে দিলেন।

আবার নতুন করে বড়লাটের সঙ্গে গান্ধিজীর কথাবার্তা সুরু হোল, নতুন করে সন্ধির বিচার করা হোল। লর্ড উইলিংডন নতি স্বীকার করলেন। গান্ধিজী রাজী হলেন বিলাত যেতে। তখন আর বেশী সময় হাতে ছিল না, ঠিক সময় গান্ধিজী যেন জাহাজ ধরতে পারেন, সেজন্য স্পেশ্যাল ট্রেনের ব্যবস্থা হোল।

গান্ধিজী বিলাতে যাচ্ছেন, খবর ছড়িয়ে পড়লো।

রাত দুপুরে গান্ধিজী বোম্বাইয়ে নাবলেন, হাজার হাজার লোক তাঁর জন্য অপেক্ষা করছিল। অতো রাতেই আজাদ ময়দানে বিরাট সভা বসলো মহাত্মাজীকে বিদায় জানাবার জন্য। গান্ধিজী বললেন—ভারতের কোটি কোটি লোক পেট ভরে খেতে পায় না। তাদের অবস্থার উন্নতির জন্য কংগ্রেস চেষ্টা করছে। সেই কংগ্রেসের নির্দেশেই আমি বিলাত যাচ্ছি। যদি আমি সেই বিশ্বাস না রাখতে পারি তাহলে তোমরা আমাকে কংগ্রেস থেকে তাড়িয়ে দিও, ইচ্ছা হলে আমাকে খুন করতে পার, তা আমি অহিংসা বলেই মনে করবো।···ইংরাজ, মুসলমান, খৃস্টান, শিখ, কারুর বিরুদ্ধেই আমার কোন বিদ্বেষ নেই। সকলের অধিকারই আমার কাছে সমান।—ইহাই আমার ধর্ম। তোমরা আমাকে আশীর্বাদ কর, তোমাদের শুভেচ্ছা পেলে আমি জয়যুক্ত হব, ভগবান আমাকে আশীর্বাদ করুন।

জনতা অভিনন্দন জানালো—গান্ধিজীকি জয়! বন্দেমাতরম!!

পরদিন দুপুর সাড়ে বারোটার সময় গান্ধিজী রাজপুতানা জাহাজে গিয়ে উঠলেন। তাঁকে জাহাজে উঠিয়ে দিতে এলেন বোম্বাইয়ের প্রধান বিচারপতি স্যার পুরুষোত্তম দাস, পণ্ডিত জহরলাল, সর্দার বল্লভভাই, শেঠ যমুনালাল ও দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন।

জাহাজে আর কারুর ওঠার হুকুম ছিল না, কিন্তু কে কার কথা শোনে? কত লোক এসে গান্ধিজীর গলায় ফুলের মালা পরিয়ে দিল। জেটীতে শত শত কংগ্রেস ভলেনটিয়ারের মুখে বিউগিল বেজে উঠলো, গেরুয়া শাড়ী পরা স্বেচ্ছাসেবিকারা পতাকা উড়িয়ে গার্ড-অব-অনার জানালো। স্মিত হাস্যে হাত জোড় করে গান্ধিজী বিদায় নিলেন। জাহাজ ছেড়ে দিল।

১৯৩১ সালের ১৫ই আগষ্ট।

বেলা একটার সময় বোম্বাই বন্দর থেকে 'রাজপুতানা' জাহাজ ছাড়লো। ডেকের উপর রেলিংয়ের ধারে দাঁড়িয়ে ছিলেন মহাত্মাজী, আর তাঁর পাশে ছিলেন পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য, শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু, শ্রীমতী মীরা বেন, মহাদেব দেশাই, শ্রীদেবদাস গান্ধী, স্যার প্রভাশংকর পট্টনি, প্যারীলাল, ও ঘনশ্যাম দাস বিরলা।

সামনে জেটীর উপর দণ্ডায়মান শত সহস্র মানুষের জনতা, ক্রমশঃ যাত্রীদের চোখের সামনে অস্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে। দূর থেকে দূরান্তরে মিলিয়ে যাচ্ছে তাদের জয়ধ্বনি—'বন্দেমাতরম্! মহাত্মাজীকি জয়'! নীল জলরাশি চারিপাশের দিগন্তের সীমানাকে ডুবিয়ে দিল। রেলিংয়ের ধার থেকে মহাত্মাজী সরে এলেন দ্বিতীয় শ্রেণীর ডেকের পাশে যেখানে তাঁর মাল-পত্তর ছিল।

স্যুটকেশ আর বিছানাপত্তরের বাহুল্য দেখে মহাত্মাজী চমকে উঠলেন, বললেন —এতো জিনিষ কি হবে? আমরা জগতের সব চেয়ে গরীব দেশের প্রতিনিধি হয়ে যাচ্ছি, সেখানে আমাদের সেই মতই চলতে হবে। সিমলাতেও তো শীত কম পড়ে না, সেখানে তোমরা একখানি ধুতি, একটি জামা আর একজোড়া স্যাণ্ডেল পরে চালিয়ে দিয়েছ, আর লণ্ডনে সে ভাবে চলতে পারবে না? সেখানে কি এতোই শীত পড়ে!

কাজেই অতি প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রগুলি ছাড়া বাকী সব এডেন থেকে ফেরৎ পাঠানোর ব্যবস্থা হোল।

মহাত্মাজী ডেকের একপাশে একটু জায়গা বেছে নিলেন, সেইখানে একখানি খদ্দরের চাদর বিছিয়ে তিনি চরকা নিয়ে বসলেন।

চরকা কাটতে কাটতে কোন এক সময় হয়তো অবসাদ জাগে, ডেকের উপর খানিকটা বেড়িয়ে নেন। হাঁটু অবধি কাপড়-পরা মানুষটির পানে ছিমছাম সাহেব মেমেরা তাকিয়ে দেখে। এই বাষট্টি বছরের অর্ধনগ্ন সন্ন্যাসী সারা ভারতের চল্লিশ কোটি নরনারীর মনকে কেমন করে জয় করলো তাই ভাবে হয়তো!

ওদিকে জাহাজের বেতার যন্ত্রে একটির পর একটি অভিনন্দন-বাণী আসতে থাকে এই মানুষটিকে উদ্দেশ করে:—

—'সিটি অফ বরোদা' জাহাজের যাত্রীরা আপনাকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছে—

—'ক্রকেভিয়া' জাহাজের যাত্রীরা আপনার সাফল্য কামনা করে—

—'বৃটিশ সোমালিল্যাণ্ডের' 'বারবারা' সহরের বাসিন্দারা আপনাকে আনন্দ-অভিবাদন জানাচ্ছে।

—মিশরের মা, জগলুল পাশার পত্নী জানাচ্ছেন—মহাভারতের মহান জননায়ককে আমার আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি, সর্বান্তঃকরণে আপনার সাফল্য কামনা করি—

—কায়রোর 'অল্‌বলঘ' সংবাদপত্র আপনার ভিতর দিয়ে ভারতকে নমস্কার করছে। কনফারেন্সে ভারতীয় প্রচেষ্টার সাফল্য কামনা করি।

—ওয়াফ্‌দ সম্প্রদায়ের সভাপতি মুস্তাফা এল্‌ নাহাশ পাশা জানাচ্ছেন—স্বাধীনতা-কামী মিশরের পক্ষ থেকে ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ নেতা আপনাকে আজ আমি অভিনন্দিত করছি। আপনার যাত্রাপথ নিরাপদ হোক, ভগবান আপনার উদ্দেশ্য পূর্ণ করুন। আপনার সংকল্প যেমন উদার, আপনার সাফল্যও তদনুযায়ী হোক। আপনার প্রত্যাবর্তন শুভ হোক। যখন আপনি ফিরবেন তখন আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করার আনন্দলাভ করবো,—আমার দেশবাসীও তখন আপনাকে দেখার আনন্দ লাভ করবে। আদর্শ বজায় রাখার জন্য আপনি যে বিরাট ত্যাগ স্বীকার করেছেন তার জন্য মিশরবাসীরা সেই সময় আপনাকে আন্তরিক শ্রদ্ধা ও সম্মান জ্ঞাপন করবে। ভগবান আপনার জীবন দীর্ঘ করুন, আপনার চেষ্টাকে জয়যুক্ত করুন!

মহাত্মাজীর কাছে বার্তাগুলি পৌঁছে দেওয়া হয়, সহাস্যে তিনি সেগুলি পাঠ করেন, তারপর আবার চরকার হাতল ঘুরিয়ে চলেন।

ছোট ছোট ইংরাজ ছেলেমেয়েরা মহাত্মাজীকে ঘিরে বসে, বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে,—দেখে কি ভাবে তুলো থেকে সুতো বেরিয়ে আসে, চাকা ঘুরে···মহাত্মাজী তাদের মুখের পানে তাকিয়ে তাকিয়ে হাসেন, কখনো বা কারুর কান ধরে টানেন, কখন বা কারুর পিঠে একটা চাপড় মারেন—দেখতে দেখতে দিব্যি বন্ধুত্ব জমে ওঠে।

মহাত্মাজী কেবিনে খেতে গেছেন এমন সময় আস্তে আস্তে দরজাটি ঠেলে একটি ছোট মুখ দরজায় উঁকি মারলো। মহাত্মাজী হাসলেন, জিজ্ঞাসা করলেন—কি চাই? ভেতরে এসো—

হাসতে হাসতে ছেলেটি সামনে এসে দাঁড়ালো, তার লোভী দৃষ্টি ছিল থালার আঙুরগুলির পানে। মহাত্মাজী হেসে আঙুরের থালাটি তার হাতে তুলে দিলেন। ছেলেটি একদৌড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

একটু বাদেই খালি থালাখানি সে ফিরিয়ে দিয়ে গেল।

জাহাজ এসে লাগ্‌লো এডেনে।

সেখানকার ভারতীয়েরা মহাত্মাজীকে নিয়ে গেল এক অভিনন্দন সভায়।

কিন্তু সভা স্থুরু হবার আগেই এক গোলযোগ বাধলো। ওখানকার শাসনকর্তা বললেন সভায় ভারতীয় জাতীয় পাতাকা ওড়ানো চলবে না।

মহাত্মাজী বললেন—ভারতীয়দের সভায় জাতীয় পতাকা উড়বে না, এ আমি কল্পনাও করতে পারি না। যে পতাকার জন্য লোকে প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দিয়েছে সেই জাতীয় পতাকাকে বাদ দিয়ে ভারতের কোন জন-নায়ককেই সম্মান দেখানো যেতে পারে না। সভায় আমি যাব না।

এডেনে ৫৩০০০ লোকের বাস, তার মধ্যে ৫৫০০ জন ভারতীয়,—শতকরা দশ-জনেরও বেশী। এরা সবাই মিলে একটা গোলযোগ বাধিয়ে তুলবে দেখে শেষে প্রেসিডেণ্ট তাঁর মত পাল্‌টালেন—সভার মাঝে তিনরঙা নিশান উড়লো।

গান্ধিজীও সভায় গেলেন।

সেখানকার বাসিন্দারা মহাত্মাকে অভিনন্দিত করে ৩২৮ খানি গিনি উপহার দিল।

মার্সেঁইতে মহাত্মাজী জাহাজ থেকে নামলেন। দীনবন্ধু এণ্ড্রুজ তখন ওখানে ছিলেন, তাঁর সঙ্গে এলো একদল ছাত্র, বললো—আপনাকে যেতে হবে আমাদের সভায়!

বন্দর থেকে সভা অবধি পথের মাঝে দু'সারি মানুষ দাঁড়িয়েছিল, ভারতের এই অর্ধনগ্ন জননায়কটিকে দেখার জন্য!

সভায় গান্ধিজী অহিংসার কথা বলেন—

> অহিংসা দুর্বলের অস্ত্র নয়, সর্বাপেক্ষা শক্তিমান লোকের হাতিয়ার। একজন শক্তিমান জুলু একজন য়ুরোপীয়ান বালকের হাতে একটি রিভলভার দেখলে দাঁড়িয়ে কাঁপতে থাকে। কিন্তু ভারতের রমণীরা পুলিশের লাঠির আঘাতে বিচলিত হয় না, অকম্পিত দেহে দাঁড়িয়ে থাকে। যুদ্ধে শত্রুকে হত্যা করা বা শত্রুর হাতে হত হওয়া খুবই সাহসের পরিচায়ক। কিন্তু শত্রুর আক্রমণ সহ্য করা ও সেজন্য কোন প্রতিশোধ গ্রহণ না করা তার চেয়েও বেশী সাহসের কাজ…

মার্সেঁই থেকে মহাত্মাজী ট্রেনে উঠলেন।

পথে প্যারিস ষ্টেশনে সাংবাদিকেরা গান্ধিজীকে ঘিরে ধরলো, তাদের পিছনে প্লাটফর্মভর্তি জনতা। সবাই ষ্টেশন মাষ্টারকে বললো ট্রেন পাঁচ মিনিট পরে ছাড়লেও চলবে, কিন্তু এই মহামানবকে একবার ভালো করে দেখে নেবার, ছুটো মুখের কথা শোনার এই স্থযোগ ছেড়ে দেওয়া চলবে না।

সাংবাদিকেরা কথাবার্তা স্থরু করলেন।

ট্রেনখানি ক' মিনিট দেরী করেই ছাড়লো।

ইতালি ও ফ্রান্সে গান্ধিজীর এই জনপ্রিয়তা সকল ইংরাজের সহ্য হোল না।

'ডেলিমেল' লিখলো—অভ্যর্থনার দীনতায় মিষ্টার গান্ধী নিরাশ হয়েছেন…

'ইভ্‌নিং ষ্ট্যাণ্ডার্ড' মহাত্মাজীর ব্যক্তিত্বকে ছোট করে দেখানোর জন্ত লিখলো—প্রিন্স-অফ-ওয়েল্‌স যখন ভারতে আসেন মিষ্টার গান্ধী তখন তার সামনে সাষ্টাঙ্গে লুটিয়ে পড়েছিলেন।

তবু লণ্ডনে যখন মহাত্মাজী ট্রেন থেকে নামলেন তখন ষ্টেশনে ভীড় কম ছিল না। মোটার প্রস্তুত ছিল, বরাবর মহাত্মাজীকে নিয়ে আসা হোল 'ফ্রেণ্ডস মিটিং হলে'। হলটির ভিতরে তখন তিল ধরণের স্থান ছিল না, বাইরে পথের উপর হাজার হাজার নরনারী বৃষ্টির মাঝে দাঁড়িয়ে ভিজছিল—মহাত্মাজীকে একবার দেখার জন্য, মুখের ছুটো কথা শোনার জন্ত।

ইষ্ট-এণ্ড লণ্ডনের গরীব পল্লী। সেখানে মুরিয়েল লিষ্টারের আশ্রম 'কিংসলি হলে' মহাত্মাজী আশ্রয় নিলেন।

গোল টেবিল বৈঠক বসেছিল সেণ্ট-জেম্‌স্‌ প্রাসাদে। কিংসলি হল থেকে অনেকটা পথ। স্থবিধার জন্ত অনেকে বললো—ওয়েষ্ট-এণ্ডে আমার বাড়ীতে এসে থাকুন।

কিন্তু গান্ধিজী গরীব পাড়া ছাড়তে রাজী হলেন না।

ছু'চার দিনেই পাড়ার গরীব ছেলেমেয়েদের সঙ্গে তাঁর দিব্যি ভাব জমে গেল তিনি হলেন তাঁদের—গান্ধিখুড়ো।

সকালে গান্ধিজী প্রাতঃ ভ্রমণে বেরুতেন, ঝির ঝির করে বরফ পড়ছে, কনকনে শীতের হাওয়া। বিশেষ প্রয়োজন না থাকলে তখন মানুষ পথে বেরোয় না, খদ্দরের শাদা চাদরখানি গায় দিয়ে গান্ধিজী তখন ভ্রমণে বের হলেন, এক জোড়া

মোজা অবধি পায় নাই, স্যাণ্ডেল পরে নির্বিবাদে তিনি তুষারাচ্ছন্ন পথের উপর হেঁটে চলেন। বাষট্টি বছরের মানুষ, কিন্তু শীতকে তিনি জয় করেছেন।

একদিন চেয়ারিং ক্রশ ষ্টেশনের কাছে মহাত্মাজী এইভাবে বেড়াচ্ছেন। তখনও লণ্ডন শহরের ঘুম ভাঙেনি।

এক ট্যাক্সি ড্রাইভার ওভার-কোট মুড়ি দিয়ে গাড়ীর মধ্যে বসেছিল, হঠাৎ তার চোখে পড়লো পথের উপর দিয়ে একটি লোক হেঁটে চলেছে। বুড়ো মানুষ সামনের দিকে ঝুঁকে পড়েছে অথচ গায়ে একটা গরম কোট নেই, পায়ে মোজা নেই, একখানি শাদা সুতির চাদর গায়, এক জোড়া চপ্পল পায়, হন হন করে হাঁটছে। ও কোন মানুষ নয়, নিশ্চয়ই অশরীরী কোন আত্মা—কোন ভূত!

লোকটি তার গাড়ীর কাছাকাছি এসে পড়েছে, এবার বোধ হয় তাকে ধরবে, গাড়ীর উলটো দিকের দরজা খুলে পথে নেবেই সে ছুট দিল।

তারপর যখন সে শুন্‌লো যে ইনিই গান্ধিজী, তখন বললো—অমন মানুষের পক্ষেই এই তুষারাচ্ছন্ন পথে মোজা পায়ে না দিয়ে বেড়ানো সম্ভব!

ছোট ছেলেমেয়েরা তাঁকে পথে দেখতে পেলেই সামনে এসে দাঁড়াতো, দু'হাত তুলে বলতো—গান্ধিখুড়ো, নমস্কার!

চরকা কাটার সময় ছেলের দল কাছে এসে বসতো, গল্প করতো, কেউ বলতো—গান্ধিখুড়ো, আপনি কি খান?

কেউ বা জিজ্ঞাসা করতো—গান্ধিখুড়ো, আপনি জুতো পারেন না কেন?

২রা অক্টোবর তারা গান্ধিজীর জন্ম উৎসব করলো। যার যেমন খেল্‌না পছন্দ, পাঠিয়ে দিল খুড়োর কাছে, কেউ বা লিখে দিল—খুড়ো, এমনি জন্মতিথি যেন তোমার জীবনে বার বার ফিরে আসে।

আবার কেউ বা এসে নিমন্ত্রণ করলো—খুড়ো, তুমি আমাদের ওখানে চলো তোমার জন্মদিনে আমরা বাজনা বাজাব, গান গাইব, মোমবাতি জ্বালিয়ে উৎসব করবো।

একদিন এক দুষ্টু মেয়েকে তার বাবা ধরে আনলো গান্ধিজীর কাছে। বললো—আমি সকালে উঠতে পারি না, আর জেন রোজ কিল-চড় মেরে আমাকে ঘুম থেকে তুলে দেয়, বলে—'বেলা অবধি ঘুমুতে নেই, দেখনা গান্ধিখুড়ো কত ভোরে ওঠে!' রেগে মারতে উঠলে বলে—'জান না, গান্ধিখুড়ো বলেছেন, মার খেয়ে মার ফিরিয়ে দিতে নেই!' আপনি ওকে একটু বকে দিন।

ছ'সাত বছরের মেয়ে জেন বলে—আমি কি মিছে কথা বলেছি খুড়ো? তুমি বল না—'মার খেয়ে মার ফিরিয়ে দিতে নেই'?

মহাত্মাজী হেসে বললেন—নিজে না মেনে তোমার বাবাকেই বুঝি সেটা আগে মানাতে চাও।

দ্বিতীয় গোল টেবিল বৈঠক সুরু হোল ১৪ই সেপ্টেম্বর থেকে।

লণ্ডনের সেণ্ট জেম্‌স্ প্রাসাদ।

লর্ড স্যাংকি ছিলেন সভাপতি। আর সভাপতির বাঁপাশের প্রথম আসন দেওয়া হয়েছিল মহাত্মাজীকে।

এই বৈঠক চলেছিল এগারো সপ্তাহ।

যেদিন অধিবেশন সুরু হোল সেদিন মহাত্মাজীর মৌন-দিবস, কোন কথাই তিনি বললেন না। পরদিন পুরো এক ঘণ্টা বক্তৃতায় ভারতবাসীর অধিকার সম্পর্কে যা কিছু বলা দরকার তার সবই তিনি বলেন।

মহাত্মাজী কংগ্রেসের পরিচয় দেন প্রথমেই :

> ভারতের যতগুলি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান আছে, কংগ্রেস তাদের মধ্যে সব চেয়ে পুরানো। কংগ্রেসের বয়স পঞ্চাশ বছর।…এর প্রথম পরিকল্পনা একজন ইংরাজের—এলেন অকটোভিয়ান হিউম।…স্যার ফিরোজসা মেটা ও দাদাভাই নৌরজী ছিলেন পার্শী।…রেভারেণ্ড কালীচরণ ব্যানার্জী ছিলেন ইণ্ডিয়ান খৃস্টান।…মৌলানা মহম্মদ আলী কংগ্রেসের সভাপতি হয়েছিলেন। আনি বেশান্ত ও সরোজিনী নাইডু সভানেত্রী হয়েছিলেন।…কংগ্রেস ধর্ম ও সম্প্রদায়কে প্রাধান্য দেয় না। কংগ্রেস স্ত্রী-পুরুষও ভেদ করে না।…সামন্ত রাজাদের পক্ষও কংগ্রেস গ্রহণ করেছে। দাদাভাই নৌরজী কাশ্মীর ও মহীশূরের পক্ষ গ্রহণ করেন, এই দুটি রাজবংশের ঋণ কংগ্রেসের কাছে সামান্য নয়।… কংগ্রেস নিখিল ভারত চরকা সমিতি মারফৎ দু'হাজার গ্রামে আশী হাজার নর-নারীকে কাজ দিয়েছে এবং তাদের প্রায় অর্ধেকই মুসলমান।…কংগ্রেস ভারতবর্ষের কৃষকদেরও প্রতিনিধি। আমার এই মত সম্পর্কে যদি কেহ প্রতিবাদ করেন, আমি তাঁকে বিতর্কে আহ্বান করছি।… এখনও যদি ভারতীয় জেলের কাগজপত্র আপনারা পরীক্ষা করেন তবে বহুসংখ্যক মুসলমানকে কংগ্রেসের প্রতিনিধি হিসাবে দেখতে পাবেন। কংগ্রেসের নামে কয়েক হাজার মুসলমান গত বছর জেলে গিয়েছিল, আজও কংগ্রেসের খাতাপত্রে কয়েক হাজার মুসলমানের নাম পাওয়া যাবে।… হাজার হাজার অস্পৃশ্যের নামও কংগ্রেসের খাতাপত্রে আছে, বহু ভারতীয়

খৃস্টানকেও খাতাপত্রে দেখতে পাওয়া যাবে।…জমিদার, মিলের মালিক ও ক্রোড়পতিও কংগ্রেসের মধ্যে আছেন।

সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা ও অস্পৃশ্যদের ভেদাভেদ সম্পর্কে মহাত্মাজী বলেন:

কংগ্রেস কোন সংখ্যা লঘিষ্টদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা বা বিশেষ নির্বাচন সঙ্ঘ স্বীকার করবে না।…তাতে দায়িত্বশীল শাসনতন্ত্রকে অস্বীকার করা হয়।… ডাক্তার আম্বেদকর ভারতীয় অস্পৃশ্যদের পক্ষ থেকে যে দাবী পেশ করেছেন সে দাবী পেশ করার অধিকার তাঁর নেই।…ইহাদ্বারা হিন্দুধর্মের ভিতর একটি ভেদ সৃষ্টি করা হবে। সেই বিভেদকে আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। অস্পৃশ্যেরা যদি ইসলাম বা খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করে, তাতে আমার আপত্তি নেই, কিন্তু প্রত্যেক গ্রামে গ্রামে যদি হিন্দুধর্ম দু'ভাগ হয়ে যায় তবে তার ফলে হিন্দুদের অবস্থা যা হবে তা সহ্য করা আমার পক্ষে অসম্ভব।…এই ব্যবস্থার প্রতিরোধ করার জন্য যদি আমাকে একাই দাঁড়াতে হয়, আমি তাই করবো, সেজন্য যদি জীবন দিতে হয় তাতেও আমি পশ্চাৎ-পদ হব না।…অস্পৃশ্যেরা কি চিরকাল অস্পৃশ্য হয়ে থাকবে?…আমি নিজেই বিরাট অস্পৃশ্য জনসঙ্ঘের প্রতিনিধিত্ব দাবী করি। অস্পৃশ্যদের যদি ভোট দিতে বলা হয় তাহলে আমার বিশ্বাস আমিই তাদের সবচেয়ে বেশী ভোট পাব।…

হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ সম্পর্কে মহাত্মাজী বলেন—

গ্রামে আজও হিন্দু-মুসলমানের ভিতর ঝগড়া নেই…এ বিরোধ ইংরাজ আসার সঙ্গে সঙ্গে দেখা দিয়েছে। যে মুহূর্তে গ্রেট বৃটেনের সঙ্গে ভারতের এই দুর্ভাগ্যময় সম্পর্ক দূর হয়ে যাবে, সেই মুহূর্তে আপনারা দেখতে পাবেন যে হিন্দু-মুসলমান, শিখ, য়ুরোপীয়ান, এ্যাংলো, খৃষ্টান, অস্পৃশ্য, সকলেই এক সঙ্গে একই রকমের মানুষের মত বসবাস করছে…

স্বাধীন ভারতের ভাবী রাষ্ট্র ব্যবস্থা কেমন হবে সেই সম্পর্কে মহাত্মাজী বলেন:

দুর্বলই হোক আর সবলই হোক, স্বাধীনতা লাভের অধিকার সকলেরই সমান বলে মনে করি, প্রত্যেক জাতির স্বাধীনতা যদি আমি না চাই,— স্বাধীনতা লাভের যোগ্যতা আমারও থাকে না।…

বৃটিশ ভারতে মোট গ্রামের সংখ্যা প্রায় পাঁচ লাখ। প্রত্যেকটি গ্রাম নিজেদের প্রতিনিধি নির্বাচন করবে এবং সেই প্রতিনিধিরা নির্বাচকমণ্ডলী গড়ে তুলবে। সেই নির্বাচকমণ্ডলী কেন্দ্রীয় বা যুক্ত ব্যবস্থাপক সভার জন্য

প্রতিনিধি নির্বাচন করবে।…ভোট দাতাদের লেখাপড়া জানতেই হবে একথা আমি মানি না। আমার দেশের লোক লেখাপড়া শেখে তা আমি চাই কিন্তু ভোট দেবার অধিকারের জন্য লেখাপড়া জানা যদি অপরিহার্য হয়ে ওঠে, তাহলে তাদের এখনও বহু বৎসর অপেক্ষা করতে হবে, আমি ততদিন অপেক্ষা করতে রাজী নই।…যাদের টাকা আছে তারাই ভোট দিতে পারবে, আর যাদের চরিত্র আছে কিন্তু অর্থ নেই, অক্ষর পরিচয় নেই, তারা ভোট দিতে পারবে না, এ ব্যবস্থা অসহনীয়।…এমন ব্যবস্থা রাখতে হবে যার বলে মনোনীত সদস্যকেও পদচ্যুত করতে পারা যাবে।…কংগ্রেস চায় প্রত্যেক প্রাপ্ত বয়স্কের ভোটাধিকার থাকবে।…

এদেশে উচ্চ পদের কর্মচারীদেরকে যেভাবে মোটা বেতন দেওয়া হয় তার প্রতিবাদ জানিয়ে মহাত্মাজী বলেন—

গড়পড়তা ভারতবাসীর দৈনিক আয় তিন পেনী মাত্র।…বৃটিশ জাতি তাদের সঙীন উঁচিয়ে এই দরিদ্র দেশের লোকদের কাছ থেকে যতদিন পারে ট্যাক্স্ আদায় করে এক-একজন রাজ কর্মচারীকে মাসিক পাঁচ হাজার, দশ হাজার, বিশ হাজার টাকা মাহিনা দেবার ব্যবস্থা করেছে। কিন্তু আমি মনে করি আমার দেশে এমন লোক অনেক আছেন যারা সাধারণ মানুষের মত সহজ সরল জীবন যাত্রা নির্বাহ করে ভালো ভাবে, খাঁটি ভাবে, উদার ভাবে, দেশের সেবা করতে দ্বিধা করবেন না।…যে সমস্ত আইনজ্ঞেরা এখানে উপস্থিত আছেন তারা সবাই আমার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন। মাহিনা সম্পর্কে সমস্ত রাজারাও আমার বিরুদ্ধে। কি ভীষণ বাধা ও প্রতিবন্ধকতার ভিতর দিয়ে কাজ করতে হচ্ছে তা আমিই জানি, কিন্তু যে মত কংগ্রেস ও আমি দৃঢ় ভাবে পোষণ করি, তা আপনাদের না জানালে আমি কর্তব্যে অবহেলার অপরাধ করতাম।…

ভারতীয় সৈন্যদল সম্পর্কে মহাত্মাজী বলেন :

সৈন্যদলের ভার আমাদের উপর সম্পূর্ণরূপে ছেড়ে দিতে হবে।…যদি ইংরাজরা মনে করেন সেজন্য একশো বছর প্রয়োজন, তবে সেই একশো বছরই কংগ্রেসের অন্ধকারে হাঁতড়ে ফেরা ছাড়া উপায় নেই।…কংগ্রেসকে এখন ভীষণ অগ্নি-পরীক্ষার ভিতর দিয়ে যেতে হবে, নানা দুঃখ সহ্য করতে হবে, প্রয়োজন হলে এবং ভগবানের অভিপ্রায় হলে বন্দুকের গুলির সামনে বুক পেতে দিতে হবে, এবং এরূপ যদি সত্যিই ঘটে তবে তা ঘটবে

পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাসের জন্য—ইংরাজ ও ভারতীয়ের দৃষ্টিভঙ্গী এক রকম নয় বলে।

ভারতীয় বিপ্লবীদের সম্পর্কে মহাত্মাজী বলেন—

আমি জানি বাংলায় হিংসাশ্রয়ী বিপ্লবীদল আছে এবং তারা কাজও করছে। এদের উপর আমার কোন রকম সহানুভূতি নেই তবে এঁদের লক্ষ্য এবং আমাদের লক্ষ্য একই।···চট্টগ্রামে একটা ছোটখাট সংস্করণের 'ব্ল্যাক এণ্ড ট্যান' নীতি অনুসৃত হচ্ছে। কলিকাতায় পতাকা প্রদর্শনী উৎসব হয়। দশটি রাস্তায় সৈন্য বাহিনীর কুচকাওয়াজ চলে, এর জন্যে যে খরচ হয়েছে সে টাকা কে দেবে? এর উদ্দেশ্যই বা কি? এতে কি বিপ্লবীরা ভয় পাবে? না কংগ্রেস আইন-অমান্য ছেড়ে দেবে? কিছুই হবে না···আমাদের ছেলেরা এই প্রদর্শনী দেখে হাসবে!···ভারতের আকাশে যতই উড়োজাহাজ উড়ুক না কেন, ভারতবর্ষে যতই বিষবাষ্প আমদানি করা হোক না কেন, তাতে কিছুমাত্র ফল হবে না। এই সব জিনিষ তরুণমতি বালকদের মনেও আজ এতটুকু চাঞ্চল্য জাগায় না। যখন তাদের সামনে গুলিগোলা চলতে থাকে তখন তারা যাতে আনন্দে নৃত্য করতে পারে, সেই শিক্ষাই তাদের দেওয়া হয়। পঁয়ত্রিশ কোটী লোক দ্বারা গঠিত এক জাতির পক্ষে স্বাধীনতা লাভের জন্য হত্যাকারীর ছোরা, বিষের পাত্র, বর্শা অথবা গুলি—কিছুই প্রয়োজন নেই। প্রয়োজন কেবল একটা ইচ্ছাশক্তির। কেবল 'না' এই কথাটি বলার মত শক্তি তাদের থাকা চাই। জাতি আজ এই 'না' কথাটাই বলতে শিখেছে।···এমন হাজার হাজার লোক আছে যারা এই শপথ গ্রহণ করেছে যে স্বাধীনতা না পাওয়া পর্যন্ত তারা নিজেও শান্তি চাইবে না, দেশকেও শান্তি দেবে না।···

কিন্তু শেষে গোল টেবিল বৈঠকের কর্মধারায় মহাত্মাজী হতাশ হয়ে পড়লেন, বৈঠকের শেষ দিনে তিনি বললেন—

আমার ভাগ্যে যাহাই হোক না কেন, গোল টেবিল বৈঠকের ভাগ্যে যাহাই ঘটুক না কেন, এই স্মৃতিটাই আমি আমার সঙ্গে বহন করে নিয়ে যাচ্ছি যে ছোট-বড় কারুর কাছ থেকেই আমি অবিচ্ছিন্ন ভদ্রতা ছাড়া আর কিছুই পাইনি। মানুষের স্নেহের যে পরিচয় আমি পেয়েছি তার জন্য ইংলণ্ডে আসা আমার সার্থক হয়েছে, মানুষের চরিত্রের উপর আমার যে বিশ্বাস আছে ইহা সেই বিশ্বাসকেই গভীরতর করেছে।

## আমাদের গান্ধিজী

বিলাতের জনগণের কাছে গান্ধিজী অত্যন্ত প্রিয় হয়ে ওঠেন, যে তিন মাস তিনি বিলাতে ছিলেন তার মধ্যে তাঁকে যে কত সভায় বক্তৃতা করতে হয় তার হিসাব নেই। যেদিন তিনি বিলাতে পৌঁছলেন তার পরদিনেই আমেরিকাবাসীদের উদ্দেশে তাঁকে এক বেতার বক্তৃতা দিতে হয়। সেই বক্তৃতায় মহাত্মাজী ভারতের আদর্শ সম্পর্কে বলেন—

> জগতের বিভিন্ন জাতি পশুর মত পরস্পরের রক্তপাত করে আজ শ্রান্ত হয়ে পড়েছে। ভারতবর্ষ এদের নতুন পথ দেখাবে—সে পথ মানবতার পথ। রক্তক্ষয়ী বিপ্লবের ভিতর দিয়ে আমি স্বাধীনতা চাই না। সেজন্য আমাকে যদি যুগ-যুগান্তর অপেক্ষা করতে হয় তাতেও আমি রাজি আছি।

মহাত্মাজী বিলাতের কয়েকটি স্থান পরিভ্রমণ করেন তার মধ্যে বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য হচ্ছে ল্যাংকাশায়ার, ম্যানচেষ্টার, অক্সফোর্ড, কেমব্রিজ প্রভৃতি।

ল্যাংকাশায়ারের শ্রমিকেরা মহাত্মাজীকে ঘিরে ধরে, ভারতে বিলিতী বস্ত্র বর্জনের ফলে তাদের কত দুর্গতি হয়েছে সেই কথা বলে। গান্ধিজী আড়াই ঘণ্টা ধরে তাদের সঙ্গে আলাপ করেন, তিনি বলেন—

> অন্য কোন দেশের অকল্যাণ করে আমার দেশের কল্যাণ করতে আমি চাই না।···এখানকার বেকারদের অবস্থা দেখে আমার দুঃখ হচ্ছে সত্যি কিন্তু এখানে তো কেউ উপোস করে কি আধপেটা খেয়ে নেই। কিন্তু আপনারা যদি ভারতবর্ষের কোন গাঁয়ে যান তাহলে দেখতে পাবেন সেখানকার লোকেরা খেতে না পেয়ে অস্থিচর্ম সার হয়ে গেছে, তাদেরকে জীবন্ত শবদেহ বললেও চলে।···ভারতের এই সব লাখ লাখ লোকের সমাধির উপর আপনাদের সম্পদকে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইবেন না।··· আপনাদের বেকার সংখ্যা ত্রিশ লাখ আর আমাদের বেকার সংখ্যা ত্রিশ কোটি। এই ত্রিশ কোটি লোক যাতে সামান্য ভাতভাত যোগাড় করতে পারে সেইজন্য তাদের হাতে আমি চরকা তুলে দিয়েছি। আমি যে আজ আপনাদের কাছে এই অর্ধনগ্ন পরিচ্ছদে এসেছি তার কারণ আমি সেই সব অর্ধাহারী অর্ধনগ্ন মূক নরনারীর একমাত্র প্রতিনিধি। আমি আপনাদের মোটেই সাহায্য করতে পারবো না, ল্যাংকাশায়ারের কাপড়ের ব্যবসাকে আগের মত পুনরুজ্জীবিত করার কোন আশা আর রাখবেন না।

বার্মিংহামের সভায় মহাত্মাজী বলেন :

> ভারতের সমস্ত দলাদলির মূলে হচ্ছে বৃটিশ শাসন। তারাই একদলকে

আরেক দলের বিরুদ্ধে লাগিয়ে দিয়ে খেলাচ্ছে।…ভারতের সমস্ত দারিদ্র্যের মূলে বৃটিশ শাসন। একদিকে লাখ লাখ লোক যখন অনাহারে থাকে আরেকদিকে তখন দিল্লী প্রাসাদে বড়লাট বাহাদুর বল-নাচের অনুষ্ঠান করেন।…আমার হাতে ক্ষমতা থাকলে দেশীয় রাজাদেরকে আমি গৃহচ্যুত করতাম।…

অক্সফোর্ডে বিখ্যাত শিক্ষাবিদ বেলিয়াল কলেজের অধ্যক্ষ ডক্টর লিণ্ডসের বাড়ীতে এক সভা বসে। গিলবার্ট মুরে, স্যার মাইকেল স্যাডলার, পি-পি-লিয়নস্ প্রভৃতি বড় বড় পণ্ডিতেরা তিনঘণ্টা ধরে মহাত্মাজীকে নানাভাবে নানা প্রশ্ন করেন। কিন্তু তাঁর কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে মহাত্মাজী এতটুকু বিব্রত বোধ করেননি।

কথা প্রসঙ্গে মহাত্মাজী পাঞ্জাবে জেনারেল ডায়ারের অত্যাচারের কথা বলেন। শ্রোতারা শিউরে উঠলো। মিসেস্ লিণ্ডসে বললেন—মিষ্টার গান্ধি, আপনি যদি মনে করেন আমরা বুকে হাঁটলে এই অত্যাচারের প্রায়শ্চিত্ত হবে, তাহলে আমরা পঞ্চাশবার বুকে হেঁটে চলতে প্রস্তুত আছি।

মহাত্মাজী বলেন—স্বেচ্ছায় পঞ্চাশবার বুকে হাঁটা যায় কিন্তু আমি কাউকে তা করতে বলি না।

২রা অক্টোবর ওখানকার ভারতীয়েরা মহাত্মাজীর জন্ম-জয়ন্তীর অনুষ্ঠান করেন। ওয়েষ্ট-মিনষ্টার প্লেসটী ফুলপাতা দিয়ে সাজানো হয়। সভায় সভাপতিত্ব করলেন ফেনার ব্রক্‌ওয়ে।

সভার পক্ষ থেকে গান্ধিজীকে একটী চরকা উপহার দেওয়া হয়।

মহাত্মাজী এখানে ভারতবাসীর নৈতিক আদর্শ সম্পর্কে বলেন—

শাসক শ্রেণীর রক্তপাত করে ভারতভূমি কোনদিনই তার স্বাধীনতা চায় না। কিন্তু স্বাধীনতা লাভের জন্য প্রয়োজন হলে ভারতবাসীরা নিজেদের রক্তে গঙ্গার জল লাল করে দেবে।…

৫ই নভেম্বর সম্রাট পঞ্চম জর্জ বাকিংহাম প্রাসাদে গান্ধিজীকে নিমন্ত্রণ করেন। গোল টেবিল বৈঠকের অন্যান্য সদস্যেরাও সেখানে নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন।

লাল ভেল্‌ভেট মোড়া সিঁড়ির উপর দিয়ে লর্ড চেম্বারলেন অর্ধনগ্ন সন্ন্যাসীর হাত ধরে সম্রাট ও সম্রাজ্ঞীর কাছে নিয়ে গিয়ে পরিচয় করিয়ে দিলেন। করমর্দন করে সম্রাট ও সম্রাজ্ঞী একান্তে মহাত্মাজীর সঙ্গে মিনিট পাঁচেক কথাবার্তা কইলেন। তারপর সম্রাট সমবেত সবাইকে চা-পানে আপ্যায়িত করলেন।

মহাত্মাজী চা খান না, আধঘন্টা অবস্থানের পর মহাদেব দেশাইয়ের হাত ধরে তিনি সেখান থেকে নিষ্ক্রান্ত হলেন।

বিলাতের অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি মহাত্মাজীর সঙ্গে দেখা করেন। তাঁদের মধ্যে চার্লি চ্যাপলিন, বার্ণার্ড শ' ও ম্যাডাম মন্তেশ্বরীর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

চার্লি চ্যাপলিনকে গান্ধিজী চিনতেন না, তিনি দেখা করতে এসেছেন শুনে মহাত্মাজী জিজ্ঞাসা করলেন—চার্লি চ্যাপলিন কে?

—অত্যন্ত জনপ্রিয় অভিনেতা, সারা পৃথিবীর মানুষকে ইনি হাসিয়েছেন।

চার্লি মহাত্মাজীর সামনে এসে বসলেন, বললেন—আপনি যন্ত্র পছন্দ করেন না, কেন?

গান্ধিজী বললেন—ভারতের কোটী কোটি চাষীরা ছ'মাস পেট ভরে খেতে পায় না তাদেরকে কাজ দেবার জন্য তাদেরকে আমি চরকা কাটতে বলি।...

—আপনার এই প্রচেষ্টা তাহলে তো কেবল বস্ত্রের সম্পর্কে।

—হ্যাঁ। অন্নে ও বস্ত্রে সমস্ত জাতির স্বয়ং-সম্পূর্ণ হওয়া দরকার। আগে আমরা তাই ছিলাম। ভবিষ্যতেও তাই হবার চেষ্টা করছি।

—কলকারখানার ভিতর দিয়ে কি তা হয় না?

—ইংলণ্ড বিরাট কল কারখানা করে প্রচুর জিনিষ প্রস্তুত করে, সেই সব জিনিষ বিক্রীর জন্য তাকে বাইরের বাজার খুঁজতে হয়। এরই নাম শোষণ। এই শোষণপন্থী ইংলণ্ড সমগ্র পৃথিবীর বিপদের কারণ। আর তা'ই যদি হয় তবে ভারতবর্ষ যন্ত্রের সাহায্যে তার প্রয়োজনের অতিরিক্ত বস্ত্র প্রস্তুত করলে সেই শোষণপন্থী ভারত জগতের কত বড় বিপদের কারণ হবে তা বোঝা মোটেই কঠিন নয়।

—ধরুন ভারত যদি রুশিয়ার মত হয়। আপনারা বেকারদের জন্য নানারূপ কাজের ব্যবস্থা করলেন এবং অর্থের সমবন্টনের ব্যবস্থা করলেন তাহলে আপনি কলকারখানা নিশ্চয়ই সমর্থন করবেন। এবং শোষণপন্থী যাতে না হতে হয় সেজন্য শ্রমিকদের কাজের সময় কমিয়ে দিয়ে বিশ্রামের সময় বাড়িয়ে দেবার ব্যবস্থা করবেন—তাই না?

—নিশ্চয়ই।

শ্রীমতী সরোজিনী নাইডুও সেখানে ছিলেন। চার্লি তাঁর সঙ্গেও নানা কথা আলোচনা করলেন। কথায় কথায় জেলখানার কথা উঠলো। চার্লি বললেন—কোন কয়েদীর সামনে আমি দাঁড়াতে পারি না। ভগবানের অনুগ্রহ না থাকলে আমাকেও

হয়তো আজ তাদেরই সঙ্গে থাকতে হোত। আমি জেলের আমূল সংস্কারের পক্ষপাতী অন্যান্য ব্যাধির মত পাপও একটা ব্যাধি, ও-ব্যাধির চিকিৎসা জেলে হওয়া উচিত নয়, হওয়া উচিত শুদ্ধি-গৃহে।

এদিকে গান্ধিজীর উপাসনার সময় হোল। চ্যাপলিন জুতো খুলে মহাত্মাজীর পাশে কার্পেটের উপর উঠে বসলেন, তাঁর সঙ্গে সান্ধ্য উপাসনা করলেন, তারপর হৃষ্ট চিত্তে বিদায় নিলেন।

দু'জনের এক সঙ্গে একখানি ছবি তোলা হোল: চার্লি শুধু গায়ে মহাত্মাজীর লাঠি ধরে বসলেন আর মহাত্মাজী চার্লির টুপিটা মাথায় দিলেন। দুজনের মুখেই প্রসন্ন হাসি। ছবির নীচে পরিচয় দেওয়া হোল—'চার্লি গান্ধী ও মহাত্মা চ্যাপ্‌লিন।'

বার্ণার্ড শ' এলেন গান্ধিজীর সঙ্গে দেখা করতে। শ' বললেন—আমি আপনার সম্পর্কে অল্প বিস্তর সংবাদ রাখি। আমার মনে হয় আপনার সঙ্গে আমার প্রকৃতি-গত একটা মিলও আছে। মানব সমাজে একটী অতি ক্ষুদ্র সম্প্রদায় আছে, আমরা দু'জন তারই অন্তর্ভুক্ত।

শ' জিজ্ঞাসা করলেন,—গোল টেবিল বৈঠকে কি আপনার ধৈর্যের সীমা পার হয়ে যাচ্ছে না?

গান্ধিজী বললেন—এ সমস্ত ব্যাপারটা একটা প্রকাণ্ড পরিহাস। বক্তৃতা শোনানো হচ্ছে, শুধু সময় কাটিয়ে দেবার জন্য, আমি জিজ্ঞাসা করে ছিলাম, তারা স্পষ্ট করে, তাদের নীতি ঘোষণা করে না কেন? তাহলে তো আমরাও স্পষ্ট বলতে পারি সে নীতি আমরা গ্রহণ করতে পারবো কি পারবো না। কিন্তু ইংরাজের রাজ-নীতি অন্য রকমের। এরা জটিলতা সৃষ্টি করে।

শ'য়ের সঙ্গে নানা বিষয়ে প্রায় ঘণ্টা খানেক মহাত্মাজীর আলোচনা হয়।

জগৎ বিখ্যাত শিক্ষাবিদ ম্যাডাম মন্তেশ্বরী মহাত্মাজীকে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে গিয়ে-ছিলেন তাঁর এক ইস্কুলে ইসলিংটন গ্রামে। সেখানকার ছেলে মেয়েরা রীতিমত ভারতীয় কায়দায় গান্ধিজীকে নমস্কার জানালো। তাদের গান বাজনা শুনে মহাত্মাজী খুসি হন। সভার শেষে তিনি সখেদে বলেন—ভারতের জীর্ণ কুটিরে যে সব বালক বালিকা বাস করে তাদেরকে প্রকৃত ও জীবন্ত শিক্ষা দেবার সমস্যা আমাদের একটা

বড় সমস্যা! কিন্তু এ সমস্যা সমাধানের প্রধান উপায়ই আমাদের নেই, শিক্ষকদের স্বেচ্ছাকৃত সাহায্যের উপরেই আমাদেরকে নির্ভর করতে হয়।

বিলাতে কিভাবে মহাত্মাজীর দিন কাটতো তার একটা হিসাব দিয়েছেন ক্লেয়ার সেরিডন। ইনি একজন প্রসিদ্ধ শিল্পী, কয়েকদিন গান্ধিজীর কাছে কাছে ছিলেন তাঁর একখানি ছবি আঁকার জন্য।

সকালে ১০টা থেকে ১২টা পর্যন্ত ছিল মহাত্মাজীর সঙ্গে দেখা করার সময়।

গান্ধিজী বসে চরকা কাটছিলেন :

প্রথমেই এলেন এক পাদ্রী, একখানি খাতা মহাত্মাজীর সামনে ধরে বললেন—লিখে দিন 'সত্যিকারের খৃস্টান হতে হলে আমাদের কি করতে হবে'?

তারপর এক ইংরাজ ভদ্রলোক এলেন দক্ষিণ আফ্রিকায় মহাত্মাজীর সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছিল সেই পরিচয়টা জানিয়ে দিতে।

তারপর ডাক্তার মেডক। এঁর অস্ত্রোপচারের ফলে একদিন মহাত্মাজীর জীবন রক্ষা পেয়েছিল।

তারপর এক ফরাসী মহিলা।

তারপর এক আমেরিকান মহিলা, ইনি বিখ্যাত গায়ক পল রবসনের স্ত্রী।

তারপর গান্ধিজীর পরিচিত এক জার্মান মহিলা।

তারপর মহামান্য আগা খাঁ'র এক পত্রবাহক।

তারপর এলেন আর এক মার্কিন মহিলা, এক ভারতীয় ছাত্রের পত্নী। বললেন—গান্ধিজী আপনি আমেরিকায় চলুন।

—এখনও কিছু ঠিক করিনি।

—আমেরিকার লোকেরা আপনাকে দেখতে চায়।

—বন্ধুরা বলেন আমি গেলেই তারা আমাকে চিড়িয়াখানায় পাঠাবে।…

তারপর এলেন দীনবন্ধু এণ্ডরুজ।

একদিন সেরিডন মহাত্মাজীর প্রভাতী উপাসনায় যোগ দিয়েছিলেন। তখনও সকাল হয়নি পূব আকাশের কুয়াসা ভেদ করে মৃদু আলোর আভাষ দেখা দিয়েছে। তার স্তিমিত বিবর্ণতার মাঝে বসে মহাত্মাজী প্রার্থনা করছেন, পাশে দু'জন হিন্দু ও একজন ইংরাজ মৃদু কণ্ঠে স্তোত্র পাঠ করছেন। তার মাঝে গিয়ে যখন বসলাম, মনে হোল আমি যেন স্বপ্ন দেখছি, এই পৃথিবীর দুঃখ কষ্ট থেকে বহুদূরে এসে পৌঁচেছি।…

তারপর মহাত্মাজীর সঙ্গে প্রাতঃ ভ্রমণে বেরুলাম। তখনও পাঁচটা বাজেনি। তাঁর সঙ্গে ঠিকমত তাল রাখতে পারলুম না, দেখতে দেখতে তিনি কুয়াশার মধ্যে হারিয়ে গেলেন।

মহাত্মাজী যে কদিন বিলাতে ছিলেন, সব সময় তাঁর সঙ্গে দু'জন করে গোয়েন্দা থাকতো।

গোলটেবিল বৈঠক শেষ হয়ে গেল, ৫ই ডিসেম্বর মহাত্মাজী ট্রেনে উঠলেন। প্লাটফর্মে ভীড় কম হয়নি। ভারতীয়েরা সাড়া তুললো—বন্দে-মাতরম্! মহাত্মা গান্ধিকী জয় !!

ইংরাজ ছাত্র-বন্ধুরা গান ধরলো—চমৎকার খোস্ মেজাজী মানুষ ছিলেন তিনি ( for he was a jolly good fellow )।

জনতার সকলের মাথাতেই ছিল গান্ধিটুপী।

ফোকষ্টোনে এসে গান্ধিজী ষ্টীমারে উঠলেন। ইংলণ্ড থেকে বিদায় নেবার আগে মহাত্মাজী বলেন—

> ইংরাজদের বিরুদ্ধে আমি কোন ঘৃণার ভাব বয়ে নিয়ে যাচ্ছি না। যদি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালানোই আমার অদৃষ্টে থাকে, আমি প্রীতিপূর্ণ ভাবেই সেই যুদ্ধ চালাবো···

প্যারিসে মহাত্মাজীকে দেখবার জন্য বিরাট ভীড় হয়। পুলিশ কমিশনার মহাত্মাজীর হাত ধরে সেই ভীড় পার করে দিলেন। সেণ্টলেজার হোটেলে দু'হাজার প্যারিসবাসী তাঁকে সম্বর্ধনা জানালো। মহাত্মাজী বললেন—

> যুদ্ধ বিরতি রেখে আমি সন্ধির কথাবার্তা চালাতে এসেছিলাম, এখানে এসে যাদের সঙ্গে লড়াই করতে হবে তাদের কলাকৌশল জানা গেল, পরে নতুন উৎসাহে সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়া যাবে।···

সেখান থেকে মহাত্মাজী গেলেন জেনেভা হ্রদের তীরে রোমাঁ রোলাঁর বাড়ী ভিলা-লিনেটে।

সেখান থেকে লেসিনের যক্ষা হাসপাতালে। তারপর লুসেনের এক জনসভায় এবং জেনেভার আন্তর্জাতিক নারী সঙ্ঘে।

রোন উপত্যকায় আশী বছরের এক বৃদ্ধ মহাত্মাজীকে মাদুর বোনার কৌশল দেখান্, গান্ধিজীও তাঁর সঙ্গে সঙ্গে বোনার চেষ্টা করেন।

রোমের পথে মিলানের ষ্টেশন মাষ্টার মহাত্মাজীকে নিমন্ত্রণ করেন, দশ মিনিট দুজনের মাঝে কথাবার্তা হয়।

সন্ধ্যাবেলা ইতালি-রাজের কনিষ্ঠা কন্যা রাজকুমারী মেরিয়া এসে মহাত্মাজীর সঙ্গে আধ ঘন্টা গল্প করেন, সন্ধ্যাবেলার প্রার্থনা সভাতেও যোগ দেন।

পরদিন ব্রিনদিসিতে মহাত্মাজী জাহাজে ওঠেন।

দশ দিন পরে ২৮শে ডিসেম্বর গান্ধিজী ভারতে পৌছান।

বোম্বাইয়ে বিপুল জনতা তাকে সম্বর্ধিত করে।

দেশে তখন দমননীতি চলছে প্রচণ্ড, অর্ডিন্যান্সের পর অর্ডিন্যান্স জারী হয়েছে, নেতারা গ্রেপ্তার হয়েছেন।

সন্ধ্যাবেলা বোম্বাইয়ের আজাদ ময়দানে সভা বসলো, গান্ধিজী বললেন—খৃষ্ট ধর্মাবলম্বী বড়লাটের কাছ থেকে এই দমননীতি আমি বড়দিনের উপহার বলে গ্রহণ করলাম! খৃশ্চানদের মধ্যে বড়দিনের উপহার দেবার তো রীতি আছে।...

যে ক'মাস তিনি বিলাতে ছিলেন সেই সময় এদেশের বুকে দুর্যোগের কি ঝড় বহে যাচ্ছে, সেই সব সংবাদ শুনে গান্ধিজী পরদিনেই বড়লাটের কাছে টেলিগ্রাম করলেন—এই দমননীতি দেখে আমি বুঝতে পারছি না, আমাদের দু'জনের মাঝে বন্ধুত্বের সম্পর্ক কি শেষ হয়ে গেল? অথবা আমি আপনার সঙ্গে দেখা করে এ সম্পর্কে আলোচনা করার সুযোগ পাব?

একদিন পরেই বড়লাট বাহাদুরের সেক্রেটারী জবাব দিলেন—দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য যে সব বিধি ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে সে সম্পর্কে আপনার সঙ্গে কোনরূপ আলোচনা করতে বড়লাট বাহাদুর প্রস্তুত নন।...

১লা জানুয়ারী গান্ধিজী আবার 'তার' করলেন—অহিংসা আমার নীতি। আমি বিশ্বাস করি দেশের শাসনব্যবস্থায় জনসাধারণের যদি কোন কর্তৃত্ব না থাকে, তাহলে আইন অমান্য করার অধিকার তাদের আছে! অহিংস বিপ্লব সশস্ত্র বিপ্লবের মতই কার্যকরী, এবং সেই দিকেই আমি কংগ্রেস কার্যনির্বাহক সমিতিতে নির্দেশ দিয়েছি। তবে ইতিমধ্যে যদি বড়লাট বাহাদুর আমার সঙ্গে দেখা করেন, তাহলে আলোচনা শেষ না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন স্থগিত রাখতে রাজী আছি।...

পরদিন বড়লাটের সেক্রেটারী উত্তর দিলেন—আপনি ও কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি আইন অমান্য আন্দোলনের ভয় দেখিয়ে বড়লাটের সঙ্গে দেখা করে নিজেদের সুযোগ সুবিধা আদায় করে নেবেন তা সম্ভব নয়। আপনারা যদি তেমন কিছুই

রূন, তাহলে সে সম্পর্কে সমস্ত দায়িত্ব আপনাদের এবং তার প্রতিবিধানের জন্য যা
ছু বিধিব্যবস্থার প্রয়োজন দরকার তা প্রয়োগ করতে পশ্চাদপদ হবেন না।

৩রা জানুয়ারী গান্ধিজী 'তার' পাঠালেন—আপনার উত্তরে আমি দুঃখিত। ভাবী
ল আমাদের সততার বিচার করবে। আপনি আমাকে ও কংগ্রেসকে যে দায়িত্বের
থা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, আমি তা স্বীকার করছি···

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক বসলো, বিভিন্ন প্রদেশের নেতারা সরকারী
নাচারের যে হিসাব তৈরী করেছিলেন তা গান্ধিজীর কাছে পেশ করলেন। নতুন
রে আইন অমান্য আন্দোলন সুরু করার কথা উঠলো, নেতৃত্বের সমস্ত দায়িত্ব দেওয়া
াল গান্ধিজীর উপর।

কিন্তু গান্ধিজীকে নেতৃত্ব করতে হোল না।

৪ঠা জানুয়ারী সকাল হবার অনেক আগেই রাত তিনটের সময় পুলিশ তাঁকে
গ্রেপ্তার করলো। তারপরেই সুভাষচন্দ্র, সর্দার প্যাটেল, ডাক্তার আনসারী প্রভৃতি
তারা একে একে কারাগারে স্থান পেলেন। খাদি আশ্রম, জাতীয় শিক্ষালয়,
ংগ্রেস কার্যালয় প্রভৃতিতে পুলিশ তালা লাগালো। সুরু হোল লাঠি চালানো আর
াইকারী জরিমানা।

গবর্মেণ্ট স্থির করেছিলেন ছ'সপ্তাহেই কংগ্রেসীদের শায়েস্তা করে দেবেন। কিন্তু
ত্যাগ্রহীর সংখ্যা উত্তরোত্তর বেড়েই চললো, তারা লবণ আইন অমান্য করলো,
াজেয়াপ্ত পুস্তক প্রচার করলো, বিলিতী জিনিষ বয়কট করলো, অনেক জায়গায় কর
ওয়াও বন্ধ করলো। পুলিশের কঠোর দৃষ্টিকে উপেক্ষা করে দিল্লীর চাঁদনী চকে
মগ্র ভারত থেকে পাঁচশত কংগ্রেস কর্মী সমবেত হলেন। কংগ্রেসের বার্ষিক
াধিবেশন বসলো মুক্ত আকাশের নীচে, পুলিশ তাদের রুখতে পারলো না, সভাপতি
ণ্ডিত মালব্যকে দিল্লী আসার পথে পুলিশ গ্রেপ্তার করলো।

মাসকয়েক আগে গান্ধিজী এক সভায় বলেছিলেন—গান্ধী না থাকলেও গান্ধি-
ীতি চিরদিন থাকবে।

গবর্মেণ্টও এবার সে কথা ভালোভাবেই টের পেলেন।

গান্ধি-নীতি কোন দার্শনিক মতবাদ নয়, কোন রাজনীতিক সংজ্ঞাও নয়। তাঁর
ীতি হচ্ছে মানুষের মন বদলানোর নীতি। এর মূল কথা হচ্ছে সত্য ও অহিংসা।
াান্ধিজী বলেন—লোককে যদি ভালো করতে হয় তবে তাকে মেরে ভালো করা যায়
া, তাকে ভালবাসতে হয়, ভালো কথায় তার ভুল বুঝিয়ে দিতে হয়।···যতদিন

মানুষ মানুষকে হিংসা করবে, ততদিন ঝগড়া হবে, যুদ্ধ হবে, দুনিয়ায় শান্তি কিছুতে আসবে না। অহিংসাই শান্তির প্রকৃত রাস্তা।

যদি কেউ অন্যায় বা অত্যাচার করে পাল্টা অত্যাচার করে তার উপর প্রতিশো নেওয়া চলে, কিন্তু তাতে অত্যাচারী মন বদলায় না, সে আবার নতুন করে অত্যাচা করার ফিকির খোঁজে। কিন্তু অত্যাচারীকে যদি মিষ্ট কথায়, ভদ্র ব্যবহা অন্যায়ের কথাটা বুঝিয়ে দিতে পারা যায়, তাহলে সে আর অন্যায় করবে না। জগা মাধাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মাথা ফাটিয়ে দিয়েছিলেন, কিন্তু মহাপ্রভু সেজন্য তাঁদে উপর এতটুকু রাগ করেন নি। পরে জগাই মাধাই একেবারে বদলে গেলেন, মহাপ্রভু শিষ্য হয়ে গেলেন। গান্ধিজী বলেন—ভালোবাসার আগুনে সবচেয়ে শক্ত জিনি গলে যায়, যদি না গলে বুঝতে হবে সে ভালবাসার জোর কম।

অহিংসার ভিত্তি হচ্ছে সত্য। অন্যায় ও অত্যাচারের মূল কথাই হচ্ছে হিংসা অসত্য। যা সত্য তা-ই ন্যায়। জোর গলায় বুকে সাহস রেখে সত্য প্রচার কর হবে অন্যায়ের প্রতিবাদ করার সময় ভয় পেলে চলবে না। সত্যের যিনি সাধ করেন গুলি গোলা প্রহার ও জেলখানা তাঁকে জয় করতে পারে না। বৃটিশ গবর্মেণ্টে অনাচারের বিরুদ্ধে গান্ধিজী এই সত্যাগ্রহের পরীক্ষা করেছেন, এবং জয়ীও হয়েছেন

সত্য ও অহিংসার মধ্যে হতাশার কোন স্থান নেই। সত্যাগ্রহী সৈনিক, প্রাণে ভয় সে করবে না। সত্যাগ্রহী নির্ভীকভাবে শৃঙ্খলা বজায় রেখে অন্যায়ের প্রতিবা করবে এবং যত লোককে পারে বুঝিয়ে নিজের দলে আনার চেষ্টা করবে হরিজন আন্দোলন এমনি এক প্রচেষ্টা, এই জন্য গান্ধিজীর জীবন নাশের চেষ্টা হয়েছিল, কিন্তু শেষে গান্ধিজীর নীতিই জয়ী হয়েছে।

নিজের আদর্শকে গান্ধিজী সহজ সরল ভাবে প্রকাশ করেছেন—দুনিয়ার ইতিহা হচ্ছে প্রতিহিংসার ইতিহাস—ও পথে শান্তি আসবে না। চরকায় সুতো কাটে খদ্দর পরো, নিজের কাজ নিজে করো, পরের সেবা পারতপক্ষে নিও না, গ্রামে ফি যাও, কুটীর শিল্পে নজর দাও, শিক্ষা দাও আর শিক্ষা নাও, মদ ছাড়ো, অস্পৃশ্যত ছাড়ো, অহিংসায় বিশ্বাস করো, সত্যকে জয়ী করে তোলো।

"সত্যের নাহি পরাজয়  
হও ধরমেতে ধীর  
হও করমেতে বীর  
হও উন্নত শির  
—নাহি ভয়।"

এই সত্য ও অহিংসার নীতি যে কতটা শক্তিমান তা আমরা বুঝতে পারি যখন দেখি, যে-চার্চিল, যে-হিটলার, মুসোলিনী ও তোজোর কাছে পরাজয় মানে নি, এক নিরস্ত্র ক্ষীণ সন্ন্যাসীর ভয়ে যে আর্তনাদ তুলেছে—যদি ভারতে বৃটিশ রাজ্য রক্ষা করতে চাও, তবে ওই অর্ধ-নগ্ন ফকিরটাকে আন্দামানে দ্বীপান্তরে পাঠাও!

এবং শেষে ইংরাজকে এই অর্ধনগ্ন সন্ন্যাসীর কাছে মাথা নত করতে হয়েছিল।

সত্য ও অহিংসা পৃথিবীতে নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করেছে—চল্লিশ কোটি মানুষের স্বাধীনতা এনে দিয়েছে ত্রিশ বছরের মধ্যে।

ইংরাজেরা ভারতীয়দের ঐক্যকে ভয় করে, চল্লিশ কোটি মানুষ এক হলে এদেশে তাদের রাজ্য টিঁকবে না, তাই তাদের নীতি ছিল—ডিভাইড্ এণ্ড রুল—ঐক্য নষ্ট কর, শাসনের সুবিধা হবে! সেইজন্য তারা হিন্দু মুসলমানে বিরোধ জাগিয়ে রেখেছিল, হিন্দু-বিদ্বেষী মুসলমানদের তারা নেতা করে তুলতো। গোল-টেবিল বৈঠকে তারা আরেকটু এগিয়ে গেল, বিলাতের প্রধান মন্ত্রী ম্যাকডোনাল্ড সাহেব স্থির করলেন—হিন্দুদের মধ্যেই দুটো ভাগ করে দাও—উঁচু জাত আর নীচু জাত—বর্ণ হিন্দু আর অস্পৃশ্য। আইন সভায় দু'দলের আলাদা-আলাদা আসন থাকবে, দু'দল পৃথক ভাবে ভোট দেবে!

গান্ধিজী জেল থেকেই তার প্রতিবাদ করলেন—হিন্দু জাতিকে বিভক্ত করার এই চেষ্টা যদি কার্যকরী হয় তাহলে অনশনে আমি জীবন বিসর্জন দেব!

ম্যাকডোনাল্ড সাহেব তার উত্তরে বললেন—মহাত্মাজী অস্পৃশ্যদের শত্রু, তাদের উন্নতি তিনি চান না।

মহাত্মাজী বললেন—ভারতের সাতকোটি হিন্দু অস্পৃশ্য। বহু শতাব্দী ধরে ঘৃণা করে তাদের একপাশে ফেলে রেখে যে অন্যায় করা হয়েছে তার প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য আমি অনশন সুরু করলাম। এর প্রতিবিধান না করতে পারলে আমি দেহরক্ষা করবো, সামান্য নুন জল কিংবা সোডার জল ছাড়া আমি আর কিছুই খাব না।

প্রত্যূষে রবীন্দ্রনাথের কাছে তিনি টেলিগ্রাম করলেন—

> গুরুদেব, এখন প্রত্যূষ তিনটে, মঙ্গলবার, আজ দুপুর থেকে আমার অগ্নিপরীক্ষা সুরু হবে। আপনার আশীষ চাই। আপনি আমার সত্যকারের সুহৃদ, কারণ আপনি আমার আন্তরিক শুভকামী। আপনার অন্তর যদি আমার কাজ সমর্থন করে, আপনি আমার আশীর্বাদ করবেন। তা-ই হবে

আমার অবলম্বন। আশা করি আপনি আমাকে বুঝতে পেরেছেন। প্রীতি জানাবেন—ম, ক, গান্ধী।

কিন্তু অন্তরের যোগ যেখানে নিকটতম, সেখানে একজনের জন্য আরেকজন অপেক্ষা করতে পারেন না। গান্ধিজীর চিঠি পাবার আগেই গুরুদেব 'তার' করলেন—ভারতের ঐক্য ও সামাজিক সংহতি রক্ষার জন্য মূল্যবান জীবন আহুতি দেবার প্রয়োজন আছে…আমার দুঃখিত অন্তর শ্রদ্ধা ও প্রীতি সহকারে, আপনার মহান প্রায়শ্চিত্তের গতি লক্ষ্য করছে।

য়েরোড়া জেলে বেলা দ্বিপ্রহর থেকে গান্ধিজী অনশন সুরু করলেন। জেলের নিয়মকানুন কিছুটা শিথিল করা হোল। তাঁর বিছানার চারিপাশে সমবেত হলেন কস্তুরবা, সরোজিনী নাইডু, বাসন্তী দেবী, বল্লভভাই প্যাটেল ও মহাদেব দেশাই প্রভৃতি ঘনিষ্ঠ অন্তরঙ্গের দল। আব্বাস তায়েবজীর কন্যা রৈহানা বেন একটি গুজরাতী ভজন পাঠিয়ে ছিলেন, সমবেত কণ্ঠে তাই গাওয়া হোল:

উঠ, জাগো মুসাফির, ভোর ভই
অব রৈন কহাঁ জো সোবত হৈ?
জো সোবত হৈ বহ খোবত হৈ
জো জাগত হৈ বহ পাবত হৈ।

টুক নীদসেঁ আঁখিয়া খোল জরা
ও গাফিল! রবসে ধ্যান লগা।
যহ প্রীতিকরনকী রীত নহীঁ
রব জাগত হৈ তু সোবত হৈ।

জয় জান ভুগত করণী আপনী
ও পাপী! পাপমেঁ চৈন কহাঁ?
জব পাপকী গঠড়ী সীস্ ধরী
ফির সীস পকড় ক্যোঁ রোবত হৈ?

জো কাল করে বহ আজ কর লে
জো আজ করে বহ অব কর লে
জব চিড়িয়ন খেতী চুগত ডারী
ফির পছতাবে ক্যা হোবত হৈ?

[পথিক জাগো, প্রভাত হয়েছে। আর রাত্রি নেই তবু তুমি শুয়ে আছ কেন? যে শুয়ে থাকবে তার সব যাবে, যে জাগবে সে-ই পাবে শান্তি।

ওগো অলস বারেক চোখ মেলে তাকাও, বিশ্বনিয়ন্তার কথা ভাবো। সবাই যখন জেগেছে তখনও তুমি ঘুমিয়ে আছ, এই কি ভক্তি নিবেদনের রীতি ?

ওগো পাপী, তোমার পাপ মোচনের জন্য সচেষ্ট হও। পাপের মাঝে শান্তি নাই। পাপের বোঝা তুমি বাড়িয়ে চলেছে, শুধু কেঁদে কি হবে ?

যা কাল করবে তা আজই শেষ কর। যা আজ করবে তা এখনই সম্পন্ন কর। পাখী যখন তোমার শস্য নিয়ে যাবে, তারপর আপশোষ করলে কি হবে ? ]

গান্ধিজী অনশন সুরু করলেন।

সারা ভারত ব্যাকুলতায় চঞ্চল হয়ে উঠলো। সর্বত্র সভা বসলো। দেশশুদ্ধ লোক সেদিন উপবাস করলো। গান্ধিজীর দীর্ঘ জীবন কামনা করে মন্দিরে মন্দিরে প্রার্থনা সুরু হোল।

দক্ষিণ ভারতে অস্পৃশ্যতার প্রকোপ বেশী। সেখানে সেদিনকার কার্যসূচী হোল :

পূর্ণ উপবাস।

বায়োস্কোপ থিয়েটার দেখা ও সমস্ত আনন্দ উৎসব বন্ধ।

সব রকম খেলাধূলা বন্ধ।

রেডিও শোনা বন্ধ।

হোটেল, রেষ্টুরেণ্ট ও খাবারের দোকান বন্ধ।

অচ্ছ্যুৎদের অবস্থার উন্নয়নের জন্য ব্যাপক প্রচেষ্টা।

গান্ধিজীর অনশন ! সারা ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের নেতারা এসে সমবেত হলেন পুণায়। ম্যাকডোনাল্ড সাহেব যে আইন চাইছেন তাই নিয়ে বসলো আলোচনার বৈঠক।

একটি একটি করে দিন কাটে, গান্ধিজীর অবস্থা একটু একটু করে খারাপের দিকে অগ্রসর হয়। উৎকণ্ঠিত ভারত নেতাদের মুখের পানে তাকিয়ে প্রতিটি মুহূর্ত গুণতে থাকে।

নেতারা দিনের পর দিন আলোচনা করেন, যখনই কোন জটিলতা দেখা দেয় তখনই ছুটে আসেন গান্ধিজীর কাছে। শেষে গান্ধিজী ডক্টর ভীমরাও রামজী আম্বেদকরকে বললেন—অস্পৃশ্যদের সমগ্রভাবে কল্যাণ যাতে হয় তা-ই আমি মেনে নেব···তোমার সম্প্রদায় আমার সম্প্রদায় থেকে কার্যতঃ একেবারে পৃথক হয়ে যাবে তা আমি সইতে পারি না। আমরা ঐক্য বজায় রাখবো, আমাদের ভাগ করা চলবে না। অস্পৃশ্যতা হিন্দুধর্মের এক গভীর কলঙ্ক। যদি হিন্দুধর্ম থেকে অস্পৃশ্যতা একেবারে মুছে ফেলা না যায়, তাহলে এই গ্লানি বার বার বহু দিক থেকে হিন্দুর সামাজিক ও রাজনৈতিক

জীবনকে বিষাক্ত করে তুলবে। সেইজন্ত আমি তোমাকে অনুনয় করছি, হিন্দুদের কেল্লায় এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করার সুযোগ দাও। আমাকে বর্ণ হিন্দুদের মধ্যে কাজ করার সুযোগ দাও।...দশ পনেরো বছরের কথা নয়, পাঁচ বছর বাদে গণভোট নেওয়া হবে, তার বেশী দেরী করা চলবে না। বন্ধুদের বল, এই একটা বিষয়ে আমার মত বদলাবে না। আমি হয়তো মানুষ খারাপ হতে পারি, কিন্তু সত্য যখন আমার মুখ থেকে প্রকাশ পায় তখন তা দুর্ভেদ্য!

ডাঃ আম্বেদকর এবার নরম হয়ে যান, পাঁচ দিন আলোচনার পর অনুন্নত সম্প্রদায় পৃথক নির্বাচনের অধিকার পরিত্যাগ করলো। স্থির হোল বিভিন্ন প্রদেশের পরিষদে হরিজনদের ১৪৮টি আসন সংরক্ষিত রাখা হবে। এই আলোচনা 'য়েরোড়া চুক্তি' নামে প্রসিদ্ধ। এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করলেন পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য, তেজ বাহাদুর সাপরু, মুকুন্দরাম রাও জয়াকর, ডক্টর ভীমরাও রামজী আম্বেদকর, চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারী, ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ, ঘনশ্যামদাস বিড়লা, শংকরলাল ব্যাংকার, বি. এল. রাজভোজ, হংস মেহেতা, পুরুষোত্তমদাস ঠাকুরদাস, বালচাঁদ হীরাচাঁদ, হৃদয়নাথ কুঞ্জরু, পি. কোদণ্ডরাও, জি. কে. গ্যাডগিল, মনু সুবেদার, অবন্তিকাবাঈ গোখলে, এবং আরো অনেকে।

কিন্তু এখানকার নেতারা মানলেই তো হবে না, বিলাতে যারা আইন তৈরী করলেন তারা তো মানা চাই, তাই বিলাতে খবর পাঠানো হোল, দীনবন্ধু এণ্ডরুজ ছিলেন বিলাতে। সেখানে যা কিছু করা সম্ভব, সবই তিনি করলেন।

এদিকে গান্ধিজীর অবস্থা ক্রমশ সংকটজনক হয়ে আসছে, দুজন ডাক্তার সব সময় তাঁর পাশে বসে আছেন। দিনে দু'বার তাঁর স্বাস্থ্য সম্পর্কে বুলেটিন বেরুচ্ছে। জেল আর কারাগার নেই, হয়েছে তীর্থক্ষেত্র, কতজন আসছে গান্ধিজীর খবর জানতে, মহাত্মাজীকে দেখতে।

এক সাংবাদিক এই সময়কার এক বর্ণনা দিয়েছিলেন বোম্বাইয়ের 'ইলাস্ট্রেটেড্ উইকলি' কাগজে—'ওয়ার্ডের সামনে দেড়শো ফীট লম্বা ও চল্লিশ ফীট চওড়া একটি বারান্দা। সেই বারান্দার এক পাশে ছোট একটি আমগাছের নীচে গান্ধিজীর খাটিয়া পাতা। জেলখানার লাল কম্বল মুড়ি দিয়ে তিনি খাটের উপর শুয়ে আছেন। চারিপাশে বসে আছেন, শ্রীমতী কস্তুরবা, মহাদেব দেশাই, বল্লভভাই প্যাটেল, এবং আরো অনেকে। একজন তালপাতার পাখা নিয়ে তাঁকে হাওয়া করছেন। দুর্বল ক্ষীণ মানুষটির পানে তাকালে, সাংবাদিক হিসাবে কোন প্রশ্ন করতে ইচ্ছা করে না। পাশে এক বোতল জল আছে, দু-একটা কথা বলার পর তিনি এক চুমুক করে জল

খাচ্ছেন। কিন্তু এই দুর্বলতার মাঝেও তাঁর চোখ দুটি জল জল করছে। জেলের ডাক্তার দু'জন পাশে দাঁড়িয়ে আছেন। কস্তুরবা জল-পাইয়ের তেল মালিশ করে দিচ্ছেন কপালে।…

'ঘণ্টা খানেক তাঁর পাশে বসে থাকার পর আমার মনে হোল, তাঁর মূল্যবান সময় নষ্ট করে দিচ্ছি। মহান রাজনৈতিক নেতার কাছ থেকে ধীরে ধীরে বিদায় নিয়ে চলে এলাম। আসবার সময় তাঁর সেক্রেটারীর মুখে শুনলাম—এখনও তিনি ভোর চারটের সময় ওঠেন, সাড়ে চার থেকে পাঁচটা পর্যন্ত প্রার্থনা করেন। তারপর জেলের নাপিত এসে দাড়ী কামিয়ে দেয়, তারপর এক চুমুক জল খেয়ে এক ঘণ্টা ঘুমিয়ে নেন, তারপর আসে টেলিগ্রাম, সংবাদপত্রের প্রতিনিধি ও নেতার দল।'

শান্তি-নিকেতনে খবর এলো গান্ধিজীর অবস্থা খারাপের দিকে যাচ্ছে।

রবীন্দ্রনাথ আর স্থির থাকতে পারলেন না, বরাবর চলে এলেন পুণায়। ২৬শে সেপ্টেম্বর দুপুরবেলা, রবীন্দ্রনাথ এসে দাঁড়ালেন য়েরোড়া জেলে গান্ধিজীর শয্যাপার্শে। গান্ধিজীর পাশে বসে, শীর্ণ শ্রান্ত সন্ন্যাসীর মুখের পানে তাকিয়ে কবিগুরুর চোখে জল এলো, গান্ধিজীর বুকের উপর মুখ রেখে তিনি কেঁদে ফেললেন। মিনিট কয়েক কেউ কোন কথা বললেন না। তারপর চোখের জল মুছে ধরা গলায় গুরুদেব জানালেন —মহাত্মাজীর মনোবেদনার গুরুভার লাঘব করার উদ্দেশ্যে অস্পৃশ্যদের জন্য যা কিছু করা দরকার সব কিছু করার জন্যই তিনি প্রস্তুত আছেন!…

মৃদু কণ্ঠে ভারতের দুই ঋষি পরস্পরের কাছে অন্তর মেলে ধরলেন।

কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর মহাত্মাজী শ্রান্ত হয়ে পড়ছেন দেখে রবীন্দ্রনাথ বিদায় নিলেন।

গান্ধিজীর অবস্থা সেদিন অত্যন্ত কাহিল, ডাক্তাররা শংকা প্রকাশ করছেন, সারা দেশ তাকিয়ে আছে য়েরোড়া জেলের পানে। নেতারা উদগ্রীব হয়ে আছেন বিলাতের উত্তরের প্রতীক্ষায়—তাদের চুক্তি প্রধান মন্ত্রী মেনে নেবেন কি নেবেন না!

এমন সময় বিকাল সওয়া-চারটের সময় বিলাত থেকে খবর এলো—আপনাদের চুক্তি আমরা মেনে নিলাম!

গান্ধিজীর জয় হোল, সারা ভারতে উল্লাসের বন্যা বয়ে গেল, এক ঘণ্টার মধ্যে গান্ধিজী অনশন ভঙ্গ করলেন।

য়েরোড়া জেলখানা ভারতের তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হোল। গান্ধিজীর খাটিয়ার চারিপাশে এসে বসলেন রবীন্দ্রনাথ, সরোজিনী নাইডু, বাসন্তী দেবী, স্বরূপরাণী নেহেরু,

উর্মিলা দেবী, আম্বালাল সরাভাই, সর্দার বল্লভভাই, মহাদেব দেশাই, এবং সবরমতী আশ্রমের শ'দুয়েক আশ্রমিক।

প্রার্থনা সুরু হোল। কবিগুরু গীতাঞ্জলির একখানি গান গাইলেন—

জীবন যখন শুকায়ে যায় করুণা-ধারায় এসো
সকল মাধুরী লুকায়ে যায়, গীত-সুধা-রসে এসো
কর্ম যখন প্রবল আকার
গরজি উঠিয়া ঢাকে চারিধার
হৃদয় প্রান্তে হে জীবননাথ, শান্ত-চরণে এসো।
আপনারে যবে করিয়া কৃপণ
কোণে পড়ে থাকে দীনহীন মন
দুয়ার খুলিয়া হে উদার নাথ! রাজ সমারোহে এসো।
বাসনা যখন বিপুল ধূলায়
অন্ধ করিয়া অবোধে ভুলায়
ওহে পবিত্র! ওহে অনিদ্র! রুদ্র আলোকে এসো।

ওই জেলেরই কয়েদী পরাশর শাস্ত্রী কয়েকটি সংস্কৃত শ্লোক আবৃত্তি করলে তারপর সমবেত কণ্ঠে গুজরাতী ভজন সুরু হোল :

বৈষ্ণব জন তো তেনে কহিয়ে
যে পীড় পরাঈ জানে রে।
পরদুঃখে উপকার করে তোয়ে
মন অভিমান না আনে রে॥
সকল লোকমাঁ সহুনে বন্দে
নিন্দা না করে কেনী রে।
বাচ কাছ মন নিশ্চল রাখে
ধন ধন জননী তেরী রে॥
সমদৃষ্টি নে তৃষ্ণ ত্যাগী
পরস্ত্রী জেনে মাত রে।
জিহ্বা থকী অসত্য ন বোলে
পরধন নও ঝালে হাথ রে॥
মোহ মায়া ব্যাপে নহি জেনে
দৃঢ় বৈরাগ্য জেনে মনমে রেঁ

রামনামশুঁ তালী বে লাগি
সকল তীরথ তেনা তনমাঁ রে—
বনলোভী নে কপট রহিত ছে
কাম ক্রোধ নিবার্ষ্যা রে।
ভণে নরসৈঁয়ে তেহু দরশন করতাঁ
কুল একোত্তোর তার্ষ্যা রে॥

[ তাঁকেই তো বৈষ্ণবজন বলে—যাঁর মনে পরহিতের আকাঙ্ক্ষা আছে, যিনি পরের দুঃখে উপকার করেন, যাঁর মনে কোন অভিমান নেই, যিনি সকল লোককে সমভাবে শ্রদ্ধা করেন, কারুর নিন্দা করেন না, যাঁর মনে কোন চাঞ্চল্য নেই, তাঁর জননী ধন্য। যাঁর ভোগের কোন তৃষ্ণ নেই, যিনি পরস্ত্রীকে নিজের মায়ের মত মনে করেন, যিনি কখনও মিথ্যা কথা বলেন নি, পর-ধনে কখনও হাত দেন না, যাঁর মন মোহ মায়ায় অবদ্ধ নয়, যিনি বৈরাগ্যের কঠোর সাধক, যিনি রামনামে আত্মহারা হয়ে আছেন, তাঁর মনের মাঝে সকল তীর্থের পবিত্রতা বিদ্যমান। যার মনে কোন কপটতা নেই, যিনি কাম ক্রোধকে জয় করেছেন, তিনিই পরম বৈষ্ণব। কবি নরসিংহ সেই মহামানবের দর্শন লাভ করে ভবসাগর পার হতে চান। ]

ভজন শেষ হোল, কস্তুরবা এক গ্লাস কমলালেবুর রস তুলে দিলেন গান্ধিজীর হাতে, তা পান করে গান্ধিজী উপবাস ভঙ্গ করলেন।

ইতিমধ্যে ঝুড়ী ঝুড়ী ফল আর সন্দেশ আসতে সুরু করেছে। যত ছিল জানা-অজানা বন্ধু ও শুভাকাংখীর দল, সবাই পাঠিয়েছে কত রকমারি সন্দেশ, কত রকমের ফল। সেই সব ফল ও সন্দেশ বিলি করা হোল সমবেত শুভকামীদের মধ্যে।

ভারতের বাহিরের দূর দূরান্তর থেকে জ্ঞানী গুণী ও দেশনায়কেরা গান্ধিজীকে শুভেচ্ছা জানালেন:

মিশরের কায়রো থেকে শ্রীমতী সোফিয়া জগলুল পাশা জানালেন—ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে সহানুভূতিশীল মিশরের নরনারীরা উদ্বেগ-ব্যাকুল চিত্তে লক্ষ্য করছে ভারতের ঐক্য ও স্বাধীনতার জন্য আপনি কি মহান আত্মত্যাগ করছেন।… আমি সত্যই আশা রাখি গান্ধিজীর মহান আত্মত্যাগের ভিতর দিয়ে ভারতবাসী ভ্রাতৃত্ব ও স্বদেশপ্রেমের বন্ধনে ঐক্যবদ্ধ হবে, যাঁর জীবন ও কর্মনীতি সারা পৃথিবীর সম্পদ্ সেই মহান ভারত সন্তানের জীবন রক্ষার জন্য ও দেশের স্বাধীনতার জন্য সচেষ্ট হবে।

আলেকজান্দ্রিয়া থেকে 'মিশরীয় ওয়াফদ্ দলে'র সভাপতি মুস্তাফা নাহাশ পাশা জানালেন—ভারতীয়দের মধ্যে ঐক্য ও জাতি বিচার দূর করার জন্য আপনি যেভাবে

আত্মবলি দিতে সংকল্প করেছেন তা মিশরবাসীদের চিত্তে গভীর রেখাপাত করেছে। স্বাধীনতা ও স্বজাত্যবোধ বিকাশ করার জন্য আমরা যে দুঃখ ভোগ করেছি তারই পবিত্র বন্ধনে গত বিশবছর ধরে ভারতবর্ষ ও মিশর একত্র বাঁধা পড়েছে। সকল সম্প্রদায়ের ও সকল ধর্মের মিশরীরা বিশ্বাস করে যে বিরাট ভারতীয় জাতি ঐক্যবদ্ধ হয়ে মহাত্মার জীবন রক্ষার জন্য তাদের পবিত্র ঐক্যকে পুনরুজ্জীবিত করুক। গান্ধিজী যে মহৎ আদর্শের জন্য প্রাণ দিচ্ছেন তার সাফল্যের জন্য প্রাচ্যের প্রত্যেকটি সংগ্রামশীল ব্যক্তি ভারতের পানে তাকিয়ে আছে। মিশরদেশের নামে মিশরীদের পক্ষ থেকে আমরা আপনাকে ও ভারতীয়দের প্রীতি জ্ঞাপন করছি এবং সত্য, সাম্য ও স্বাধীনতার যে মহান আদর্শ আপনি জগতের সামনে তুলে ধরেছেন তা বাস্তবে রূপায়িত হোক—এই আমরা কামনা করি।

দক্ষিণ আফরিকার 'কেপটাউন যুক্ত হিন্দু সম্মেলন' জানালেন—আপনি অনশন ভঙ্গ করেছেন জেনে আমরা আনন্দিত। আজ—আপনার ৬৪তম জন্মতিথিতে—আমরা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি আপনি দীর্ঘজীবন লাভ করে ভারতভূমির সেবা করুন, আপনার স্বাস্থ্য অক্ষয় হোক!

জার্মানী থেকে 'হামবুর্গ শান্তি সঙ্ঘ' জানালেন—শান্তি-সুহৃদেরা কামনা করছে এই সংগ্রামে ভগবান আপনার প্রাণ রক্ষা করুন।

আমেরিকার শিকাগো সহরের 'ন্যাশানাল আইরিশ রিপাব্লিকের' পক্ষ থেকে ডেনিশযালয় জানালেন—বৃটিশের উপর আপনার বিজয়লাভে আইরিশ গণতন্ত্রীরা সানন্দে অভিনন্দন জানাচ্ছে। লুণ্ঠিত স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের জন্য আপনাকে সংগ্রাম চালিয়ে যেতে অনুরোধ করি।

জেনেভা থেকে রোমাঁ রোলাঁ ও মদলিয়েঁ রোলাঁ জানালেন—আপনার আত্মিক বিজয় লাভের জন্য আমরা আনন্দিত।

জার্মান বন্ধু হার্মান ক্যালেনবাক জানালেন—আনন্দ করছি। প্রীতি জানবেন।

বিলাত থেকে দীনবন্ধু এণ্ডরুজ জানালেন—আপনার উপবাসের ভিতর দিয়ে আপনি যে মহাপ্রেম প্রদর্শন করলেন সেজন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ।...আপনার উপবাস ভারতকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য যে বিস্ময়কর বিজয় লাভ করেছে তার জন্য আমরা আনন্দিত। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি তাঁর ইচ্ছাকে সার্থক করে তোলার জন্য তিনি আপনাকে অক্ষয় স্বাস্থ্য দিন।

আমেরিকার ব্রুকলীন থেকে পাদরী জন-হেইন্‌স্‌-হোম্‌স্‌ জানালেন—পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ যে আপনার জীবন রক্ষা পেয়েছে। সত্যাগ্রহ অবিস্মরণীয় জয়লাভ করলো।

মহাত্মাজী সাংবাদিকদের বললেন—প্রয়োজন হলে হরিজনদের জন্য আমি আবার উপবাস করবো।…আমার কিছু থাকলে আমি হরিজনদের সেবায় তা দিয়ে দিতাম, কিন্তু প্রাণটুকু ছাড়া দেবার মত আর কিছুই তো আমার নেই।…কারুর বিরুদ্ধে আমার কোন অভিযোগ নেই, শুধু হিন্দুর বিবেকবুদ্ধিকে জাগ্রত করার জন্য, শুধু ধর্ম-কার্যে অনুপ্রাণিত করার জন্যই আমি উপবাস করেছি।…

মেয়েদের উদ্দেশ্যে গান্ধিজী বলেছিলেন—আমি চাই, তোমরা অন্তর থেকে অস্পৃশ্যতার মূলশুদ্ধ উপড়ে ফেলবে, হরিজন ছেলেমেয়েদের তোমরা দেখবে, নিজের ছেলেমেয়েদের মত। তোমরা তাদের ভালবাসবে নিজের আত্মীয় পরিজন ভাই বোনের মত—সকলেই তো ভারতমাতার সন্তান।…মেয়েদের অন্তর স্নেহপ্রবণ, দুঃখ দেখলে অন্তর গলে যায়। যদি হরিজনদের দুঃখ কষ্ট তোমাদের মাঝে দোলা দেয় এবং তোমরা অস্পৃশ্যতা তুলে দাও, আর তার সঙ্গে তুলে দাও উঁচু নীচুর পার্থক্য, তাহলে হিন্দুধর্ম পরিশুদ্ধ হবে, এবং হিন্দুসমাজও আধ্যাত্মিক মার্গে মহাবেগে অগ্রসর হবে। পরিণামে সারা ভারতের পঁয়ত্রিশ কোটি জনগণের কল্যাণ হবে। পৃথিবীর এক পঞ্চমাংশ মানুষ যখন সেই বিস্ময়কর পরিশোধন প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়ে অগ্রসর হবে, তখন সারা বিশ্বের মানব সমাজের উপর তার স্বাস্থ্যকর প্রতিক্রিয়া হতে বাধ্য।…

এই কথাগুলি মেয়েদের অন্তর স্পর্শ করেছিল, কত মেয়ে তাদের গায়ের গহনা খুলে নিঃশঙ্কচিত্তে গান্ধিজীর হাতে তুলে দিয়ে এসেছে, কোন পরিচয় রাখে নি, কিছু জিজ্ঞাসাও করেনি। বোম্বায়ের মেয়েরা এগিয়ে এলো কাজ করতে। এতদিন বোম্বাইয়ের সব মন্দিরে অচ্ছুৎদের প্রবেশ করার অধিকার ছিলনা, হিন্দু হয়েও হিন্দুর মন্দিরের দরজা ছিল তাদের কাছে রুদ্ধ। বোম্বাইয়ের মহিলা প্রতিষ্ঠান গান্ধী-সেবা-সেনা এবার সাড়া তুললো—সমস্ত মন্দিরে হরিজনদের ঢুকতে দিতে হবে!

এ' সম্পর্কে গণভোট নেবার ব্যবস্থা হোল।

বিলিতী কায়দায় ছাপানো কাগজে ঢেঁড়া কেটে ভোট দেওয়া নয়। এ ভোটের কোন খরচ নেই, লেখাপড়ার সংগেও কোন সম্পর্ক নেই। বোম্বাই শহরের সাতটি বড় মন্দিরের সামনে দুটি করে বড় বাক্স রাখা হোল, একটি শাদা আর একটি কালো। স্বেচ্ছাসেবিকাদের পাহারা বসলো বাক্সগুলির পাশে। যে সব মেয়েরা মন্দিরে পূজা করতে আসবে তারা পথ থেকে এক এক টুকরো পাথর কুড়িয়ে এনে সেই বাক্সে ফেলে দিয়ে যাবে। যারা বিশ্বাস করে দেবতার কাছে অস্পৃশ্য বলে কিছু নেই, মন্দিরে হরিজনরাও পূজা করতে পারে, তারা আনবে শাদা পাথর, ফেলবে শাদা

বাক্সে আর যারা মনে করে মন্দিরে অস্পৃশ্যেরা ঢুকবে না, তারা আনবে কালো পাথর, ফেলবে কালো বাক্সের মধ্যে।

ভোটের ফলাফল গুণে দেখা গেল—হরিজনদের পক্ষে ২৪,৭৯৭ জন আর বিপক্ষে আছেন ৪৪৫ জন :

| | | | |
|---|---|---|---|
| মাধব বাগ— | হরিজনদের পক্ষে | ১০,৬২২ | বিপক্ষে ৪১ |
| ভুলেশ্বরের রাম মন্দির | " " | ৫০৫১ | বিপক্ষে ৮০ |
| নরনারায়ণ মন্দির— | " " | ৩০৬০ | বিপক্ষে ৪০ |
| মহাদেবী— | " " | ১,৭১৮ | " ১২ |
| ঠাকুরদ্বারের রাম মন্দির— | " " | ৩,৫৩১ | " ২৬৫ |
| বাবুল নাথ | " " | ৫২৫ | " ২ |
| ভুলেশ্বরের রাধাকৃষ্ণের মন্দির— | " " | ২৯০ | " ৫ |
| | | পক্ষে ২৪,৭৯৭ | বিপক্ষে ৪৪৫ |

শুধু এই সাতটি মন্দিরই নয়, বোম্বাইয়ের সমস্ত মন্দির হরিজনদের জন্য মুক্ত হয়ে গেল, আর তারই সংগে সারা ভারতের অসংখ্য মন্দিরে অস্পৃশ্য বলে আর কিছুই রইল না।

বাংলা দেশে উন্মুক্ত হোল—কালীঘাটের মন্দির, ত্রিপুরা রাজ্যের সব মন্দির, রাজবাড়ীর কালিমন্দির, নৈহাটীর সব মন্দির···

বিহার প্রান্তে—পাটনার বড় পত্তনদেবীর মন্দির, জামসেদপুরের শ্রীরাম মন্দির, গয়ার সব কটি মন্দির···

উড়িষ্যা প্রান্তে—কটকের বিশ্বনাথ মন্দির···

যুক্ত প্রদেশে—প্রয়াগের বারোটি মন্দির, লখ্‌নৌর বাণীকবির মন্দির, মীরাটের কালিপল্টনের শিবমন্দির, এবং অন্যান্য পাঁচটি মন্দির···

মধ্য প্রদেশে—নাগপুরের শুক্রবারী মন্দির ও অন্য দুটি মন্দির, জব্বলপুরের প্রত্যেকটী মন্দির, রায়পুরের গোপীনাথ মন্দির, ওয়ার্ধার মন্দির, অমরাবতীর নীলকণ্ঠেশ্বরের মন্দির ও অম্বা মন্দির, বেলগাঁয়ের হনুমান মন্দির ও কপিলেশ্বর মন্দির···

দিল্লীতে—দয়াশঙ্কর মন্দির···

বোম্বাইয়ে—আমেদাবাদের দেবীমন্দির, বিঠোবা রুক্মিণী মন্দির, ঠাকুরদ্বার মন্দির, কন্দবওয়ালা মন্দির, মুরলীধর মন্দির, নরনারায়ণ মন্দির, ঠাকুরদ্বার দত্তাত্রেয় মন্দির, হনুমান মন্দির, পুণার শিবমন্দির, থানার মারুতী মন্দির, খাণ্ডবের

পণ্ডারেন্তী শ্রীমন্দির, নড়িয়াদে দেবী মুরয বাঈ মন্দির, বোম্বাইয়ের গামদেবী মন্দির, সুবর্গাঁও ও শেলম্বার মন্দির, আমেদাবাদে রামজী মন্দির···

পাঞ্জাবে—মহাবীর মন্দির···

সিন্ধুতে—সব মন্দির···

হায়দরাবাদ রাজ্যে—শিবমন্দির···

বরোদা রাজ্যে—খাণ্ডেরাও মহাদেব মন্দির···

মহীশূর রাজ্যে—মারিয়াম্বা কয়েল গণেশ মন্দির, বেণু গোপালস্বামী মন্দির, শোলাপুরের সিদ্ধেশ্বর মন্দির···

রণপুর রাজ্যে—কবীর মন্দির···

মদ্রদেশে—কুন্দস্বামী মন্দির, অঞ্জনেয় মন্দির, কোলাপুরের দত্ত মন্দির, মহাজের বীরেশ্বর মন্দির, সবন্তবাদীর শ্রীবিঠল মন্দির···

এগুলি ছাড়া ভারতের বহুস্থানে খ্যাত অখ্যাত বহু মন্দির হরিজনদের জন্য উন্মুক্ত হোল। মানবতা কুসংস্কারকে জয় করলো।

দেশের নেতারা হরিজনদের অবস্থার উন্নতি করার জন্য হরিজন সেবক সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা করলেন, ঘনশ্যাম দাস বিড়লা হলেন সঙ্ঘের সভাপতি এবং অমৃতলাল ঠক্কর হলেন সম্পাদক। ভূপালের নবাব মুসলমান, তবু হিন্দুদের মধ্যে এই সংস্কার আন্দোলনের জন্য তিনি সবার আগে দিলেন পাঁচ হাজার টাকা।

সবরমতী আশ্রমের আপ্পা সাহেব পটবর্ধন ছিলেন কারাগারে, জেলখানায় তিনি ধাঙড়-মেথরদের সঙ্গে সমভাবে কাজ করতে চাইলেন, কিন্তু জেলের কর্তারা সে অনুমতি দিলেন না—উঁচু জাতের লোক হরিজনদের কাজ করতে পারে না।

আপ্পা সাহেব অনশন সুরু করলেন।

গান্ধিজীর কাছে খবর এলো। গান্ধিজী আপ্পা সাহেবকে সমর্থন করলেন, সহানুভূতি জানিয়ে তিনিও সুরু করলেন অনশন।

দু'দিন উপবাস।

তৃতীয় দিনেই ভারত সরকার জেলের আইন কানুন সব বদলে দিলে। উচ্চ জাতির কোন লোককে জেলে মেথরের কাজ দেবার নিয়ম ছিল না, সে নিয়ম শোধরানো হোল—আপ্পা সাহেব জেলে সাধারণ মেথরের মত মলমূত্র পরিষ্কার করার কাজে আত্মনিয়োগ করলেন।

গান্ধিজীকেও আর অনশন করতে হোল না।

ভারতের সমস্ত অস্পৃশ্যতার গ্লানি দাক্ষিণাত্যে পুঞ্জীভূত হয়েছিল, সংক্রামক রোগের মত হিন্দু আচারকে পঙ্গু করে ফেলেছিল, গুরুবায়ুর মন্দিরে তারই প্রকাশ দেখা দিল—অস্পৃশ্যদের পূজার অধিকার নিয়ে বাধলো গোলমাল।

হরিজনদের নেতা কেলাপ্পন বললেন—হরিজনরা হিন্দু, হিন্দু-মন্দিরে ঢোকবার তাদের অধিকার আছে।

মন্দির নিয়ন্ত্রকেরা বললেন—পারিয়াদের মন্দিরে প্রবেশ করার অধিকার নেই।

কেলাপ্পন বললেন—এই অন্যায়ের প্রতিবাদে আমি অনশনে প্রাণত্যাগ করবো।

গান্ধিজী বললেন—কেলাপ্পন উপবাস করলে আমাকেও উপবাস করতে হবে।

গান্ধিজী অনশন করবেন! মন্দিরের মালিকেরা ত্রস্ত হয়ে উঠলো, ব্যাপারটার গুরুত্ব নিজেদের উপর থেকে সরিয়ে দেবার জন্য বললো—আমরা তো জনসাধারণের কথাই জানিয়েছি মাত্র, জনসাধারণ কি চায় গণভোট নিয়ে দেখা যাক্!

কেলাপ্পন রাজী হলেন।

পয়লা জানুয়ারী ২০,১৬৩ জন নাগরিকের মতামত নেওয়া হোল। তাতে দেখা গেল, হরিজনদের পক্ষে ভোট দিয়েছেন—১৫,৫৬৩ জন—শতকরা ৭৭ জন [ এঁদের মধ্যে ৮০০০ মহিলাও ছিলেন ]।

হরিজনদের বিপক্ষে ভোট দিয়েছেন—২৫৭৯ জন—শতকরা ১৩ জন।

মধ্যপন্থী হিসাবে মত জানিয়েছেন—২০১৩ জন—শতকরা ১০ জন।

হরিজনদের অধিকারই স্বীকৃত হোল, গান্ধিজী ও কেলাপ্পনকে আর উপবাস করতে হোল না। গুরুবায়ুর মন্দিরদ্বার হরিজনদের জন্য উন্মুক্ত হোল।

গান্ধিজী বললেন—অস্পৃশ্যতার মূলশুদ্ধ আমি উপড়ে ফেলতে চাই। সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই আমি বেঁচে আছি, সেজন্য আমি সানন্দে প্রাণ দিতেও পারি। ইহাই আমার গত পঞ্চাশ বছরের স্বপ্ন।···আমার জীবনের কোন মূল্যই আমি দিই না। হিন্দুরা স্বধর্মী শত সহস্র নরনারীর উপর যে অন্যায় আচরণ করেছে আমার মত শতটি জীবন দান করলেও তার যথেষ্ট প্রায়শ্চিত্ত হবে না।···আমার যদি দেবার মত আর কিছু থাকতো, আমি স্বচ্ছন্দ্যে দিতাম, কিন্তু দেবার মত শুধু আমার জীবনটাই আছে। ···আমি মরি কিম্বা বাঁচি তাতে কিছু যায় আসে না, আমার উদ্দেশ্য সাফল্য লাভ করুক এইটাই আমার কামনা···

জেল থেকেই গান্ধিজী হরিজনদের সেবা করার অধিকার দাবী করলেন।

কিন্তু গবর্ণমেণ্ট সে অধিকার দিতে চাইল না।

৮ই মে থেকে গান্ধিজী আবার অনশন সুরু করলেন, বললেন—কারুর বিরুদ্ধে অভিযোগ নয়। এ আমি ও আমার সহকর্মীদের আত্মশুদ্ধির জন্য আন্তরিক প্রার্থনা, যেন হরিজনদের উন্নয়নের জন্য আমরা আরো বেশী নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করতে পারি!

গান্ধিজীর তখনকার ভগ্ন স্বাস্থ্যের পক্ষে একুশদিন অনশন করা বিপজ্জনক। ভারত সরকার সেই বিপদের ঝুঁকি নিতে সাহস করলেন না, অনশন সুরু করার সঙ্গে সঙ্গেই সরকার গান্ধিজীকে মুক্তি দিলেন। গান্ধিজী বললেন—মুক্তি আমি পেয়েছি, কিন্তু হরিজনদের সেবা করা ছাড়া অন্য কোন কাজে আমি আত্মনিয়োগ করতে পারবো না! তাহলে আমার উপবাসের উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হবে।...

মুক্তি পাবার জন্য গান্ধিজী অনশন করেন নি, দেশবাসীর মনকে অস্পৃশ্যতার সংস্কার থেকে পরিশুদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। অনশন চলতে লাগলো।

পুনায় লেডী প্রেমলতা ঠাকরসীর প্রাসাদ 'পর্ণ কুঠী'। জেল থেকে বেরিয়ে সেখানেই গান্ধিজী শয্যা গ্রহণ করলেন। কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট মাধব শ্রীহরি আনেকে অনুরোধ করলেন ছ' সপ্তাহের জন্য আইন অমান্য আন্দোলন স্থগিত রাখতে। বললেন—এই উপবাস শেষ করে যদি আমি বাঁচি তাহলে কংগ্রেসকে যথা কর্তব্য নির্দেশ দেবার চেষ্টা করবো। গবর্মেণ্টের উচিত ইতিমধ্যে দেশে সত্যিকারের শান্তি ফিরিয়ে আনার জন্য সমস্ত আন্দোলনকারীকে বিনা সর্তে মুক্তি দেওয়া।

গবর্মেণ্ট তার উত্তরে বললেন—রাজনৈতিক বন্দীদের যতদিন জেলখানায় রাখা দরকার তার বেশী রাখার ইচ্ছা আমাদের নেই। কিন্তু রাজবন্দীদের ছেড়ে দিলে যদি আবার আইন অমান্য আন্দোলন সুরু হয়ে যায় সেইজন্য আমরা তাদেরকে এখনই ছেড়ে দিতে পারছি না। আমরা এমন কিছু করতে চাই না, যাতে নতুন করে গোলযোগ সুরু হতে পারে!

কিন্তু অপর পক্ষ কি করবে না করবে তার উপর গান্ধিজীর চিন্তাধারা নির্ভর করে না। আন্দোলন বন্ধ করার যে নির্দেশ তিনি দিয়েছিলেন তা আর প্রত্যাহার করলেন না। আন্দোলন বন্ধ হোল।

আন্দোলন বন্ধ করে দেওয়া অনেকের কাছেই ভালো লাগলো না।

সুদূর ভিয়েনায় ছিলেন বিঠলভাই প্যাটেল ও সুভাষচন্দ্র বসু, সেখান থেকে তাঁরা বিবৃতি দিলেন—আইন অমান্য আন্দোলন স্থগিত রাখার জন্য যে নির্দেশ গান্ধিজী দিয়েছেন, তা থেকে তাঁর নীতির ব্যর্থতাই তিনি স্বীকার করেছেন···রাজনৈতিক নেতা হিসাবে গান্ধিজী ব্যর্থ হয়েছেন বলেই আমরা মনে করি। কংগ্রেসকে এখন আবার নতুন করে সংগঠন করার সময় এসেছে—নতুন নীতি, নতুন পদ্ধতি ও নতুন

নেতার আজ একান্ত প্রয়োজন, কারণ সারা জীবন ধরে যে কর্মনীতি গান্ধিজী অনুসর করে আসছেন তার ব্যতিক্রম করে কোন কাজ করা গান্ধিজীর কাছ থেকে আশ করা অনুচিত।...কংগ্রেসের যদি আমূল সংস্কার সম্ভব হয় ভালো কথা, অন্যথ কংগ্রেসের ভিতরেই একটি শক্তিশালী দল গড়ে তুলতে হবে।...

তারা গান্ধিজীকে ঠিক বুঝেছিলেন, রাজনীতিক লাভ লোকসানের চেয়ে নীতি কথা ও মনুষ্যত্বের কথাই গান্ধিজীর কাছে বড় ছিল। মুক্তি পাবার পর কর্ণাটকে নেতা গঙ্গাধর রাও দেশপাণ্ডে যখন গান্ধিজীর সঙ্গে দেখা করে কথায় কথায় কর্ণাটকে অবস্থা সব বললেন—কেমন ভাবে সেখানে আইন অমান্য আন্দোলন ধীরে ধীরে পুলিশের চোখে ধূলা দিয়ে অগ্রসর হচ্ছে, কংগ্রেসকর্মীরা মিথ্যা ও গোপনতার আশ্র নিয়ে গ্রেপ্তারী পরোয়ানাকে ফাঁকী দিয়ে কেমন ভাবে কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন...

কংগ্রেসের এক নাম-করা নেতা ছিলেন বসে, সব শুনে তিনি খুসি হলেন, বললে —চমৎকার! খুব বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে!

গান্ধিজী বললেন—খুব বুদ্ধির পরিচয় আছে সত্যি, কিন্তু এ সত্যাগ্রহ নয়।

গান্ধিজীর সত্যাগ্রহের নীতিতে মিথ্যা বা গোপনতার স্থান ছিল না—আন্দোল বরং বন্ধ রাখাও ভালো, কিন্তু সত্য ও অহিংসা থেকে বিচ্যুত হলে চলবে না!

পর্ণ কুটীতে গান্ধিজী একুশ দিন উপবাস শেষ করলেন। দেশের সর্বত্র তাঁর দীর্ঘজীবন কামনা করে প্রার্থনা করা হোল।

কদিন পরে পুনায় কংগ্রেস কর্মীদের বৈঠক বসলো, তাঁরা স্থির করলেন—গান্ধিজী বড়লাটের সঙ্গে দেখা করে একটা মীমাংসায় পৌছবার চেষ্টা করবেন।

গান্ধিজী বড়লাটের সঙ্গে দেখা করতে চাইলেন। কিন্তু বড়লাট দেখা করতে রাজী হলেন না। কংগ্রেস কমিটি নির্দেশ দিলেন—সাধারণভাবে আইন অমান্য আন্দোলন বন্ধ থাকলেও, কংগ্রেসকর্মীরা ইচ্ছা করলে ব্যক্তিগতভাবে সত্যাগ্রহ চালাতে পারে।

গান্ধিজীও কংগ্রেসের এই নির্দেশ মেনে নিলেন। ঘোষণা করলেন—পয়লা আগস্ট তিনি রাসগ্রামে যাত্রা করবেন, এবং সেখান থেকেই সুরু করবেন ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ।

নিজেকে প্রস্তুত করার চেষ্টায় গান্ধিজী এলেন সবরমতী আশ্রমে, দাণ্ডি যাবার সময় তিনি বলেছিলেন স্বাধীনতা না নিয়ে তিনি আশ্রমে ফিরবেন না। স্থির করলে এমন কোন বন্ধন রাখবেন না, যা তাঁর মনকে আকর্ষণ করতে পারে। তিনি আশ্রমটি

গবর্মেন্টের হাতে তুলে দিতে চাইলেন, কিন্তু গবর্মেন্ট তা গ্রহণ করতে রাজী হলেন না। তখন তিনি আশ্রমটি হরিজন সঙ্ঘের হাতে তুলে দিলেন। আশ্রমে তখনও চৌত্রিশজন বাসিন্দা ছিল, কথা রইল তাদের নিয়ে গান্ধিজী তাঁর অভিযান সুরু করবেন।

কিন্তু পয়লা আগস্ট প্রভাত হবার আগেই গান্ধিজীকে পুলিশ পাকড়াও করলো। তাঁকে ও তাঁর অনুচরদের তিনদিন আটকে রাখা হোল য়েরোড়া জেলে।

চৌঠা আগস্ট গান্ধিজীকে ছেড়ে দেওয়া হোল, সঙ্গে সঙ্গে জেলের দরজায় ম্যাজিষ্ট্রেটের এক বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হোল তাঁর হাতে, ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব হুকুম দিয়েছেন—য়েরোড়া গাঁয়ের সীমানা ছেড়ে আপনাকে চলে যেতে হবে এবং পুণায় আপনাকে বাস করতে হবে।

পরোয়ানা পড়ে গান্ধিজী হাসলেন—আদেশ অমান্য করাই যিনি স্থির করেছেন আদেশ মান্য করার কোন প্রশ্নই তখন ওঠে না। গান্ধিজী রাসগ্রামের দিকে যাত্রা করলেন।

খবর পেয়েই পুলিশ ছুটে এলো, আধঘণ্টার মধ্যে গান্ধিজী আবার গ্রেপ্তার হলেন, আদেশ অমান্য করার অভিযোগে তাঁর উপর এক বছর কারাদণ্ডের আদেশ হোল।

সারা ভারতের বুকে আবার নতুন উন্মাদনা দেখা দিল। এক সপ্তাহের মধ্যেই ভারতের নগরে ও গ্রামে, পথে ও প্রান্তরে শত শত কর্মী কারাবরণ করলো।

কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট মাধব শ্রীহরি আনে, তেরোজন সহকর্মী নিয়ে আকোলা যাবার পথে গ্রেপ্তার হলেন। তাঁর স্থান দখল করলেন সর্দার শার্দুল সিং কবিশের। তাঁকেও পুলিশ পাকড়াও করলো। কস্তুরবা, দেবদাস, মহাদেব দেশাই, রাজাগোপালাচারী প্রভৃতি একে একে কারা-প্রাচীরের আড়ালে অদৃশ্য হলেন। তারপর সারা ভারতের শত শত কর্মীর মাঝে আন্দোলন ব্যাপ্ত হয়ে পড়লো, প্রতি প্রদেশে দেখা দিল অগণিত জেল-যাত্রীর জনতা।

গান্ধিজী দাবী করলেন—জেলের মধ্যে থেকেও হরিজন সেবার পূর্ণ অধিকার তাঁকে দিতে হবে।

গবর্মেন্ট জানালো—জেলের ভিতর থেকে তা হবে না।

গান্ধিজী বললেন—হরিজন সেবা শ্বাস-প্রশ্বাসের মতই আমার বাঁচার পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়, এ ছাড়া আমি বাঁচতে পারি না। এই অধিকার না পেলে আমি উপবাসে দেহত্যাগ করতে বাধ্য হব।

গবর্ণমেণ্ট জানালেন—যদি তিনি আইন অমান্য আন্দোলনের সঙ্গে কোন সম্পর্ক না রাখেন তাহলে তাঁকে মুক্তি দেওয়া যায়।

কিন্তু গান্ধিজী কোন সর্ত মেনে নিতে রাজী হলেন না।

১৬ই আগষ্ট থেকে আবার অনশন সুরু করলেন।

প্রথম চারদিন ভালই কাটলো, পঞ্চম দিনে গান্ধিজীর অবস্থা এতই কাহিল হয়ে পড়লো যে সরকারী ডাক্তাররা শংকিত হয়ে উঠলো, তাঁকে তাড়াতাড়ি পুণার সেস্থন হাসপাতালে স্থানান্তরিত করলো। হাসপাতালেও গান্ধিজী দু'দিন কয়েদীর মতই রইলেন। কিন্তু সপ্তম দিনে তাঁর জীবন সংশয় হোল—আর বুঝি গান্ধিজী বাঁচেন না!

সরকারের দৃঢ়তা এবার টুটলো। গান্ধিজীকে আটক করে রাখতে আর তারা সাহসী হোল না। সেই দিনই বিনা সর্তে গবর্ণমেণ্ট গান্ধিজীকে ছেড়ে দিলে।

গান্ধিজী মুক্তি পাবার জন্য অনশন করেননি, হরিজন সেবায় আত্মনিয়োগ করার অধিকার পাবার জন্যই উপবাস করেছিলেন। কেউ যেন তাঁকে ভুল না বোঝে, তাই তিনি জনসাধারণকে জানালেন—এক বছর জেলে থাকার কথা, আগষ্ট ১৯৩৪ সালে সেই এক বছর শেষ হবে। ততদিন পর্যন্ত তিনি নিজেকে বন্দী বলেই ভাববেন, ততদিন কোন রাজনৈতিক ব্যাপারে থাকবেন না। হরিজনদের সেবা করার অধিকার তিনি চেয়েছিলেন, একান্তভাবে সেই কাজই তিনি করবেন।

হরিজনদের সমস্যা সম্পর্কে প্রত্যক্ষভাবে জ্ঞান সঞ্চয় করার উদ্দেশ্যে গান্ধিজী আবার পথে বেরিয়ে পড়লেন।

গান্ধিজী বললেন—অস্পৃশ্যতা হিন্দু ধর্মের সবচেয়ে বড় গ্লানি···আমরা ভগবানকে পতিতপাবন বলি, সেইজন্যই হিন্দু হয়ে যারা জন্মেছে তাকে অস্পৃশ্য বলে ভাবা সয়তানি ছাড়া আর কিছু নয়।···আমি সনাতনী হিন্দু। সংস্কৃত ভাষায় আমার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য নেই, তবে বেদ ও উপনিষদের অনুবাদ আমি পড়েছি, এবং হিন্দু হিসাবে এটুকু দাবী আমি করতে পারি যে, সে-সব শাস্ত্রগ্রন্থের অন্তর্নিহিত সুরটা আমি ধরতে পেরেছি। অন্যান্য ধর্ম সম্পর্কেও আমি পড়েছি···আমি উপলব্ধি করেছি যে যদি আমার মুক্তি আসে সে হিন্দুধর্মের ভিতর দিয়েই আসবে। হিন্দুধর্মের প্রতি আমার শ্রদ্ধা ও আস্থা গভীরতর হয়েছে। সেইজন্যই আমি বিশ্বাস করি যে হিন্দু ধর্মের কোথাও অস্পৃশ্যতা বলে কিছু নেই, যদি থাকে তাহলে সে ধর্ম আমার ধর্ম নয়।···এই সম্পর্কে আমি বিতর্ক করতে চাই না। ভগবদ্গীতা বা মনুসংহিতা থেকে শাস্ত্রবাক্য উদ্ধৃত করে আমার মতকে সমর্থন করানোও আমার পক্ষে কঠিন। হিন্দু ধর্মের অন্তর্নিহিত সত্য আমি ধরতে পেরেছি। অস্পৃশ্যতা স্বীকার করে হিন্দুরা

মহাপাপ করেছে, আমরা অবনমিত হয়েছি, সমগ্র বৃটিশ সাম্রাজ্যে আমরাই হয়েছি অস্পৃশ্য। যতদিন হিন্দুরা অস্পৃশ্যতাকে তাদের ধর্মের অন্তর্গত বলে মনে করবে, যতদিন হিন্দু সমাজ ভাববে তাদের এক ভাইকে স্পর্শ করলে দোষ হয় ততদিন স্বরাজ লাভ অসম্ভব। যুধিষ্ঠির সঙ্গের কুকুরটিকে ছেড়ে স্বর্গে প্রবেশ করতেও রাজী হননি, যুধিষ্ঠিরের বংশধরেরা অস্পৃশ্যদের বাদ দিয়ে কেমন করে স্বরাজ লাভ করবে। যে অনাচারের জন্য গবর্মেন্টকে আমরা সয়তান বলে গালি দিই, অস্পৃশ্য ভাইদের প্রতি কি আমরা সেই অপরাধে অপরাধী নই?···আমরা আমাদের ভাইদের পতিত করেছি, তাদের বুক দিয়ে হাঁটতে শিখিয়েছি, মাটির উপর তাদের নাক ঘষতে শিখিয়েছি, চোখ রাঙিয়ে তাদের ট্রেনের কামরা থেকে নাবিয়ে দিই, ইংরাজেরা কি এর চেয়েও বেশী কিছু করছে? যতদিন আমরা দুর্বল ও অসহায়কে রক্ষা করতে না পারি ততদিন স্বরাজের কথা বলা অবান্তর···আমাদের দুর্বল-ভাইদের প্রতি যে অন্যায় অত্যাচার করে আসছি, যতদিন সেই পাপ থেকে আমরা নিজেদের মুক্ত করতে না পারছি ততদিন আমরা পশু ছাড়া আর কিছু নই।···

দশমাস ধরে মহাত্মাজী আর্যাবর্তের প্রত্যেকটি প্রদেশে পরিভ্রমণ করলেন, শত শত সভায় তিনি অস্পৃশ্যতা নিরাকরণের নির্দেশ দিলেন, আর তারই সঙ্গে সাধারণের কাছে হাত পাতলেন হরিজন সেবায় কিছু সাহায্য করার জন্য।

এক সভায় ছোট্ট একটি মেয়ে ফুলের মালা পরিয়ে দিল গান্ধিজীর গলায়। মহাত্মাজী হেসে বললেন—মালাই দিচ্ছ, তোমার হাতের আংটিটা দাও না কেন হরিজন ফাণ্ডে?

—আপনি যখন চাইছেন নিশ্চয়ই দোব!—মেয়েটি আঙুল থেকে আংটিটি খুলে ফেললো।

গান্ধিজী তাড়াতাড়ি বললেন—না না, তোমার মা বাবা হয়তো বকবেন।

—তাঁরা কিছু বলবেন না, আপনি এটা নিন্!

কিন্তু তবু গান্ধিজী নিতে চান না দেখে বালিকার চোখে জল এলো, রুদ্ধ কণ্ঠে বললো—আপনি তাহলে নেবেন না?

চোখের জল গান্ধিজী সহ্য করতে পারতেন না, বললেন—বেশ তাহলে দাও!

কত জায়গায় কত মানপত্র দেওয়া হোত গান্ধিজীকে। কোথাও রূপার কৌটায়, কোথাও-বা হাতীর দাঁতের কৌটায়। সভার মাঝেই গান্ধিজী সেগুলি নীলামে চড়াতেন, সভাপতি হাঁকতেন—দো রূপিয়া, তিন রূপিয়া, পাঁচ রূপিয়া···

হয়তো দর উঠলো তিনশো টাকা। গান্ধিজী বললেন—তিনশো টাকা হলে তো চলবে না, আমি এক একটি বেচে যে হাজার টাকা করে পাই!

হাজার টাকাতেই শেষ অবধি কৌটাটি বিক্রী হোল।

কোথাও মানপত্র দেবার কথা উঠলেই তিনি বলতেন—টাকার থলি চাই কিন্তু!

*

দক্ষিণ ভারতের এক সভায় এক ভদ্রলোক বললেন—আপনার পায়ের ধুলো আমার গৃহে দিতে হবে!

—কিন্তু আমি যে হরিজনদের কাজ করতে বেরিয়েছি, অবসর বড় কম!

—আমি আপনার সময়ের দাম দোব। যতক্ষণ আপনি আমার বাড়ীতে থাকবেন প্রত্যেকটি মিনিটের জন্য আমি ১১৮৲ টাকা করে দোব!

এইভাবেই চললো অর্থ সংগ্রহ।

তিনি যে শুধু সংগ্রহই করে যেতেন তা নয়, ছোট একখানি পকেট-বই থাকতো সঙ্গে, প্রতিদিন রাত্রে বসে তাতে হিসাব রাখতেন।

একদিন এক মার্কিন যুবক তাঁকে প্রশ্ন করলো—কত টাকা পেলেন?

—সাড়ে তিন লাখ!

—এ টাকা কিভাবে খরচ করবেন?

—হরিজনদের সেবায় সংগঠনের কাজে। কোন প্রোপাগাণ্ডায় নয়!

•

ট্রেনে গান্ধিজী চলেছেন, ষ্টেশনে ষ্টেশনে গাড়ী থামছে, অগণিত জনতা তাঁকে এক বার চোখের দেখা দেখবার জন্য উন্মুখ হয়ে আছে, সাড়া তুলছে—মহাত্মা গান্ধিজী জয়!

গান্ধিজী হাসতে হাসতে এসে দাঁড়ালেন জানালার সামনে, হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললেন—হরিজনদের জন্য একটি করে পয়সা তোমরা দাও আমাকে।

গান্ধিজী ভিক্ষা চাইছেন! জনতার মধ্যে ঠেলাঠেলি পড়ে গেল, কে আগে তাঁর হাতে পয়সা দেবে তার তরে সুরু হোল ব্যস্ততা, মুহূর্ত মধ্যে এক হাত ভরে গেল, গান্ধিজী আরেক হাত বাড়িয়ে দিলেন। সে মুঠিও পূর্ণ হতে দেরী হোল না। গান্ধিজীর হাতে পয়সা তুলে দেওয়ার আনন্দে জনতা উল্লসিত হয়ে উঠলো—মহাত্মা গান্ধিজী জয়!

ট্রেন ছাড়লো, গান্ধিজী হিসাব করতে বসলেন কত পয়সা সংগ্রহ হোল সেখানে। একটি পয়সাও হিসাবের ফাঁকে পড়তো না।

রাত্রেও এইভাবে পয়সা ভিক্ষার ব্যতিক্রম ছিল না। দুপুর রাত্রে হয়তো গান্ধিজী ঘুমুচ্ছেন, এমন সময় ষ্টেশনে গাড়ী এসে থামলো, জনতার চীৎকার শুনে গান্ধিজীর ঘুম ভেঙ্গে গেল, তিনি বিরক্ত হলেন না, হাসিমুখে জানালার ধারে এসে হাত বাড়িয়ে দিলেন, বললেন—হরিজন সেবাকে দিয়ে যাবে এক এক পৈসা দিজিয়ে!

পণ্ডিত মালব্যজীর মত তিনি বড় বড় ধনীর কাছ থেকে, রাজা মহারাজার কাছ থেকে অনায়াসে লাখ লাখ টাকা সংগ্রহ করতে পারতেন, কিন্তু তিনি তা চাননি, তিনি চেয়েছিলেন হরিজনদের সেবায় ভারতের প্রত্যেকটি মানুষের কিছু কিছু দান থাক।

ছোট ছেলে তাঁর সামনে অটোগ্রাফের খাতা মেলে ধরলেই তিনি স্বাক্ষর দিতেন না, হেসে বলতেন—আগে আমার ফী দাও পাঁচ টাকা?

কোন ডাক্তার তাঁকে পরীক্ষা করতে গেলে তিনি হেসে বলতেন—আমাকে ছুঁলেই ফী লাগবে!

হরিজন ফাণ্ডে কিছু না দিলে ডাক্তার রেহাই পেতেন না।

সকাল সন্ধ্যা প্রার্থনা সভাতেও হরিজনদের জন্য তিনি চাঁদা তুলতেন।

১৯৩৭ সালে যখন 'শাদা কাগজের' নতুন আইন চালু হোল, তখন এক সাংবাদিক গান্ধিজীকে প্রশ্ন করেন—কংগ্রেসীরা কি মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করবে?

গান্ধিজী ঠাট্টা করে বললেন—কেন? তুমি কি মন্ত্রী হতে চাও নাকি?

সাংবাদিক বেচারা আর কি বলে, এক পাশে সরে দাঁড়ালো, কিন্তু মহাত্মাজী এতো সহজে তাঁকে ছাড়লেন না, বললেন—তোমার টুপিটা আমাকে দেবে, ভিক্ষাপাত্র করবো!

সাংবাদিক তাড়াতাড়ি টুপিটি খুলে গান্ধিজীর হাতে দিলেন। গান্ধিজী সেটি হাতে নিয়ে প্রথমেই বাড়িয়ে দিলেন সেই সাংবাদিকের সামনে, বললেন—আগে তুমিই কিছু দাও, তোমা থেকেই সুরু হোক!

সাংবাদিক তাড়াতাড়ি কিছু দিয়ে নিষ্কৃতি পেলেন, চারিদিকে হাসির হর্‌রা উঠলো।

এই টাকাটা যে শুধু হরিজনদের জন্যই খরচ হোত তা নয়, যাঁরা অনুন্নত তাদের উন্নতি বিধানের কাজেও খরচ করা হোত, সেখানে হিন্দু কি মুসলমানের বিচার ছিল না। অনেক গোঁড়া হিন্দুর তা ভালো লাগতো না, একবার একজন ধনী এসে বললেন—মহাত্মাজী, আপনাকে আমি দু'লাখ টাকা দিতে চাই, কিন্তু একটা কথা—মুসলমান ও হরিজনদের কাজে এ টাকা আপনি খরচ করতে পারবেন না!

গান্ধিজী হেসে বললেন—কথাটা ভালো। কিন্তু তোমার ওই সর্তে তো আমি টাকা নিতে পারবো না, তুমি আর কোন মহাত্মাকে খুঁজে বের কর গে—

সত্যাগ্রহীর কাছে টাকার চেয়ে তো সত্য বড়।

কয়েক মাসের মধ্যেই মহাত্মাজী আট লাখ টাকা সংগ্রহ করলেন।

কিন্তু এমন মহৎ কাজও নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়নি। একদল সংস্কারাচ্ছন্ন মানুষ এতদিনের আত্মাভিমান এতো সহজে ছাড়তে পারলো না, গান্ধিজী ছোট লোকদের জন্য এতো মাতামাতি করছেন এ তারা সইতে পারলো না। তারা গান্ধিজীকে আঘাত করার জন্য সংকল্প করলো।

তাদের প্রথম অভিযান প্রকাশ পেল পুণা সহরে।

পুণা মিউনিসিপ্যালিটি সেদিন এক বিশেষ সভায় গান্ধিজীকে নিমন্ত্রণ করে। তাঁকে অভিনন্দন জানিয়ে একখানি মানপত্র দেবার জন্য। যথা সময় গান্ধিজী মোটারে যাচ্ছিলেন, পথে একটি যুবক তাঁর গাড়ীতে বোমা ছুঁড়লো। যুবকের মোটার চিনতে ভুল হয়েছিল। আগের গাড়ীতে যাচ্ছিলেন অন্য লোক, বোমাটি সেই গাড়ীর সামনেই ফাটলো। মোটারখানি লাফিয়ে উঠলো, ভিতরের সাতজন আরোহী জখম হোল।

চল্লিশ কোটি মানুষের অদৃষ্টলিপি সেদিন ভালো ছিল বলতে হবে। জাতির ভাগ্য-নিয়ন্তা সে মোটরে ছিলেন না, তিনি আসছিলেন পিছনের গাড়ীতে। নিরাপদে তিনি পৌর-সভায় এসে পৌঁছলেন।

হরিজনদের ব্যাপারে কর্মীদের মধ্যে তর্ক বিতর্ক প্রায় লেগে থাকতো। বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণেরা ছোটলোকদের সমান অধিকার দেবার বিরোধী ছিলেন। কাশ্মীর মানী পণ্ডিত লোকনাথ ছিলেন এই দলের মানুষ। একদিন তো হরিজন কর্মীদের সংগে তাঁর প্রচণ্ড বিতর্ক বেধে গেল।

লোকনাথ হরিজনদের মানুষ বলে মানতে চান না।

কর্মীরাও যুক্তি দিতে ছাড়েন না।

শেষে পণ্ডিতজী গান্ধিজীকে গালি দিতে সুরু করলেন। গান্ধি-বাদীরা আর সইতে পারলো না, মাথায় খুন চড়ে গেল, হাতে ছিল লাঠি, এক ঘা বসিয়ে দিল পণ্ডিতজীর মাথায়। মাথা ফেটে গেল। রক্তারক্তি ব্যাপার!

খবর পৌঁছালো গান্ধিজীর কাছে। তিনি মর্মাহত হলেন। সত্যাগ্রহের নীতি তো এ নয়। সত্যাগ্রহী সত্যের জন্য লড়বে। তার কাজ হোল অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করা, অপরকে আঘাত করা নয়,—যারা অন্যায় করছে তাদের নিজের ভুল

ঝিয়ে দেওয়া, তোমার সত্য উপলব্ধিটা তার মনে ঢুকিয়ে দেওয়া। সে যে পর্যন্ত
ার ভুল না বুঝতে পারবে, সে পর্যন্ত সত্যাগ্রহও সফল হবে না। নির্ভীক হয়ে
গিয়ে যেতে হবে, পরাজয় মানা চলবে না—মৃত্যুতেও হার মানবে না। আঘাত
লে তাকে সইতে হবে, কিন্তু আঘাত করা চলবে না।...আর কাশীতে সত্যাগ্রহীরা
ণ্ডিতজীকে আঘাত করে বসলো, সত্যাগ্রহের মর্ম এখনও তো তারা পরিপূর্ণভাবে
ঝতে পারেনি! তাদের প্রায়শ্চিত্ত করার প্রয়োজন, তাদের মনশুদ্ধি করা দরকার।

গান্ধিজী সাতদিন অনশন করলেন। কর্মীদের উদ্দেশ্যে আবেদন করলেন—পর-মত
ইতে যেন তারা অভ্যস্ত হয়, কোন মতেই হিংসার আশ্রয় না লয়।

হরিজন আন্দোলনের গতি ব্যাহত হোল বিহার ভূমিকম্পে।

কয়েক মিনিটের ভূমিকম্পে বিহারের ত্রিশ হাজার বর্গ মাইল জুড়ে যে ক্ষতি হোল,
তা অভাবিত। দেড় কোটি মানুষ গৃহহারা হোল। কুড়ি হাজার লোক প্রাণ
হারালো। মাটি ফেটে গরম বালি ছুটলো, হাহাকার উঠলো শহরে শহরে, গাঁয়ে
গাঁয়ে। কত লোক যে ধ্বংসস্তূপের নীচে চাপা পড়লো!

শত সহস্র কংগ্রেস কর্মী ছুটে এলেন বিহারে আর্তদের সেবা করতে।

ডক্টর রাজেন্দ্র প্রসাদ খবর পাঠালেন গান্ধিজীর কাছে। গান্ধিজী ছুটে এলেন।
একমাস ধরে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে পদব্রজে ঘুরে বেড়ালেন। কোথাও-বা সেবার
জন্য ভিক্ষার ঝুলি পেতে ধরলেন, বললেন—আর্ত সেবায় দান কর! আবার
কোথাও বা সর্বহারাদের ডেকে বললেন—ভিক্ষা চেও না, কাজ চাও! আবার কখনো
সেবকদের ডেকে বললেন—সরকারী লোক কি কংগ্রেসী লোক বলে কোন পার্থক্য
করো না, হিন্দু-মুসলমানের বিচার করো না, স্পৃশ্য অস্পৃশ্য বলে ভাববার মত অবসর
আজ আর নেই!

চারিদিকের এই দুর্যোগের মাঝে সত্যাগ্রহের আন্দোলন থেমে আসে, তথাপি
একদল কর্মী গান্ধিজী আন্দোলন থামিয়ে দিয়েছেন বলে তীক্ষ্ণ সমালোচনার অবতারণা
করেন। গান্ধিজী তাঁদের যুক্তিকে মেনে নিতে পারলেন না, অনেক বিচার বিবেচনা
করে তিনি কংগ্রেসের সদস্য পদ ছেড়ে দিলেন। এই সম্পর্কে তিনি বললেন—অনেক
কংগ্রেস-কর্মীর সংগে আমার মতের মিল হচ্ছে না।...অনেক তীক্ষ্ণধী কংগ্রেসকর্মী
আমার নীতিকে সমর্থন করতে না পারলেও আমার নির্দেশ পালনে দ্বিধা করেননি।...
আমি চরকা ও খদ্দরকে দেশবাসীর সামনে তুলে ধরতে চাই।কিন্তু অনেক কর্মীর এতে

পূর্ণ আস্থা নেই।...ভারতবর্ষকে যদি পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন করতে হয় তাহলে চরকা
খদ্দরকে স্বীকার করতেই হবে।...চরকা জনগণের মর্যাদা ও সাম্যের প্রতীক।...এ
জাতির দ্বিতীয় ফুসফুস। এই ফুসফুসটি ব্যবহার না করার জন্যই আজ আমরা ধ্ব
হতে বসেছি। অথচ এই চরকার উপরেই আজ বহু কর্মীর বিশ্বাস নেই। খদ্দরে
বিশ্বাস না করার অর্থ জনগণের সংগে কংগ্রেসের যোগসূত্র হারিয়ে ফেলা।...অনে
মনে করেন হরিজন আন্দোলনের ব্যাপারে আইন অমান্য আন্দোলন বন্ধ করে দি
আমি ভুল করেছি। কিন্তু আমি যা বুঝেছি তা না করলে নিজের কাছে মিথ্যাচা
হতাম।...চৌদ্দ বছর ধরে আমি অহিংসার পরীক্ষা করছি। অধিকাংশ কংগ্রে
কর্মীর কাছে এটা একটা নীতি কিন্তু আমার কাছে এটি একটি ধর্ম। যদিও এ সম্পর্
আমি এখনও রীতিমত ব্যুৎপত্তি লাভ করতে পারিনি। এই নীতি এখন কিছুদিন শু
আমার একার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকা ভালো।...সত্যাগ্রহ আমার জীবন-বেদ। সত্য
আমার কাছে ভগবান। আমি অহিংসার সাধনায় পরমেশ্বরকে উপলব্ধি করতে চাই
আমার দেশের স্বাধীনতা—সমগ্র পৃথিবীর স্বাধীনতা এই সত্যানুসন্ধানের অন্তর্গত
ইহকালের কি পরকালের কোন লাভ-লোকসানের আশায় আমি এই সত্য সাধন
ছাড়তে পারি না। এই সত্যসাধনাই পূর্ণ স্বাধীনতা। আজ আমার দেশবাসীকে একথ
বোঝাতে না পারলেও একদিন সত্য নিজগুণে ভাস্বর হয়ে উঠবে।...আমি ভারতে
জন্য পূর্ণ স্বরাজ চাই। পূর্ণ স্বরাজের অর্থ পূর্ণ স্বাধীনতার চেয়ে অনেক বেশী। সেইজন্
যতবার যেভাবেই আমি স্বরাজের ব্যাখ্যা করি না কেন,কোন বারেই সে ব্যাখ্যা সম্পূ
হয়নি।...এখন আমি কংগ্রেসের বাইরে থেকে স্বাধীনভাবে কাজ করতে চাই।...

কাগজে কলমে গান্ধিজী কংগ্রেস ছাড়লেন বটে, কিন্তু তাবলে কাজের বিরতি
হোল না। গ্রাম উন্নয়নের কাজ, হরিজনের কাজ, জাতীয় শিক্ষা পরিকল্পনার কাজ—
সব কিছুই সমভাবে চলতে লাগলো। কর্মীদের তিনি নির্দেশ দিলেন—সত্যাগ্র
আধ্যাত্মিক অস্ত্র।...আমি এই অস্ত্র প্রয়োগের বিশেষজ্ঞ হবার দাবী রাখি। এই অ
প্রয়োগ সম্বন্ধে যথেষ্ট সতর্কতার প্রয়োজন। সত্যাগ্রহের গোড়ার কথাই হচ্ছে—
সত্যাগ্রহীর বর্তমানটুকু দেখলেই চলবে না, আরো দূরে দৃষ্টি রাখতে হবে। সেইজন্য
অনেক আলোচনা করার পর এখন সত্যাগ্রহ স্থগিত রাখতে চাই।...আমার বিশ্বা
ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে জয়যুক্ত হতে হলে এইটাই হোল শ্রেষ্ঠ পন্থা।...সত্যাগ্র
মানে শুধু আইন অমান্য করাই নয়, সত্যাগ্রহ মানে সত্যের প্রতি অনুসন্ধিৎসা। এবং
সেই অনুসন্ধানে পরিপূর্ণভাবে অহিংস নীতির প্রয়োগ করা।...আইন অমান্যকারীদের

এখন কাজ হবে স্বার্থ বুদ্ধি ও দারিদ্র্য বরণ করতে শেখা, জাতি গঠনের কাজে আত্ম-নিয়োগ করা।...

এই জাতি গঠনের জন্য মহাত্মাজী কংগ্রেস কর্মীদের আঠারো দফা কার্য-নীতির নির্দেশ দিলেন :

১। খদ্দর—গান্ধিজী বলেন খদ্দর আমার কাছে একতার প্রতীক, অর্থোপার্জনের স্বাধীনতা ও সকল মানুষের সমান অধিকারের প্রতীক। এই চরকা কাটার মূল কথা হচ্ছে দেশকে স্বাবলম্বী করে তোলা। আমাদের দেশে বছরে হাজার কোটি গজ কাপড়ের দরকার। আগে এর সবটাই আমাদের দেশে তৈরী হোত কিন্তু ইংরাজেরা এদেশের চরকা নষ্ট করে দেয়, তখন তাঁতীরা দিশি সুতা না পেয়ে বিলিতী সুতায় কাপড় বুনতে সুরু করে, কোটি কোটি টাকার সুতা বিলাত থেকে এদেশে আসতে থাকে। পরে তাঁতীদের বুড়ো আঙুল কেটে দিয়ে তাঁত চালানোর ব্যবস্থাও কমিয়ে দেওয়া হোল। বিলিতী কলে বোনা কাপড় আসতে সুরু করলো। শেষে দেখা গেল ১০০০ কোটি গজের মধ্যে আমাদের দেশে তৈরী হচ্ছে মাত্র ২৫০ কোটি গজ—মিলে ১৫০ কোটি গজ আর তাঁতে ১০০ কোটি গজ। বাকী ৭৫০ কোটি গজ আমরা কিনছি বিলাত থেকে। এই কিনতে গিয়েই আমাদের গরীব দেশ বছরে বছরে আরো বেশী গরীব হয়ে পড়ছে। এই টাকাটা দেশে রাখার জন্য মহাত্মাজী দেশবাসীর হাতে চরকা তুলে দিলেন, বললেন—প্রত্যেক লোকেরই দিনে অন্ততঃ আধ ঘণ্টা চরকা কাটা উচিত। সকলকেই তিনি খদ্দর পরতে অনুরোধ করলেন। খদ্দরের দাম যদি মিলের কাপড়ের চেয়ে বেশীও হয় তবু। কারণ এক টাকার মিলের কাপড় কিনলে টাকাটার বেশীর ভাগ পায় মিলওলারা, কিন্তু এক টাকার খদ্দর কিনলে টাকাটার বেশীর ভাগ পায় চাষী, কুটুনী আর তাঁতী। তাতে গরীব লোকেরা কিছু পয়সা পায়, অনাহারের হাত থেকে বাঁচে। অবসর পেলে গান্ধিজী নিজেও চরকা কাটতেন। এই বয়সেও তাঁর কাজের বিরাম ছিল না। মুখে কথা বলতেন, হাতে কাজ করতেন। চুপ করে বসে গল্প করার সময় তাঁর ছিল না। নিজের হাতে কাটা সুতায় কাপড় বুনে তিনি পরতেন।

২। বনিয়াদি শিক্ষা—আমাদের দেশে ছেলেমেয়েদের যেভাবে শিক্ষা দেওয়া হয় তা বদলাতে হবে। তাদের হাতে কলমে এমন ভাবে শিক্ষা দিতে হবে যাতে তারা আত্মনির্ভরশীল হতে পারে। সেই উদ্দেশ্যেই ওয়ার্ধা শিক্ষা পরিকল্পনার সৃষ্টি।

৩। বয়স্কদের শিক্ষা—আমাদের দেশে একশো জনের মধ্যে দশজন মাত্র কোন

রকমে নাম সই করতে পারে। বয়স্করা অধিকাংশই অশিক্ষিত। তাদের শেখাতে হবে লেখাপড়া, জানাতে হবে আমাদের কি ছিল, বিদেশীরা আমাদের ভাত কাপড় সুখ শান্তি কি ভাবে লুটে নিচ্ছে, কি ভাবে আবার আমাদের সমৃদ্ধি ফিরিয়ে আনতে পারি।

৪। কুটীর শিল্প—গাঁয়ের ঘরে ঘরে ছোট ছোট শিল্প গড়ে তুলতে হবে। গাঁয়ের লোকেরা নিজ নিজ গাঁয়ের তৈরী জিনিষই যথাসম্ভব কিনবে। গাঁয়ে সাবান তৈরী হবে, কাগজ তৈরী হবে, দেশলাই তৈরী হবে, চামড়া পাকানো হবে, ঘানিতে তেল তৈরী হবে, গম ভাঙতে হবে যাঁতায়, ধান ভাঙতে হবে ঢেঁকীতে···

৫। ছাত্র—ছাত্রেরা সুতা কাটবে, খদ্দর পরবে, দলাদলি করবে না, দেশের উন্নতি সম্পর্কে পড়াশুনা করবে। রোগীর সেবা করবে, অশিক্ষিতদের লেখাপড় শেখাবে, ছোট জাতকে ভাই বলে মনে করবে, অন্য ধর্মের লোককে বন্ধু বলে ভাববে রাষ্ট্র ভাষা হিন্দি শিখবে। ছাত্রীদের বোনের মত দেখবে, সময় ঠিক রেখে চলতে শিখবে।

৬। জাতি ও ধর্ম—হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, পার্শী সবাই মিলে-মিশে থাকতে হবে।

৭। অস্পৃশ্যতা—ছোট জাতের সঙ্গে মিশতে হবে, তাদের উন্নতি করতে হবে তাদের ভাই বলে নিজেদেরই মধ্যে ডেকে নিতে হবে।

৮। নেশা—মদ, তাড়ি, আফিং, গাঁজা প্রভৃতি নেশা দেশ থেকে একেবারে বিদায় করতে হবে।

৯। গ্রাম—ভারতে সাত লাখ গ্রাম আছে, প্রত্যেক গ্রামকে স্বাস্থ্যকর করে গড়ে তুলতে হবে।

১০। স্বাস্থ্য—সৎচিন্তা, উপযুক্ত পরিশ্রম, মুক্ত বায়ু সেবন, ঋজু হয়ে দাঁড়ানো সোজা হয়ে বসা, পরিচ্ছন্নতা প্রভৃতির দিকে বিশেষ লক্ষ্য রেখে স্বাস্থ্যের উন্নতি করতে হবে।

১১। নারী—মেয়েদের শিক্ষা দিতে হবে, পুরুষের সঙ্গে সমান অধিকার দিতে হবে।

১২। কিষাণ—এদেশে ত্রিশ-বত্রিশ কোটি মানুষ চাষ আবাদ করে, তাদের ঠিকমত শিক্ষিত করে তুলতে হবে, স্বাধীনতার কথাটা ঠিকমত বুঝিয়ে দিতে হবে।

১২। মজদুর—যারা কারখানায় কাজ করে তাদের সংঘবদ্ধ করতে হবে

সংঘ তাদের জন্ত পাঠশালা খুলবে, হাসপাতাল করবে। স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থা করবে, দরকার হলে মালিকদের বিরুদ্ধে লড়বে।

১৪। আদিবাসী—এদেশে কোল, ভীল, সাঁওতাল প্রভৃতি পাহাড়িয়া জাত আছে, প্রায় দু'কোটি, তাদের উপযুক্ত ভাবে শিক্ষিত করে তুলতে হবে।

১৫। কুষ্ঠ ও যক্ষা—এদেশে যারা কুষ্ঠ, যক্ষা প্রভৃতি মারাত্মক রোগে কষ্ট পাচ্ছে তাদের ভালো করে তোলার ব্যবস্থা করতে হবে।

১৬। টাকা-পয়সা—সকলের টাকা পয়সা সমান হওয়া দরকার, অহিংসার মধ্য দিয়ে বড় লোকদের সকলের সাথে সমান করে নেবার চেষ্টা করতে হবে, ধনীদের মন বদলে দেবার চেষ্টা করতে হবে।

১৭। রাষ্ট্র-ভাষা—ভারতের সব লোক যাতে সব লোকের সঙ্গে কথা বলতে পারে সেজন্য একটা রাষ্ট্র ভাষার দরকার, হিন্দী হবে সেই রাষ্ট্রভাষা, এই ভাষা সকলের শেখবার ও শেখাবার চেষ্টা করতে হবে।

১৮। মাতৃভাষা—প্রত্যেকেই নিজের মাতৃভাষা ভালো করে শিখবে। মাতৃ-ভাষার উন্নতি করতে হবে। মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।

গান্ধিজী বলেন এই আঠারো দফা নীতিকে কার্যকরী করতে পারলেই সত্যিকারের স্বাধীনতা আমাদের হাতে এসে পড়বে।

গান্ধিজীর নেতৃত্ব সখের বিলাস ছিল না, কর্মীদের বাণী ও নির্দেশনামা দিয়ে নিজে চুপ করে থাকতেন না, নিজে সেই নীতি কার্যকরী করার জন্ত অনন্তসাধারণ পরিশ্রম করতেন। তাঁর আদর্শের মূল কথা ছিল—আপনি আচরি ধর্ম অপরে শিখাও। কথার চেয়ে তিনি কাজ ভালবাসতেন বেশী, সেইজন্তই তিনি বলেছিলেন—আমার জীবনই আমার বাণী!

কাজ করতে নাবলে তিনি নিজের দেহের পানেও তাকাতেন না, কাজ সম্পূর্ণ না করে তিনি স্বস্তি পেতেন না। জাতি গঠনের প্রোগ্রাম নিয়ে যখন তিনি কাজ সুরু করলেন, দেখতে দেখতে এতো কাজ হাতে জমে গেল যে তিনি হাঁপিয়ে উঠলেন। সারা ভারতের কল্যাণ করতে হলে এ কাজ অবিলম্বে শেষ করতে হবে! অন্ত সব কাজ বাকী রেখে, হাতের কাজ শেষ করার জন্ত তিনি চার সপ্তাহ মৌনাবলম্বন করলেন—মুখ বুঁজে হাতে-কলমে শুধু কাজ আর কাজ।

গান্ধিজী বলতেন—চরখা চালা-চালাকর স্বরাজ লেঙ্গে!

এই চরকার চারিপাশ ঘিরে সংগঠনের এক পরিকল্পনা গড়ে ওঠে। পণ্ডিত নারায়ণ আগরওয়ালা গান্ধিজীর সংগে আলোচনা করে এই সম্পর্কে একটা পরিকল্পনা তৈরী করেন। এই পরিকল্পনার মোটামুটি কথা হচ্ছে প্রত্যেক ভারতবাসীকে সাতটি ব্যাপারে উপযুক্ত সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হবে :

১। স্বাস্থ্যকর খাদ্য।
২। দরকারী কাপড় জামা।
৩। বাসস্থান।
৪। পড়াশুনার ব্যবস্থা।
৫। চিকিৎসার সুবিধা।
৬। খবর পাঠাবার ও যাতায়াতের সুবিধা।
৭। আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা।

খাদ্যের কথা উঠলেই চাষ আবাদের কথা ওঠে। দেশে ভালো ফসলের ব্যবস্থা করতে হবে। ৬৫ কোটি বিঘা জমি খালি পড়ে আছে, সে জমি চাষের কাজে লাগাতে হবে। জমিদার বলে কিছু থাকবে না, জমি হবে রাষ্ট্রের সম্পত্তি। এ দেশে ৫ কোটি গোরু মোষ আছে, তাছাড়া ৩৩ কোটি আছে অন্যান্য গৃহপালিত পশু, সেই সব পশু পালনের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা করতে হবে। ফল ও শাকসব্জি চাষের উন্নতি করতে হবে।

প্রত্যেকটি গ্রাম স্বয়ংসম্পূর্ণ হবে। নিজেদের প্রয়োজন মত খদ্দর তারা নিজেরাই তৈরী করবে।

এক একটি লোকের জন্য অন্ততঃ ছ'সাত হাত লম্বা ও ছ'সাত হাত চওড়া বাসস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে। শহরগুলিতে ঘেঞ্জি বাড়ীঘর করতে দেওয়া হবে না। কারখানাগুলি শহরের বাইরে সরিয়ে দিতে হবে। শ্রমিকেরা যেন স্বাস্থ্যকর জায়গায় থাকতে পায় সেদিকে নজর রাখতে হবে।

সকলে যাতে শিক্ষা পায় তার ব্যবস্থা করতে হবে। শুধু বই পড়ানো নয় হাতে কলমে কাজ করাতে হবে, দুনিয়া সম্পর্কে জ্ঞান দিতে হবে। ইস্কুলে যাবার মত যাদের বয়স তারা যেন কারখানায় মজুরী করতে না যায়। অশিক্ষিত বয়স্কদের এমনভাবে শিক্ষা দিতে হবে যে তারা যেন ভদ্র হয়ে ওঠে, নিজের দেশকে চিনতে পারে ও নিজেদের অবস্থার উন্নতি করতে পারে। দেশের মধ্যে অশিক্ষিত যেন কেউ না থাকে।

অসুখ যেন না হয় তার ব্যবস্থা ও অসুখ হলে সারাবার ব্যবস্থা করতে হবে।

হাসপাতাল, ডাক্তার, নার্স ও ওষুধের অপর্যাপ্ত ব্যবস্থা রাখতে হবে। খেলাধুলার জন্য যথেষ্ট সুবন্দোবস্ত চাই।

যাতায়াতের সুবিধার জন্য রেলপথ বাড়াতে হবে, জলপথে নৌকা ষ্টীমার ও শূন্য-পথে বিমান-পোত বাড়াতে হবে। পোষ্টাপিস বাড়াতে হবে, চিঠিপত্র পাঠাবার, টেলিফোন ও টেলিগ্রাম করার খরচ সুলভ করতে হবে, সুপ্রচুর বন্দোবস্ত করতে হবে।

খেলা-ধূলা ও আমোদ-প্রমোদের সুলভ সুন্দর ব্যবস্থা করতে হবে। সিনেমা রেডিও যাত্রা থিয়েটার প্রভৃতির ভিতর দিয়ে শুধু নিছক আনন্দ বিতরণই নয়, লোক-শিক্ষারও ব্যবস্থা করতে হবে।

এই সব নীতিকে কার্যকরী করতে হলে, রাষ্ট্রের বাজে খরচ কমাতে হবে। যারা চাকরী করবে তাদের মাইনে পাঁচশো টাকার বেশী হবে না। সৈন্য বিভাগের খরচ কমাতে হবে না। বেশী আয়ের উপর বেশী কর বসাতে হবে। সরকারী সম্পত্তির উপর বেশী সম্পত্তি থাকলে বেশী কর চাপানো হবে। চাষীদের খাজনা কমাতে হবে, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা সম্পর্কে গবেষণার খরচ বাড়াতে হবে। কেউ বিদেশে মাল পাঠিয়ে ব্যবসা করতে পারবে না, বিদেশী ব্যবসা চালাবে রাষ্ট্র। মজুরদের সংঘ গড়তে হবে। গাঁয়ে গাঁয়ে চাষীদের পঞ্চায়েৎ থাকবে। প্রয়োজন মত ভালো কাজে পঞ্চায়েৎকে রাষ্ট্র টাকা ধার দেবে। এই সব কাজে মোটামুটি রাষ্ট্রের খরচ পড়বে ৩৫০০ কোটি টাকা, তবে রাষ্ট্রের আয়ও বাড়বে আরো বেশী।

এই পরিকল্পনা, ১৮ দফা কর্মসূচী, সত্য ও অহিংসা নীতি মিলে যে রূপ গ্রহণ করে অনেকে তাকেই গান্ধিবাদ বলে নাম দেন। ১৯৩৬ সালে মাওলিতে গান্ধি-সেবা সঙ্ঘের এক সভায় এই সম্পর্কে গান্ধিজী বলেন—গান্ধিবাদ বলে কিছু নেই। আমি চাই না যে আমার মৃত্যুর পরে আমার নাম নিয়ে কোন নতুন সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়।

গান্ধিজী চেয়েছিলেন ভারতবাসীকে আত্মস্থ করতে, ব্যক্তিত্বের পূজা করা বা মতবাদ দিয়ে অভিভূত করে ফেলতে তিনি চান নি।

গান্ধিজীর মাতৃভাষা গুজরাতী। আত্মজীবনী এবং অন্যান্য অনেকগুলি বই তিনি মাতৃভাষায় লেখেন। সেই দিক দিয়ে বিচার করলে তাঁকে একজন ভালো লেখক বলা চলে। তাছাড়া ভারতের অন্যতম চিন্তানায়ক হিসাবে কয়েকটি সাহিত্য-সম্মেলনে তাঁকে সভাপতি হবার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়। জাতীয় সাহিত্যের রূপ কি হওয়া উচিত সেই সম্পর্কে সেই সব সভায় তিনি স্পষ্ট মতামত ব্যক্ত করেন।

১৯৩৬ সালে নাগপুরে নিখিল ভারত সাহিত্য-সম্মেলন বসে, সেখানে সাহিত্য

সম্বন্ধে গান্ধিজী বলেন—আমার যদি ক্ষমতা থাকতো তাহলে যেসব বই সাম্প্রদায়িকতা, ধর্মান্ধতা, এবং ব্যক্তিগত, শ্রেণীগত ও জাতিগত বিদ্বেষ প্রচার করে, তা বন্ধ করে দিতাম!

মাস কয়েক পরে আমেদাবাদে গুজরাতী সাহিত্য-সম্মেলনের বৈঠকে গান্ধিজী বলেন—আমি চাই শিল্প ও সাহিত্য জনসাধারণের জন্ম হবে।··কিন্তু আমাদের সাহিত্যের অবস্থা শোচনীয়।···

হিন্দী সাহিত্য-সম্মেলন ও ভারতীয় সাহিত্য-পরিষদের বার্ষিক অধিবেশন বসে মাদ্রাজে, সেখানে সভাপতির অভিভাষণে গান্ধিজী বলেন—সাহিত্যে সাম্প্রদায়িকতা ও সংকীর্ণতা থাকবে না···শুধু রসসৃষ্টি হিসাবেই সাহিত্যকে আমি পছন্দ করি না।···

শুধু সাহিত্য নয়, শিল্প ও সঙ্গীতকেও গান্ধিজী বড় ভালবাসতেন। কারু-শিল্প নিয়ে তিনি খুব বাড়াবাড়ি করেন নি সত্য, কিন্তু চারিপাশে তাঁর শিল্পী-দৃষ্টি ছিল, নিজে যে সামান্য দু-একটা জিনিষ ব্যবহার করতেন তাতেও একটা কারু-শ্রী থাকতো। তাঁর ঘরে ঘটীর মুখে একটি পিতলের ঢাক্‌না চাপা দেওয়া থাকতো! ঢাক্‌নাটি একখানি পিপুল পাতার ধরণে তৈরী। শান্তি নিকেতনের শিল্পাচার্য নন্দলাল বসু সেই পাতাটির সৌষ্ঠব দেখে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন।

গান্ধিজীর মন ছিল সত্যকারের শিল্পীর মন। তিনি একবার বলেছিলেন—চারিপাশের দেয়াল শুধু আমাদের আশ্রয় দেবার জন্য—যদি ছবি দেখতে চাও তবে মাথার উপর নীল আকাশের পানে তাকিয়ে দেখ; চোখের সামনে দেখ দিগন্ত ছোঁয়া সবুজ মাঠ। হাতের আঁকা ছবি কি এর চেয়ে বেশী সুন্দর?···

হরিপুরা কংগ্রেসে শিল্পচার্য নন্দলাল বসু এক চিত্র প্রদর্শনী করেন। গান্ধিজী সেই প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেছিলেন। গোলপাতায় ছাওয়া কুটীরে হাতে আঁকা চার শো ভালো ভালো ছবি টাঙ্গানো হয়েছিল। দুপুরের রোদ গোলপাতা ও ছাদকে পাশ কাটিয়ে এসে পড়েছিল ঘরের ভিতরে গান্ধিজী ঘরে ঢুকেই থমকে দাঁড়ালেন। গোলপাতার ছায়া ঘরের মেঝেতে আলপনা এঁকে দিয়েছে যেন। সেইদিকে খানিক তাকিয়ে থেকে ধীরে ধীরে চোখ তুলে গান্ধিজী হেসে বললেন—নন্দবাবু, আপনি কি এতো সুন্দর ছবি আঁকতে পারেন?

নন্দবাবু বুঝলেন গান্ধিজী কত উঁচু ধরণের সমঝদার।

বিলাতে যাবার সময় রোমের চিত্রশালায় আর গির্জার গায় আঁকা যিশুখৃষ্টের জীবনের ঘটনাবলীর বিশ্ববিখ্যাত ছবিগুলি দেখে গান্ধিজী এমন তন্ময় হয়ে গিয়েছিলেন যে, কোন ফাঁকে যে কয়েকটি ঘণ্টা কেটে গেছে তা তিনি টের পাননি।

দেশী ও বিদেশী সঙ্গীতও গান্ধিজীর কাছে অত্যন্ত প্রিয় ছিল। একবার কথায় ায় তিনি নন্দবাবুকে বলেছিলেন—দেশকে পরাধীনতা থেকে মুক্ত করার জন্ত আমি সত্যাগ্রহের ব্রত না নিতাম, তাহলে আমি সঙ্গীত চর্চাতেই জীবন কাটিয়ে দিতাম। ন আর সেপথে যাবার উপায় নেই। আমি এখন ভিন্ন উদ্দেশ্যে আত্মনিয়োগ করেছি। জীবনে আমি আর অন্ত কিছু করতে পারবো না। কিন্তু তা বলে মানব সংস্কৃতির বিচ্ছেদ্য অংশ যে শিল্প তাকে আমি অবহেলা করতে পারিনা। তবে এখন আমি ল্পের একজন রূঢ় সমালোচক হিসাবে দুর্নাম অর্জন করেছি।

গান্ধিজীর এই দুর্নাম হবার কারণও ছিল। শিল্প ও সাহিত্যে তিনি বিদেশী প্রভাব তে পারতেন না। তিনি বলেন—আমাদের সংস্কৃতিতে যে সম্পদ আছে কোন তির তা নেই। একথা আমি নিশ্চয় করে বলতে পারি। কিন্তু আমরা তা জানি না, মরা তার মূল্য দিতে শিখি নি।...য়ুরোপীয় সংস্কৃতি য়ুরোপীয়ের পক্ষে শুভ কিন্তু মরা যদি তার নকল করার চেষ্টা করি তাহলে তা ভারতের পক্ষে ধ্বংসমূলক হবে।

কাজেই যেসব শিল্পী ও লেখক বিদেশ থেকে প্রেরণা লাভ করেন, তাঁরা ান্ধিজীকে সইবেন কেমন করে!

১৯৩৫ সালে ইন্দোরে হিন্দি-সাহিত্য সম্মেলনে গান্ধিজী সভাপতিত্ব করেন। সই সভায় গান্ধিজী বলেন—হিন্দীভাষা কিষাণ মজদুরের ভাষা, তারা এ ভাষা হজে বুঝতে পারে, এই ভাষাই ভারতের রাষ্ট্রভাষা হওয়া উচিত। ভাষার ব্যাপারে এইটাই সত্যিকারের গণতন্ত্র।

হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষা করার যোগ্যতা সম্পর্কে গান্ধিজী 'হরিজনে' আলোচনা করেন: হিন্দী, হিন্দুস্থানী ও উর্দু একই ভাষা, দেবনাগরী অথবা ফার্সী অক্ষরে লিখিত।......হিন্দু ও মুসলমানদের এই ভাষায় কথা বলতে শেখা অবশ্য কর্তব্য।... যতদিন পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাস থাকবে ততদিন হিন্দুরা এই ভাষায় বেশী সংস্কৃত শব্দ ব্যবহারের চেষ্টা করবে, মুসলমানেরাও বেশী আরবী ফার্সী শব্দ ব্যবহার করতে চাইবে। কিন্তু যখন আমরা সারা ভারতকে আমাদের দেশ বলে ভাবতে শিখব তখন আর এই বিভেদ থাকবে না।...জনগণের ভাষা ধর্মগত বিভেদের ভিত্তিতে বিচার করা ঠিক নয়।... রোমান অক্ষর ভারতে চলতে পারে না। ফার্সী ও দেবনাগরীর মধ্যে দেবনাগরী অক্ষরেরই প্রাধান্ত পাওয়া উচিত, কারণ ভারতের অধিকাংশ প্রাদেশিক ভাষাই দেবনাগরী অক্ষর থেকে উৎপন্ন, সেইজন্ত শেখাও সহজ।...

গান্ধিজীর নির্দেশই নব ভারতের মন্ত্রসংহিতা। সারা ভারতের ঐক্য রাখতে

হলে, একটা জাতীয় ভাষার মাধ্যম অনিবার্য্য। কংগ্রেসী নেতারা মন্ত্রী হবার পরেই হিন্দী প্রচারে সচেষ্ট হলেন। মাদ্রাজ প্রদেশে কিন্তু আপত্তি উঠলো। সেখানে ইংরাজীর চলন বেশী, ইংরাজীকেই তারা রাষ্ট্রভাষা করতে চাইল। জনকয়েক লোক হৈ চৈ করে একটা হুজুগ তুলে কারাবরণ করতেও দ্বিধা করলো না। কিন্তু রাজ-গোপালাচারী বাজে আপত্তি শোনার মত মানুষ নন। সারা ভারতের একদল শিক্ষাভিমানী লোক ক্ষীণকণ্ঠে আপত্তি তুললো—জোর করে একটা ভাষা জনগণের উপর চাপিয়ে দেওয়া অন্যায়!

গান্ধিজী এঁদের উত্তর দিলেন—বাপ মা তার ছেলের কাছে ইংরাজীতে চিঠি লিখবে, এ আমি সহ্য করিতে পারি না।

এর উত্তরে কেউ কেউ আবার বোকার মত বললো—ইংরাজী শিক্ষা ছিল বলেই আমরা স্বাধীনতার মর্ম বুঝেছি এবং স্বরাজের জন্য আন্দোলন করছি।

গান্ধিজী বললেন—এদেশে যত কুসংস্কার আছে তার মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট হচ্ছে যে, এখনও আমরা মনে করি যে স্বাধীনতার ভাব গ্রহণ করতে হ'লে এবং সম্যকভাবে চিন্তা করতে হলে ইংরাজী ভাষায় জ্ঞান থাকা প্রয়োজন।…স্বরাজলাভ করতে হলে ইংরাজী শিক্ষার অন্ধ মোহ অবশ্য ছাড়তে হবে।…

একজন গান্ধিজীকে প্রশ্ন করলো—রাজা রামমোহন, লোকমান্য তিলক ও মহাত্মা গান্ধী নিজে ইংরাজী না জানলে কি এতো খ্যাতিলাভ করতে পারতেন?

গান্ধিজী জবাব দিলেন—শঙ্করাচার্য, শ্রীচৈতন্য, কবীর, নানক, গুরুগোবিন্দ প্রভৃতি ইংরাজী না জেনেও যে খ্যাতিলাভ করেছিলেন, রামমোহন ও তিলকের পক্ষে তা সম্ভবপর হয়েছিল কি? শঙ্করাচার্য একা যা করেছিলেন সমগ্র ইংরাজী শিক্ষিত লোক মিলিত ভাবেও তার একাংশ সম্পন্ন করতে পারে নি। আমার বিশ্বাস স্বাভাবিক শিক্ষায় শিক্ষিত হলে রামমোহন ও তিলক অধিকতর বিখ্যাত হতে পারতেন।……

কিন্তু তবু একদল পণ্ডিতমন্য লোক জিদ ছাড়লো না, গুরুগম্ভীর কণ্ঠে মত প্রকাশ করলো—বেশ, তাহলে আমাদের দেশীয় অক্ষর ছেড়ে দিয়ে রোমান অক্ষর চালানো হোক, লেখা-পড়া ও ছাপাখানার কাজ সহজ হবে, যুক্তাক্ষরের ঝামেলা থাকবে না।

গান্ধিজী তাদের যুক্তিকে খণ্ডন করলেন—ভারতবর্ষ এক পৃথক জাতি, তার একটা পৃথক অক্ষর থাকবে না কেন? দেবনাগরী অক্ষরকে আমি সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করি। ভারতের বিভিন্নভাষা দেবনাগরী থেকেই উদ্ভূত। সেইজন্য সমস্ত ভাষাই দেবনাগরী অক্ষরে লিখিত হওয়া উচিত। তাতে জনসাধারণের ভাষা শিক্ষা অনেক সহজ হবে। এখন আমি দেবনাগরী ও উর্দু দুটি অক্ষরেরই সমর্থন করছি

বর্তমানে হিন্দু-মুসলমানে বিরোধ চলছে বটে, কিন্তু প্রদেশে প্রদেশে তো কোন বিরোধ নেই। সমস্ত প্রাদেশিক ভাষার অক্ষর এক হলে ঐক্য অধিক হবে। একথা ভুললে চলবে না যে এদেশে অধিকাংশ মানুষই অশিক্ষিত, শুধু মিথ্যা জিদের বশে কিছু না ভেবেচিন্তে তাদের উপর বিভিন্ন অক্ষর চাপিয়ে দিলে আত্মহত্যার সামিল হবে। উর্দু বা ফার্সী দেবনাগরীর সঙ্গে সমভাবেই চলবে যতদিন না মুসলমানেরা জাতীয়তার দিক থেকে দেবনাগরীর শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করে নেবে। কিন্তু রোমান অক্ষর চলতেই পারে না। কেবল ছাপাখানার সুবিধার জন্য লাখ লাখ লোককে এই অক্ষর শিখতে বাধ্য করা যায় না। পবিত্র কোরাণ পাঠ করতে হলে মুসলমানদের আরবী ভাষা শিখতে হবে। হিন্দুদের শাস্ত্র পড়তে হলে দেবনাগরী অক্ষর চিনতে হবে কিন্তু ইংরেজী ভাষা শিখতে না হলে হিন্দু ও মুসলমানের রোমান অক্ষর চেনার কোন দরকার নেই। সেই জন্যই রোমান অক্ষর এদেশে জনপ্রিয় হতে পারে না। জোর করে কিছু চালাতে গেলে গণজাগরণের সঙ্গে সঙ্গে জনগণ তা সরিয়ে দেবে। সেই গণজাগরণ আসছে—অতিদ্রুত আসছে!

গান্ধিজীর বাণী সত্য। জাগ্রত জনগণ মাতৃভাষাকে প্রাদেশিক ভাষা বলে গ্রহণ করেছে, এখন হিন্দীভাষা যত শীঘ্র ইংরাজীর স্থান দখল করবে পরাধীনতার শেষ রেশটুকু তত তাড়াতাড়ি এদেশ থেকে বিদায় নেবে, আমরাও সুস্থ ও সবল মনে দেশীয় কর্ষণাকে শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করতে শিখবো, মহাত্মাজীর আদর্শও পূর্ণতা লাভ করবে।

শহরের চেয়ে গান্ধিজী গ্রামকেই বেশী পছন্দ করতেন। ১৯৩৬সালে সেবাগ্রামে তিনি নতুন আশ্রম প্রতিষ্ঠা করলেন। ওয়ার্ধার মগনওয়াড়ী থেকে এই গ্রামটি প্রায় আড়াই ক্রোশ দূরে। গান্ধিজী বলেন—সেবাগ্রামের নিরিবিলি আমার ভালো লাগে। প্রাকৃতিক পরিবেশ থেকে আমি প্রেরণা লাভ করি। সত্যাগ্রহ সুরু করা থেকেই আমি আশ্রমে বাস করে আসছি। আশ্রমই আমার সাধনা ক্ষেত্র। কিন্তু সেবাগ্রামকে আমি ঠিক আশ্রম বলতে পারি না। আমি শুধু সেখানে নিরিবিলিতে কাজ করতে চাই। তবু এখানে একটি আশ্রম গড়ে উঠছে, নতুন নতুন কুটীর তৈরী হচ্ছে। এটি এখন একটি হাসপাতালে পরিণত হয়েছে। আমি এর নাম দিয়েছি—অক্ষমদের আশ্রয়। দেহের দিক থেকে ও মনের দিক থেকে আমি পঙ্গু হয়ে পড়েছি সেইজন্য আমার চারিপাশে আমি পঙ্গুর ভীড় জমিয়েছি। এটিকে একটি উন্মাদ আশ্রমের সঙ্গে তুলনা করলে নেহাৎ অযৌক্তিক হয় না। চরকা কেটে স্বরাজ লাভের কথা পাগল

ছাড়া আর কে ভাবতে পারে! কিন্তু সৌভাগ্য বশতঃ পাগলেরা নিজেদের পাগলামির কথা জানে, সেইজন্যই আমি নিজেকে সুস্থচিত্তের লোক বলে মনে করি।

এই হোল সেবাগ্রামের পরিচয়।

এই আশ্রমে বিভিন্ন রুচির বিচিত্র মানুষের সমাগম হয়েছিল। বল্লভভাই প্যাটেল একবার রহস্য করে বলেছিলেন—আশ্রমটি একটী চিড়িয়াখানা!

আশ্রমের একখানি ঘরে থাকতেন শিক্ষাবিদ্ আর্যনায়কম্। সিংহলে তাঁর দেশ। আমেরিকায় তিনি উচ্চশিক্ষা সম্পূর্ণ করেন। গান্ধিজী ওয়ার্ধা-পরিকল্পনা লিখে যে শিক্ষাপদ্ধতির প্রবর্তন করেছিলেন, আর্যনায়কম্ নিয়েছিলেন তারই পরিচালনার ভার।

একখানি ঘরে ছিলেন অধ্যাপক ভাঁসালি। বিচিত্র এঁর জীবনকথা। উচ্চশিক্ষা শেষ করে গুজরাত বিদ্যাপীঠের অধ্যাপক হিসাবে ইনি জীবন আরম্ভ করেন। তারপর স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দিয়ে জেলে যান। শেষে কয়েকবার অনশনের পরীক্ষা চালালেন। তারপর একদিন সংসারের উপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে সর্বস্ব ত্যাগ করে নাগা সন্ন্যাসী হয়ে চলে গেলেন বনে। বনবাস কালে বছর কয়েক তিনি মৌনব্রত গ্রহণ করেন। পাছে কথা বলতে হয় তা-ই তামার একটি আংটি দিয়ে ঠোঁট দু'খানি সেলাই করে ফেললেন। এবং কাঁচা আটা ও নিমপাতা খেয়ে কয়েকটি বছর কাটিয়ে দিলেন। এই সময় একদিন সহসা গান্ধিজীর সঙ্গে তাঁর দেখা হোল। গান্ধিজী তাঁকে নিয়ে এলেন আশ্রমে, অনেক বুঝিয়ে-সুজিয়ে নাগা সন্ন্যাসীকে কাপড় পরালেন। এখন অধ্যাপক ভাঁসালি প্রতিদিন দশঘণ্টা করে সূতা কাটেন আর সাত ঘণ্টা করে আশ্রমের ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শেখান।

এখানে থাকতেন দাদাভাই নওরোজীর নাতনী শ্রীমতি খুরশেদ। সংগীতজ্ঞা হিসাবে এঁর নাম আছে! ফ্রান্স ও ইতালিতে দীর্ঘ ছ'বছর ধরে ইনি সঙ্গীত সাধনা করেন। তারপর সেবাগ্রামে এসে গান্ধিজীর সেবায় আত্মনিয়োগ করেন।

একজন জাপানী সাধু ছিলেন। তিনি সারাদিন কাজ করতেন আর সন্ধ্যার সময় জাপানী ডুগডুগি বাজিয়ে সুর তুলতেন—ওঁম্ নমো হোম্ রঙ্গে ক্যোম্!

একজন কুষ্ঠরোগী ছিলেন, স্বদেশী করে জেল খাটতে খাটতে তাঁর কুষ্ঠ হয়। পণ্ডিত মানুষ, সংস্কৃত ভাষায় অনর্গল কথা বলতে পারতেন। কুষ্ঠ রোগীকে সবাই ঘৃণা করে সেইজন্য অনশনে দেহত্যাগ করার সংকল্প নিয়ে তিনি একদিন গান্ধিজীর কাছে এসে বললেন—আমি আপনার আশ্রমে থাকতে চাই। এখানেই আমি জীবন শান্ত করবো!

গান্ধিজী বললেন—তোমাকে তো আমি না বলতে পারি না। কিন্তু সবাই তোমাকে দেখে ঘৃণা করবেন!

কুষ্ঠরোগীর জন্য আলাদা ঘর তৈরী হোল।

এখানে ছিলেন ইহুদী যন্ত্রবিদ্ মরিস্ ফ্রিডম্যান। এঁর দেশ জার্মানী। হিটলার যখন দেশ থেকে ইহুদী তাড়াতে সুরু করলেন তখন ইনি দেশত্যাগ করে নানা স্থানে ঘুরতে ঘুরতে সেবাগ্রামে এসে ঘর বেঁধেছেন। রমন মহর্ষির কাছে দীক্ষা নিয়ে তিনি এখন পুরোদস্তুর সন্ন্যাসী, নতুন নাম নিয়েছেন—ভারতানন্দ।

এক মাটীর ঘরে থাকতেন রাজার মেয়ে রাজকুমারী অমৃত কাউর।

আশ্রমে গান্ধিজী ছিলেন আশ্রমগুরু—বাপুজী। কোন ব্যাপারেই তাঁর মনোযোগের অভাব ছিল না। রোগীর পথ্যের ব্যবস্থা করছেন, গরুর সেবা করছেন, আশ্রমিকদের অভাব অভিযোগ শুনছেন, কংগ্রেস নেতাদের কর্মপদ্ধতির নির্দেশ দিচ্ছেন, সিমলা-লণ্ডনের প্রচারিত বিজ্ঞপ্তির বিচার করছেন, কোন কাজে কোথাও এতটুকু অবহেলা নেই। ছোট বড় জ্ঞানী ও অল্পবিত্ত,—প্রত্যেকটি মানুষ তাঁর কাছে সমান ব্যবহার পেয়েছে।

সেবাগ্রাম সম্পর্কে গান্ধিজী একবার এক মার্কিন সাংবাদিককে বলেন—আমার জগৎ ভারতবর্ষ এবং সেবাগ্রামেই সীমাবদ্ধ। আমার সহকর্মীদের মত আমি আন্তর্জাতিক ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাই না।

কস্তুরবা ছিলেন আশ্রম-মাতা, সকলের সেবার দায়িত্ব ছিল তাঁরই উপর।

আশ্রমের সবাইকেই নিজের কাজ নিজেকে করতে হয়। রান্না করা, বাসন মাজা, কাপড় কাচা, পায়খানা সাফ করা—কিছুই বাদ দেবার উপায় নেই। গান্ধিজী নিজে প্রতিদিন রাত তিনটের সময় উঠে ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে কর্মধারা নিয়ন্ত্রণ করে চলতেন।

গান্ধিজীর জীবন-যাত্রা ছিল সরল অনাড়ম্বর। আশ্রমে তিনি থাকতেন একখানি মাটির ঘরে। কোন রকমে জন পনেরো বসতে পারে এমন একখানি মাটীর ঘর। মাদুর ছাড়া আর কোন আসবাব-পত্র নেই। দেয়ালের গায় কয়েকটি খেজুর গাছ আঁকা আছে। একপাশে একটি চরকা, কাগজপত্র, বই ও ঝরণা কলম আর পিতলের একটি লোটা।

এই ঘরটিই সকাল বেলা গান্ধিজীর আপিস ঘর।

এগারোটার সময় এই ঘরটিই খাবার ঘরে রূপান্তরিত হয়। গান্ধিজী সকলের সঙ্গে খেতে ভালবাসতেন, খাবার পরিবেশন করতেন নিজের হাতে।

খাবার ঘন্টাখানেক পরে এই ঘরেই গান্ধিজী খবরের কাগজ ও চিঠিপত্র নিয়ে বসতেন।

তারপর ঘণ্টাখানেক গড়িয়ে নিতেন মাদুরের উপর।

তারপর লেখা, লোকজনের সঙ্গে দেখা করা ও চরকা কাটা···

সন্ধ্যার পূর্বে আহার শেষ, তারপর প্রার্থনা, সান্ধ্যভ্রমণ ও নিদ্রা···

অনেক সময় গান্ধিজী আশ্রমের কর্মীদের জন্য আলাদা কোন সময় রাখতেন না। প্রভাতে ও সন্ধ্যায় ভ্রমণকালে পথেই তাদের সঙ্গে দরকারী আলোচনা শেষ করতেন।

*

সেবাগ্রামের এই মাটির ঘরে অনেক মনীষী ও রাজনীতিকের শুভাগমন হয়েছিল। তাঁদের মধ্যে বিশ্ববিখ্যাত মার্কিন সাংবাদিক লুই ফিশার পরমানন্দে গান্ধিজীর সান্নিধ্যে এখানে সাতটি দিন কাটিয়ে যান। আশ্রমের সুন্দর বর্ণনা করে তিনি লিখেছেন :

একতলা বাড়ী, দেয়াল দরমার ঘেরা, ছাদটি লাল টালির······

ঘরের মেঝের উপর শাদা চাদর বিছিয়ে গান্ধিজী শুয়ে আছেন, কাছেই একজন শিষ্য বসে টানা পাখায় হাওয়া করছে···একজন মহিলা একটি ভিজা তোয়ালে ভাঁজ করে নিয়ে এলেন গান্ধিজীর মাথায় দেবার জন্য।···গান্ধিজীর হাত দুটি বেশ লম্বা, আঙুলগুলি বেশ লম্বা এবং সুগঠিত। হাঁটু দুটি একটু বে-মানান। শরীরের হাড়গুলি বেশ চওড়া ও শক্ত। সরু ঠোঁটের উপর গোঁপ জোড়া প্রায় শাদা, নাকটি একটু বেশী মাত্রায় লম্বা। নীচের ঠোঁটটি ভাব ব্যঞ্জক—সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। চোখের চাহনিটা যেন করুণা মাখানো। গান্ধিজীকে দেখলেই যেন শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়ে আসে।···নীরব আত্মত্যাগের তিনি একটি জীবন্ত প্রতীক।···তিনি করমর্দনে অভ্যস্ত নন, স্মিতহাস্যে হাতদুটি যুক্ত করে অভিবাদন জানান, এতে তাঁর অন্তরের সারল্যটুকু প্রকাশ পায়।···ঘরে সাজ-সজ্জার কোন বাহুল্য নেই। এক-পাশের দেয়ালে যিশুখৃষ্টের একখানি সুন্দর ছবি ঝুলছে।···সোনার ফ্রেমের চশমা তাঁর চোখে।···সামনের দোয়াত-দানীতে তিনটি ফাউণ্টেন পেন সাজানো আছে।··· বিছানার বাম ধারে কয়েকখানি বই সুন্দর করে সাজানো।···

গান্ধিজীর সকলের সঙ্গে একত্র বসে খাওয়া ও খাওয়ানো ফিশারকে মুগ্ধ করেছিল, তিনি লিখেছেন :

লম্বা খাবার ঘরের দরজার সামনে টেবিলের উপর নানারকম পাত্রে খাবার সাজানো রয়েছে। পুরুষ ও মহিলাদের বসবার জায়গা আলাদা···গান্ধিজীর বাঁ দিকে বসে আছেন তাঁর বৃদ্ধা দন্তহীনা পত্নী কস্তুরবা···আশ্রমবাসী ছোট ছোট ছেলেরাও এই দলের মধ্যে আছে।···সকলের সামনে একটি করে পিতলের থালা রাখা হোল··· গান্ধিজীর সামনে কতকগুলি পাত্র এনে রাখা হোল, তিনি সেগুলি খুলে সকলের

পাত্রে খাবার ভাগ করতে সুরু করলেন।...প্রায় জন ত্রিশেক লোক মেঝের উপর বসে আছেন। সকলেরই পরণে সাদা পোষাক, সামনে সবারই খাবার সাজানো। ঢং করে একটি ঘণ্টার আওয়াজ শোনা গেল, এক ভদ্রলোক চোখ বন্ধ করে উচ্চৈঃস্বরে মন্ত্র উচ্চারণ করার পর খাওয়া সুরু হোল।

লুই ফিশার গান্ধিজীর সঙ্গে দু-একবার সান্ধ্য-ভ্রমণেও বেরিয়েছিলেন। সেই ভ্রমণের বর্ণনা প্রসঙ্গে ফিশার লিখেছেন :

বিকাল সওয়া ছ'টার সময় গান্ধিজী বাহির হলেন। বাঁশের একটি লম্বা লাঠি তাঁর হাতে। গান্ধিজীর চিকিৎসক ডাক্তার দাস এবং আশ্রমের কয়েকজন পুরুষ ও মহিলা আমাদের সঙ্গে সঙ্গে চললেন। দু'জন মহিলার কাঁধে ভর দিয়ে তিনি হাঁটতে লাগলেন। আশপাশের গ্রাম থেকে একদল যুবক তাঁর দর্শন পাবার আশায় চারিপাশে এসে জমা হয়েছে, তাদের চোখে মুখে ভক্তির ভাব ফুটে উঠেছে। গান্ধিজীকে দেখামাত্রই তারা সবাই শ্রদ্ধায় মাথা নত করলো। আরো একটি বৃদ্ধের দল গান্ধিজীর দর্শন পাবার আশায় চারিপাশে এসে জড়ো হয়েছে। ক্ষেতের মাঝখান দিয়ে মেঠো পথ ধরে আমরা চলতে সুরু করলাম। গান্ধিজী এবার আমাকে কথা বলার সুযোগ দিলেন।

ফিশার গান্ধিজীকে নানা বিষয়ে নানা প্রশ্ন করেন। সাতদিন ধরে অবসর মত এই প্রশ্নোত্তর চলে। মহাত্মাজী কত সরল ও সহজ মানুষ ছিলেন তা তাঁর উত্তরগুলি পড়লেই বোঝা যায়। ফিশার গান্ধিজীর মনোজগতের একখানি নিখুঁৎ ছায়াচিত্র মেলে ধরেছেন ইংরাজী ভাষা-ভাষীদের কাছে।

সেবাগ্রামের এই আশ্রমে মাটীর ঘরে মাদুরের উপরে বসে রাজনীতি আলোচনা করে গেছেন বিলাতের লর্ড লোথিয়ান ও স্যার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রিপস্, জাপানের ডক্টর কাগাওয়া ও তাকাওকা। কবি ইয়োনে নগুচি, ডাক্তার টমিকো কোরা, জন্ম-নিয়ন্ত্রণ-আন্দোলনের নেত্রী মিসেস মার্গারেট সিংগার প্রভৃতি সাহিত্য, সমবায় ও সমাজনীতি সম্পর্কে মহাত্মার অভিমত শোনার জন্য এখানে এসেছিলেন।

গান্ধিজী কারুর মন রেখে কথা বলতে শেখেন নি কখনও। সত্য অপ্রিয় হলেও তিনি মুখের উপর বলে দিতেন। ১৯৩৮ সালে, জাপানীরা যখন এশিয়ার মাঝে শ্রেষ্ঠ শক্তিমান রাষ্ট্র হয়ে উঠেছে, নিজেদের সুখ সুবিধার জন্য তারা নতুন সুর ধরেছে—এশিয়া এশিয়াবাসীর জন্য ; তখন জাপানী পার্লামেন্টের সদস্য তাকাওকাকে গান্ধিজী সোজা কথায় বলে দিলেন—এশিয়া এশিয়াবাসীর জন্য—এ নীতি আমি সমর্থন

করি না, অবশ্য ইয়ুরোপ বিদ্বেষই যদি এর অর্থ হয়।···তোমাদের ভগবান বুদ্ধের নীতি পুনরালোচনা করতে হবে এবং সেই বাণী পৃথিবীর বুকে ছড়িয়ে দিতে হবে। তোমাদের ঐতিহ্যকে রক্ষা করাই তোমাদের কর্তব্য!

গান্ধিজীর এই কথা তখন শক্তিমত্ত জাপানের কাছে ভালো লাগেনি, তখন তারা সমগ্র এশিয়ায় সাম্রাজ্য বিস্তারের স্বপ্ন দেখছিল, সেই পরস্বলোভী অহঙ্কারই যুদ্ধের পর তাকে পরাধীন করেছে। ইতিহাসের বিচিত্র পরিহাস!

ওয়ার্ধায় কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক বসে বহুবার।

গোল টেবিল বৈঠকের পর শাদা কাগজের যে আইন তৈরী হয় তাতে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে কংগ্রেসী দলের মন্ত্রী হবার কথা ওঠে। ১৯৩৭ সালের জুলাই মাসে ওয়ার্ধায় কমিটির এক বৈঠকে, এই সম্পর্কে অনেক আলোচনা হয়, এবং মন্ত্রিত্ব নেওয়াই স্থির হয়। গান্ধিজী বলেন—মন্ত্রীরা যদি সৎ, স্বার্থহীন, পরিশ্রমী হন, ও সদা সজাগ থাকেন, বুভুক্ষিত লক্ষ লক্ষ লোকের সেবা করার আকাঙ্ক্ষা যদি তাঁদের থাকে তাহলে কংগ্রেসের আদেশ অনুযায়ী পূর্ণ স্বাধীনতার দিকে লক্ষ্য রেখে অনেক কিছু করার অপর্যাপ্ত সুযোগ তারা পাবেন।

মন্ত্রীদের প্রথমেই কি করা কর্তব্য সে সম্পর্কেও গান্ধিজী ইঙ্গিত দিলেন—মাদক নিবারণ, কিষাণদের অবস্থার উন্নয়ন, শিক্ষা প্রবর্তন, ও কারাগার সংস্কার।···

গান্ধিজী হরিজনে লিখলেন—আমাদের স্বাধীনতা ক্রীতদাসের স্বাধীনতায় পর্যবসিত হবে, যদি মদ্যপায়ী ও মাদকসেবীরা তাদের পুরাণো অভ্যাস আগের মত বজায় রাখে।

গান্ধিজীর অনুরোধই হোল কংগ্রেসীদের সংহিতা। মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করেই কংগ্রেসীরা সেই আদর্শে কাজ করতে সুরু করলেন। মাদ্রাজের মন্ত্রীরা সালেম, আর্কট, চিত্তুর, কোদাপ্পা প্রভৃতি জেলায় আইন করে মাদক সেবন বন্ধ করে দিলেন। তাতে, আবগারী কর থেকে যে আয় হোত তা থেকে এক কোটি টাকা কমে যায়। বিহার ও যুক্তপ্রদেশেও এই দিকে কাজ করার জন্য তেরো লাখ টাকা রাজস্বের ক্ষতি হয়। চাষীদের উন্নতি করার জন্য যুক্তপ্রদেশে বারো শো কর্মীকে নিযুক্ত করা হয়। কংগ্রেসী প্রদেশগুলিতে চাষীদের সুবিধা দেবার জন্য অনেক নতুন নিয়মকানুনও তৈরী করা হয়। মন্ত্রীরা জনশিক্ষার দিকে বিশেষ জোর দেন, সর্বত্রই ওয়ার্ধা শিক্ষাপদ্ধতির প্রবর্তন করা হয়। মাদ্রাজে ৬৬৫টী নয়া-তালিমী শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। বিহারে ১৪২৫৯টী শিক্ষাকেন্দ্র খোলা হয়। যুক্তপ্রদেশে ২৩০০০০

অশিক্ষিতকে লেখাপড়া শেখানো হয়। লেখাপড়াকে জনপ্রিয় করে তোলার জন্য বিহার ও যুক্তপ্রদেশে চার হাজার ভ্রাম্যমান লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা করা হয়। মধ্যপ্রদেশে কারাগারের আইনকানুন বদলানো হয়।...

এই সব কাজে একদল মানুষের স্বার্থে আঘাত লাগে, তারা কংগ্রেসের বিরোধী হয়ে ওঠে। নানাভাবে তারা বাধার সৃষ্টি করে, ভালো কাজেরও কঠোর সমালোচনা করতে থাকে। এই সমালোচনা চরমে গিয়ে ওঠে মাদ্রাজে হিন্দি ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা হিসাবে চালাবার চেষ্টায়। তারা হিন্দি শেখানোয় বিশেষ আপত্তি তোলে। শেষে মাদ্রাজ সরকার এদের নামে আদালতে নালিশ করেন। গান্ধিজী মন্ত্রীদের সমর্থন করে লেখেন—অনেকে বলেন কংগ্রেস পন্থীরা অহিংসবাদী, আদালতে মামলা করে বিরোধী দলকে সাজা দেওয়া তাঁদের উচিত নয়। কংগ্রেসের অহিংসবাদের মানে কিন্তু আমার কাছে তা নয়। হিংসাত্মক বক্তৃতা দিলে বা হিংসামূলক কাজে উৎসাহ দিলে কংগ্রেস মন্ত্রীরা উপেক্ষা করতে পারেন না।

কংগ্রেসীমন্ত্রীদের একটা বড় সমস্যার সামনে এসে দাঁড়াতে হোল, তা রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির সমস্যা। মাদ্রাজ ও বোম্বাইয়ের মন্ত্রীরা রাজনৈতিক মন্ত্রীদের ছেড়ে দিয়েছিলেন কিন্তু যুক্তপ্রদেশ ও বিহারের মন্ত্রীরা রাজবন্দীদের ছেড়ে দেবার কথা তুলতেই সেখানকার লাটসাহেব আপত্তি তুললেন। বন্দীরা সংখ্যায় ছিলেন নেহাৎ নগণ্য, বিহারে বারো জন, যুক্তপ্রদেশে পনেরো জন। কথাটা তাদের কানে পৌছাতেই তারা অনশন সুরু করে দিলেন, মন্ত্রীরাও পদত্যাগ করলেন,—যারা কংগ্রেসের নির্দেশে আন্দোলন করলো, তারাই যদি জেলে রইল তাহলে কংগ্রেসীদের মন্ত্রিত্ব নিয়ে লাভ কি! লাটসাহেব দু'জন আর সুবিধা করতে পারলেন না। রাজবন্দীদের ছেড়ে দিতে রাজী হলেন।

কিন্তু বাংলাদেশে তো আর কংগ্রেসী মন্ত্রী ছিল না, কিন্তু রাজবন্দী সব চেয়ে বেশী ছিল এখানেই। মুসলীম-লীগ-পন্থী মন্ত্রীসভা এঁদের মুক্তি দেবার জন্য বিশেষ কোন চেষ্টাই করলেন না। এদিকে দেশব্যাপী আন্দোলন সুরু হোল, মহাত্মাজী নিজে এলেন কলকাতায়। ব্যারাকপুর লাটভবনে গিয়ে বাংলার লাটসাহেব স্যার জন এণ্ডারসনের সঙ্গে দেখা করলেন। আলিপুর সেণ্ট্রাল জেল, প্রেসিডেন্সি জেল, হাওড়া জেল ও হিজলী বন্দীশালায় গিয়ে কথাবার্তা কইলেন এবং বন্দীদের সঙ্গে সহানুভূতি দেখিয়ে একদিন অনশন করলেন ( ২৩শে অক্টোবর )। গান্ধিজী তখন 'ব্লাড প্রেসারে' ভুগছেন, তথাপি চেষ্টার কোন ত্রুটি রাখলেন না। পুরো তিনটি সপ্তাহ

তিনি আলোচনা চালালেন লাটসাহেব ও মুসলীম মন্ত্রীদের সঙ্গে। গবর্ণমেন্টকে তিনি প্রতিশ্রুতি দিলেন—এইসব রাজবন্দীরা আর হিংসায় বিশ্বাস করেন না।

গান্ধিজীর মধ্যস্থতায় কাজ হোল, ১১০ জন রাজবন্দীর মুক্তি দেবার ব্যবস্থা হোল।

অসুস্থ হলেও সারা ভারতের রাজনীতির চাপে শীর্ণ সন্ন্যাসীর অবসর মেলে না। কলিকাতায় কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক বসলো। বোম্বাইয়ের প্রধানমন্ত্রী নারিম্যানের বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ জমা হয়েছিল। সেই সম্পর্কে অনুসন্ধান করে গান্ধিজীকে এক রিপোর্ট তৈরী করতে হোল। কংগ্রেস কমিটি সেই বিবৃতি পাঠ করে নারিম্যানকে পদত্যাগ করার নির্দেশ দিলেন।

এতো কাজের চাপ অসুস্থ দেহে সইল না। গান্ধিজী অসুস্থ হয়ে পড়লেন। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন শান্তিনিকেতনে, খবর পেয়েই ছুটে এলেন কলিকাতায়। দু'জন মহামানবের সমাবেশে—গঙ্গা-যমুনা সঙ্গমে—কলিকাতা পবিত্র হোল।

গান্ধিজী ফিরে গেলেন জুহুর সমুদ্রতীরে। ডাক্তাররা নির্দেশ দিলেন—নিরবচ্ছিন্ন বিশ্রাম করতে হবে, চিঠিপত্রের উত্তর দেওয়া, হরিজনে প্রবন্ধ লেখা, সব বন্ধ করুন।

কিন্তু চল্লিশ কোটি নর-নারীকে স্বাধীনতার আলো যিনি দেখাবেন, বিশ্রাম গ্রহণ করা তো তাঁর বিধিলিপি নয়!

রাজবন্দীদের মুক্তির প্রশ্ন আবার জটিলহয়ে উঠলো,—আগের চেয়ে জটিলতর। রাজবন্দীরা ভেবেছিলেন সকলেই এবার মুক্তি পাবেন, কিন্তু দিনের পর দিন প্রতীক্ষা করেও যখন মুক্তি এলো না, তখন পাঞ্জাব বন্দীশালায় কুড়ি জন বন্দী অনশন সুরু করলেন।

সেই খবর এসে পৌছাল হাজারিবাগ জেলে। সেখানেও সাতজন রাজবন্দী অনশন সুরু করলেন।

বাংলায় তখনও এক হাজার রাজবন্দী কারাপ্রাচীরের অন্তরালে ছিলেন, সেখানেও এবার অনশনের প্রতিধ্বনি উঠলো।

গান্ধিজীর আর বিশ্রাম করা হোল না, আবার আসতে হোল কলকাতায়। স্যার জন এণ্ডারসনের জায়গায় নতুন লাটসাহেব এসেছিলেন লর্ড ব্রাবোর্ণ। গান্ধিজী ব্রাবোর্ণের সঙ্গে দেখা করলেন। আলিপুর সেন্ট্রাল জেল, প্রেসিডেন্সি জেল ও দমদম্ স্পেশ্যাল জেলের রাজবন্দীদের সঙ্গে দেখা করলেন। প্রায় মাসখানেক ধরে চালালেন আলোচনা, শেষে বন্দীদের মুক্তির প্রতিশ্রুতি দিয়ে তিনি তাঁদের অনশন থেকে নিরস্ত করলেন।

ফিরে যাবার আগে দিন সাতেকের জন্য গেলেন ডেলাংয়ে। সেখানে গান্ধী সেবা সংঘের চতুর্থ বার্ষিক সম্মেলন বসলো। গান্ধিজী সেই বৈঠকে বললেন—অহিংসার চেয়ে বড় শক্তি আর কিছু নেই।

উড়িষ্যা থেকে গান্ধিজী গেলেন পেশোয়ারে।

অনেক দিন ধরে বাদ্‌শা খান তাকে নিমন্ত্রণ করেছিলেন একবার খুদাইখিদমতগারের মাঝে গিয়ে দাঁড়াবার জন্য। গান্ধিজীরও আগ্রহ ছিল অনেক দিনের, কিন্তু এতদিন সময় করে উঠতে পারেননি, দুর্ধর্ষ পাঠানেরা আবদুল গফুর খাঁনের নেতৃত্বে গান্ধিজীর অহিংসা মন্ত্রে দীক্ষা নিয়েছিল, ১৯৩০ সালের বন্দুকের গুলির সামনে তারা বুক পেতে দিয়েছে কিন্তু কাঁধ থেকে বন্দুক নামিয়ে পালটা গুলি চালায়নি। গান্ধিজীর বাণী সীমান্তবাসীর চেয়ে আন্তরিকভাবে আর কোন জাতি গ্রহণ করতে পারেনি। গান্ধিজী এবার গিয়ে দাঁড়ালেন তাদের মাঝে, গুরুশিষ্যে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ঘটলো। পাঠানদের গাঁয়ে গাঁয়ে জির্গায় জির্গায় গান্ধিজী যে সম্বর্ধনা পেলেন তা অভাবিত।

কংগ্রেসে আবার দুটি দল দেখা দিল। দক্ষিণপন্থী ও বামপন্থী, ১৯১৯ সাল থেকে গান্ধিজীই ছিলেন কংগ্রেসের কর্ণধার। তিনি কংগ্রেসের সদস্যপদ ছেড়ে দিলেও কংগ্রেসী নেতারা তাঁকে ছাড়তে পারেন নি। কংগ্রেসের প্রত্যেকটি সংগ্রামে তিনিই ছিলেন অগ্রগামী। কিন্তু সবকটি সংগ্রামই তিনি শেষ করেন গবর্ণমেন্টের সঙ্গে আপোষ রফা করে, একদল তরুণ কর্মীর এটা পছন্দ হোত না, তাঁরা চাইতেন আপোষহীন সংগ্রাম। হরিপুরা কংগ্রেসে সভাপতি হবার সময় থেকে এই দলটির নেতৃত্ব এসে পড়লো সুভাষচন্দ্রের উপরে। তরুণদল চেয়েছিলেন সুভাষচন্দ্র গান্ধিজীর প্রভাব অতিক্রম করে সংগ্রামের নতুন গতি নির্দেশ করবেন। সেইজন্য পরের বছর ত্রিপুরী কংগ্রেসে সভাপতিত্ব করার জন্য তাঁরা সুভাষচন্দ্রের নামই সুপারিশ করলেন। অপর দল আবুল কালাম আজাদ ও পট্টভি সীতারামিয়ার নাম প্রস্তাব করলেন। আজাদ সভাপতি হতে চাইলেন না। পট্টভি সীতারামিয়াকে সমর্থন করলেন গান্ধিজী স্বয়ং।

এতদিন গান্ধিজীর ইচ্ছানুযায়ীই সভাপতি নির্বাচন হয়েছে। গান্ধিজী যাঁকে চেয়েছেন কেউ তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী হয়নি। সুভাষবাবুও গান্ধিজীর ইচ্ছানুযায়ীই হরিপুরা কংগ্রেসের সভাপতি হয়েছিলেন। কিন্তু এবার বামপন্থীরা গান্ধিজীর মতকে স্বীকার করে নিলেন না।

সুভাষচন্দ্র বসু বনাম ডক্টর পট্টভি সীতারামিয়া।

ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যেরা সকলেই গান্ধিবাদী। সর্দার প্যাটেল, ডক্টর রাজেন্দ্র প্রসাদ, জয়রামদাস দৌলতরাম, শংকর রাও দেও, ভুলাভাই দেশাই, ও আচার্য কৃপালনী এক বিবৃতিতে বললেন—ডকটর সীতারামিয়াই সভাপতি হবার মত যোগ্য লোক।

সুভাষবাবু তার উত্তরে বললেন—দক্ষিণপন্থীরা গবর্মেন্টের সঙ্গে আপোষ রফা করতে চাইছেন, আমি তাদের পথের কাঁটা।...

প্রদেশে প্রদেশে কংগ্রেসীদের ভোট নেওয়া হোল। ২৯৫৭ ভোটের মধ্যে সুভাষ বাবু পেলেন ১৫৮০ ভোট, আর ডকটর সীতারামিয়া পেলেন ১৩৭৭টি। সুভাষবাবুই জিতলেন।

গান্ধিজী বললেন—আমি একথা স্বীকার করি যে সুভাষবাবুর পুনরায় সভাপতি হবার আমি বিরোধী ছিলাম। কি কারণ তা আমি আলোচনা করতে চাই না। সীতারামিয়াকে প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে নাম প্রত্যাহার করতে আমিই নিষেধ করি। সেই জন্যই সীতারামিয়ার পরাজয় আমারই পরাজয়। আমার কর্মধারা ও নীতিকে বাদ দিলে আমার কিছুই থাকে না। আমি এই নির্বাচনের ফলে বুঝতে পারলাম যে যাঁরা ভোট দিয়েছেন তাঁরা আমার নীতি ও কর্মধারা পছন্দ করছেন না। এর জন্য আমি আনন্দিত।...আমার সংখ্যা লঘিষ্ঠ দল শুধু সংখ্যা গরিষ্ঠদের সাফল্য কামনা করে।...কংগ্রেসের অগ্রগমনে কোন বাধা সৃষ্টি করা তাঁদের উচিত নয়।... যাঁদের ভালো লাগবে না তাঁরা কংগ্রেসের বাইরে চলে আসতে পারেন। মনে কোন বিদ্বেষ নিয়ে নয়, অধিকতর কার্যকরী হিসাবে জাতির সেবা করার উদ্দেশ্য নিয়ে।

সুভাষ বাবু তাড়াতাড়ি ওয়ার্ধায় গেলেন গান্ধিজীর কাছে, বললেন—মহাত্মাজীর আস্থা অর্জন করাই আমার প্রধান লক্ষ্য। সারা ভারতের আস্থা অর্জন করেও যদি আমি ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষটির আস্থা অর্জন করতে না পারি তাহলে আমার পক্ষে তা একান্ত মর্মান্তিক হবে।

গান্ধিজীর সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের তিনঘণ্টা কথা হোল। সাংবাদিকদের গান্ধিজী বললেন—সুভাষ বাবুকে এবার নিজের অনুগামীদের ভিতর থেকে মনোমত ওয়ার্কিং কমিটি গড়তে হবে, এখন আর তাঁর কাছে সুভাষবাবুর উপদেশ নেবার কিছু নেই। এই নির্বাচনে এইটাই প্রমাণ পেয়েছে যে কংগ্রেসীরা আমার নীতিকে সমর্থন করেন না।

ওয়ার্কিং কমিটির বারো জন পুরানো সদস্য পদত্যাগ করলেন, তাঁরা বললেন—

ামপন্থীরা এবার নিজেদের মনোমত কংগ্রেসকে পরিচালনা করুন, আমরা তাদের
ুযোগ দিলাম। তাঁরা যদি ব্যর্থ হন তাহলে তাঁরা ঠেকে শিখবেন।

দক্ষিণপন্থী নেতারা এভাবে তাঁর সঙ্গে অসহযোগিতা করবেন সুভাষচন্দ্র তা
াবেননি। অসুস্থ দেহে একশো-তিন-ডিগ্রি জ্বর নিয়ে তিনি আবার ছুটলেন
ওয়ার্ধায়। কিন্তু গান্ধিজীর মত তিনি বদলাতে পারলেন না।

গান্ধিজী কংগ্রেসের পরিচালনা করবেন না, গান্ধীবাদী নেতাদের পক্ষে একথা
চিন্তা করাও শক্ত। তাঁদের পক্ষ থেকে গোবিন্দবল্লভ পন্থ ত্রিপুরী-কংগ্রেসে প্রস্তাব
রলেন—গত কয়েক বছর ধরে গান্ধিজীর পরিচালনায় কংগ্রেসের কার্যধারা পরি-
ালিত হচ্ছে। এই কার্যক্রমে ছেদ টানা চলবে না।…সামনে যে জটিল সমস্যা
েখা দিতে পারে তার মধ্যে একমাত্র মহাত্মা গান্ধীই জাতিকে সাফল্যের পথে পরি-
ালিত করতে পারেন। সেই জন্যই আমরা চাই রাষ্ট্রপতি যেন গান্ধিজীর মনোনয়ন
নুসারে ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য নির্বাচন করেন।…

গান্ধিজী তখন রাজকোটে অনশন সুরু করেছেন।

ক'দিন পরে তিনি রাজকোট থেকে ফিরলে রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্র গান্ধিজীর সঙ্গে
েখা করলেন। কিন্তু কোন ফল হোল না, সুভাষবাবু যাঁদের নিয়ে ওয়ার্কিং কমিটি
ড়ে তুলতে চাইলেন, গান্ধিজী তাঁদের মনোনয়ন করলেন না। ওয়ার্কিং কমিটি ছাড়া
ংগ্রেসের কাজ চলে না, সুভাষচন্দ্রকে রাষ্ট্রপতি পদ ছেড়ে দিতে হোল। দেখা গেল
াান্ধিজীকে বাদ দিয়ে কংগ্রেস চলে না।

ক'মাস পরে সুভাষচন্দ্রকে দক্ষিণপন্থীরা কংগ্রেস থেকে বের করে দিলেন—তিন
ছর তিনি কংগ্রেসের কোন পদে নির্বাচিত হতে পারবেন না। এই সম্পর্কে গান্ধিজী
লেন—সুভাষবাবুকে আমি ভাবতাম আমার ছেলের মত। সেই সৌজন্যতা থেকে
জ আমি স্খলিত হলাম। সুভাষচন্দ্রের উপর যে দণ্ডবিধান করা হোল তার সঙ্গে
ুক্ত থাকার জন্য আমি দুঃখিত।

রাজকোট

এদেশে ৫৬২টি দেশীয় রাজ্য আছে, সর্বত্রই রাজাদের অনাচারে প্রজাদের মধ্যে
বিক্ষোভ জেগে উঠেছিল। কংগ্রেসী আন্দোলনের প্রভাব ছড়িয়ে পড়ছিল সেখানেও।
গান্ধিজী এই প্রজা-আন্দোলনের গতি লক্ষ্য করছিলেন।

কাথিয়াবাড়ে ৩৬০টি ছোট ছোট দেশীয় রাজ্য আছে, রাজকোট তার মধ্যে একটি।
রাজ্যটি যদিও ছোট কিন্তু পলিটিক্যাল এজেন্ট এখানে থাকার জন্য এটিকেই পশ্চিম

৩০/

ভারতীয় দেশীয় রাজ্যগুলোর রাজধানী বলে গণ্য করা হয়। রাজকোটে তখন দেওয়ান ছিলেন বীরাওয়ালা, প্রজাদের সঙ্গে তাঁর সংঘাত বাধে। প্রজাদের নেতৃত্ব করে মণিবেন প্যাটেল, মৃদুলা সরাভাই ও কস্তুরবা কারাবরণ করেন। শেষে বল্লভভাই প্যাটেল ওখানে গিয়ে রাজকোটের রাজা ঠাকুরসাহেবের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করেন। কিন্তু শেষ অবধি ঠাকুরসাহেব চুক্তিমত কাজ করতে রাজী হলেন না। গান্ধিজী স্বয়ং এলেন রাজকোটে।

রাজকোটের রাজপরিবারের সঙ্গে গান্ধিজীর পরিচয় বহুদিনের। গান্ধিজীর পিতা কাবা গান্ধী ছিলেন এই রাজ্যের দেওয়ান। পলিটিক্যাল এজেন্ট যখন একবার এখানকার রাজাকে অপমান করে, তার প্রতিবাদ করে কাবাগান্ধী জেলে যেতেও প্রস্তুত হয়েছিলেন। এই ঠাকুর সাহেবের বিবাহের সময় কস্তুরবা সবার আগে তাঁর কপালে কুমকুম শোভিত করেন। সেই ঠাকুর সাহেব যখন প্রতিশ্রুতি রাখলেন না, গান্ধিজী মনে বড় ব্যথা পেলেন। ঠাকুর সাহেবের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য তিনি সেখানে গিয়ে অনশন সুরু করলেন। হরিজন কাগজে তিনি লিখলেন—পলিটিক্যাল এজেন্টের প্ররোচনায় তিনি প্রজাদের উপর যে অন্যায় করছেন সবার আগে তার প্রতিবিধান করা প্রয়োজন।

আমরণ অনশনের সংকল্প।

একদিকে সীমান্ত এক সামন্ত নরপতি, আরেকদিকে ভারতের চল্লিশ কোটি জনগণের মন-অধিনায়ক। একদিকে অহংকার আরেকদিকে আত্মাহুতি,—নিছক এক স্বার্থের প্রতিবাদে শত সহস্র প্রজার প্রতিভূ,—শোষণ-নীতি বনাম মানবতা।

সারা ভারতভূমি উৎকণ্ঠায় স্তব্ধ!

বড়লাট মধ্যস্থ হলেন, মীমাংসা করার জন্য প্রতিশ্রুতি দিলেন। ভারতের প্রধান বিচারপতি স্যার মরিস্ গয়ারের উপর ভার পড়লো ঠাকুর সাহেব যে চুক্তি করেছিলেন তা বিশ্লেষণ করার জন্য। আর অভিযোগ করার কিছু রইল না, চারদিন অনশন করার পর পঞ্চম দিনে গান্ধিজী আহার গ্রহণ করলেন।

তিন সপ্তাহ ধরে সমস্ত নথিপত্র বিচার করে স্যার মরিস গয়ার ঠাকুর সাহেবের বিরুদ্ধে রায় দিলেন, কংগ্রেসের জয় হোল।

গান্ধিজী কিন্তু খুসি হতে পারলেন না; সহসা তাঁর মনে জাগলো—রাজকোটের বিরুদ্ধে উপবাস করার মধ্যে তাঁর অন্তরে বিদ্বেষের ভাব ছিল। তখনই গান্ধিজী দিল্লী থেকে ফিরে গেলেন রাজকোটে। ঠাকুর সাহেব ও বড়লাটের কাছে তিনি ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। জয়লাভের সুবিধাগুলি আর গ্রহণ করলেন না। যে সব

**রাজনীতিকেরা ভাবছিলেন রাজকোটে গান্ধিজী প্রজা-আন্দোলনের নতুন দিকনির্দেশ করলেন, সহসা গান্ধিজীর এই দৃষ্টি-পরিবর্তন দেখে তাঁদের মনে বিস্ময় জাগলো। কিন্তু গান্ধিজীর কাছে রাজনৈতিক লাভ লোকসানের চেয়ে সত্য-উপলব্ধির মূল্য ছিল বেশী, রাজনীতির স্বার্থ-বাহী কুটিলতার জাল ছিঁড়ে সত্যের সন্ধান দেওয়াই ছিল তাঁর ধর্ম।**

জগৎব্যাপী মহাযুদ্ধের সম্ভাবনা দেখা দিল। হিটলার প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলিকে করায়ত্ত করার জন্ম অহংকারে দৃপ্ত হয়ে উঠলো। গান্ধিজী হিটলারকে একখানি খোলা চিঠি লিখলেন, অনুরোধ জানালেন যেন ফুয়েরার রক্তক্ষরী মহাসমরে লিপ্ত না হন, শত সহস্র লোককে নিশ্চিত মৃত্যুর সামনে এগিয়ে না দেন:

'মানবতার দিক থেকে বিচার করে অনেক বন্ধু আপনার কাছে চিঠি লেখার জন্ম আমাকে অনুরোধ করেছেন। কিন্তু তা হঠকারিতার পরিচয় হবে বলে আমার মনে হয়, তবু সে কথা বিচার না করে আমি আপনার কাছে আবেদন করছি। একথা আজ স্পষ্ট যে আপনিই জগতের মধ্যে একমাত্র মানুষ যিনি যুদ্ধের বর্বরতা থেকে পৃথিবীকে রক্ষা করতে পারেন। আমার মত অহিংসবাদীর আবেদনে কি আপনি সাড়া দেবেন? আমি যদি আপনার কাছে আবেদন জানিয়ে কোন অন্যায় করে থাকি নিজগুণে আমাকে ক্ষমা করবেন!'

কিন্তু গান্ধিজীর আবেদনে কান দেবার মত মন তখন হিটলারের ছিল না। নাৎসিরা পোল্যাণ্ড আক্রমণ করলো, বিশ্ব-সংগ্রাম শুরু হোল। গান্ধিজী বড়লাটকে বললেন—যখন আমি ভাবি ওয়েষ্ট-মিনিষ্টার-অ্যাবি, পার্লামেণ্ট ভবন ও সেণ্ট-পলস্ ক্যাথিড্রালের মত ইতিহাস প্রসিদ্ধ প্রাচীন হর্ম্যগুলি বোমা ফেলে ধ্বংস করা হবে তখন আমার মন ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে। আমি আপনাদের এই দুর্দিনে সহানুভূতি জানাচ্ছি, এবং ব্যক্তিগত ভাবে আপনার সঙ্গে সহযোগিতা করতে প্রস্তুত আছি!...

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি কিন্তু গান্ধিজীর মত এতো উদার হতে পারলেন না, তাঁরা বললেন—গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার প্রতি আমাদের পূর্ণ সহানুভূতি আছে, কিন্তু ভারতবর্ষের উপর জোর করে কোন লড়াই চাপিয়ে দিলে কংগ্রেস তা সমর্থন করবে না।

সিমলাতে গান্ধিজীর ডাক পড়লো। বড়লাটের সঙ্গে গান্ধিজী আলোচনা করতে গেলেন, কিন্তু সে আলোচনা সফল হোল না। ফিরে এসে গান্ধিজী বললেন—বড়লাটের কাছ থেকে আমাকে খালি হাতেই ফিরতে হোল, কোন বোঝা-পড়াই হোল না। কেননা সত্যিকারের বোঝাপড়া যদি কিছু করতে হয় কংগ্রেসের সঙ্গে করতে

হবে···তবে আমি শুধু বলে এলাম যে ইংরাজদের পক্ষে আমার ব্যক্তিগত সহানুভূতি আছে।

ওয়ার্ধায় কংগ্রেস কমিটির বৈঠক বসলো, তাঁরা স্থির করলেন—ভারতবর্ষ এ যুদ্ধে যোগ দেবে কি দেবে না, তা ভারতবাসীরাই ঠিক করবে। সহযোগিতার কথা উঠবে সমানে সমানে। এই সংগ্রাম গণতন্ত্রের স্বাধীনতা-সংগ্রাম বলে ঘোষণা করা হয়েছে অথচ ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা দেওয়া হয়নি। এই অবস্থায় এখনই তাড়াতাড়ি কোন সিদ্ধান্ত করা ঠিক হবে না।···

গান্ধিজী বললেন—ইংরাজদের যেটুকু সাহায্য করা দরকার তা বিনা সর্তেই করা উচিত বলে আমি মনে করি। কিন্তু একথা শুধু আমি ছাড়া আর কেউ ভাবে না দেখে আমি দুঃখিত।···এজন্য আজ সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন বৃটিশ রাজনীতিকদের চিন্তাধারার আমূল পরিবর্তন। গণতন্ত্র সম্পর্কে যে কথা তাঁরা বলেন তা যথাযথ প্রতিপালিত হওয়া অবশ্য কর্তব্য। ইংরাজ কি চায় ইচ্ছার বিরুদ্ধে ভারতকে যুদ্ধে লিপ্ত করতে, না ভারতবাসীর স্বেচ্ছাকৃত পূর্ণ সহযোগিতা ?

বিলাতে লর্ড জেটল্যাণ্ড এর উত্তর দিলেন—বৃটেনের এই দুর্দিনে ভারতের স্বাধীনতা দাবী করা অন্যায় ! যা কিছু করতে হবে আমরা যুদ্ধের পর করবো।

গান্ধিজী বললেন—বৃটিশ রাজনীতিকদের কাছে আমার বিনীত নিবেদন এই যে তাঁরা যেন সাম্রাজ্যবাদীর ভাষা ভুলে যান এবং যারা সাম্রাজ্যের শৃঙ্খলে বাঁধা তাদের সম্পর্কে ইতিহাসের এক নতুন পৃষ্ঠা খুলে ধরেন।

জহরলাল সেই কথাই আরো স্পষ্ট করে বললেন—লর্ড জেটল্যাণ্ড যে ভাষায় কথা বলেছেন তা বহুদিনের মৃত ভাষা, কুড়ি বছর আগে এই বক্তৃতা দিলে ভালো শোনাতো !···আমরা বাজারের দরাদরি করতে চাই না।

বিলাতে স্যার স্যামুয়েল হোর আশ্বাস দিলেন—সাম্রাজ্যবাদের আকাঙ্খা আমরা অনেকদিন আগে একপাশে দূর করে দিয়েছি। আমরা বিশ্বাস করি যে এই জগতে অন্য জাতিকে শাসন করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। আমরা চাই অন্য জাতিকে আত্মনিয়ন্ত্রণে সাহায্য করতে।

আবার গান্ধিজীর ডাক পড়লো বড়লাটের দরবারে। রাজেন্দ্রপ্রসাদ এবং জিন্নাও সেখানে উপস্থিত হলেন। আলোচনা হোল। কিন্তু শেষ অবধি জিন্না গোলযোগ বাধালেন। মুসলমানদের যতটা পাওয়া ন্যায়-সঙ্গত তার চেয়েও অনেক বেশী তিনি দাবী করলেন। মতে মিললো না। মহাত্মাজী হরিজনে লিখলেন—কংগ্রেসকে তার লক্ষ্য

পৌঁছাতে হলে আরো বেশী শক্তি সঞ্চয় করতে হবে। বৃটিশের কাছ থেকে কংগ্রেস চেয়েছিল রুটি কিন্তু পেলে পাথর!

এই শক্তি সঞ্চয় করার অর্থই হোল, নতুন আন্দোলনের ভিতর দিয়ে শক্তির পরীক্ষা করা। ওয়ার্কিং কমিটি সেইদিকেই নির্দেশ দিলেন। আটটি প্রদেশের কংগ্রেসী মন্ত্রীরা পদত্যাগ করলেন। কর্মীরা ভাবী সংগ্রামের নীতি প্রচার করতে লাগলেন জনগণের মধ্যে।

মার্চ মাসে রামগড়ে কংগ্রেস বসলো, গান্ধিজী বললেন—প্রত্যেকটি কংগ্রেস কমিটিকে এক একটি সত্যাগ্রহ কমিটিতে রূপান্তরিত করতে হবে।…আমাদের সংগ্রাম এখনও শেষ হয় নি। আমরা যখন সৈনিকের মত অগ্রসর হবো, তখন সৈনিকেরা যেমন সেনানায়কের আদেশ নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে আমাদেরও ঠিক তাই করতে হবে—সেনানায়কের আদেশই হবে আইন। আমি তোমাদের সেনানায়ক, কিন্তু আমার মত শক্তিহীন সেনাপতি ইতিহাসের পাতায় একজনও দেখা যায় নি। আমার অস্ত্র হোল ভালবাসা।…আমি সকলকেই ভালবাসি।…তবু তোমরা যখন আমাকেই সেনাপতি করেছ তখন আমার কথা তোমাদের মানতে হবে, তর্ক করা চলবে না। আমার ধর্ম প্রেমের ধর্ম, এবং প্রেম-ধর্মের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ধৈর্য।…আমি জানি, তোমরা সবাই জেলে যাবার জন্য প্রস্তুত। কিন্তু সেই জেলে যাবার অধিকার অর্জন করতে হবে, তার মূল্য দিতে হবে।…যতই আমি অহিংসার কথা ভাবি ততই তার মধ্যে আমি গুণের সন্ধান পাই।…সত্যই আমার ভগবান।…সত্য ও অহিংসা ছাড়া তোমাদের হয়তো অন্য কোন নীতি থাকতে পারে, কিন্তু আমার নীতি সেই সনাতন। আমি মানুষ, আমার ভুল হতে পারে। আমি নিজেকে মহাত্মা বলে মনে করি না। ঈশ্বরের কাছে আমরা সবাই সমান।…আমি শত্রুর মনে শুভ বুদ্ধি জাগাতে চাই। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আমার সংগ্রাম, কিন্তু যারা সাম্রাজ্য চালায় তাদের সঙ্গে আমার কোন বিরোধ নেই। যাতে কোন সংঘাত না বাধে সেজন্য আমি পঞ্চাশবার বড়লাটের কাছে যেতে রাজী আছি।…কিন্তু দেশবাসীর স্বার্থের ক্ষতি হয় আমি কিছুই করবো না।

গান্ধিজীর এই নীতিকে বামপন্থীরা সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করতে পারলো না। রামগড়-কংগ্রেসের পাশে বামপন্থীরা এক সম্মেলন করলো, তার নাম দিল—আপোষ-বিরোধী সম্মেলন। সেখানে তারা প্রস্তাব করলো—কংগ্রেসী নেতারা গবর্ণমেন্টের সঙ্গে কোন রকম আপোষ করার চেষ্টা করলে, তারা তার বিরুদ্ধে দাঁড়াবে।

আন্দোলন-বিরোধীরা শুধু এভাবেই করলো না, গান্ধিজীর বিরুদ্ধে প্রচার-পত্র বিলি করলো, কালো নিশান দেখিয়ে গান্ধিজীর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করলো।

গান্ধিজীর কাছে এ ব্যাপার নতুন নয়, তিনি ধৈর্য হারালেন না, বললেন—আমার নীতির বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করার অধিকার সকলেরই আছে। এতে উত্তেজনার কিছু নেই।···বিরোধী দলকে সহ্য করতে না পারলে তোমরা অহিংসার অর্থ উপলব্ধি করতে পারবে না। আমি জানিনা গান্ধীবাদ বলতে কি বোঝায়, আমি তো নতুন কিছুই প্রচার করিনি, যা আছে তাকেই শুধু নতুন আকার দেবার চেষ্টা করেছি মাত্র।

কিন্তু বিরোধী দল ধৈর্য হারালো, কলিকাতার পরের ষ্টেশনে ভীড়ের ভিতর থেকে কোন একজন লোক গান্ধিজীর কামরার ভিতর একপাটি জুতো ছুড়ে দিল।

•

যুদ্ধ ক্রমশঃই দুর্যোগময় হয়ে উঠছে, হিটলারের বিদ্যুৎবাহিনী সমস্ত বাধা অতিক্রম করে দুর্বার বেগে য়ুরোপের বুকে এগিয়ে চলেছে, মুসোলিনীর সেনা নেবে আসছে মিশরের দিকে। এই সময় ভারতবর্ষের সহযোগিতা উপেক্ষা করার ব্যাপার নয়, তার উপর গান্ধিজী যখন বলেছেন পঞ্চাশবার তিনি বড়লাটের কাছে যেতে রাজী আছেন। লিনলিথ্‌গো আবার গান্ধিজীকে ডেকে পাঠালেন।

বড়লাটের সঙ্গে আলোচনা করে গান্ধিজী দেশবাসীর কাছে কৈফিয়ৎ দিলেন—আমি কোন দলের নেতা হিসাবে লাটসাহেবের সঙ্গে দেখা করিনি, আমি বন্ধু ভাবে আলোচনা করার জন্ত নিমন্ত্রিত হয়েছিলাম—যদি কোন রকমে আমি তাঁকে সাহায্য করতে পারি, বিশেষতঃ কংগ্রেস কি চায় তা বুঝিয়ে বলার উদ্দেশ্যও আমার ছিল।···

বড়লাট কংগ্রেসীদের নিয়ে তাঁর মন্ত্রীসভাকে বড় করতে চাইলেন। কিন্তু কংগ্রেসী নেতারা সে আমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন না, তাঁরা দাবী জানালেন—সহযোগিতার আগে জাতীয় সরকার চাই!

ওয়ার্ধায় কংগ্রেস কমিটিতে গান্ধিজী বললেন—ইংরাজেরা হেরে যায় তা আমি চাই না, তাদের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয় তা'ও আমার কাম্য নয়। কিন্তু যে নিজে ডুবে যাচ্ছে সে অপরকে সাহায্য করবে কেমন করে?···

আবার বড়লাট গান্ধিজীর সঙ্গে দেখা করলেন, কিন্তু স্বরাজ দেবার কোন প্রতিশ্রুতি না থাকায় সে আলোচনাও ব্যর্থ হোল।

গান্ধিজী এবার ইংরাজ জাতির উদ্দেশ্যে এক খোলা চিঠি লিখলেন—বৃটিশ পরাজিত হয় তা আমি চাই না, পশুশক্তির জোরে সে জয়লাভ করুক, তা'ও আমি চাই না।···নাৎসীদের সঙ্গে তোমরা পশুশক্তির প্রতিযোগিতা কর এ'ও অনাকাঙ্ক্ষিত।

মি চাই তোমরা নাৎসীবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম কর, অস্ত্র দিয়ে না, অহিংসা দিয়ে।··· তোমরা হিটলার ও মুসোলিনীকে নিমন্ত্রণ জানাও। তোমাদের দেশ, বাড়ী ঘর সম্পত্তি তারা দখল করে নিক। কিন্তু যখন তারা তোমাদের কাছে বশ্যতা দাবী করবে, তখন ছেলে-বুড়ো নির্বিচারে তোমরা প্রাণ দিতেও কুণ্ঠিত হবে না।···ভারতে অহিংস-অসহযোগের পরীক্ষা করে আমি যথেষ্ট সাফল্য লাভ করেছি।···আমি এমন একটি ঘটনাও জানি না যেখানে এই নীতি ব্যর্থ হয়েছে। যেখানে ব্যর্থ হয়েছে সেখানে আমার অক্ষমতার জন্যই তা ঘটেছে। আমি নিজের পূর্ণতা দাবী করি না। কিন্তু আমি সত্যের সন্ধানী, সত্যই আমার কাছে ভগবান, সত্যানুসন্ধানের মধ্যে আমি অহিংসাকে আবিষ্কার করি। অহিংসা আমার জীবনের আদর্শ। সেই আদর্শকে প্রচার করা ছাড়া আমার জীবনের আর কোন উদ্দেশ্য নেই।···

কিন্তু সাম্রাজ্য-বিলাসীদের নীতির বালাই থাকে না, শোষণ কখনও সত্যকে স্বীকার করে না। নিপীড়িত জনগণের দীর্ঘশ্বাসে সাম্রাজ্যবাদীদের ব্যাংকের একাউন্ট স্ফীত হয়। সঙ্গীনের আড়ালে তারা আত্মরক্ষা করে, চল্লিশ কোটি অস্ত্রহীন জনগণের দাবী তারা গ্রাহ্য করবে কেন। ভারতবাসীর অধিকার জানাবার জন্য গান্ধিজী আবার সত্যাগ্রহের আহ্বান জানালেন—একক সত্যাগ্রহ।

একক সত্যাগ্রহ।

১৭ই অক্টোবর গান্ধিজীর আশীর্বাদ নিয়ে বিনোবা ভাবে ওয়ার্ধা আশ্রম থেকে বাহির হলেন। হাতে তেরঙা নিশান, মুখে কংগ্রেসের বাণী, নির্ভীক পদক্ষেপে পথ ও প্রান্তর অতিক্রম করে স্বাধীনতার সৈনিক এগিয়ে চললেন, গাঁয়ে গাঁয়ে কিষাণদের ডেকে বললেন—ইংরাজের এই যুদ্ধকে সৈন্য হয়ে, অর্থ দিয়ে, সাহায্য করা পাপ।··· এই সংগ্রামকে প্রতিরোধ করতে হবে অহিংসা দিয়ে।···

পঞ্চম দিনে বিনোবা ভাবেকে পুলিশ গ্রেপ্তার করলো।

তারপর জহরলাল।

তারপর একে একে বহু কংগ্রেসকর্মী, প্রধান মন্ত্রী থেকে একজন সাধার নাগরিক অবধি—সারা দেশকে দুলিয়ে দিল আন্দোলনের দোলা!

গবর্মেন্ট সত্যাগ্রহীদের সংবাদ প্রকাশ করা বন্ধ করে দিলেন, গান্ধিজী ত প্রতিবাদে 'হরিজন' 'হরিজনবন্ধু' ও 'হরিজন-সেবক' কাগজ বন্ধ করে দিলেন।

গান্ধিজী বললেন—আমি পরাজয় স্বীকার করবো না। বৃটিশ জাতিকে আমি এ সত্য হৃদয়ঙ্গম করাবার চেষ্টা করবো যে, কংগ্রেস অথবা কোন দলের ব্যর্থতার উ

ভারতের স্বাধীনতা নির্ভর করছে না, ন্যায্য নীতি স্বীকার করতে বৃটিশের যে অনিচ্ছা তাতেই এইরূপ ঘটেছে। যদি লড়তেই হয় তাহলে যেন পরস্পরের মাঝে ভুল বোঝার স্বন্দ্ব না থাকে, কোন তিক্ততা না থাকে। আমি এই আশাতেই সংগ্রাম সুরু করেছি—ভারতবর্ষ ভালো ব্যবহার দাবী করে শুধু ইংরাজদের কাছ থেকেই নয় সমগ্র বৃটিশ জাতির কাছ থেকে।...দাবী হচ্ছে বাঁচবার অধিকার, অর্থাৎ নিজেকে প্রকাশ করার অধিকার। সহজ কথায় যাকে বলে কথা বলার স্বাধীনতা, কংগ্রেস এই স্বাধীনতা দাবী করে নিজের জন্য নয়, সকলের জন্য। কংগ্রেসের নীতি হোল অহিংসা।...

ভারত-সচিব লিওপোল্ড আমেরী তর্জন করে উঠলেন—যারা জেলে যেতে চায় তাদের ইচ্ছা অপূর্ণ থাকবে না।...

আমেরী সাহেবের তর্জনে দেশ-সেবকেরা ভয় পেলেন না, কয়েক সপ্তাহের মধ্যে আড়াই হাজার সত্যাগ্রহী কারাবরণ করলেন।

আমেরী সাহেব বিলাত থেকে সাড়ম্বরে উপদেশ দিলেন—ভারতে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে যে বিরোধ, তাতে স্বাধীনতার কথা এখন দূরে রাখাই ভালো।

গান্ধিজী বললেন—আমি বাঁরবার বলেছি ইংরাজেরাই আমাদের একতার বাধা-স্বরূপ, তাদের নীতিই হচ্ছে বিভেদ বাধিয়ে শাসন করা। বৃটিশ যতদিন অস্ত্রবলের জোরে ভারত শাসন করবে ততদিন বৃটিশ রাজনীতিকেরা বিভেদের নীতি বজায় রাখবেই। কংগ্রেস ও মুসলীম লীগের মাঝে বিরোধ দেখা দিয়েছে সত্য, কিন্তু সে বিরোধ বৃটিশ রাজনীতিকেরা আমাদের ঘরোয়া বিরোধ বলে মেনে নিচ্ছেন না কেন? আজ তারা ভারত ছেড়ে চলে যাক্, লীগ ও অন্যান্য রাজনীতিক নেতারা নিজেদের স্বার্থের খাতিরে নিজেদের সমস্যা নিজেরাই মিটিয়ে ফেলবে। হয়তো সেজন্য আমরা নিজেদের মাঝে বিবাদ করবো, কিন্তু সে বিবাদ পনেরো দিনের বেশী স্থায়ী হবে না, এবং আজকের যুদ্ধে যত মানুষ একদিনে মরছে ততো রক্তপাত হবে না; অবশ্য যদি বাইরে থেকে আমরা কোন শক্তির সাহায্য আমন্ত্রণ করে না আনি।...আমেরী সাহেব ভারতের সমৃদ্ধি সম্বন্ধে যে কথা বলেছেন তা আমি রুদ্ধ নিঃশ্বাসে পড়েছি। আমার অভিজ্ঞতা থেকে আমি বলতে পারি—সে কাহিনী পৌরাণিক যুগের। ভারতের লক্ষ লক্ষ নরনারী আজ ক্রমশঃ নিঃস্ব হতে বসেছে। তারা খেতে পায় না, তাদের পরণে কাপড় নেই। কারণ ভারত একটি লোকের ইচ্ছানুযায়ী শাসিত হচ্ছে, তিনি কোটি কোটি প্রজার রাজস্ব ইচ্ছামত ব্যয় করেন। ইংরাজ আজ ভারতকে তার গোড়ালির নীচে গুঁড়ো করছে। এই অবস্থায় প্রত্যেক ভারতবাসীর উচিত এই স্বেচ্ছাচারের

বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা। সৌভাগ্যের কথা ভারতে শান্তিপূর্ণ ভাবে বিদ্রোহ হয়েছে; এই শান্তির ভিতর দিয়েই ভারতবর্ষ তার লক্ষ্যে গিয়ে পৌঁছাবে।

সেনাপতি তাঁর সৈন্যদের চিনতেন, সৈনিকেরাও বিশ্বস্তভাবে সেনাপতির বিশ্বাসকে সার্থক করে তুলেছিলেন, কংগ্রেসের হিসাব দেখলেই তা জানা যায়:

| প্রদেশের নাম : | পুলিশ কর্তৃক গ্রেপ্তারের সংখ্যা : | আদায়ী জরিমানা : |
|---|---|---|
| সংযুক্ত প্রদেশ | ১৪৯৫ | ৩৮০০০৲ |
| অন্ধ্র প্রদেশ | ৮৮২ | ৭৬৫৩৩৲ |
| তামিলনাড প্রদেশ | ৪২৪ | ২৯০৩০৲ |
| উৎকল প্রদেশ | ৩১৫ | ৯৫৩২৲ |
| গুজরাট প্রদেশ | ২৯৬ | ৬১৫০৲ |
| বিহার প্রদেশ | ২৪২ | ৪৩৪০৲ |
| মহারাষ্ট্র | ২২১ | ১৯১৫৲ |
| কর্ণাটক | ২১০ | ৫৩৮৫৲ |
| আসাম | ১৭৬ | ৩১৪৫৲ |
| মহাকোশল | ১৩৭ | ১০৩০২৲ |
| বিদর্ভ | ১২৩ | ৮১৭৬৲ |
| কেরল | ৭০ | ৫৭০০৲ |
| বোম্বাই | ৪৭ | ? |
| বাংলা* | ৩৯ | ৩৬২৫৲ |
| দিল্লী | ৩৯ | ২০৫০৲ |
| নাগপুর | ২১ | ৫২১৫৲ |
| আজমীর | ১০ | ৫৬৫৲ |
| সীমান্ত প্রদেশ | ২ | ০ |
| | ৪৭৪৯ | ২০৯৮৬৩৲ |

এই সত্যাগ্রহীদের যোগ্যতা সম্পর্কে সেনাপতির শুধু একটিমাত্র নির্দেশ ছিল—যে সুতা কাটতে পারে না, সে সত্যাগ্রহী হতে পারবে না।

দেশ কাল পাত্রের উপরে মহাত্মাজী স্থান দিয়েছিলেন সত্যাগ্রহীর আদর্শকে, টাইম্‌স্‌-অফ-ইণ্ডিয়া কাগজে তিনি লেখেন—হিটলার যদি ভারত আক্রমণ করে, এবং সমস্ত সত্যাগ্রহীকে হত্যা করে তাহলে হতাশা ও ভয়ের কোন কারণ নেই। যদি

* শেষে বাংলা ও পাঞ্জাবে পুলিশ সত্যাগ্রহীদের গ্রেপ্তার করা ছেড়ে দেয়।

একদল সত্যাগ্রহী জার্মান-বাহিনীর সামনে দাঁড়িয়ে বিনা বিদ্বেষে মৃত্যু বরণ করে, তাহলে এই সব সত্যাগ্রহীর কথা প্রকৃত বীরের মত ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

সত্যাগ্রহীদের সে দৃঢ়তা ছিল, একবার যিনি পথে নাবতেন তাঁর দৃঢ় পদক্ষেপ কোন কারণে এতটুকু শিথিল হোত না। বাংলা দেশে এক সত্যাগ্রহী দিনের পর দিন গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে প্রচার করে গেছেন, পুলিশ আর জরিমানার ভয়ে কেউ তাঁকে আশ্রয় দেয়নি, একমুঠো অন্ন জোটেনি কয়েক দিন। কিন্তু সেজন্য তাঁর অগ্রগতির বিরাম ঘটেনি। শেষে এক জমিদার তাঁর আহারের ব্যবস্থা করেন।

সারা ভারতের বিরাট রাজনৈতিক জটিলতার মধ্যেও মহাত্মাজী ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব এবং সংগঠনের কাজকে ভীড়ের মাঝে হারিয়ে ফেলেন নি। দীনবন্ধু এণ্ডরুজ অসুস্থ দেহে কলিকাতার এক হাসপাতালে পড়েছিলেন, গান্ধিজী তাঁকে দেখতে এলেন কলিকাতায়।

সেখান থেকে গান্ধিজী কস্তুরবাকে সংগে নিয়ে এলেন শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্র-সকাশে। আম্রকুঞ্জে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে রাজকীয় সম্বর্ধনা জানালেন। শান্তিনিকেতনের আর্থিক অবস্থা তখন ভালো ছিল না। কিছুদিন আগে এমনি এক দুর্যোগ থেকে গান্ধিজী বিশ্বভারতীকে সঙ্কটমুক্ত করেছিলেন, কবিগুরু এবার তাই গান্ধিজীকে বললেন—আমার জীবনের সাধনা ও সম্পদ এই বিশ্বভারতী, এই প্রতিষ্ঠানটিকে রক্ষা করার জন্য, বাঁচিয়ে রাখার সমস্ত ভার আপনি গ্রহণ করুন।

গান্ধিজী এলেন মলিকান্দায় গান্ধী সেবা-সঙ্ঘের বার্ষিক অধিবেশনে।

গান্ধিজী গেলেন বরদৌলিতে প্যাটেলের আশ্রয়ে।

কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের রজত জয়ন্তী উৎসবে যোগ দিলেন।

শেষে দীনবন্ধু এণ্ডরুজের মৃত্যুর পর তাঁর স্মৃতিরক্ষার জন্য পাঁচ লাখ টাকা গান্ধিজী তুলে দেন শান্তিনিকেতনে।

রবীন্দ্রনাথ যখন অসুস্থ হয়ে পড়লেন, গান্ধিজী যেখানেই থাকুন না কেন নিয়মিত গুরুদেবের খবর নিতেন। যখন নিজে আসার অবসর পেলেন না মহাদেব দেশাইকে পাঠিয়ে দিলেন কবিগুরুর শয্যাপার্শ্বে। রবীন্দ্রনাথ তখন জীবনমৃত্যুর সন্ধিক্ষণে শায়িত, বিদ্যুৎ-দীপ্তির মত ক্ষণে ক্ষণে মহাত্মাজীর কথাই হয়তো তাঁর মনে জাগছিল, এমন সময় মহাদেব দেশাই গান্ধিজীর চিঠিখানি এনে তাঁর হাতে দিলেন। কবির হাত কেঁপে

উঠলো, চিঠিখানি পড়তে পড়তে আনন্দের উচ্ছ্বাসে তাঁর চোখ ছল ছল করে উঠলো, ...ন্ধুদের আন্তরিকতা কৃতার্থ হোল, স্মরণীয় হোল।

১৯৪১-এর ২রা অক্টোবর।

ভারতের অহিংস সেনাশক্তি তিয়াত্তর বৎসরের জীবন আরম্ভ করলেন। সেবা-...গ্রামে গান্ধিজীর জন্মোৎসব হোল। আশ্রমিকেরা বারো হাজার টাকার একটি থলি ...ও তিন কোটি গজ সূতা গান্ধিজীকে উপহার দিলেন।

গান্ধিজী বললেন—এক এক গজ সূতো আমাদের স্বরাজের পথে এক এক পা ...গিয়ে দেবে। এ কাব্য কথা নয়, এ আমার অন্তরের কথা। স্বরাজ বলতে আমি ...জনগণের স্বরাজ বুঝি। শাদাদের স্থানে কালোদের স্বৈরাচার-শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ...করতে আমি চাই না। আমি স্বরাজ বলতে বুঝি—গরীব লোকেরাও দুধ ঘি ফল ...ও সব্জি খেতে পাবে, উপযুক্ত আহার পাবে, থাকবার মত স্বাস্থ্যকর বাড়ী পাবে। ...আন্দোলনের গতি দেখে আমি খুসি হয়েছি···লোকে যদি কোন যাদু দেখাবার আশা ...করে থাকে, তা দেখাতে আমি পারবো না, তবে অহিংসা হোল পরম-পিতার ...অভিব্যক্তি, তিনিই এর সাফল্য দেবেন। অহিংসা সংগ্রাম দুঃখবরণ ও আত্মত্যাগের ...সংগ্রাম। য়ুরোপে আজ দানবীয় যুদ্ধের ফলে সেখানকার জনগণকে যে অকথ্য কষ্ট ...সহ্য করতে হচ্ছে আমাদের কোনদিনই ততো দুঃখ সইতে হবে না। কিন্তু ...আমাদের বারবার জেলে যেতে হবে, প্রয়োজন যত আমরা যদি দুঃখবরণ করতে না পারি তাহলে স্বরাজের কথা বলাই অবান্তর। অহিংসার পথে যে স্বরাজ আমরা চাই, গঠনমূলক কাজে সাফল্যলাভ করাই তার ভিত্তি। গঠনমূলক কাজে আমাদের লেগে থাকতে হবে।

সংগ্রামের দিকেই কংগ্রেস কর্মীরা কর্মশক্তি কেন্দ্রীভূত করার চেষ্টা করেন। ওয়ার্কিং কমিটির ঘনঘন সভা বসাতে সুরু করে, প্রত্যেকটি বৈঠকে গান্ধিজী গান্ধী-নীতি ও ভবিষ্যৎ কর্মপদ্ধতির ইঙ্গিত দিতে থাকেন।

ডিসেম্বর মাসে বরদৌলির বৈঠকে গান্ধিজী বললেন—আমি কংগ্রেস-সেবক, সত্য ও অহিংস নীতি বজায় রেখে আমি কংগ্রেসের সেবা করতে চাই।

জানুয়ারী মাসে ওয়ার্ধার বৈঠকে গান্ধিজী বললেন—কংগ্রেস কমিটিগুলিকে শক্তিমান করতে হবে, স্বেচ্ছাসেবকদের সংখ্যা বাড়াতে হবে, জনসাধারণের সঙ্গে যোগাযোগ ঘনিষ্ঠ করতে হবে। প্রত্যেকটি গ্রামে যেন কংগ্রেসের বাণী গিয়ে পৌঁছায়।

এবং কর্মীদের কাছে ভাবী সংগ্রামের বাণী পৌঁছে দেবার জন্য গান্ধিজী আবার তাঁর হরিজন প্রকাশ করলেন। পনেরো মাস কাগজখানি বন্ধ ছিল।

যুদ্ধ ক্রমেই সংকটপূর্ণ অবস্থায় এসে পৌঁছালো। চীনের ভিতর দিয়ে জাপানীরা এগিয়ে এলো রেংগুণ অবধি। চীন ও ব্রহ্মদেশের সমস্ত উপকূল জাপানীদের করতল গত; জাহাজে অস্ত্রশস্ত্র আমদানীর পথ একেবারে বন্ধ। চীনের রাজধানী পিছিয়ে গেছে চুংকিংয়ে। কিভাবে লড়াই চালিয়ে এখন জাপানীদের কবল থেকে দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করা যায় তাই আলোচনা করার জন্য চীনের সর্বাধিনায়ক জেনারেলিসিমো চিয়াং-কাই-শেক এলেন ভারতবর্ষে। বড়লাট ও প্রধান সেনাপতির সঙ্গে চিয়াং নানা ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করলেন। তারপর দেশবাসীর মনোভাব জানার জন্য জহরলালের সঙ্গে অনেক কথা হোল। পণ্ডিতজীর সঙ্গে তিনি এলেন শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্র-তীর্থ দর্শনে! কলিকাতায় গান্ধিজীর সঙ্গে চিয়াংয়ের দেখা হোল। সাড়ে চারঘণ্টা ধরে আলোচনা হোল, চিয়াং ইংরাজী জানেন না, চিয়াং-পত্নী দু'জনের মাঝে দোভাষীর কাজ করলেন।

ইংরাজেরা এশিয়ার দুই মহাদেশের রাষ্ট্রনায়কের মধ্যে এই আলোচনা ভালো চোখে দেখেনি। কিন্তু চিয়াং জানতেন বড়লাট বা প্রধান সেনাপতির কথা ভারতবাসীর কথা নয়। ভারতবর্ষের মনের কথা জানতে হলে, গান্ধিজীর মুখ থেকে তা শুনতে হবে। সেইজন্য ভারত-সরকারের দিক থেকে কোন ব্যবস্থা না হলেও চিয়াং নিজে উদ্যোগী হয়ে মহাত্মাজীর সঙ্গে দেখা করেন।

গান্ধিজীর সঙ্গে মহাদেব দেশাই ও পণ্ডিত জওহরলালও ছিলেন। গান্ধিজী একটি চরকা নিয়ে গিয়েছিলেন। কথা বলতে বলতে কিছুক্ষণ তিনি সেই চরকায় সুতা কাটেন, তারপর সেই সুতা ও চরকাটি উপহার দিয়ে আসেন চিয়াংকে।

এই সভার বিশেষত্ব ছিল ম্যাডাম চিয়াংয়ের পরিচ্ছদ। ভারতীয় কায়দায় খদ্দরের সাড়ী পরে মাথায় সিঁদুর দিয়ে পুরোপুরি ভারতীয় মহিলা সেজে চিয়াং-পত্নী মহাত্মাজীকে প্রণাম জানান।

আলোচনা কি হয়েছিল জানা যায় না, তবে মহাত্মাজীর বাণী ও ব্যক্তিত্ব যে মহাচীনের রাষ্ট্রনায়কের মনে প্রভাব বিস্তার করেছিল তা বোঝা যায় তাঁর বিদায় বাণীতে। ভারতভূমি থেকে বিদায় নেবার সময় চিয়াং বলেন—আমি আশা রাখি ও বিশ্বাস করি যে গ্রেটবৃটেন ভারতবাসীর কোন দাবীর অপেক্ষা না রেখেই যতশীঘ্র

হব তাদের হাতে দেশ-শাসনের ক্ষমতা দেবে···বৃটিশ সাম্রাজ্যের তাতে গরিমা
ড়বে এবং বিজ্ঞজনোচিত কাজ হবে বলেই আমি মনে করি।

বৃটিশ মন্ত্রী ষ্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্‌স্ এলেন ভারতবর্ষে।

দু'বছর তিন মাস আগে লড়াই সুরু হবার মুখেই তিনি আরেকবার এসেছিলেন।

তখন ক্রিপ্‌স্ সাহেব এসেছিলেন গান্ধিজী ও কংগ্রেসী নেতাদের সংগে আলোচনা
াতে, এবারও সেই একই ব্যাপার। তাঁর আলোচনা করার বিষয় ছিল—কংগ্রেস
: যুদ্ধে যোগ দিক্, যুদ্ধ শেষ হলে ধীরে সুস্থে তাদের স্বাধীনতার বিলি-ব্যবস্থা করা
ব। এখন কংগ্রেসীরা বড়লাটের দরবারে মন্ত্রীত্ব করুক।

গান্ধিজী ও কংগ্রেসী নেতারা ক্রিপ্‌স্ সাহেবের সংগে তখনও একমত হতে পারেন
এবারও এ সর্তে রাজী হতে পারলেন না, গান্ধিজী বললেন—'এ হচ্ছে ভবিষ্যতের
সই করা চেক—এ পোষ্ট ডেটেড চেক।' সাংবাদিকেরা আবার তার সংগে যোগ
র দিল—'দেউলিয়া ব্যাংকের নামে—অন এ ক্র্যাশিং ব্যাংক্!' ক্রিপ্‌স্ সাহেবের
াবগুলি সারা ভারতের সংবাদ-পত্রে নতুন নাম পেল—দেউলিয়া ব্যাংকের উপর
িষ্যতের জন্য সই করা চেক—এ পোষ্ট ডেটেড চেক্ অন এ ক্র্যাশিং ব্যাংক্।

তথাপি ক্রিপ্‌স্ সাহেবের সংগে কথাবার্তা কহে গান্ধিজী প্রত্যেক বারেই হাসি-
। বাহির হয়ে আসতেন। ক্রিপ্‌স্ বলতেন—আমি গান্ধিজীকে হাসতে শিখিয়ে
েছি।

পরে অবশ্য গান্ধিজী হেসে বলেন—সব ব্যাপারটাই হাস্যকর!

জাপানী আক্রমণ সম্পর্কে ইংরাজরা যে ভয় দেখাতো সেই সম্পর্কে গান্ধিজী
াকটা স্পষ্ট কথা বলেন—ইংরাজরা ভারতে আছে বলেই জাপানীরা এ দেশ আক্রমণ
ছে···আমার দৃঢ় বিশ্বাস বৃটিশ ও ভারতের পরস্পর থেকে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন
র দিন এসেছে। বৃটিশকে সাফল্য লাভ করতে হলে প্রথমেই কৃত অন্যায়ের সংশোধন
তে হবে।···বৃটিশের এশিয়া ও আফরিকার অধিকৃত স্থানগুলি ছেড়ে চলে যাওয়ার
আমি যে আবেদন করেছি, আশা করি প্রত্যেক বৃটনই তা সমর্থন করবেন।
আমি চাই বিনা রক্তপাতে নতুন যুগের সূচনা করতে। ভগবানের হাতে তোমরা
তভূমিকে সমর্থন কর, তা যদি খুব বেশী বলে মনে হয়, অরাজকতার মধ্যেই তাকে
ড় দাও! তার মধ্যে থেকেই সত্যকারের ভারতের অভ্যুত্থান হবে!

ব্যর্থকাম ক্রিপ্‌স্ সাহেব বিলাতে গিয়া যে সব বাজে কথা বলেন, সেই প্রসংগে
ন্ধিজী বললেন—ভারতকে জোর করে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে নামানো হয়েছে। বিভিন্ন

রাষ্ট্রগুলিকে স্বাধীনতা দেবার জন্য এই সংগ্রাম লড়া হচ্ছে। যারা অন্য জাতির মুক্তির জন্য যুদ্ধ করছে এক জাতিকে পরাধীন করে রাখা তাদের পক্ষে অনুচিত। কিন্তু বৃটিশ ভারতকে পরাধীন করে রেখেছে, কাজেই এই যুদ্ধের কোন নৈতিক ভিত্তি নেই। তাহলে ভারতবর্ষকে অবশ্যই স্বাধীনতা দিতে হয়। সব দল এক[illegible] হয়নি বলে যে কথা তোলা হয়, তা অর্থহীন। কোন ক্রীতদাসকে মুক্তি দিতে হলে তার মতামত জিজ্ঞাসা করার কোন মানে হয় না। অনেক ক্রীতদাস তার শিকলকেই ভালবাসে। ভারতের একটি দল যদি সেই শিকলেই বিশ্বাস রাখে, সেই কারণে সমগ্র ভারতকে শৃঙ্খলিত করার কোন অর্থ হয় না। ইংরাজ চলে গেলেই সারা ভারত একতা-সূত্রে আবদ্ধ হবে।

এই মতবিরোধের মূলে ছিল মুসলীম লীগ। লীগের নেতা জিন্না প্রচার করতে সুরু করে যে এদেশের মুসলমানেরা ভারতীয় নয়, হিন্দুদের স্বার্থ আর তাদের স্বার্থ এক নয়। কংগ্রেস হিন্দু প্রতিষ্ঠান, কংগ্রেসের সংগে কোন মতেই তা[illegible] মিলতে পারে না।

গান্ধিজী এই সম্পর্কে লুই-ফিসারকে একদিন বলেছিলেন—এ[illegible] দুঃখের কথা নয়, এটা কলংকের কথা। এ দোষ শুধু মুসলীম লীগের। যুদ্ধ বা[illegible] সংগে সংগে কংগ্রেস এবং লীগকে বড়লাটের সংগে আলোচনার জন্য ডাকা [illegible]ছিল কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য রাজেন্দ্র প্রসাদ এবং আমি কংগ্রেস তরফে ক[illegible] বলার জন্য উপস্থিত ছিলাম। মুসলীম লীগের মিষ্টার জিন্নাও উপস্থিত ছিলেন। [illegible]তাকে আগে থাকতে একটা ঘরোয়া আলোচনার জন্য আমি আমন্ত্রণ জানিয়ে ছিলা[illegible] এবং ইংরাজ সরকারের কাছে যুক্ত আবেদন যাতে পেশ করতে পারি, সেই উপায় উদ্ভাবন করার কথাও বলেছিলাম। দিল্লীতে দু'জনের দেখা করার কথা ঠিক হয়েছিল। কিন্তু আমি যখন প্রস্তাব করলাম যে ভারতের স্বাধীনতা আমাদের উভয়েরই কাম্য তখন মি[illegible] জিন্না বাধা দিয়ে বলে উঠলেন—'আমি স্বাধীনতা চাই না!' এর পর আমরা[illegible] হতে পারলাম না। আমি তাকে এমন কথাও বললাম যে বড়লাটের কাছে একসঙ্গে উপস্থিত হয়ে আমরা একতার একটা ভাণ দেখাই।...হয় তিনি আম[illegible] গাড়ীতে আসতে পারেন নাহয় আমি তাঁর গাড়ীতে যেতে পারি। শেষ পর্যন্ত তাঁর গাড়ী করেই লাট প্রাসাদে গিয়ে হাজির হলাম। কিন্তু একসংগে গেলেও সেখানে গিয়ে তিনি বড়লাট বাহাদুরকে ভিন্ন সুরে ভিন্ন মত জানিয়ে দিলেন।...বাস্তব জীবনে আমাদের দুটি জাতিতে পরিণত করা অসম্ভব। আমরা একই জাতি। পারিবারিক ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যাবে প্রত্যেক মুসলমানেরই পূর্ব পুরুষ হিন্দু। এর দ্বারা জাতিগত পার্থক্য বোঝায় না। আমরা যদি দুটি জাতি হতাম, এবং

ান খৃস্টান পাদরী আমাদের খৃস্টধর্মে দীক্ষিত করতেন তাহলে আমরা রাতারাতি
ক জাতি হয়ে যেতে পারতাম না। ঠিক এই দুটি ধর্ম সম্প্রদায়কেও দুটি জাতি বলা
ল না। সমগ্র য়ুরোপ খৃস্টান ধর্মে বিশ্বাসী এবং ইংলণ্ড ও জার্মানী মধ্যে কৃষ্টিগত
ভাষাগত সাদৃশ্য থাকা সত্বেও একে অপরের টুঁটি চেপে ধরতে কসুর করেনি।
রতে আমাদের একই ঐতিহ্য বর্তমান। উত্তর ভারতে হিন্দু ও মুসলমান উভয়
দায়ই হিন্দী ও উর্দু বুঝতে পারে। মাদ্রাজে হিন্দু ও মুসলমান তামিল
ার কথা বলে এবং বাংলা দেশে তারা হিন্দী ও উর্দুতে না বলে বাংলাতেই কথা
। সাম্প্রদায়িক হত্যার কারণ খুঁজলেই দেখা যায়, হয় সেটা গোহত্যার ব্যাপারে
য় সেটা কোন ধর্মার্থীদের মিছিলের জন্য। এ থেকে এই কথাটাই প্রমাণিত হয়
অন্ধবিশ্বাসই বিরোধের সৃষ্টি করে। জাতিভেদ এর কারণ নয়।···জনসাধারণ
বিভেদ চায় না, রাজনীতিকেরাই এই বিভেদ ঘটান।···

গান্ধিজীর মনে এই বিশ্বাস ছিল বলেই দোসরা আগষ্টের হরিজন কাগজে তিনি
বলেন—ইংরাজ যদি সত্যই স্বাধীনতা দিতে চায়, তাহলে মুসলীম লীগের হাতেও
ত পারে, আমাদের কোন আপত্তি নেই।

কিন্তু স্বাধীনতা দেবার এতটুকু আগ্রহ বৃটিশের ছিল না। জুলাই মাসে ভারত
রকারের সেক্রেটারী স্যার ফেডারিক পাকেল, ভারতব্যাপী স কারী কর্মচারীদের
াছে এক সার্কুলার জারী করলেন: তাতে কংগ্রেস ও গান্ধিজীকে বিশ্বের চোখে
ক করে ছোট করা যায়, সেই সম্পর্কে কয়েকটি নির্দেশ দেন; পাকেল সাহেব
লখেন: আইন অমান্য আন্দোলন জার্মান ইতালি জাপানকে উৎসাহিত করবে
···গান্ধীর প্রস্তাব অনুযায়ী ভারতে অরাজকতা দেখা দিলে জাপানকে ভারতে আমন্ত্রণ
[illegible]···শত্রুপক্ষের বেতারে কংগ্রেসী নেতাদের কথা এখন প্রায়ই শোনা যায়,
[illegible]বোঝা যায় কংগ্রেসের এই প্রস্তাব ভারতের শত্রুদের সুবিধা করে দেবে মাত্র।
[illegible] জয়ী নাহলে ভারতের স্বাধীনতা আসবে না—ক্রীতদাসের জগতে স্বাধীন
ারত সম্ভব নয়।···স্মরণ রাখতে হবে যে মুসলমান, শিখ, কমিউনিষ্ট, রায়দল ও
ন্যান্যসভাগুলি কংগ্রেস বিরোধী···মনে রাখতে হবে যে জাপানের জয়ে কংগ্রেসকর্মীরা
ানন্দিত···গান্ধী জাতীয় সরকার গঠনের পর ভারতীয় সৈন্য বাহিনী ভেঙে দেবার
পক্ষপাতী। শত্রুপক্ষের কাছে দূত পাঠাবার কথাও তিনি বলেন। আজাদ ও
ধী যে ভারতব্যাপী গণবিক্ষোভের ভয় দেখিয়েছেন তাতে ভারতবর্ষ জাপান ও
ার্মানীর হাতে গিয়ে পড়বে।···এখন কংগ্রেসের বিরুদ্ধে জনমত গঠন করা দরকার।

সেই উদ্দেশ্যে খবরের কাগজে চিঠি ছাপিয়ে, পুস্তিকা প্রকাশ করে, বক্তৃতা দিয়ে, কার্টুন ছবি, পোষ্টার ও বেতার ঘোষণা মারফৎ রীতিমত প্রচার চালাতে হবে।···

ছবিগুলি কেমন হবে সেই সম্পর্কে কয়েকটি পরিকল্পনাও পাকেল সাহেব দিয়ে দেন: একখানি ছবি বা পোষ্টারে থাকবে একখানি ঘরের ছবি। ঘরের দু'দিকে দুটি দরজা। ঘরের ভিতর দাঁড়িয়ে আছে একজন কংগ্রেসী আর তাঁর পিছনে একজন চাষা। বাঁদিকের দরজা দিয়ে একজন ইংরাজ সৈনিক বেরিয়ে যাচ্ছে কংগ্রেসী তাকে নমস্কার করছে, আর ডানদিকের দরজায় একজন জাপানীর মুখ দেখা যাচ্ছে, চাষাটি সেদিক পানে তাকিয়ে বলছে—বাবুজী, দেখুন কে আসছে!

আরেকখানি ছবিতে আঁকা থাকবে পথের এক চৌমাথা। চৌমাথার উপর এক সাইন বোর্ড ঝুলছে তাতে লেখা আছে—জয়। দু'জন পথিক পথের মোড়ে থমকে দাঁড়িয়েছে, একজন জিজ্ঞাসা করছে—স্বাধীনতার পথ কোনটা? আরেকজন উত্তর দিচ্ছে—জয়ের পথই স্বাধীনতার পথ!···

আরেকখানি ছবিতে থাকবে পর পর তিনটি মাইক্রোফোনের সামনে হিটলার মুসোলিনী ও তোজো বক্তৃতা করছে, তিনজনই বলছে—আমি কংগ্রেসের প্রস্তাব সমর্থন করি।

একখানি সার্কুলার গান্ধিজীর হাতে এসে পড়লো, তিনি মন্তব্য করলেন—এ থেকে জনসাধারণ জানতে পারবেন আন্দোলন দমন করার জন্য গবর্মেণ্ট কতদূর অগ্রসর হবে। ভগবান জানেন এই ধরণের নির্দেশ আর কতগুলি ছাড়া হয়েছে।···গণভোট নিয়ে জনমত গ্রহণ করা হোক, এবং সরকার সেই জনমত মেনে নিক, কংগ্রেস খুসি হবে। ইহাই হোল সত্যিকারের গণতন্ত্র।···'ভারত ছাড়ো' মৌখিক কথা নয়, লক্ষ লক্ষ মানুষের অন্তরের অভিব্যক্তি। জনসাধারণ যেন মনে রাখে যে জাতীয় স্বার্থকে ক্ষুণ্ণ করার চেয়ে জীবিকা আহরণের আরো অনেক সৎপথ খোলা আছে।

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি বললো—শুধু ভারতের জন্যই নয়, বিশ্বের নিরপত্তার জন্য ভারতের স্বাধীনতার প্রয়োজন।

নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি প্রস্তাব করলো—ভারতের জনগণ বিপদ ও দুর্যোগের মাঝে সাহস ও সহিষ্ণুতা না হারায়, গান্ধিজীর নেতৃত্বে সমগ্র ভারত এক হয়ে শৃঙ্খলাবদ্ধ সৈনিকের মত স্বাধীনতা সংগ্রাম চালিয়ে যাবে!···ভারতের স্বাধীনতা সমগ্র এশিয়ার স্বাধীনতার পূর্বসূচনা মাত্র, ব্রহ্মদেশ, মালয়, হিন্দুচীন, পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ ইরাণ ও ইরাকের পূর্ণ স্বাধীনতা পাওয়া উচিত।···ভারতের স্বাধীনতার জন্য দেশব্যাপী

গণ সংগ্রামের প্রয়োজন।…গান্ধিজী সেই অহিংস সংগ্রামের অবশ্যম্ভাবী নেতা। এই কমিটি তাঁকে পথ প্রদর্শক হতে, নেতৃত্ব গ্রহণ করতে অনুরোধ করছে।…যদি এমন সময় আসে যখন কংগ্রেস আর তার নির্দেশ দিতে পারবে না, তখন প্রত্যেকটি স্বাধীনতা-কামী ভারতীয় সংগ্রামের কঠিন পথে নিজেই নিজের পথ প্রদর্শক হবে, যতদিন না স্বাধীনতা ও মুক্তি আসে…

গান্ধিজী বললেন—আমি আপনাদের নেতৃত্ব গ্রহণ করবো আপনাদের সেনাপতি হিসাবে নয়, পরিচালকও নয়, কেবল আপনাদের সেবক হিসাবে। আমার অন্তর বলছে সমগ্র জগতের বিরুদ্ধে আমাকে লড়তে হবে, একলা দাঁড়াতে হবে। সারা জগৎ আমার পানে চোখ রাঙিয়ে দাঁড়ালেও এগিয়ে যেতে ভয় করলে চলবে না, ভগবানে বিশ্বাস রাখলেই চলবে।…আমি হয়তো বেশীদিন বাঁচবো না, কিন্তু আমি যখন চলে যাব, তখন ভারত স্বাধীন হবে; শুধু ভারতই নয়, সারা জগৎ স্বাধীন হবে। …যদি সারা দুনিয়া আমার বিরুদ্ধে দাঁড়ায়, যদি ভারতের সমস্ত লোক বোঝাবার চেষ্টা করে যে আমি ভুল পথ ধরেছি, তবু আমি সামনের দিকে এগিয়ে যাব,—ভারতের জন্য, সারা জগতের মঙ্গলের জন্য।…বৃটিশ ভারতের উপর সবচেয়ে বেশী অনাচার করেছে, কিন্তু সেজন্য তাদের আমি অন্যায় আঘাত করবো না।… আমরা সকলে ভারতের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করবো। আমি অধৈর্য হয়ে পড়েছি। সকলের স্বাধীনতার জন্য আমরা সংগ্রাম করবো।… মুসলমানেরাও ভারতের লোক, ভারত তাদেরও মাতৃভূমি, তাদের দরজা খোলা আছে, তারাও কংগ্রেসে প্রাধান্য পেতে পারে।… মুসমানদের জন্য হিন্দুদেরও আজ জীবন-পাত করার সময় এসেছে।…গণসংগ্রাম আসছে। আমাদের গোপন কিছু নেই। এ আমাদের প্রকাশ্য অভিযান।… কংগ্রেসকে ধ্বংস করার শক্তি কারুর নেই। আমরা এক বিরাট সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে নাবছি। একে ভুল করলে চলবে না, ভুল বুঝলেও চলবে না। [illegible]র জিন কোন কার্যকলাপ আমাদের নেই, যে গোপনে কিছু করার চেষ্টা করবে, সে ব[illegible] পাবে।

গান্ধিজী কংগ্রেসে পাঁচ দফা কর্মসূচী দিলেন:

১। সংবাদ-পত্রগুলিকে নির্ভীকভাবে সংবাদ পরিবেশন করতে হবে।…সরকারী ঘুষ নিয়ে মাথা নত করা চলবে না, সেজন্য তাঁদের আপিস ও ছাপাখানা বিসর্জন দেবার জন্য প্রস্তুত হতে হবে।

২। সামন্ত রাজাদের আমি শুভানুধ্যায়ী। আমি দেশীয় রাজ্যে জন্মেছি, আমার বাবা ছিলেন এক রাজার দেওয়ান।…আমি চাই সামন্ত রাজারাও এখন দুর্ধর্ষকে

মেনে চলবেন। প্রজাদের উপর দেশ শাসনের দায়িত্ব ছেড়ে দেবেন।...তা যদি তাঁরা না করতে পারেন তাহলে স্বাধীন ভারতে তাঁদের স্থান হবে না। সামন্ত রাজারা তাঁদের স্বেচ্ছাচার ভুলে যান।

৩। এই আন্দোলনে গোপন কিছু থাকবে না, গোপনতা পাপ, গুপ্তভাবে কোন কাজ করা চলবে না।

৪। ছাত্র ও অধ্যাপকেরা সাহস সঞ্চয় করে কংগ্রেসের পাশে এসে দাঁড়াবেন। যদি প্রয়োজন দেখা দেয়,তাদের পেশা ও ভবিষ্যতের সব সম্ভাবনা ছেড়ে আসতে হবে।

৫। সরকারী কর্মচারীদের এখনই চাকরী ছাড়ার প্রয়োজন নেই, তবে তাঁরা যেন গবর্মেন্টকে জানিয়ে দেন যে তাঁরা কংগ্রেসকে সমর্থন করেন।

৮ই আগষ্ট বোম্বাইয়ে নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির সভায় গান্ধিজীর 'ভারত ছাড়ো' প্রস্তাব গৃহীত হোল, এই সম্পর্কে আমেরিকার উদ্দেশ্যে গান্ধিজী বললেন—আমি সত্যের পূজারী, সত্যই আমার ভগবান।...আমি অনুভব করি যে ভগবান আমার দেহের প্রতিটি তন্তুতে বিরাজমান।...সেই সত্যকে সাক্ষী রেখে আমি বলছি যে ভারতকে শৃঙ্খল থেকে মুক্তি দেওয়া বৃটেনের অবশ্য কর্তব্য।...ভারতবাসীর মনে যে অসন্তোষ দেখা দিয়েছে, এই ন্যায় কাজের দ্বারা তা প্রশমিত হবে। অসন্তোষ সদিচ্ছায় রূপান্তরিত হবে। সমস্ত বোমারু বিমান ও রণপোতের চেয়ে তার মূল্য বেশী··আমি জানি কংগ্রেস সম্পর্কে মিথ্যা প্রোপাগাণ্ডা আপনাদের চোখ কাণ বিভ্রান্ত করেছে, আমাকে ধাপ্পাবাজ ও বৃটেনের ছদ্মবেশী শত্রু বলে চিত্রিত করা হয়।...আপনারা শুধু একটি কথা বিচার করবেন, কংগ্রেস যে বিনা সর্তে ভারতের স্বাধীনতা চাইছে সে কি অন্যায়? বলা হয়—'এখন তার সময় নয়,' কিন্তু আমরা বলি 'এখনই সেই সময়।' তাহলেই এ দেশে জাপানী আক্রমণ প্রতিরোধ করা যাবে। মিত্র পক্ষ ও ভারতবাসীর কাছে তার যথেষ্ট মূল্য আছে।...এই মুহূর্তে ভারতের স্বাধীনতাকে স্বীকার করে নেওয়া আমি যথেষ্ট মূল্যবান বলে মনে করি।

আগে থেকে 'ভারত ছাড়ো' প্রস্তাবের একখানি নকল সংগ্রহ করার জন্য ভারত সরকার পাঁচশো টাকা পুরস্কার দিয়েছিলেন, কি করতে হবে তা'ও তারা স্থির করে রেখেছিলেন কংগ্রেস ভারত সরকারের বিরুদ্ধে যে দুঃসাহস নিয়ে দাঁড়িয়েছে ভারত সরকার সে জন্য তার কর্তব্য করতে পিছিয়ে যাবে না।' রাষ্ট্রীয় সমিতি থেকে কোন কংগ্রেসীই আর ঘরে ফিরলেন না; ৯ই আগষ্ট প্রত্যুষেই পুলিশ সবাইকে গ্রেপ্তার করলো। মহাত্মাজীকে নিয়ে যাওয়া হোল আগাখাঁ প্রাসাদে, সঙ্গে রইলেন কস্তুরবা ও মহাদেব দেশাই।

সারা ভারতের বুকে স্বতঃস্ফূর্ত গণবিক্ষোভ দেখা দিল। লোকে রেললাইন উপড়ে ফেললো, টেলিগ্রাফের তার কেটে দিল, পথের মাঝে খানা কেটে রাখলো, থানা ও কাছারি পুড়িয়ে দিল, মদের দোকান তচনচ করে দিল, বৃটিশ শাসন অচল করে তুললো মিলিটারী এসে নির্বিচারে গুলি চালালো, প্লেন থেকে বোমা ফেললো, বাড়ী জ্বালিয়ে দিল, সাধারণের উপর কত যে অত্যাচার করলো, তার সীমা নেই। ছ'মাস পরে বড় লাটের দপ্তর থেকে এক হিসাব বেরুলো তাতে জানা গেল :

নিহত হয়েছে—৯৪০ জন

আহত হয়েছে—১৬৩০ জন

জেলে গেছে—২৬০০০ জন

বিনা বিচারে আটক রাখা হয়েছে—১৮০০০ জন

পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে—৬০,২২৯ জন

শুধু তমলুক মহকুমাতেই পুলিশ পুড়িয়ে দিয়েছিল ১৬৪ খানি গৃহস্থের বাড়ী ও ৩১টি কংগ্রেস কার্যালয়। সারা ভারতে আরো কত বাড়ী পুড়েছিল তার হিসাব নেই।

স্যার রামস্বামী আয়ার এই ব্যাপারে বড়লাটের মন্ত্রীত্ব ছেড়ে দেন, বলেন—আজ এমন কোন শক্তি নেই, বা জাতির এই অগ্রগতিকে রোধ করতে পারে।

গান্ধিজী বড়লাটকে একখানি চিঠি লিখলেন—ভারত সরকার অবস্থাকে সংকট-জনক করে ভুল করছে।···আপনার কাজ আমি যতই অপছন্দ করি না কেন, আমি আপনার বন্ধুই আছি··· ভগবান আপনার পথ প্রদর্শক হোন্।···

বিলাতের পার্লামেণ্টে চার্চিল সাহেব এর উত্তর দিলেন—মিষ্টার গান্ধী মুখে যে অহিংসার বাণী প্রচার করেন কংগ্রেসীদল এখন সে নীতি বর্জন করে প্রত্যক্ষ বিপ্লবে অবতীর্ণ হয়েছে···আমাদের বিরাট বাহিনী ভারতে গিয়ে পৌঁছেছে···বৃটিশ শাসিত ভারতে এতবড় বাহিনী আর কখনও যায় নি···ভারতের এই পরিস্থিতিতে আমাদের হতাশ হবার বা ভয় পাবার কোন কারণ নেই।

গান্ধিজী লিখলেন—বিরুদ্ধে যত কথাই বলা হোক না কেন। আমি তথাপি দাবী করছি যে কংগ্রেস কর্মধারা এখনও অহিংসনীতিতে অচল আছে। যে ধ্বংসমূলক কাজ ঘটছে তার জন্য কংগ্রেসকেই আমি দায়ী করছি। সরকারী কঠোর ব্যবস্থা অসন্তোষ ও তিক্ততা বৃদ্ধি করবে মাত্র।

কেন্দ্রীয় পরিষদের সদস্যেরা গান্ধিজী ও কংগ্রেসকর্মীদের মুক্তি দাবী করলেন।

ক্ষিতীশ নিয়োগী দাবী করলেন—এক অনুসন্ধান কমিটি করে কোন্ পক্ষের দোষ তার মীমাংসা করা হোক।

সিন্ধুর প্রধানমন্ত্রী আল্লাবক্স্ দাবী করলেন—জাতীয় সরকার চাই।

বাংলার রাজস্বমন্ত্রী ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ গান্ধিজীর সংগে দেখা করার অনুমতি না পেয়ে প্রতিবাদে পদত্যাগ করলেন।

চীন দেশ থেকে 'তার' এলো—গান্ধিজীর গ্রেপ্তারের সংবাদ, দাংগা হাংগামা ও রক্তপাতের সংবাদ পেয়ে চীনারা অত্যন্ত দুঃখিত।…ভারতীয় স্বাধীনতা-সংগ্রামের মূল সত্য মিত্র পক্ষের সংগ্রাম নীতির সংগে এক, সেইজন্যই আমরা ভারতের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন।…

দক্ষিণ আফরিকার জেনারেল স্মাট্স্ লণ্ডনে বললেন—গান্ধিজীকে শত্রুপক্ষের লোক বলা নিছক বোকামি। তিনি একজন বিরাট মানুষ। তিনি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষদের একজন—জগতের শ্রেষ্ঠ মহামানব। তিনি মহান আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত।…সেই আদর্শ আমাদের বর্তমান সংকটপূর্ণ পৃথিবীতে কার্যকরী হবে কি না সেই প্রশ্ন উঠতে পারে, কিন্তু মিষ্টার গান্ধী একজন মহান দেশপ্রেমিক, মহামানব, মহান আধ্যাত্মিক নেতা।

আমেরিকায় ইংরাজেরা ভারতের বিরুদ্ধে যে প্রপাগাণ্ডা চালিয়েছিল, তার প্রতিবাদে কলম ধরলেন—লুই ফিশার, এডগার স্নো, লিন-উ-তাং, পার্ল বাক, ও উইণ্ডেল উইল্‌কি।

লুই ফিশার লিখলেন—ভারতের সবচেয়ে বড় ঘটনা হচ্ছে গান্ধিজী।…তিনি জাপান, জর্মানী কি ইতালির পক্ষে নন তিনি বৃটিশের পক্ষে, চীনের পক্ষে, আমেরিকার পক্ষে। তিনি চান আমরা যুদ্ধে জয়ী হই। কিন্তু ভারতবাসীর সহানুভূতি ছাড়া আমরা যুদ্ধে জয়লাভ করবো এ কথা তিনি বিশ্বাস করেন না।…গান্ধিজী দাংগা হাংগামা বা বিশৃঙ্খলা চান না, তিনি এ সব করতে নিষেধ করেন…গান্ধিজী অত্যন্ত ধর্মপ্রবণ ও ক্ষমা করতেই তিনি অভ্যস্ত।

লিন উতাং লিখলেন—গান্ধিজী নিশ্চয়ই মূর্খ কারণ জর্জ ওয়াশিংটনের মত তিনি ইংলণ্ডের শৃঙ্খল থেকে মাতৃভূমিকে মুক্তি করতে চান…গান্ধিজী ও নেহেরু জর্জ ওয়াশিংটন ও ডিভেলেরার মতই দৃঢ়চেতা লোক…আমেরিকা ও আয়ারল্যাণ্ডের উপর অতীতে যে অনাচার করা হয়েছিল ভারতের উপরেও আজ সেই অত্যাচার করা হচ্ছে। গান্ধিজী ও নেহেরু এক বিরাট শক্তিকে উদ্বুদ্ধ করে তুলেছেন…আমরা আজ গ্রীস যুগোস্লাভিয়া ও ফ্রান্সের জন্য লড়ছি, কিন্তু ভারতের স্বাধীনতার প্রতি কি আমরা চোখ বুঁজে থাকতে পারি।…ভারত এখনই স্বাধীনতা চায়, সে স্বাধীনতা না পাওয়া পর্যন্ত তার সংগ্রামের শেষ হবে না।

পার্ল বাক লিখলেন—ভারতের পুরানো রাজনীতির খেলা শেষ হয়েছে, চল্লিশ কোটি লোকের মনে আজ শুভেচ্ছা জাগাতে হবে।

উইণ্ডেল উইল্‌কি লিখলেন—ভারতের আশা আকাঙ্খাকে ভবিষ্যতে সমাধান করার জন্ত একপাশে ঠেলে সরিয়ে দিলে শুধু গ্রেটবৃটেনের ক্ষতি হবে না, আমেরিকারও ক্ষতি হবে।

এই সব জনমতের উত্তরে একটা কিছু বলা প্রয়োজন, সেইজন্ত পার্লামেণ্টে চার্চিল সাহেব বললেন—কংগ্রেস একটি দল মাত্র, এবং ভারতের নয় কোটি মুসলমান, পাঁচ কোটি অস্পৃশ্য এবং সামন্তরাজ্যের ৯ কোটি ৫০ লাখ প্রজা কংগ্রেস বিরোধী··· কংগ্রেসের বিরুদ্ধতা সত্বেও গত দু'মাসে (জুলাই ও আগষ্ট) আমরা যুদ্ধের জন্ত সেদেশে ১লাখ ৪০ হাজার স্বেচ্ছাসেবক পেয়েছি।···কংগ্রেসের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করতে আমাদের মোটেই কষ্ট হয়নি, পাঁচশতেরও কম লোক প্রাণ হারিয়েছে মাত্র এবং সামান্ত সংখ্যক বৃটিশ ফৌজকে এখানে ওখানে ঘোরাতে হয়েছে।···

প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট-সাহেব মিষ্টার উইলিয়ম ফিলিপ্‌সকে পাঠালেন এদেশে, যুদ্ধ পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনা করতে। কিন্তু গান্ধিজী ও জহরলালের সঙ্গে দেখা করার স্থবিধা তিনি পেলেন না।

বিলাত থেকে বৃটিশ সরকার এক বিবৃতি প্রচার করলেন। নিজেদের কাজের একটা কৈফিয়ৎ দিলেন জগৎবাসীর কাছে: এই প্রকাণ্ড বিপ্লবের পরিকল্পনা করেন গান্ধিজী। এ যুদ্ধ বৈদেশিক অধীনতা-পাশ ছিন্ন করার সংগ্রাম, অস্ত্রহীন বিদ্রোহ—সংক্ষিপ্ত, দ্রুত ও স্থনিশ্চিত।···গান্ধিজী চরম পরিস্থিতির জন্ত প্রস্তুত হয়েছেন—যতই ক্ষয়-ক্ষতি হোক না কেন?···এক একস্থানে এই বিপ্লব এমনভাবে প্রকাশ পেয়েছে যে সহসা মানুষ যে এমন উদ্দাম হয়ে উঠতে পারে তা বিশ্বাস করা চলে না।···সর্বত্রই হিন্দু ছাত্রেরা প্রাধান্ত নিয়েছে...মুসলমানেরা কোন অংশই গ্রহণ করেনি···কংগ্রেস সমাজতন্ত্রীদল এতে প্রধান ভূমিকা অভিনয় করেন···দিল্লী থেকে এক প্রচার পুস্তিকা বিলি করা হয়, তাতে লিনলিথগো ও ওয়াভেলকে বন্দী করে ভারতীয় গণতন্ত্র ঘোষণা করার কথা বলা হয়েছে।···ইত্যাদি

আগা খাঁ প্রসাদে গান্ধিজীকে বন্দী করে রাখা হোল। সঙ্গে ছিলেন কস্তুরবা, মহাদেব দেশাই, সরোজিনী নাইডু ও মীরা বেন।

মহাদেব দেশাই তখন অসুস্থ, কিন্তু গবর্মেণ্ট সে অসুস্থতা গ্রাহ্য করলো না, যে মানুষটি কুড়ি বছরেরও বেশী মহাত্মাজীকে একনিষ্ঠ হয়ে সেবা করেছেন, সেক্রেটারী

হিসাবে তিনি মহাত্মাজীর বদলি হন। গবর্মেন্ট তাঁর আবেদনের কথাটা বিচার না করেই উভয়েরই বন্দী করলেন। সাম্রাজ্য রক্ষার দায় থেকে দেশাইজী কিন্তু সাতদিনের মধ্যে গবর্মেন্টকে মুক্তি দিয়ে গেলেন।

মহাদেব হরিভাই দেশাই বোম্বাইয়ে ওকালতি করতেন। চম্পারণ সত্যাগ্রহের সময় তিনি গান্ধিজীর দলে যোগ দেন—একা নয়, সস্ত্রীক। সে ১৯১৮ সালের কথা। মধুবনে গান্ধীজি যখন কিষাণদের অবৈতনিক ইস্কুল খুললেন তখন দেশাইজী ও তাঁর স্ত্রী সেখানে শিক্ষকতা সুরু করলেন। শেঠ ঘনশ্যামদাসও ছিলেন তাঁদের সঙ্গে। শিল্প সাহিত্য ও কাব্যের উপর তাঁর দখল ছিল অসামান্য, অল্পদিনেই তিনি গান্ধিজীর সেক্রেটারীর আসনটি দখল করে বসলেন। ইয়ং ইণ্ডিয়া ও হরিজন পত্রিকার সম্পাদনার ভার পড়লো তাঁর উপর। তাছাড়া সত্যাগ্রহ-আশ্রমের অতিথিশালা থেকে রান্নাঘর অবধি কিছুই তাঁর পরিচর্যা থেকে বাদ যেত না। মহাদেব সব সময়েই ছায়ার মত থাকতেন গান্ধিজীর পাশে পাশে, প্লেটো যেমন ছিলেন সক্রেটিশের কাছে। কিন্তু সেজন্য মহাদেবের ব্যবহারে কোনদিন এতটুকু অহংকার প্রকাশ পায়নি। অসামান্য কর্মক্ষমতা নিয়ে দিনের পর দিন তিনি মহাত্মাজীর সেবা করে গেছেন বিনিময়ে কোনদিন কিছুই চাননি। কারুর বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ করেননি। পরাধীন দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানবের সেবা করে বিদেশীর বন্দীশালায় তিনি নিজেকে নিঃশেষ করে দিলেন।—জাতির পরাধীনতার প্রায়শ্চিত্ত করে গেলেন।

তাঁর শেষ দিন সম্পর্কে গান্ধিজী লিখেছেন :

মহাদেবের আকস্মিক মৃত্যু হয়েছে। পূর্বে কিছুই বুঝা যায় নাই। গত রাত্রে শান্তিতে নিদ্রা গিয়েছিল। প্রাতরাশ গ্রহণ করেছিল। আমার সঙ্গে ভ্রমণও করেছিল। সুশীলা ও জেলের ডাক্তাররা যথাসাধ্য করেছিলেন, কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছা অন্যরূপ। সুশীলা ও আমি দেহস্নান করিয়েছি। প্রশান্ত দেহ পুষ্পাচ্ছাদিত, ধূপাগ্নি প্রজ্জলিত। সুশীলা ও আমি গীতা পাঠ করছি। মহাদেব যোগী ও স্বদেশ প্রেমিকের মৃত্যু বরণ করেছে। দুর্গা, বাবলা ও সুশীলাকে [মহাদেবের পত্নী, পুত্র, কন্যা] বলো—কোন শোক চলবে না। এমন মহান মৃত্যুতে শুধুই আনন্দ। আমার সামনেই দাহের ব্যবস্থা হয়েছে। চিতাভস্ম রাখবো। দুর্গাকে আশ্রমেই থাকতে বলো, কিন্তু স্বজনদের সঙ্গে দেখা করতে হলে সে যেতে পারে। আশা করি বাবলা সাহসীর মত মহাদেবের যোগ্যস্থান পূরণ করার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করবে।

কিন্তু এই সংবাদটুকুও ইংরাজ সরকার যথাসময় মহাদেবের পরিবারবর্গের কাছে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করেনি।

বন্দী-বাড়ীর প্রাঙ্গণে মহাদেবের দেহভস্ম সমাধি হয়। প্রতিদিন সকালে মহাত্মাজী সেখানে এসে দাঁড়াতেন। প্রভাতী সূর্যের [illegible] আলোকে প্রিয় অনুচরটির মৌনভাষাকে হয়তো অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করতে চাইতেন, বিয়োগব্যথা মনের মাঝে উজ্জ্বল হয়ে উঠে আঁখিজলে ফুটে উঠতে চাইত কি না কে জানে!

কিন্তু চল্লিশ কোটি আর্ত নরনারীর স্বাধীনতার যিনি পুরোধা, ব্যক্তিগত শোক দুঃখের অনুভূতি রাখলে তো তাঁর চলবে না।

গান্ধিজী বন্দীনিবাসে। ভারতের সমস্ত স্বদেশ-প্রেমিকেরা কারা-প্রাচীরের অন্তরালে। ভারত সরকার এবার ধীরে সুস্থে এক বিবৃতি তৈরী করলেন। ভারত-সরকারের স্বায়ত্ত-শাসন বিভাগের অতিরিক্ত সেক্রেটারী স্যার রিচার্ড টটেনহাম্ এক পুস্তিকা প্রকাশ করলেন—'হাঙ্গামা সম্পর্কে কংগ্রেসের দায়িত্ব'। তাতে তিনি গান্ধিজী ও কংগ্রেস নেতৃবৃন্দকে সব কিছুর জন্যই দায়ী করলেন। গান্ধিজী তার দীর্ঘ উত্তর দেন, এবং টটেনহামের সমস্ত যুক্তিকে খণ্ডন করেন। ভারতীয় আন্দোলনকে গান্ধিজী কিভাবে পরিচালিত করতে চান তা এই উত্তর থেকেই ভালভাবে জানা যায়।

গান্ধিজী তখন অনশন করছেন—জীবনের আশা নেই, তথাপি সরকার তাঁকে মুক্তি দিলনা, উপরন্তু সেই সময় নিজেদের দোষ স্খালনের জন্য সরকার পক্ষ এই বিবৃতি প্রচার করেন। মহাত্মাজী সেই উপবাসে দেহত্যাগ করলে এই বিবৃতির উত্তর দেবার কেউ থাকতো না, কিন্তু বিশ্বনিয়ন্তার ইচ্ছা ছিল ভিন্ন, সেইজন্য উপবাস শেষ করে উত্তর দেবার সুযোগ গান্ধিজী পেলেন। গান্ধিজী লিখলেন:

…যে দলিলের লক্ষ্যবস্তু আমি, সেটি প্রকাশের জন্য আমার উপবাসের কালকে নির্বাচিত করা হোল কেন বলতে পারেন?…অভিযোগ পত্রের আরম্ভ হয়েছে মিথ্যা বর্ণনার সহিত।…বৃটিশ গবর্মেণ্টের প্রতিটি কাজের সম্বন্ধে ঠিক কথাই বলা হয়েছে, যে তা' তার স্বীয় স্বার্থ ও নিরপত্তার জন্য। যৌথ সাধারণ স্বার্থ বলে কিছু নাই… জাতীয় প্রাধান্য পাপের বদলে পুণ্য বলে বিবেচিত হচ্ছে। শুধু ভারতবর্ষে একথা সত্য নয়, একথা সমভাবে সত্য আফরিকায়, একথা সত্য ব্রহ্মে ও সিংহলে।…এই কড়া রোগের দাওয়াইও কড়া হওয়া উচিত। দাওয়াই আমি নির্দেশ করেছি—অন্ততঃ ভারত থেকে আর যথোচিতভাবে সমস্ত ইউরোপীয় স্থানাধিকার থেকে অবিলম্বে সমস্ত বৃটিশের প্রস্থান। বৃটিশ জনগণের এইটাই হবে সর্বাপেক্ষা বীরোচিত ও পরিষ্কার কাজ। এতে অবিলম্বে মিত্রশক্তি সম্পূর্ণ নৈতিক শক্তির উপর দণ্ডায়মান হবে। ভারতে বৃটিশ উপস্থিতিই জাপানকে ভারত আক্রমণের নিমন্ত্রণ জানাচ্ছে।…প্রত্যাহার

যা পরিত্যাগ করার মত কিছুই আমার নেই। সে সময় আমি যেমন বৃটিশ জাতির বন্ধু ছিলাম, আজও তাই আছি। তাদের প্রতি এক কণা বিদ্বেষও আমার নেই। কিন্তু তাদের সীমা পরিসীমা সম্বন্ধে আমি কোনকালেও অন্ধ থাকি নাই, যেমন অন্ধ হইনি তাদের মহান গুণাবলি সম্বন্ধে।…বৃটিশ জনগণের সহিত ভারতবর্ষের কোন বিবাদ নেই। আমার শত শত বৃটিশ বন্ধু আছেন। এগুরুজের বন্ধুত্বই বৃটিশ জনগণের সহিত আমাকে একত্র বন্ধন করার পক্ষে যথেষ্ট।…আমি তো ফ্যাসিস্ত-নাৎসি শক্তি ও মিত্রশক্তির মধ্যে কোন পার্থক্যই দেখি না। ওরা সবাই-ই শোষণ করে, সবাই-ই তাদের স্বার্থ অর্জনের জন্য প্রয়োজনমত নিষ্ঠুরতার আশ্রয় নেয়। আমেরিকা ও বৃটেন অতি মহান জাতি কিন্তু তাদের মহত্ব আফরিকা ও এশিয়ার নির্বাক মানবতার রুদ্ধদ্বারের সম্মুখে ধূলির মত পড়ে থাকবে। শুধু তাদেরই (বৃটেন ও আমেরিকা) অন্যায়ের প্রতিকার করার শক্তি আছে। কলংকমুক্ত না হওয়া পর্যন্ত মানব স্বাধীনতা বা অন্য কিছু সম্বন্ধে কিছু বলার অধিকার তাদের থাকতে পারে না। …বিশ্বের শান্তির জন্য, চীন রাশিয়ার জন্য, মিত্রশক্তির কারণের জন্য, ভারতবর্ষস্থ বৃটিশ শক্তির আজই চলে যাওয়া উচিত।…মিত্রশক্তি আজ এক বিরাট শবের ভার বহন করছে।—অবসাদ জড়ত্ব নিয়ে এক বিরাট জাতি পড়ে আছে বৃটেনের পদতলে। শুধু বৃটেন নয়, আমি বলবো মিত্রশক্তির পদতলে।…মিত্রশক্তির সম্বন্ধে যতদিন পর্যন্ত দুটি পাপ চেপে থাকবে, একটি পাপ হচ্ছে ভারতের পরাধীনতা, অপরটি হচ্ছে নিগ্রো ও আফরিকার জাতিগুলির দাসত্ব—ততদিন পর্যন্ত তাদের সংগ্রামের নৈতিক কারণ থাকতে পারেনা। আমি অনেক অপেক্ষা করেছি আর অপেক্ষা করতে পারি না। এই যুদ্ধে চল্লিশ কোটি নরনারীর কোন বক্তব্য থাকবে না, এটি অতি দুঃখকরই ব্যাপার। আমাদের কর্তব্য সমাধা করার জন্য যদি আমরা স্বাধীনতা পাই তাহলে জাপানের অগ্রগতি রোধ করে চীনকে আমরা রক্ষা করতে পারি। যে মুহূর্তে আমরা স্বাধীন হব, সেই মুহূর্তেই আমরা এমন এক জাতিতে রূপান্তরিত হব, যে জাতি তার স্বাধীনতার প্রতিদান দেবে এবং সমস্ত শক্তি দ্বারা মিত্রশক্তির কারণের সহায়তা করবে।…হরিজনের স্তম্ভে আমি একাধিকবার এই অভিমত প্রকাশ করেছি।…আমার নিবেদন ভারতে বৃটিশ শক্তি অবসান হোক।…এখন ভারতভূমি তো ক্রীতদাসমাত্র।…বৃটিশরা যদি একে (আমার আন্দোলনকে) ভুল বুঝে আর তাদের হাবভাবে যদি প্রকাশ পায় যে তারা একে ধ্বংস করতে চায় তবে ফলাফলের দায়িত্ব তাদেরই, আমার নয়। কাল যে মুহূর্তে ভারত স্বাধীন হবে সেই মুহূর্তেই বৃটেন নৈতিক শক্তি লাভ করবে আর লাভ করবে নৈতিক বলে বলীয়ান

এক স্বাধীন জাতির শক্তিমান মৈত্রী। ইহা ইংলণ্ডের শক্তিকে সর্বোচ্চ ডিগ্রীতে তুলে দেবে।...আজ ভারতবাসীর মধ্যে জীবনের অস্তিত্ব নেই। তাদের মধ্য হতে উহা নিংড়ে বের করা হয়েছে। তাদের দৃষ্টিতে যদি দীপ্তি আনতে হয়, স্বাধীনতাকে তবে কাল নয় আজই আসতে হবে। কংগ্রেস তাই অবশ্যই অংগীকার করবে করেংগে ইয়া মরেংগে।...অহিংস-নীতি অর্থাৎ প্রতিশোধবিহীন আত্মনিগ্রহ ও স্বার্থত্যাগই হোল আন্দোলনের সন্ধানী প্রস্তাব।...৮ই আগষ্ট নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সভায় হিন্দুস্থানী বক্তৃতায় আমি বলেছিলাম—কিছুই গোপনভাবে করা হবে না। ইহা প্রকাশ্য বিদ্রোহ। এ সংগ্রামে গোপনতা পাপ। স্বাধীন ব্যক্তি গোপন আন্দোলনে জড়িত থাকবে না।...এই বর্তমান সংগ্রামে আমাদের প্রকাশ্যে কাজ করতে হবে এবং পলায়ন না করে গুলির আঘাত বুক পেতে গ্রহণ করতে হবে। এই ধরণের সংগ্রামে সমস্ত গোপনতাই পাপ, অতি নিয়ম-নিষ্ঠভাবে তা অবশ্য বর্জন করতে হবে।—যে ব্যক্তি গোপনতা পাপ বলে বর্জন করছে তাকে সেই অপরাধে অপরাধী করা, বিশেষ করে যখন সেই অভিযোগের কোন প্রমাণ নেই, কিছুটা কঠোর।...জয়লাভ করলেও প্রমাণিত হবে না, যে আপনারাই ঠিক পথে ছিলেন; শুধু প্রমাণ হবে আপনাদের ধ্বংসের শক্তি ছিল বৃহত্তর। একথা স্পষ্টতঃ মিত্রশক্তিবৃন্দের পরেও প্রযুজ্য, যদি না তারা এশিয়া ও আফরিকায় অপর সমস্ত পরাধীন জনগণকে স্বাধীন করবার আন্তরিকতা ও প্রতিশ্রুতি স্বরূপ এই মুহূর্তেই ভারতকে মুক্তি দিবার যথার্থ ন্যায়োচিত কাজ সম্পন্ন করে।...আমার ধারণার সংক্ষিপ্ত সার:

১। আমার ধারণা শুধুমাত্র অহিংসাই ভারতবর্ষকে রক্ষা করতে সক্ষম, শুধু জাপানের বিরুদ্ধেই নয়, সমগ্র পৃথিবীর বিরুদ্ধেও।

২। আমার ধারণা বৃটেন ভারত রক্ষা করতে অক্ষম। সে আজ ভারতকে রক্ষা করছে না, সে রক্ষা করছে নিজেকে আর ভারত ও অন্যান্যস্থানের স্বার্থাবলীকে। এগুলি প্রায়ই ভারতীয় স্বার্থের পরিপন্থী।

৩। 'ভারত ছাড়ো' প্রস্তাবের অভিপ্রায় ছিল পরিণামে বৃটিশ শক্তির প্রস্থান, আর সম্ভব হলে সংগে সংগেই সমস্ত প্রধান দলগুলির প্রতিনিধি সহ এক অস্থায়ী গবর্ণমেণ্ট গঠন। প্রস্থানটা যদি গড়ি-মসির সহিত হয় তবে অরাজক কালের উদ্ভব হবে।

৪। ভারতের সৈন্যবাহিনী বৃটিশের সৃষ্টি বলে স্বভাবতই ভেঙে দেওয়া হবে—যদি না এটা মিত্রবাহিনীর অংশরূপে গঠিত হয় অথবা স্বাধীন ভারত সরকারের নিকট আনুগত্য প্রদান করে।

৫। মিত্রশক্তি ও স্বাধীন ভারত গবর্মেণ্টের মীমাংসিত সর্তে মিত্রবাহিনী অবস্থান করবে।

৬। ভারতবর্ষ স্বাধীন হলে স্বাধীন গবর্মেণ্ট তার সাধ্যমত সামরিক সাহায্য প্রদান করে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবে। কিন্তু ভারতের দীর্ঘতম অংশে—যেখানে কোনরূপ সামরিক প্রচেষ্টা সম্ভব নয়—সেখানে জনসমবায় কর্তৃক চরম উৎসাহ-উদ্দীপনার সহিত অহিংস কর্মপন্থা গৃহীত হবে। ··· কংগ্রেসের প্রস্তাবে আছে—

···ভারতের স্বাধীনতা ঘোষিত হ'লে এক অস্থায়ী গবর্মেণ্ট গঠিত হবে এবং স্বাধীন ভারত সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের অন্যতম মিত্র হবে।···ভারতীয় জনসাধারণের সমস্ত শ্রেণীর প্রতিনিধিমূলক এক মিশ্র গবর্মেণ্ট হবে। এর প্রাথমিক কাজ হবে মিত্রশক্তির সহিত একত্রভাবে স্বীয় সশস্ত্র এবং অহিংস শক্তির সাহায্যে ভারতবর্ষ রক্ষা ও আক্রমণ প্রতিরোধ করা এবং যাদের কাছে সমস্ত শক্তি ও ক্ষমতা থাকবেই সেই কৃষিক্ষেত্র, কারখানা ও অন্যাংশে স্থিত কর্মীদের কুশল ও প্রগতি বর্ধন করা।···আর গণপরিষদে ভারত গবর্মেণ্টের জন্য জনসাধারণের সমস্ত শক্তির গ্রহণযোগ্য এক শাসন-পদ্ধতি রচনা করবে। প্রদেশগুলির হাতে সর্বোচ্চ স্বায়ত্তাধিকার ও অবশিষ্ট ক্ষমতা ন্যস্ত থাকবে।···গণসংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়ে শুধুমাত্র নিজের জন্যই ক্ষমতা আহরণ করার কোন অভিপ্রায় কংগ্রেসের নেই। ক্ষমতা যখন আসবে তখন তা অবশ্যই ভারতের সমগ্র জনগণের মধ্যে আসবে।···ভারতবর্ষের সর্বশক্তিমান গবর্মেণ্টের মুসলীম লীগের পক্ষ-তলে আশ্রয় নওয়া নিন্দাজনক। এতে সেই পুরাণো সাম্রাজ্যবাদী মন্ত্র—'বিভাগ করে শাসন করার' উগ্র গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। লীগ কংগ্রেস অনৈক্যটা খাঁটি ঘরোয়া প্রশ্ন। উহা যদি শীঘ্র অন্তর্হিত না-ও হয় তবে বিদেশী প্রভুত্বের অবসান হলে নিশ্চিতরূপে অন্তর্হিত হবে।···বুয়র যুদ্ধ ও গত মহাসমরের সময় আমি 'ভালো ছেলে' ছিলাম, কারণ বৃটিশ গবর্মেণ্টের ইচ্ছার সহিত আমার কাজের সংগতি ছিল, আজ আমি দুষ্ট শত্রু। আমি যে বদলে গেছি তা এর কারণ নয়। এর কারণ···বৃটিশ গবর্মেণ্টকে ত্রুটি গ্রস্ত দেখা যাচ্ছে। বৃটিশের শুভেচ্ছায় আমি বিশ্বাস করেছিলাম বলেই পূর্বে সাহায্য করেছিলাম। আজ আমাকে বাধা দিতে দেখতে পাওয়ার কারণ বৃটিশ গবর্মেণ্টের উপর স্থাপিত বিশ্বাস অনুযায়ী কাজ করতে তাঁরা অনিচ্ছুক।···আমার এই উত্তর হয়তো কর্কশ লাগবে, কিন্তু ইহাই সত্য, সমগ্রভাবে সত্য,—ঈশ্বর যে সত্য আমাকে দেখতে দেন সেই সত্য ছাড়া আর কিছু নয়।

···আমার সামনে কুড়িটি আইন অমান্য আন্দোলনের তালিকা রয়েছে, দক্ষিণ আফরিকার সেই প্রথমটা হতে এই তালিকার সুরু। যেগুলিতে জনসাধারণের

উন্মত্ততার বাঁধ ভেঙে গিয়ে পরিণামে দুঃখজনক হত্যাকাণ্ডের সংঘটন হয়েছে সেই উদাহরণগুলিও আমার স্মরণে আছে। যে দেশ ভূমিখণ্ডের দিক্ থেকে রাশিয়া-বিহীন ইউরোপের মত বৃহৎ এবং জনসংখ্যার দিক থেকে বৃহত্তর তার বিপুল আকৃতির অনুপাতে হিংসাকার্যের এই উদাহরণগুলি অবশ্য মন্দ হলেও মক্ষিকা দংশনের সমান মাত্র। গোপনভাবে অথবা প্রকাশ্যে হিংসাই যদি কংগ্রেসের নীতি হোত, অথবা তার শৃঙ্খলা কম কঠিনতর হোত, তাহলে উপলব্ধি করা সহজ যে ওই হিংসাকার্য মক্ষিকাদংশনের পরিবর্তে আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের সমান হোত। কিন্তু যতবার যখনই এরূপ দুর্ঘটনা ঘটে, ততবার তখনই সমগ্র কংগ্রেস-সংগঠন কর্তৃক সেগুলির সঙ্গে বুঝাপড়া করবার জন্য পূর্ণোদ্যমে ব্যবস্থা করা হয়। কয়েকটি ক্ষেত্রে আমি নিজেই উপবাসের আশ্রয় নিয়েছি। তাতে জনগণের মনে হিতকর ফল প্রসব করেছে। আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই যে গবর্মেণ্ট যদি সরাসরি কাজের দ্বারা অনাবশ্যকভাবে জনসাধারণের ধৈর্যের বাঁধ না ভেঙে ফেলতেন তাহলে কোন হিংসা কাজের সংঘটন হোত না।··· অহিংসা কোন মঠমন্দিরের ধর্ম নয়, শান্তি ও চরম মোক্ষের জন্যও তা পালনীয় নয়। অহিংসা হোল মনুষ্যত্বের সকল মর্যাদার সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে সমাজের বেঁচে থাকার জন্য ও যে শান্তির জন্য সমাজ অতীত বহুযুগ ধরে ব্যাকুল হয়ে আছে তা লাভের উদ্দেশ্যে প্রগতির পথে অগ্রসর হবার জন্য এক সামাজিক আচার-বিধি। তাই একথা ভাবলে দুঃখ হয় যে পৃথিবীর এক অতি শক্তিমান গবর্মেণ্ট এই মতবাদকে খাটো করে এর উপাসকদের (তারা যতই অসম্পূর্ণ হোক) অকর্মক করে দিয়েছে।

নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটিতে ৭ই আগষ্ট আমি বলেছিলাম :···

'আমি যা করেছি ও বলেছি তার মধ্যে একেবারে খাঁটি অহিংসা ছাড়া আর কিছু নেই। ওয়ার্কিং কমিটির খসড়া প্রস্তাব অহিংসার উপর প্রতিষ্ঠিত, প্রস্তাবিত আন্দোলনেরও মূল অনুরূপ অহিংসায়। তাই আপনাদের মধ্যে যদি এমন কেউ থাকেন, যিনি অহিংসায় আস্থাহীন বা ধৈর্যরহিত, তাহলে তিনি এই প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দিতে বিরত থাকুন।···আমাকে এখনই কাজ করতে হবে।···আমি দ্বিধা করবো না বা শুধু মাত্র চেয়ে থাকবো না···ইহা আমার ক্ষমতা অধিকারের জন্য আন্দোলন নয়, ইহা ভারতের স্বাধীনতার জন্য খাঁটি অহিংস সংগ্রাম।···স্বাধীনতার অহিংস সৈনিক নিজের জন্য কিছুই আকাঙ্খা করে না, সে শুধু তার দেশের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করে। স্বাধীনতা এলে কে দেশ শাসন করবে তা নিয়ে কংগ্রেসের দুশ্চিন্তা নেই। ক্ষমতা যখন আসবে তখন তা জনগণের অধিকারেই আসবে এবং তারাই স্থির

করবে কার নিকট উহা ন্যস্ত করা যায়।…আমার বিশ্বাস পৃথিবীর ইতিহাসে আমাদের অপেক্ষা বেশী সত্যকার গণতান্ত্রিক সংগ্রাম হয়নি।…অহিংসা প্রতিষ্ঠিত গণতন্ত্রে সকলের জন্যই সমান অধিকার থাকবে।'

বড়লাট, দীনবন্ধু এণ্ডরুজ ও কলিকাতার মেট্রোপলিটানকে আমি বলেছিলাম—

'আমার ভিতরের যাহা আমাকে কখনও প্রতারিত করে নাই, তা আমাকে বলছে সারা জগৎ বিরুদ্ধে দাঁড়ালেও আমাকে সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে।…

১০ই আগষ্টের বক্তৃতায় আমি বলি অহিংসা ব্যতীত সত্যিকারের স্বাধীনতা আসতে পারে না…আমার জীবনতরীর কর্ণধার এই মূলগত বিশ্বাস ও ইহাই আমাকে আশা দেয় যে সমগ্র ভারতবর্ষ আসন্ন সংগ্রামে অহিংসার নীতি বজায় রাখবে। যদি দেখা যায় আমার বিশ্বাস ভ্রান্ত তবুও আমি পশ্চাদপদ হব না বা বিশ্বাস পরিহার করবো না। শুধু বলবো—এখনও পাঠশিক্ষা সম্পূর্ণ হয়নি। আবার আমাকে চেষ্টা করতে হবে। সত্যাগ্রহের মধ্যে জুয়াচুরী বা মিথ্যার স্থান নেই। জুয়াচুরী ও মিথ্যাচার পৃথিবীতে চুপি চুপি পা ফেলে আসছে। এরূপ পরিস্থিতির অসহায় দর্শক হতে আমি পারি না। আমি সমগ্র ভারতবর্ষ পর্যটন করেছি।…দেশের কোটি কোটি মূক মানুষ আমার মধ্যে তাদের বন্ধু ও প্রতিনিধিকে দেখেছে। আর আমিও নিজেকে তাদের সঙ্গে অভিন্ন করে দিয়েছি। তাদের চোখে আমি যে বিশ্বাসের দীপ্তি দেখেছি তা আমি অসত্য ও হিংসার উপর প্রতিষ্ঠিত এই সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধে উত্তম সংস্থানে পরিবর্তিত করতে চাই। আমাদের উপর সাম্রাজ্যের নিয়ন্ত্রণ যতই হোক না কেন, এ থেকে আমাদের মুক্তি পেতেই হবে।…সমগ্র পৃথিবী বিশাল আগুনে ছেয়ে যাচ্ছে, আজ যদি এর মধ্যে চুপ করে নিক্রিয় হয়ে বসে থাকি তবে ঈশ্বর আমাকে যে সম্পদ দিয়েছেন তার ব্যবহার না করার জন্য তিরস্কার করবেন।…পরিস্থিতি এখন অসহ্য হয়ে উঠেছে আর কংগ্রেসের ইহা ছাড়া অন্য কোন পথ নেই।…রাত্রির অবসানে যেমন দিন আসে ঠিক তেমনি বিদেশী প্রভুত্বের অবসানে সাম্প্রদায়িক ঐক্য আসবে। যদি চল্লিশ কোটি জনসাধারণ স্বাধীন হয় তবে নিপীড়িত মানব সমাজের অন্যান্য অংশও স্বাধীন হবে। আর মিত্র-জাতি-বৃন্দ স্বভাবতঃই এই স্বাধীনতার স্বার্থবাহক হওয়ার দরুণ বিশ্বের নৈতিক ও অবৈতনিক নেতৃত্ব আপনা থেকেই তাদের কাছে এসে উপস্থিত হবে।…আমার বা কংগ্রেস নেতাদের দ্বারা হিংসাকার্য কখনো বিবেচিত হয় নাই, আমি ঘোষণা করেছিলাম যে, যদি কংগ্রেসীরা হিংসার মধ্যে উন্মত্ত থাকে তাহলে তারা আমাকে তাদের মধ্যে জীবিত দেখতে পাবে না, গণ-আন্দোলন আমার দ্বারা কখনো আরম্ভই হয়নি—শুধু ইহা আরম্ভ করবার সমস্ত ভার আমার উপর ন্যস্ত ছিল, গবর্ণমেণ্টের সাহত আলাপ

ালোচনার কথা চিন্তা করেছিলাম। আলোচনা ব্যর্থ হলে তখনই আন্দোলন রবার কথা ছিল, আর আলোচনার জন্য দুই বা তিন সপ্তাহ অন্তবর্তীকালের থা ভেবেছিলাম—তাই ইহা সুস্পষ্ট যে গ্রেপ্তারাদি না হলে এরূপ গোলযোগ াতো না, বিগত ৯ই আগষ্ট ও পরে যেমন ঘটেছিল…কংগ্রেসী ও অকংগ্রেসী যে ানো জনসাধারণেরই হিংসাকার্য নেতাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই সাধিত হয়েছিল।… াধীনতাকে ধোঁকা দেওয়া হয়েছে। কখনো হিন্দু মুসলিম অনৈক্য, কখনো াজন্যবর্গের প্রতি অংগীকার, কখনো তপশিলভুক্ত জাতির স্বার্থ, কখনো ইউরোপীয়দের ায়েমী স্বার্থ, স্বাধীনতার দ্বার রুদ্ধ করেছে। বিভাগ যার শাসন—সে শেষহীন উৎস। ই আগষ্টের রাত্রি পর্যন্ত কংগ্রেসের সক্রিয়তা প্রস্তাবাদির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। ই-এর প্রত্যূষ কংগ্রেসকে কারারুদ্ধ দেখলো। তারপর যা ঘটলো তা সরাসরি বর্মেন্টেরই কাজের ফল…আমি একথা বলতে সাহস করবই যে, গবর্মেন্ট যদি ারতব্যাপী কংগ্রেস-কর্মীদের কারা রুদ্ধ করার পরিবর্তে তাদের সেবার সুযোগ দিতেন াহলে ওই অভাব (ভারতবর্ষের অধিবাসীদের খাদ্য বস্ত্র ও জীবনের অন্যান্য াবশ্যকীয় অভাব) একেবারে নিবারিত করা না গেলেও অনেক লঘু করা যেত।… ামার নিবেদন…রাজবন্দীদের মুক্তি দিয়ে মুক্তির পরে যারা অপরাধ সম্পাদন বা ধ্বংস মূলক কাজে ধরা পড়বে তাদের বিচার করাই তাদের উচিত। তাঁদের অসীম ক্ষমতা সংগে নিয়ে অপ্রতিপালনীয় অভিযোগের আশ্রয় লওয়ার প্রয়োজন নেই।… ারিশেষে আমি যদি কোথাও ভুল করে থাকি এবং আমার ভুল যদি আমাকে দেখিয়ে দওয়া হয়, আমি সানন্দে নিজেকে সংশোধন করবো। আমি যা বোধ করেছি, তাই ারলভাবে লিখে গেছি।

টটেনহ্যাম এর উত্তর দিল—আলোচ্য পুস্তিকাটি জনসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশিত হয়েছে, আপনাকে সংশয়যুক্ত করা বা আপনার নিকট থেকে যুক্তি তর্ক বের করে আনার উদ্দেশ্যে নয়…আপনার সহানুভূতি কোথায় তা সুস্পষ্ট।…আপনার বন্দীত্বের কারণের পরিবর্তন নাহলে গবর্মেন্ট আপনাকে জনসাধারণের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের সুবিধা প্রদান করতে প্রস্তুত নন।…

গান্ধিজী লিখলেন—আমার প্রত্যুত্তরের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়েছে,…আমার নির্দোষিতা গবর্মেন্টকে বিশ্বাস করাতে পারা যায় নি। …অভিযোগগুলিকে যে শুধু সবগুলি একসংগে অস্বীকার করেছি তা নয়, পক্ষান্তরে গবর্মেন্টের বিরুদ্ধেও পাল্টা অভিযোগ এনেছি। এই হেতু আমি মনে করি উভয় পক্ষের অভিযোগ একটি নিরপেক্ষ বিচার-পরিষদের নিকট উপস্থাপিত করার ব্যাপারে তাঁদের সম্মত হওয়া উচিত।…

কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী ক্ষমতামত্তের কাছ থেকে সত্য ও ন্যায়ের যোগ্য মূল্য কোনদিনই পাওয়া যায় না।

মহাত্মাজীকে বন্দী করার পর বিশ্বের চিন্তাশীল মণীষীরা যেভাবে তাঁদের মতামত ব্যক্ত করেন তাতে আত্মদোষ ক্ষালনের জন্য ভারত সরকার কংগ্রেসের বিরুদ্ধে নানান অভিযোগ তোলে। সংবাদপত্রে সেই সব অভিযোগ পড়ে গান্ধিজী বড়লাটকে লেখেন —ঘোষিত লক্ষ্য ভারত গবর্ণমেণ্ট ও আমাদের একই।...ভারত গবর্ণমেণ্ট মনে করেন এই লক্ষ্যের জয়লাভের জন্য ভারতের স্বাধীনতার প্রয়োজন নেই। আমি ঠিক বিপরীতটাই ভাবি।...আমি নিজেকে ছ'মাসের সময় দিয়েছিলাম! সময়টা শেষ হয়ে এসেছে। আমার ধৈর্যের অবস্থাও তাই। কিন্তু আমি জানি সত্যাগ্রহের নীতি এই সব পরীক্ষার মুহূর্তে প্রতিকার নির্ধারণ করে। এক কথায় ইহা 'উপবাসের দ্বারা দেহ ক্রুশবিদ্ধ করা'। আবার ওই একই নীতি শেষের আশ্রয় ছাড়া অন্য কোনো ভাবে এর ব্যবহার নিষেধ করে। এড়াতে পারলে আমি ইহা নিতে চাইনা।...বেদনার শান্তি-কর ঔষধ না পেলে আমি সত্যাগ্রহীর জন্য নির্দিষ্ট নীতি অর্থাৎ সামর্থ অনুযায়ী উপবাসের আশ্রয় নিতে বাধ্য হব। ৯ই ফেব্রুয়ারীর প্রাত্যূষিক প্রাতরাশের পর শুরু হয়ে ২রা মার্চের প্রাতে উহা শেষ হবে। সাধারণতঃ উপবাসের সময় আমি লবণসহ জল গ্রহণ করি। কিন্তু ইদানীং আমার পদ্ধতিতে জল নিষিদ্ধ। এইবার তাই জল পানযোগ্য করবার জন্য লেবুর রস মেশাবার প্রস্তাব করছি। কারণ আমৃত্যু অনশন করার পরিবর্তে ঈশ্বর করেন তো পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়াই আমার ইচ্ছা। গবর্ণমেণ্ট সাহায্যাদির ব্যবস্থা করলে উপবাস আরো শীঘ্র শেষ হতে পারে।...এক শক্তিশালী গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি আপনি ও এক নগণ্য ব্যক্তি আমি—আমাদের মধ্যে কে দেশ ও মানবতার সেবা করবার প্রয়াস পেয়েছে, ভাবীকালের মানুষ ভবিষ্যতের মধ্য দিয়াই তা নির্ণয় করবে।

টটেনহ্যাম তার উত্তরে জানালো—যদি আপনি বন্দী অবস্থায় উপবাস করতে চান তো সম্পূর্ণ নিজের দায়িত্বে ও নিজের ঝুঁকিতে তা করতে পারেন।...

গান্ধিজী অনশন সুরু করলেন। কাছে ছিলেন কস্তুরবা, সরোজিনী নাইডু ও মীরা বেন। ডাক্তার গিল্ডার ছিলেন য়েরোড়া জেলে, তাঁকে নিয়ে আসা হোল পুনার বন্দীবাসে।

বাহিরে যখন খবর গিয়ে পৌছালো, তখন গান্ধিজীর স্বাস্থ্য খারাপের দিকে যেতে সুরু করেছে—বমির ভাব, রাত্রে ঘুম নেই। ক্রমে অস্থিরতা আরো বেড়ে গেল,

ন্তু যে জলটুকু তিনি পান করতেন, তাতেও কষ্ট হতে লাগলো। চারিদিক থেকে
ারেরা ছুটে গেলেন—কলিকাতা থেকে ডাক্তার বিধান চন্দ্র রায়, ডাক্তার সুশীলা
ার, বোম্বাই থেকে সার্জেন জেনারেল মেজর জেনারেল ক্যাণ্ডি। নাক, কান, গলার
শেষজ্ঞ এসে গান্ধিজীকে পরীক্ষা করলেন। সারা ভারতের জনগণের উৎকণ্ঠা শান্ত
ার জন্য সকাল বিকালে ছ'জন ডাক্তারের স্বাক্ষর দিয়ে গান্ধিজীর স্বাস্থ্য-সংবাদ
ষণা করার ব্যবস্থা হোল,—ডাক্তার গিলডার, মেজর জেনারেল ক্যাণ্ডি, ডাক্তার
ানচন্দ্র রায়, লেফটেন্যাণ্ট কর্ণেল ভাণ্ডারী, ডাক্তার সুশীলা নায়ার, লেফটেন্যাণ্ট
র্ণেল শা। বোম্বাই সরকারের উপদেষ্টা ব্রিষ্টো সাহেব এলেন গান্ধিজীর অবস্থাটা
চক্ষু দেখবার জন্য।

২১শে ফেব্রুয়ারী গান্ধিজীর অবস্থা অত্যন্ত কাহিল হয়ে উঠলো। বেলা ৪টার সময়
নি মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লেন। ধমনীর গতি অনুভব করা যায় না।

পরদিনও অবস্থা বিশেষ ভালর দিকে গেল না, ইউরিমিয়ার ভাব দেখা গেল।
ার বুঝি গান্ধিজী আর বাঁচেন না। সারা ভারত থম্‌থম্ করতে লাগলো, বড়লাটের
বার থেকে তিনজন মন্ত্রী পদত্যাগ করলেন—হোমি মুদী, নলিনীরঞ্জন সরকার ও
ধব শ্রীহরি আনে।

২৫শে গান্ধিজীকে গরম জলে গা মুছিয়ে গাত্র-মর্দনের ব্যবস্থা করা হোল, কিন্তু
থাপি অবস্থা বিশেষ কিছু ভালর দিকে গেল না।

২৭শে তারিখে তিনি লোক চিনতে পারলেন না। কিন্তু ডাক্তারদের তিনি
অনুরোধ করেছিলেন যখন তিনি আচ্ছন্ন হয়ে পড়বেন তখন যেন তাঁরা জোর করে
কান কিছু না করেন, সেইজন্য গান্ধিজীর মুখ থেকে যখন লালা ঝরতে সুরু করলো
তখন ডাক্তাররা কিছুই করতে সাহস পেলেন না, উপরন্তু গান্ধিজী এলোপ্যাথিক
চিকিৎসার বিরোধী ছিলেন, তাঁর মানসিক শান্তি ক্ষুণ্ণ করতেও ডাক্তাররা শঙ্কিত
হয়েছিলেন।

পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য বিলাতে চার্চিল সাহেবের কাছে 'তার' করলেন—
আমি এই শেষমুহূর্তে আপনার কাছে আবেদন করছি মহাত্মাজীকে মুক্তি দিন।...
গান্ধিজীর মৃত্যু ঘটলে ভারত ও ইংলণ্ডের মধ্যে যে হৃদ্যতার সম্ভাবনা আছে তা
চিরদিনের মত নষ্ট হয়ে যাবে!

কিন্তু মুক্তি দেবার জন্য বৃটিশের তখন মোটেই আগ্রহ ছিল না।

শোনা যায় এই সময় ভারত সরকার মহাত্মাজীর মৃত্যু অবধারিত মনে করে
পুণায় প্রচুর চন্দন কাঠ সংগ্রহ করে রেখেছিলেন।

কিন্তু বৃটিশ প্রভুদের ইচ্ছা সফল হোল না, গান্ধিজীর অবস্থা ধীরে ধীরে রূপান্তরিত হোল। ৩রা মার্চ সকাল ৯টায় তিনি যখন অনশন শেষ করলেন, তখন সমস্ত অসুস্থতা তিনি জয় করেছেন, শুধু দৈহিক দুর্বলতা ছাড়া আর কিছুই ছিল না। ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় বললেন—গান্ধিজী আমাদের বোকা বানিয়ে দিয়েছেন। মৃত্যুর অত্যন্ত কাছে গিয়ে তিনি পৌঁছেছিলেন।

উপবাস শেষ করে গান্ধিজী বললেন—জানিনা, ভগবান কেন আমার জীবন রক্ষা করলেন, সম্ভবতঃ তিনি আমাকে দিয়ে আরো অনেক কাজ করিয়ে নিতে চান।

এই উপবাসের সময় গান্ধিজী দৈনিক সাড়ে সাত পো জল খেতেন, তাতে তিন ছটাক নেবুর রস মিশানো থাকতো। কিন্তু সময় সময় জল পান করলেই বমি হবার উপক্রম করতো, তখন কিছু পটাসিয়াম সাইট্রেট, অথবা সোডিয়াম সাইট্রেট জলে মিশিয়ে নিতেন। কিন্তু এই সামান্য জল দেহের ক্ষয় পূরণের কোন সহায়তা করতে পারে না, গান্ধিজীর দেহের ওজন চৌদ্দ সের কমে গেল,—একমন সাড়ে চৌদ্দ সের থেকে এক মন আধ সের।

সারা ভারত ভগবানের কাছে গান্ধিজীর দীর্ঘজীবন প্রার্থনা করলো।

গান্ধিজীর এই অনশন শুধু এদেশে সাড়া তোলে নি, বিলাতে ও আমেরিকাতেও সোরগোল তুলেছিল, চার্চিলের দল সেখানে যেসব প্রোপাগাণ্ডা করতো লুই ফিশার, এডগার স্নো, বার্ণার্ড শ', প্রভৃতির বিবৃতি সেই কুটিলতার জাল ছিন্ন করে ফেলে। ভারতের অনেক নরনারী সহানুভূতি জানিয়ে আট-দশ দিন আহার করেননি, আমেরিকাতেও অনেক লোক একদিন অনশন করেছিলেন।

বার্ণার্ড শ' তো একদিন স্পষ্টই বলে দিলেন—গান্ধিজীকে বন্দী করে রাখা গবর্মেন্টের পক্ষে মূর্খতার চরম পরিচয়। হিটলারের বিরুদ্ধে আমরা যে নৈতিক কারণ দেখাই এ ঘটনাটি তা একেবারে মুছে দিচ্ছে। রাজার উচিত বিনাসর্তে গান্ধিজীকে ছেড়ে দেওয়া এবং তাঁর মন্ত্রীমণ্ডলীর যে মানসিক পঙ্গুতা দেখা দিয়েছে সেজন্য গান্ধিজীর কাছে ক্ষমা চাওয়া। তবেই ভারতের কাছে আমাদের মুখ থাকবে।

কিন্তু সহজ কথা চাচিল সাহেবকে বোঝানো শক্ত—উপদেশো হি মূর্খানাং প্রকোপায় ন শান্তয়ে—চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী—যদি ভারতের এক অর্ধ-নগ্ন ফকিরের কাছে মাথাই নোয়াতে হোল, তাহলে কিসের জন্য এতো সৈন্য আর গুলি গোলা কামান রাখা?

বন্দীবাসে কস্তুরবা' অসুস্থ হয়ে পড়লেন। তাঁর শ্বাসনালী ফুলে উঠলো, আর তারই সঙ্গে দেখা দিল ব্রংকাইটিস্ আর বুকের যন্ত্রণা। চোখের পাতাগুলি ফুলে উঠলো, হৃদ্স্পন্দন উঠলো ১৮০ বার। ডাক্তার গিলডার ও ডাক্তার নায়ার জেলের অধ্যক্ষকে লিখলেন তাঁর কাছে একজন সেবিকা রাখার জন্ত।

কিন্তু কর্তৃপক্ষ সে ব্যবস্থা করলেন না, পৌত্র কানু গান্ধীকে একদিন অন্তর কস্তুরবা'র সঙ্গে দেখা করার অনুমতি দিলেন মাত্র। কিন্তু যখন প্রতিক্ষণের জন্ত সেবার প্রয়োজন তখন একদিন অন্তর একজনকে অল্পক্ষণের জন্ত দেখা করতে দেওয়ার কোন মানে হয় না।

মায়ের অসুখ শুনে বড়ছেলে হরিলাল এলেন দেখা করতে, কিন্তু ঢুকতে পেলেন না।

দেখতে দেখতে অবস্থা খারাপ হতে লাগলো, একদিন রাত্রে ঘুম বন্ধ হয়ে গেল। শ্বাস নিতে কষ্ট হতে লাগলো, ধমনীর গতি হয়ে এলো দুর্বল। দেহবর্ণ ভস্ম-ধূসর। ডাক্তার নায়ার ও ডাক্তার গিলডার সেইখানেই বন্দী ছিলেন, তাঁদের চেষ্টায় কুড়ি মিনিট পরে কস্তুরবা' কিছুটা সুস্থ হলেন। ডাক্তার দু'জন জানালেন—ডাক্তার জীবরাজ মেহতা ও ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়কে একবার দেখানো দরকার।

কিন্তু সরকার সেদিক থেকে কোন চেষ্টাই করলো না।

গান্ধিজী তখন অসুস্থ—শয্যাশায়ী। তাঁর রক্তের চাপ ১০৬।১১০। সেই অবস্থাতেই তিনি অনেক চিঠিপত্র লিখে সরকার থেকে অনুমতি আদায় করেন যে, একজন সেবিকা থাকবে, ডাক্তার জীবরাজ মেহতা রোগিনীকে দেখবেন, আত্মীয়রা এসে দেখা করতে পারবেন এবং বৈদ্যরাজ শিবশর্মা রোগিনীর চিকিৎসা করবেন।

কিন্তু কদিন সেবা করার পর সেবিকা বুঝতে পারলেন যে তার একার পক্ষে রীতিমত সেবা করা সম্ভব নয়, তিনি বিদায় নিলেন, তার স্থান দখল করলেন কানু গান্ধী, গিলডার ও নায়ার।

জেলের কর্তাদের কড়া হুকুম ছিল বৈদ্যরাজ অথবা ডাক্তার জীবরাজ রাত্রে বন্দী-বাসে থাকতে পারবেন না, ফটকের বাইরে মোটরে তাঁরা সারারাত বসে থাকতেন, অসুখ বাড়লে রাত্রে সেইখান থেকে তাঁদের ডেকে আনা হোত।

কবিরাজী চিকিৎসায় কোন ফল হোল না। রোগিনীর স্বর বন্ধ হয়ে এলো।

গান্ধিজী অসুস্থ দেহ নিয়ে এসে বসলেন রোগিনীর পাশে। কয়েকটি রাত্রি ছটফট করে রোগিনীর কেটে গেল। সাম্রাজ্যবাদের কঠিন নিগড় একটুও শিথিল হোল না। চুয়াত্তর বছরের বৃদ্ধা স্বামীর কোলে মাথা রেখে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। শিব-

চতুর্দশীর সন্ধ্যা তখন রাত্রির অন্ধকারে ঘন কালো হয়ে উঠেছে ( সন্ধ্যা ৭-৩০ মি, ২২শে ফেব্রুয়ারী ১৯৪৪ )।

ভারতের জনগণ-মন-অধিনায়ক, পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ অসুস্থ দেহ নিয়ে চুপ করে তাকিয়ে রইলেন, সাম্রাজ্যবাদীর কঠিন কারাগারে তাঁর জীবন-সঙ্গিনী শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন, উপযুক্ত সেবা ও যোগ্য চিকিৎসা করে শেষ মুহূর্তে তাঁর যাতনার এতটুকু লাঘব করতে পারলেন না, সারা জীবন অহিংসা ও মানবতার অনুশীলন করেও সাম্রাজ্যবাদীর লোভ ও নিষ্ঠুরতা তিনি জয় করতে পারলেন না। যারা একাগ্র চিত্তে তাঁর সেবা করলো, যাঁরা নিজেকে সমর্পণ করলো তাঁর হাতে, তাঁর চোখের সামনেই তাঁরা তিল তিল করে মৃত্যু বরণ করলো, তিনি তাঁদের রোগযন্ত্রণা উপশম করার জন্য সামান্য কিছুও করতে পারলেন না! নিজের এই অক্ষমতার কথাই গান্ধিজীর চিত্তকে দোলা দিচ্ছিল কি না কে জানে। তাঁর চোখে জল এসেছিল কী! কালো আকাশের পানে তাকিয়ে, বাইরের অন্ধকারের পানে তাকিয়ে গান্ধিজী বোধ হয় ভাবছিলেন—কস্তুরবা গেল, মহাদেব গেল, মতিলাল গেল, লজপৎ গেল, যতীন্দ্রমোহন গেল, দেশবন্ধু গেল, তিলক গেল, গোখ্‌লে গেল···আরো কত গেল—'এর যত মূল্য সে কি ধরার ধূলায় হবে হারা?

স্বর্গ কি হবে না কেনা—
বিশ্বের ভাণ্ডারী শুধিবে না
এত ঋণ
রাত্রির তপস্যা সে কি আনিবে না দিন
নিদারুণ দুঃখরাতে
মৃত্যুঘাতে
মানুষ চূর্ণিল যবে নিজ মর্ত্তসীমা
তখন দিবে না দেখা দেবতার অমর মহিমা?'

কিন্তু শোক করার অবসর তখন কোথায়, শেষকৃত্যের জন্য তিনি সরকারকে অনুরোধ করলেন—আমার পুত্র ও আত্মীয়দের হাতে মৃতদেহ সমর্পণ করা হোক!

কিন্তু সে অনুরোধ গবর্ণমেন্ট রাখলেন না।

মহাদেব দেশাইয়ের দেহ যেখানে ভস্মীভূত করা হয়েছিল তারই পাশে কস্তুরবা'র শেষ-কাজ সমাধা হোল। ধোঁয়ার কুণ্ডলীর মাঝে ধরণীর সঙ্গে দেহের সব সম্পর্ক শেষ হয়ে গেল, গান্ধিজী স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে রইলেন। ভস্মাবশেষের পানে তাকিয়ে ধীরে ধীরে শ্রান্ত কণ্ঠে উচ্চারণ করলেন—'আত্মা হয়তো অনুকৃতি উপলব্ধি করতে পারে!'

দেশবাসী শোকে স্তব্ধ হয়ে গেল। বাপুজী ২২ মার্চ কস্তুরবা-শোক-দিবস পালনের আবেদন করলেন। কস্তুরবা'র স্মৃতিকে স্মরণীয় করার জন্য কস্তুরবা-ফাণ্ড খোলা হোল। পঁচাত্তর লাখ টাকা সংগ্রহ করার কথা হোল, কিন্তু দেশবাসী স্বেচ্ছায় দিল এক কোটি কুড়ি লাখ টাকা। টাকাটা ভারতের নারী জাতির কল্যাণের জন্য ব্যয় করা হচ্ছে।

এই শোকের মধ্যেও বৃদ্ধ রুগ্ন সত্যাগ্রহীকে সাম্রাজ্যবাদীরা স্বস্তি দিল না। স্যার গিরিজাশঙ্কর বাজপেয়ী আমেরিকায় ভারত সরকারের হয়ে সাফাই গাইলেন—ভারত গবর্মেণ্ট বহু বার কস্তুরবা'কে মুক্তি দিতে চেয়েছিলেন কিন্তু স্বামীকে ছেড়ে যেতে তিনি চাননি। সরকার তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে যাননি। তার উপর ওই একই বাড়ীতে একজন নামকরা ডাক্তারও ছিলেন, কস্তুরবা তাঁর সেবা শুশ্রূষার যথেষ্ট সুযোগ পেয়েছিলেন…

বিলাতের কমন্স-সভায় বাটলার সাহেব বললেন—কস্তুরবা'র মুক্তির কোন অনুরোধ পাওয়া যায়নি এবং ভারত সরকার বিশ্বাস করেন যে তাঁকে আগাখাঁর প্রাসাদ থেকে স্থানান্তরিত করা তাঁর পক্ষে বা তাঁর পরিবারের পক্ষে করুণা-জনক হোত না…আমি সংবাদ পেয়েছি যে, মিষ্টার গান্ধীর অনুরোধে পুনাস্থিত আগাখাঁ প্রাসাদের প্রাংগণে অন্ত্যেষ্টি সম্পন্ন হয় এবং বন্ধু ও আত্মীয়-স্বজনেরা উপস্থিত ছিলেন।…

গান্ধিজী আর সইতে পারলেন না, তিনি সত্যপ্রকাশ করার জন্য পর পর কয়েকখানি চিঠি লিখলেন। তাতে তিনি বললেন—গবর্মেণ্টের প্রদত্ত সংবাদ সমগ্রভাবে ভ্রান্ত। আমাকে নির্বাচনের স্বাধীনতা দেওয়া হলেও যে আমি পবিত্র শ্মশানভূমির পরিবর্তে এই কারাপ্রাংগণে আমার প্রিয়ের দাহ কার্য সমাধায় সম্মত হব ইহা ধারণা করা যায় না… এই সমস্ত ব্যক্তিগত বিষয় সম্পর্কে গবর্মেণ্টকে লেখা আমার পক্ষে সুখকর বা সহজ নয়। কিন্তু যিনি ষাট বছরেরও অধিক দিন আমার বিশ্বস্ত সঙ্গিনী ছিলেন তাঁর স্মৃতির জন্যই একথা লিখছি।…

কিন্তু জগৎবাসীর কাছে মিথ্যাকে সত্য বলে প্রচার করাই যাদের রীতি তারা সত্যকে গ্রহণ করবে কেন! স্যার রিচার্ড টটেনহাম শেষে উত্তর দিলেন—ভারত সরকার আপনার পত্রগুলি দুঃখের সঙ্গে পাঠ করেছেন। তাঁদের বিরুদ্ধে আপনি যে অভিযোগগুলি করেছেন, তাঁদের বিশ্বাস, নিরপেক্ষ বিচারের দ্বারা সেগুলি প্রমাণিত হবে না। সংগে সংগে তাঁরা মনে করেন যে তাঁদের নিকট প্রেরিত অনুরোধগুলি রক্ষা করতে যৌক্তিকতার দিক থেকে তাঁরা যে যথাসম্ভব প্রচেষ্টা করেছিলেন তার

ন্যায়োচিত স্বীকৃতি এই শোকের সময় আপনার নিকট থেকে প্রত্যাশা করা সম্ভব হবে না এবং এইরূপ পত্রালাপ চালিয়েও কোন প্রয়োজনীয় উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না।

বন্দীবাসে মহাত্মাজীর ম্যালেরিয়া দেখা দিল। ঘুস,ঘুসে জ্বর তারই সঙ্গে আমাশয়! শোক ও নিঃসঙ্গতা তাঁর মন ও শক্তিকে বিষাদক্লিষ্ট করে তুললো।

ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় কি একটা কাজে গিয়েছিলেন বোম্বাইয়ে, বোম্বাই সরকারের অনুরোধে তিনি গান্ধিজীকে দেখতে গেলেন পুনায়। ডাক্তার বিধানকে দেখে গান্ধিজী খুশি হলেন, কিন্তু চিকিৎসা করার কথা শুনে বললেন—ডাক্তার বিধান, তোমার চিকিৎসা তো আমি নিতে পারবো না।

বিধানচন্দ্র বিস্মিত হলেন, বললেন—আমার অপরাধ কি জানতে পারি না?

গান্ধিজী বললেন—আমার দেশের চল্লিশ কোটি দীন দুঃখীর অসুখে তুমি যখন চিকিৎসা করতে পার না, তখন আমিই-বা তোমার চিকিৎসা নেব কেন?

বিধানচন্দ্র বললেন—এই কথা! মহাত্মাজী,আমি চল্লিশ কোটি নরনারীর চিকিৎসা করতে পারিনি এ কথা সত্যি, কিন্তু এই চল্লিশ কোটি নরনারীর যিনি আশা-ভরসা, চল্লিশ কোটি পরাধীন মানুষ যাঁর মুখের পানে চেয়ে আছে, চল্লিশ কোটি নরনারীর দুঃখ লাঘবের ভার যাঁর হাতে, যিনি বাঁচলে চল্লিশ কোটি বাঁচবে, যাঁর মৃত্যুতে চল্লিশ কোটি মরবে, তাঁর চিকিৎসার ভার সেই চল্লিশ কোটি নরনারী আমার উপর দিয়েছে, আপনি 'না' বললেই বা আমি শুনবো কেন?

গান্ধিজী বললেন—কিন্তু ডাক্তার বিধান, তোমার এলোপ্যাথিক চিকিৎসা তো আমি নিতে পারি না।

বিধানচন্দ্র বললেন—মহাত্মাজী আপনি তো বলেন যে—পৃথিবীর সব কিছু—এমন কি ধূলিকণাটি পর্যন্ত ভগবানের সৃষ্টি—একথাটা কি সত্যি আপনি বিশ্বাস করেন?

মহাত্মাজী বললেন—নিশ্চয়, নিশ্চয়, সমস্তই ভগবানের সৃষ্টি!

—তাহলে মহাত্মাজী এলোপ্যাথি চিকিৎসাও কি তাঁর সৃষ্টি নয়?

গান্ধিজী এবার হেসে ফেললেন, বললেন—তোমার উকিল কি ব্যারিষ্টার হওয়া উচিত ছিল, তুমি কেন যে আইনজীবি হওনি আমি তাই ভাবছি।

—ভগবান আমাকে আইনজীবি না করে চিকিৎসাজীবি করেছেন, কারণ তিনি জানতেন যে এমন একদিন আসবে যেদিন তাঁর সব-সেরা ভক্ত মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর চিকিৎসার ভার পড়বে আমার উপর। উকিল ব্যারিষ্টার হয়ে হয়তো আমি অনেক বেশী টাকা উপায় করতে পারতাম, কিন্তু ভগবানের প্রিয়তম সন্তানের

চিকিৎসা করার সৌভাগ্য তো পেতুম না। এই জন্তই ভগবান আমাকে ডাক্তার করেছেন।

মহাত্মাজী হেসে উঠলেন, বললেন—তোমার সঙ্গে পারবার জো নেই, তুমি কি ওষুধ দেবে দাও, খাই!

এলোপ্যাথিক মতেই সেবার গান্ধিজীর চিকিৎসা হোল, এবং কদিনের মধ্যেই বিধানচন্দ্র তাঁকে নিরাময় করে কলকাতায় ফিরলেন।

বন্দীশালায় গান্ধিজীর জন্য কি রকম খরচ-পত্র হচ্ছে সেই সম্পর্কে স্বরাষ্ট্র সচিব একদিন এসেম্ব্লিতে বললেন—আগা খাঁর প্রাসাদে মিঃ গান্ধী ও অন্যান্য সহ অন্তরীণ-দের ব্যয়ভার মাসিক পাঁচশো পঞ্চাশ টাকার মত।

খবরের কাগজে কথাটা পড়েই গান্ধিজী গবর্মেণ্টের কাছে লিখলেন—যে বৃহৎ স্থানে বহু সংখ্যক রক্ষী বেষ্টিত অবস্থায় আমাকে আটক রাখা হয়েছে আমার মতে তা সাধারণের অর্থের অপচয়। যে কোন কারাগারে থাকতে পেলেই আমি সম্পূর্ণ খুসি থাকবো।...সঙ্গীগণ ও আমার জন্য ব্যয় শুধুমাত্র মাসিক সাড়ে পাঁচ শো টাকাই নয়। এই বিরাট স্থানটির (যার একটি অংশমাত্র আমাদের নিকট উন্মুক্ত) ভাড়া এবং বিরাট দেহরক্ষীর দল ও সুপারিনটেণ্ডেণ্ট জমাদার ও সিপাহী সহ আভ্যন্তরীণ কর্মচারী-বৃন্দের ব্যয় ভারও এর সঙ্গে যোগ করা উচিত। এবং এর সঙ্গে আরো যুক্ত হবে আভ্য-ন্তরের বাসিন্দাদের তদারক ও উদ্যান পরিচর্যার জন্য নিয়োজিত যেরোড়া থেকে আনীত এবং একদল আসামীর ব্যয়ভার। ন্যায়ত, এই ব্যয় বহনের সবটাই আমার মতে সম্পূর্ণরূপে অনাবশ্যক। আর জনসাধারণ যখন অনাহারে মৃতপ্রায় তখন উহা ভারতের জনসাধারণের বিরুদ্ধে অপরাধ। গবর্মেণ্টের নির্বাচন মত যে কোন সাধারণ কারাগারেই আমাকে ও আমার সংগীদের স্থানান্তর করবার অনুরোধ করছি। বিশেষে এই ব্যয়ভারের সবটুকুই ভারতের কোটি কোটি মূক মানুষের নিকট হতেই গৃহীত হয় ভেবে আমার বিষণ্ণ চিত্তকে অবরুদ্ধ করে রাখতে পারছি না।

সরকার এ সম্পর্কে কোন সাড়া দিলেন না। সপ্তাহ দুই বাদে গান্ধিজী আবার লিখলেন—এই বন্দীশালায় অন্তরীণদের অন্য কোন কারাগারে (সেখানকার খরচ এখানকার চেয়ে কম হবে) পাঠাবার অনুরোধ করে গত ৬ঠা মার্চ একখানি পত্র লিখেছিলাম। এই বিষয়ে আশু ব্যবস্থা প্রার্থনা করি।

এই চিঠি পাঠাবার দু' সপ্তাহ পরে এই যে সকাল বেলা জেলখানার ইনেসপেকটার-

জেনারেল এসে গান্ধিজীকে বললেন—আপনার শরীর-গতিক কেমন? ট্রেনে বা মোটার গাড়ীতে শ'খানেক মাইল যেতে পারবেন?

প্যারিলাল ও আর দু'একজন যাঁরা সেখানে ছিলেন, একথা শুনে তাঁরা চমকে উঠলেন, তবে কি গান্ধিজীকে অন্য কোন বন্দীবাসে স্থানান্তরিত করা হবে? কিন্তু কেউই কোন প্রশ্ন তুললেন না। ইনেসপেকটার-জেনারেলও কিছু বললেন না।

সন্ধ্যাবেলা ৫টার সময় ইনেসপেকটার-জেনারেল আবার এলেন, বললেন—মহাত্মাজী কাল সকাল আটটার সময় আপনি বিনা সর্তে মুক্তি পাবেন।

গান্ধিজী বললেন—আপনি কি ঠাট্টা করছেন?

—না! হুকুম এসে গেছে। সকাল আটটার পর এখানে আর কোন শান্ত্রী থাকবে না, আপনি ইচ্ছা করলে এখানেও থাকতে পারেন। কিন্তু আপনার পক্ষে এখানে না থাকাই ভালো, এখানে সৈনিকদের সব ঘাঁটি রয়েছে, যারা আপনার দর্শন পেতে আসবে তাদের সঙ্গে সৈনিকদের সহসা কোন হাংগামা বেধে যেতে পারে।

মুক্তি অপ্রত্যাশিত। গান্ধিজী বারেক কি যেন ভাবলেন, তারপর লঘুকণ্ঠে বললেন—আমার গাড়ী ভাড়ার কি হবে?

—চলে যাবার সময় নিশ্চয়ই আপনি গাড়ীভাড়া পাবেন।

ইনেসপেকটার-জেনারেল চলে গেলেন, গান্ধিজী গভীর চিন্তায় ডুবে গেলেন।

প্যারিলাল পাশেই বসেছিলেন, সহসা কোন একসময় গান্ধিজী প্রশ্ন করলেন—আমার স্বাস্থ্য খারাপ বলেই কি এরা আমাকে ছেড়ে দিচ্ছে?

তারপর নিজেই তার উত্তর দিলেন—যাক্ যেজন্যই ছাড়ুক, ওরা যা বলছে তাই সহজভাবে গ্রহণ করা ভালো! তোমরা আটটার আগেই তৈরী থেকো! আটটার পর আর তোমাদের এক মিনিট সময় দোব না!

গান্ধিজী সাত বছর বন্দী থাকার জন্য প্রস্তুত হয়েছিলেন, কিন্তু ঠিক একুশ মাস পরে তিনি মুক্তি পেলেন।

সারা রাত জিনিষ পত্তর বাঁধতেই কেটে গেল। গান্ধিজী চুপ করে বিছানায় পড়ে রইলেন, চোখে ঘুম নেই, যত রাজ্যের চিন্তা ভীড় করে এলো তাঁর মাথায়—চল্লিশ কোটি নরনারীর দুঃখ ও দারিদ্র্যের দুর্ভাবনা।

রাত কেটে গেল, দিনের আলো পূর্ব গগনে ফুটে ওঠার আগেই সকলে স্নান শেষ করে প্রার্থনায় সমবেত হলেন।

তারপর গান্ধিজী গবর্মেন্টের কাছে লিখলেন, আবেদন জানালেন—শ্রীমহাদেব দেশাই ও আমার স্ত্রীর দাহস্থানটি পবিত্র ভূমি, বন্দীর দল প্রত্যহ দু'বার স্থানটি পরিদর্শন

রে স্বর্গতঃ আত্মার উদ্দেশ্যে পুষ্পার্ঘ প্রদান করতেন।...আমার বিশ্বাস গবর্মেণ্ট এই নটি দখল করার ও তৎসহ মহামান্য আগা খাঁর প্রাংগণ মধ্য দিয়া গমন অধিকারও দায় করবেন, যাতে বন্ধু ও স্বজনবর্গ ইচ্ছামত সমাধি-ভূমি পরিদর্শন করতে রেন। গবর্মেণ্টের অনুমতি সাপেক্ষ্যে আমি পবিত্র স্থানটি রক্ষা ও প্রাত্যহিক প্রার্থনার ন্দোবস্ত করতে ইচ্ছাকরি। আশা করি আমার অনুরোধ অনুযায়ী গবর্মেণ্ট াবশ্যক পন্থা গ্রহণ করবেন।*

সাতটার সময় গান্ধিজী এসে দাঁড়ালেন সমাধি-স্থানে, কস্তুরবা ও মহাদেবের ানভূমিতে শেষ পুষ্পার্ঘ তুলে দিলেন। আর তিনমাস আগে তিনি মুক্তি পেলে স্তুরবাকে সঙ্গে নিয়েই তিনি ফিরতে পারতেন!

'হায়রে হৃদয়, তোমারি সঞ্চয়
দিনান্তে নিশান্তে
শুধু পথপ্রান্তে
ফেলে যেতে হয়......'

পৌনে আটটার সময় ইনেসপেকটার-জেনারেল মোটার নিয়ে এলেন।

ঠিক আটটার সময় প্রাসাদ বেষ্টিত কাঁটা তারের বেড়া পার হয়ে গান্ধিজীর গাড়ী া থামলো; পুলিশ অপেক্ষা করছিল, ডাক্তার সুশীলা নায়ারের হাতে একখানি মনামা জারী করলো: আগা খাঁ প্রাসাদের কোন কথাই তিনি প্রকাশ করতে রবেন না!

পর্ণকুটির দিকে মোটার ছুটলো, গান্ধিজী চুপ করে বসে রইলেন। আজ তিনি াহারা, একান্ত আপনার দু'জনকে তিনি পিছনে ফেলে রেখে চলেছেন। কোন সময় বলে উঠলেন—এর চেয়ে মহত্তর মৃত্যু হয় না। বা' ও মহাদেব স্বাধীনতার ীমূলে জীবন উৎসর্গ করেছেন, তাঁরা অমর হয়ে রইলেন। কারাগারের বাইরে ল এ গৌরব কি তাঁরা পেতেন?

---

* গবর্মেণ্ট এই আবেদনের উত্তরে জানিয়েছিলেন—ভূম্যধিকার আইনের বলে গবর্মেণ্টের পক্ষে বাধ্যতা-মূলকভাবে দখল করা আইনতঃ অসম্ভব। গবর্মেণ্টের মতে উহা আপনার ও মান্য আগা খাঁর মধ্যে ব্যক্তিগত আলোচনার বিষয়...

প্রাসাদটি সামরিক কর্তৃপক্ষ অধিকার করে। শেষে অনেক লেখালেখির পর গবর্মেণ্ট ায়—প্রতি রবিবার সমাধি-ভূমি পরিদর্শন করা চলতে পারে। অন্য দিন সমাধি-ভূমি র্শন-কামী ব্যক্তিকে আগা খাঁর প্রাসাদস্থিত ৩৬ সংখ্যক ডিভিসনের কামাণ্ডার-জেনারেল ়ের নিকট আবেদন করতে হবে।

গান্ধিজীর শরীর তখনও ভালো সারে নি। নিউজ ক্রনিকিলের সাংবাদিক গেল্ডার সাহেব এলেন গান্ধিজীর সঙ্গে দেখা করতে, এবার গান্ধিজী কি করবেন সেই সম্পর্কে আলোচনা হোল, গান্ধিজী কথায় কথায় বললেন—আইন অমান্য আন্দোলন সুরু করার ইচ্ছা আমার নেই, আমি আবার উনিশ-শো-বিয়াল্লিশ সালে ফিরে যেতে চাই না। ইতিহাসকে পুনরাবৃত্তি করানো যায় না, কংগ্রেস-প্রদত্ত অধিকার না থাকলেও জনসাধারণের উপর আমার যে প্রভাব আছে তারই জোরে আজ আমি আইন অমান্য আন্দোলন সুরু করতে পারি, কিন্তু তাতে শুধু বৃটিশ গবর্মেণ্টকে হায়রানি করা হবে, আমার উদ্দেশ্য তা হতে পারে না।

তবু গান্ধিজীর সম্পর্কে প্রোপাগাণ্ডার বিরাম ছিল না, গবর্মেণ্টের পক্ষ নিয়ে স্যার ফিরোজ খাঁ নুন আমেরিকাতে গান্ধিজীর নিন্দা করলো, বললো—গান্ধিজীর এবার রাজনীতি থেকে বিদায় নেওয়াই উচিত...

এই সব দেশদ্রোহী স্বার্থবাহীদের মতামত গান্ধিজী বিশেষ গ্রাহ্য করতেন না। কিন্তু ফিরোজ খাঁ নুনের জবাব দিলেন জর্জ বার্ণার্ড শ', তিনি বললেন—গান্ধিজীর রাজনীতি পঞ্চাশ বছরের পুরানো হয়ে গেছে। তাঁর কলাকৌশলে ভুল থাকতে পারে কিন্তু তাঁর নীতি সুদৃঢ়, তা পঞ্চাশ বছর আগেও যেমন ছিল, পঞ্চাশ লাখ বছর আগেও তেমনি ছিল।

ইতিমধ্যে গান্ধিজী ডাক্তার জয়াকরকে চিঠি লিখলেন—দেশ আমার কাছ থেকে অনেক কিছু আশা করে, তোমরা কি ভাবছ আমি জানি না, কিন্তু আমি সুখী নই। আমি লজ্জিত। আমার অসুখ হওয়া ঠিক হয়নি, অসুখ যেন না হয় সেই চেষ্টাই আমি করেছিলাম কিন্তু শেষে ব্যর্থ হলাম, আমার মনে হয় আমার এই অসুস্থতা কাটিয়ে উঠলেই ওরা আবার আমাকে জেলে পাঠাবে। কিন্তু যদি আমাকে ধরে তাহলে আমি কি করবো . কংগ্রেসের আগষ্ট-প্রস্তাবকে আমি প্রত্যাহার করতে পারবো না...ওইটিই আমার প্রাণ-বায়ু...

শরীরটাকে ভালোমত সারাতে গান্ধিজীর বেশ কিছুদিন লাগলো। কিছুদিন তিনি কাটালেন জুহুর সাগর তীরে, তারপর গেলেন পুণায় ডাক্তার দীনশা মেহতার চিকিৎসালয়ে, সেখান থেকে গেলেন পাঁচগণিতে। কিন্তু দেহ দুর্বল হলেও, বয়স বাড়লেও মন দুর্বল হয়নি।

জুনমাসে মহারাষ্ট্রের কংগ্রেস কর্মীদের এক সভায় বললেন—গবর্মেণ্টের বিরুদ্ধে 'না' কথাটাই হোল স্বরাজের চাবিকাঠি।

জুলাই মাসে কয়েকটি আলোচনা ও বিবৃতিতে তিনি বললেন—স্বাধীনতার জন্যই

আমি বেঁচে আছি, যদি মরি স্বাধীনতার জন্যই মরবো।…আমি চাই এখনই সমগ্র ভারতের স্বাধীনতা মেনে নেওয়া হোক তবে মিত্রপক্ষের প্রয়োজন মত যুদ্ধকালীন কিছু বাধা-নিষেধ থাকতে পারে।…ভারতের স্বাধীনতা যদি পাওয়া যায় তাহলে আমি নীচে নামতেও রাজী আছি।…তোমরা (কংগ্রেসীরা) নিজেদের আবিষ্কার করবে এবং জেলে যাবার ঝুঁকি নেবে, বিশ্বাস রাখবে যে এই ভাবে জেলে গেলে স্বাধীনতা আন্দোলনকে সাহায্য করা হবে।…আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে 'ভারত ছাড়ো' প্রস্তাব একটা আকস্মিক চীৎকার নয়, ক্রোধের বশেও এ প্রস্তাবের খসড়া করা হয়নি। পার্লামেণ্টারী ভাষায় বললে বলতে হবে ভারতবাসীরাই ভারতবর্ষ শাসন করবে— কোন-দল বিশেষের দ্বারা নয়, জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে জনগণ তাদের প্রতিনিধি নির্বাচন করবে।…

ডেলি-ওয়ার্কারের প্রতিনিধির কাছে মহাত্মাজী বললেন—অধুনা মিত্রপক্ষ গণতন্ত্র ও স্বাধীনতা সম্পর্কে অনেক ঘোষণা করছেন, আমার কাছে—আরো সহজ করে বললে—নিপীড়িত জাতির কাছে এ সব ঘোষণা অর্থহীন। প্রতিশ্রুতিকর ঘোষণা নিপীড়িতদের খুসি করতে পারে না। 'নিপীড়িত জাতি' বলতে আমি বুঝি এশিয়াবাসী ও আফরিকাবাসী। তাঁরা যদি গণতন্ত্রের জন্যই সংগ্রাম করেন তাহলে পৃথিবীর সমস্ত শোষিত জাতির সেই গণতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত। কিন্তু আমি দেখছি বাস্তব ঘটনা তার উল্টোটাই প্রমাণ করছে। প্রায় সমস্ত দলই আজ এবিষয়ে একমত যে ভারতবর্ষ এখন যেভাবে বিদেশী আধিপত্য বহন করছে এমন কোন দিন ছিল না।

মহাত্মাজী আশ্রমে ফিরে এলেন। ছোট ছেলেমেয়েদের আর আনন্দের সীমা রইল না। রাজনীতির চেয়ে ছোট ছেলেমেয়েদের সারল্যই মহাত্মাজী বেশী ভালবাসেন, এই ক'দিন মহাত্মাজীকে না পেয়ে তাদের বড় কষ্ট হচ্ছিল।

মহাত্মাজীর কাছে ছোটদের যাওয়া আসার কোন বাধা ছিল না, কারুর অসুখ করলে মহাত্মাজী নিজেই আসতেন তার ঘরে।

একবার একটি মাদ্রাজী ছেলের পেটের অসুখ করেছে, বিকালবেলা চুপ করে বিছানায় শুয়ে শুয়ে সে ভাবছে কি খাবে, এমন সময় মহাত্মাজী এসে ঘরে ঢুকলেন, হেসে বললেন—কি গো, কেমন আছ?

—সেরে গেছি।

—বেশ বেশ! খুব খিদে পাচ্ছে তো? কি খেতে ইচ্ছে করছে বলত?

ছেলেটা কফি খেতে বড্ড ভালবাসতো, বললো—এক কাপ কফি খেতে ইচ্ছে করছে!

—দুষ্টু ছেলে, পেটের অসুখ সারতে না সারতেই কফি খাবে!

ছেলেটার মুখ মলিন হয়ে গেল। তার বিমর্ষ মুখের পানে তাকিয়ে মহাত্মাজী বললেন—বেশ, বেশ, এক কাপ কফি দেবার ব্যবস্থা আমি করছি, আর তার সঙ্গে দু'খানা গরম্ গরম টোষ্ট মন্দ হবে না, কি বল?

ছেলেটা তো মহাখুসি, বললো—সত্যি দেবেন?

—দেখনা, এখনি পাঠিয়ে দিচ্ছি—

মিনিট কুড়ি পরে খটখট করে খড়মের শব্দ তুলে মহাত্মাজী ফিরে এলেন, হাতে একখানি ট্রে। ট্রের উপর দু'খানি টোষ্ট আর এক কাপ কফি। ট্রে'টা সামনে এগিয়ে দিয়ে হাসতে হাসতে গান্ধিজী বললেন—এই নাও তোমার কফি, নিন্দে করতে পারবে না কিন্তু, এই কফি আমি নিজের হাতে তৈরী করেছি, খেয়ে তোমাকে সার্টিফিকেট দিতে হবে।

ছেলেটার মুখে সহসা কথা জোগালো না, মহাত্মাজী নিজে তার জন্য কফি তৈরী করে এনেছেন! কোন রকমে বললো—কিন্তু আমার জন্য আপনি এত কষ্ট করলেন?

—কথা বলবে পরে, কফি জুড়িয়ে যাচ্ছে যে!

ছেলেটা আর কিছু বলতে সাহস পায় না, কাপে চুমুক দিতে সুরু করে। গান্ধিজী হাসি মুখে তার পানে তাকিয়ে থাকেন, খাওয়া শেষ হলে ঘর থেকে বাহির হয়ে যান। ছেলেটা তাকিয়ে থাকে, তার দৃষ্টি ঝাপ্সা হয়ে আসে।

আরেক দিনের কথা।

গান্ধিজী পুণা থেকে বোম্বাই যাচ্ছেন, সঙ্গে দশজন সেক্রেটারী ও বিশিষ্ট ভক্তবৃন্দ! তৃতীয় শ্রেণীর কামরা, ভিতরে ও বাইরে মানুষের গোলমাল। তার উপর ঝম্‌ঝম্ করে বৃষ্টি পড়ছে, গাড়ীর ছাদ দিয়ে ভিতরে জল পড়ছে। এসব কিন্তু গান্ধিজীর মনে কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি, স্থির চিত্তে তিনি হরিজনের জন্য প্রবন্ধ লিখে চলেছেন।

এক ষ্টেশনে বৃষ্টির সেই মুষল ধারাকে অগ্রাহ্য করে কয়েকটা ছেলে এসে উঠলো গান্ধিজীর কামরার জানালায়; গান্ধিজীকে দেখতে পেয়েই তারা সানন্দে চীৎকার করে উঠলো—গান্ধিজী, গান্ধিজী! জয় মহাত্মা গান্ধিকী জয়!!

কিশোর কণ্ঠের চীৎকারে গান্ধিজীর কলম থেমে গেল। জানালার পানে তাকিয়ে তিনি হাসলেন। ছেলেদের তিনি ভালবাসতেন, তাদের সব কিছু অত্যাচার সইতে তিনি সদাই প্রস্তুত ছিলেন।

মার্কিন সাংবাদিক লুই-ফিশার ছিলেন সঙ্গে, তিনি প্রশ্ন করলেন—গান্ধিজী, এই ছেলের দল আপনার কাছে আসে কেন?

গান্ধিজী হাসলেন, টাকওলা মাথার দু'পাশে দু'টী আঙুল দেখিয়ে বললেন—আমার মাথায় দু'টী শিং আছে, ওরা সেই শিং দেখতে আসে!

জানালার বাইরে ছেলেরা হেসে উঠলো, লুই-ফিশারও না হেসে থাকতে পারলেন না, গান্ধিজীর সরল ছেলে-মানুষি তাঁকে মুগ্ধ করলো।

একবার কলকাতার এক মন্তেসারী ইস্কুলের একদল ছোট ছেলেমেয়ে গিয়েছিল সোদপুরে গান্ধিজীর সঙ্গে দেখা করতে। প্রত্যেকেই গান্ধিজীকে প্রণাম করে এক এক টাকা প্রণামী দিল। শেষে কয়েকটী নেহাৎ ছোট ছেলে সাহস করে আর এগিয়ে আসে না। গান্ধিজী হেসে একটী ছেলের হাত ধরে টানলেন, আরেকজনের নাকটীর উপর এক টোকা মারলেন, ছেলেদের মাঝে হাসির ঢেউ উঠলো, সব ভয় ভেঙে গেল। তাড়াতাড়ি হুড়োহুড়ি পড়ে গেল, কে আগে বাপুজীর কাছে গিয়ে টাকা দেবে। দু'দশ মিনিটের মধ্যে গান্ধিজী দিব্যি ভাব জমিয়ে ফেললেন সব ক'টী ছেলের সঙ্গে। বললেন—এই টাকাগুলো যে দিলে, এ নিয়ে আমি কি করবো বলদিকি?

ছেলেরা উত্তর দিল—গরীব হরিজনদের সেবায় খরচ করবেন।

গান্ধিজী হেসে বললেন—ঠিক বলেছ। আরো অনেক টাকা আমার দরকার, তোমরা এখন ছোট আছ, এখনই তোমরা আমাকে টাকা দিচ্ছ, বড় হয়ে কিন্তু লাখ লাখ টাকা দিতে হবে!

ছেলেরা ঘাড় কাত করে বললো—দোব!

খানিক পরে ছেলেদের জলখাবার মুড়ি এলো। ছোটরা খেতে সুরু করে দিয়েছে এমন সময় বাপুজী তাদের মাঝে এগিয়ে গেলেন, বললেন—বাঃ, নিজেরাই সব খাচ্ছ, আমার ভাগ কই?

বাপুজী ডান হাতখানি বাড়িয়ে ধরলেন। ছোটরা এক ভাগ মুড়ি তাঁর হাতে তুলে দিল, গান্ধিজী হো হো করে হেসে উঠলেন।

শুধু এদেশেই নয় বিলাতের ছেলেমেয়েদের কাছেও গান্ধিজী ছিলেন—গান্ধিকাকা।

গোলটেবিল বৈঠকে দিনের পর দিন গান্ধিজী যখন গুরুতর গভীর আলোচনায় ব্যাপৃত, তখনও অবসর সময় দেখা যেত ছোট ছেলেমেয়েদের নিয়ে তিনি গল্প বলতে বসেছেন—ভারতবর্ষের গরীব-দুঃখীদের গল্প। আবার কখন-বা তাদের হাত ধরে বাহির হয়ে পড়েছেন মাঠে বেড়াতে।

লণ্ডনের ইষ্ট-এণ্ডের ছেলেমেয়েরা গান্ধিকাকাকে এমন ভালবেসে ফেলেছিল, যে চলে আসার দিনে তারা আর ছাড়তে চায় না, জলভরা চোখ তুলে গান্ধিজীকে তারা প্রশ্ন করলো—গান্ধিকাকা আবার কবে আসবেন?

হাসি মুখে গান্ধিজী উত্তর দিলেন—যেদিন আমার দেশ স্বাধীন হবে, সেদিন আবার আসবো।

স্বাধীন ভারতের স্বাধীন মানুষ হয়ে আবার একদিন বিলাত যাবার ইচ্ছা হয়তো তাঁর মনে ছিল, কিন্তু বিশ্বনিয়ন্তার ইচ্ছা তা নয়!

গান্ধিজী যেখানেই থাকতেন, দিনের মধ্যে একটা সময় ছোট ছেলেমেয়েদের সঙ্গে গল্প-গুজব করে কাটাতেন, সভায় যাবার পথে ওদের কাঁধে ভর দিয়ে যেতেন, হেসে বলতেন—তোমরা হচ্ছ আমার লাঠি—লকুড়ি!

•

রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধিজীর সম্বন্ধ ছিল আন্তরিক।

আমেরিকায় রবীন্দ্রনাথ গান্ধিজী সম্পর্কে বলেন—মহাত্মা গান্ধী বর্তমান পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ। তাঁর মন শিশুর মত সরল। কেউ যদি তাঁকে আক্রমণ করে গান্ধিজী শুধু তার দিকে চেয়ে হাসবেন। যদি তাঁকে আমেরিকার সিংহাসন দেওয়া হয়, তিনি সেই সিংহাসনের মণিমুক্তো খুলে নিয়ে গরীবদের বিলিয়ে দেবেন। নিজের জন্ম তিনি কিছুই চান না।···

আবার রবীন্দ্র-জয়ন্তীর সময় গান্ধিজী লিখলেন—ভারতবর্ষে ফিরে আসার পর গুরুদেবই আমাকে আশ্রয় দেন, তাঁর সঙ্গে আমার প্রাণের যোগ। সে যোগ এতো গভীর ও পবিত্র যে সকলের সামনে তা বলা যায় না।···

রবীন্দ্রনাথ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, গান্ধিজী শান্তি-নিকেতনে এলেন তাঁকে দেখতে।

এসে শুনলেন, ডাক্তাররা রবীন্দ্রনাথকে বিশ্রাম নেবার জন্ম অনুরোধ করেছেন, কিন্তু তিনি তথাপি দুপুরে লেখাপড়ার কাজ করেন। গান্ধিজী রবীন্দ্রনাথকে বললেন, —গুরুদেব, আপনার কাছে আমার একটি ভিক্ষা আছে!

রবীন্দ্রনাথ তো অবাক্, মহাত্মাজী কি ভিক্ষা চাইবেন তাঁর কাছে! হেসে বললেন —বলুন, আপনার কি ভিক্ষা?

মহাত্মাজী হাতজোড় করে বললেন—দেখুন, আমি আপনার দৈনন্দিন জীবন থেকে রোজ এক ঘন্টা করে ভিক্ষা চাইছি। আপনি দুপুরে একঘন্টা করে সম্পূর্ণ বিশ্রাম নেবেন, সেই সময় আপনি পড়া-লেখার বা অন্ত কোন কাজ করবেন না।

রবীন্দ্রনাথ হেসে বললেন—তথাস্তু।

সেই দিন থেকে রবীন্দ্রনাথ প্রত্যেকদিন দুপুরবেলা একঘন্টা করে বিশ্রাম করতেন।

কবিগুরুর মৃত্যুর পরে গান্ধিজী গেলেন শান্তি-নিকেতনে। বোলপুরে ট্রেণ থেকে নেবে, তিনি হাঁটতে সুরু করলেন, গাড়ী তৈরী ছিল কিন্তু তিনি গাড়ীতে উঠলেন না, বললেন—শান্তি-নিকেতন আমার কাছে পরমতীর্থ। পবিত্র স্থানে পায়ে হেঁটে যাওয়াই আমাদের প্রথা!

শান্তিনিকেতনের আশ্রমিকদের তিনি বললেন—সোনার মন্দির তৈরী করলে এই মহাকবির প্রতি উপযুক্ত শ্রদ্ধা দেখানো হবে না। আমরা যদি তাঁর বাণী স্মরণ করে স্বাধীনতার পথে চলি তবেই বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথকে যে আমরা সম্মান করি তার প্রমাণ দিতে পারবো।

গান্ধিজী বলতেন—প্রত্যেক মানুষের উচিত, কথা দিয়ে কথা রাখা এবং সকল অবস্থাতেই সময় অনুযায়ী কাজ করা।

মহাত্মাজী নিজের জীবনেও এই সময়ানুবর্তিতা মেনে চলার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করতেন। সেই জন্য একটি ট্যাঁক-ঘড়ি সব সময়েই তাঁর কটিবস্ত্রে গোঁজা থাকতো, সারা ভারতের কাজের চাপেও তাঁর সময়ের ভুল হোত না।

১৯২৮ সালে একদিন বিকালে গান্ধিজী গিয়েছিলেন গুজরাট বিদ্যাপীঠে ছাত্রদের এক সভায়। সভা শেষ হতে সাড়ে পাঁচটা বেজে গেল। ছটার আগে গান্ধিজীর আশ্রমে ফিরে যাবার কথা অথচ একখানিও গাড়ী নেই, সন্ধ্যার আগে ফিরতে না পারলে গান্ধিজীকে সারাটা রাত উপবাসে থাকতে হবে। গান্ধিজী ঘড়িটি একবার দেখে নিয়ে বললেন—আর কুড়ি মিনিট মাত্র সময় আছে। তোমরা কেউ আমাকে একখানি সাইকেল জোগাড় করে দিতে পার?

—খুব দিতে পারি, কিন্তু এই বয়সে এতটা পথ কি আপনি সাইকেলে যেতে পারবেন?

—একখানা সাইকেল এনে দিয়েই দেখ না পারি কিনা ?

তখনই দু'খানি সাইকেল জোগাড় হয়ে গেল। গান্ধিজীর সঙ্গে ছিলেন কাকা কালেলকার। দু'জন সাইকেল দু'খানিতে উঠে বসলেন। একটি ছাত্র ছেলে বললো—দেখবেন বাপুজী ধাক্কা লাগাবেন না যেন!

বাপুজী হেসে বললেন—না না তোমাদের মত আমার অতো ভয় নেই। ঠিক সময় আমি আশ্রমে পৌঁছে যাব দেখো।

অনেকদিন সাইকেল চালানোর অভ্যাস নেই। ছেলেরা গান্ধিজীর গাড়ী ঠেলে নিয়ে চললো খানিক পথ। বড় রাস্তায় এসে পড়তেই গান্ধিজী বললেন—আর দৌড়াতে হবে না, তোমরা এবার আমাকে ছেড়ে দাও!

—কিন্তু আপনি যেতে পারবেন তো?

—দেখি না চেষ্টা করে।

ছেলেরা গান্ধিজীকে ছেড়ে দিল, গান্ধিজী বরাবর এগিয়ে গেলেন, হাত এতটুকু টললো না, সোজা পথে কাকা-কালেলকারের সঙ্গে তিনি অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

গান্ধিজী সেদিন ঠিক সময়েই আশ্রমে এসে পৌঁছেছিলেন। সান্ধ্য-ভোজনেরও ব্যতিক্রম হয়নি।

হেসে গান্ধিজী বলেছিলেন—সূর্য চন্দ্র নক্ষত্র নিজেদের কাজ যথারীতি করে যায় এতটুকু ব্যতিক্রম হয় না। আমরা,—মানুষরাই বা তেমন হতে পারবো না কেন।

•

ভারতের স্বাধীনতার প্রচেষ্টাকে বিশ্বের মাঝে, বিশেষতঃ মার্কিনীদের চোখে ছোট করে ধরার জন্য চার্চিল সাহেব চেষ্টার ত্রুটি করেননি, তিনশত অ-ভারতীয় বক্তাকে বৃটিশ দূত-বাস থেকে রীতিমত বেতন দিয়ে রাখা হয়, তারা ছোটখাটো সভা-সমিতিতে বক্তৃতা করে ভারতের বিরুদ্ধে প্রচার চালায়। বেভার্লি-নিকলসের মত নাম-করা লেখকও এই দলে ছিল। তার বই "ভারডিক্ট্ অন ইণ্ডিয়াতে" সে লেখে:

সত্যের প্রতি গান্ধীর কোন নিষ্ঠা নেই।

হিন্দু ধর্মের কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই।

ভারতীয় সাংবাদিকদের কোন বুদ্ধি নেই।

ভারতে সত্যিকারের শিল্প বলে কিছু নেই।

ভারতের সংবাদ-পত্রগুলি গুজব, কুসংস্কার আর অজ্ঞতায় ভরা।

এমন ধরণের খবরও নাকি ওদেশের কাগজে ছাপা হয়েছিল যে গোলটেবিলের সময় গান্ধিজী বিলাতে গিয়ে কোন তরুণী নর্তকীর সঙ্গে নেচে ছিলেন।

এই প্রোপাগাণ্ডার কাজে ভারত সরকার বছরে পঁচিশ লাখ আর বৃটিশ গবর্মেণ্ট বছরে এক কোটি টাকা খরচ করতো, দশ হাজার লোক প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এই কাজের জন্য পারিশ্রমিক পেতো।

এ প্রোপাগাণ্ডার উপর বিশ্বাস রেখেই চার্চিল সাহেব সদম্ভে বলেছিলেন —ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা দেবার জন্য আমি বৃটিশ গবর্মেণ্টের প্রধান মন্ত্রী হইনি।

কিন্তু ১৯৪৫ সালের ১০ই জুলাই এই দম্ভ শেষ হয়ে গেল। চার্চিল সাহেবের গদি দখল করে বসলেন শ্রমিক দলের নেতা ক্লিমেণ্ট এট্‌লি, আর আমেরীর আসন অধিকার করলেন লর্ড পেথিক-লরেন্স।

ডিসেম্বর মাসে বড়লাট ওয়াভেল সাহেব কলকাতায় এক বক্তৃতায় বললেন— 'ভারত ছাড়' বললেই আলিবাবার চিচিংফাঁকের মত কাজ করবে না। রক্তপাত করে এ'সমস্যার সমাধান হবে না, সমাধান করা যাবেও না।···আমি একজন পুরানো সৈনিক, যুদ্ধের বীভৎসতা ও রক্তপাত সম্পর্কে আপনাদের চেয়ে আমার ভালো ধারণা আছে। এই রক্তক্ষয়কে পরিহার করে চলতে হবে, পরিহার করতে আমরা পারবো। নিজেদের মধ্যে আমরা বুঝাপাড়া করবো। স্থির সংকল্প থাকলে তা আমরা পারবো। এই মহান দেশে হিন্দু মুসলমানকে পাশাপাশি বাস করতে হবে, তাদের সর্ত তারাই স্থির করবে···

এই হিন্দুমুসলমান বিরোধের মূল সূত্র হচ্ছে মুসলীম-লীগ আর তার দলপতি মহম্মদ আলি জিন্না। মুসলমান জনসংখ্যা যদিও হিন্দুর সিকি ভাগেরও কম এবং ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনেও মুসলমানদের ত্যাগ নগণ্য তথাপি সুযোগ সুবিধা ভোগ করার বেলা জিন্না মুসলমানদের জন্য সমান সমান দাবী করে। গোলটেবিল বৈঠকে সেজন্য মুসলীম-লীগ কংগ্রেসের বিরোধিতা করে। পরে জিন্না গান্ধিজীকে লেখে : আমি দুঃখের সঙ্গে আপনাকে জানাচ্ছি যে ভারতীয়দের এক জাতি বলে গণ্য করে আপনি ভুল করেছেন, ভারতীয় 'নেশনের' অস্তিত্ব নেই। সুতরাং আপনার বিবেক-বুদ্ধিও ভ্রান্ত।···আপনার প্রবন্ধে যা কিছু লিখেছেন সবই কল্পনামাত্র তার কারণ আপনি সেবাগ্রামে নিরিবিলি জীবন যাপন করেন এবং আপনার চিন্তা ও কার্যক্রম 'অন্তরের বাণী' দ্বারা পরিচালিত হয়। বাস্তবতা—সাধারণ লোকে যাকে বলে 'প্রত্যক্ষ রাজনীতি'—তার সঙ্গে আপনার যোগাযোগ নেই বললেই হয়।··· ঘটনার প্রবাহ দ্রুতপ্রবাহমান। দর্শন ও ধর্মতত্ত্ব সম্পর্কে হরিজন কাগজে আপনার দুর্বল আলোচনা, খদ্দর, অহিংসা ও সুতাকাটা সম্পর্কে আপনার অদ্ভুত নীতি ভারতের স্বাধীনতা আনতে পারবে না। কাজ ও রাজনীতিক দূরদর্শিতাই আমাদের অগ্রগমনে সহায়তা করবে।···

গান্ধিজী তার উত্তরে লেখেন—এমন একদিন ছিল যখন প্রত্যেক মুসলমানই ভারতবর্ষকে নিজের মাতৃভূমি বলে মনে করতো। আলি-ভাইয়েরাও তা করতেন। সে মিথ্যাকথা ও ধাপ্পাবাজী, এ কথা মুহূর্তেকের জন্য বিশ্বাস করতে আমরা প্রস্তুত নই। সহকর্মীদের সন্দেহ করার চেয়ে আমি অন্ধ হতেও রাজী আছি।...আমি ছেলেবেলা থেকেই হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িক ঐক্যে বিশ্বাস করি।...আমি যখন আফরিকায় ছিলাম এক মুসলমান মক্কেলের মামলা লড়ে তাদের জিতিয়ে দিই, তাদের আমি কখনও অবিশ্বাস করিনি। আমি আফ্রিকা থেকে হতাশ হয়ে অথবা পরাজিত হয়ে ফিরিনি। আমার কোন কোন মুসলমান বন্ধু আমাকে যে গালি-গালাজ দেন তা আমি গ্রাহ্য করি না। আমি জানি না আমি এমন কি করছি যা তাদের ক্ষুণ্ণ করতে পারে।...আমি মুসলমানদের সঙ্গে আহার গ্রহণ করি। জাতি ধর্ম নির্বিচারে সকলের সঙ্গেই আমি আহার গ্রহণ করি। কাউকেই আমি ঘৃণা করি না, আমার অন্তরে ঘৃণার স্থান নেই।...জিন্না সাহেব অতীতে কংগ্রেসী ছিলেন, এখন তিনি ভুল পথে চলেছেন বলে মনে হয়। আমি প্রার্থনা করি তিনি দীর্ঘজীবি হোন, এবং কামনা করি তিনি আমার পরেও বেঁচে থাকুন। এমন একদিন নিশ্চয়ই আসবে যেদিন তিনি বুঝতে পারবেন আমি কোনদিন তাঁর প্রতি কোন অন্যায় করিনি, মুসলমানদের উপর কোন অবিচার করিনি। মুসলমানদের সততার উপর আমার পূর্ণ আস্থা আছে, যদি তারা আমাকে হত্যাও করে তথাপি আমি কোনদিন তাদের নিন্দা করবো না।...

কিন্তু জিন্নার কাছে নীতি ও যুক্তির কোন বালাই নেই। স্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্‌সের কাছে তিনি স্পষ্ট বললেন—ভারতের স্বাধীনতা আমি চাই না।

আগা-খাঁ-প্রাসাদের বন্দীবাস থেকে গান্ধিজী যখন জিন্নাকে লিখলেন নতুন করে মুসলীম-লীগের সঙ্গে একটি বুঝাপড়ার আলোচনা চালাবার উদ্দেশ্যে। তখন জিন্না তার ভাবার্থ করলো—মুসলীম-লীগকে গবর্মেণ্টের বিরুদ্ধে লাগিয়ে দিয়ে নিজেকে জেলখানা থেকে মুক্ত করে নেবার এ একটি চাল মাত্র।

তথাপি গান্ধিজী কোনদিন জিন্না সম্পর্কে কোন কটূক্তি করেন নি, কারণ গান্ধিজীর নীতি ছিল :

ন পরেসং বিলোমানি, ন পরেসং কথা কথং
অত্তনো ব অভিকৃখেয্য কতানি অকতানি চ।

[ পরের পরুষ বাক্য ও কোন কথায় কর্ণপাত না করাই ভালো। তার চেয়ে নিজের কৃত ও অকৃত কাজ বিশ্লেষণ করে দেখা ও আত্ম দর্শনই শ্রেয়ঃ।—ধর্মপদ ]

১৯৪৬ সালের গোড়ার দিকে বিলাত থেকে এলো পার্লামেন্টের কয়েক জন সদস্য। তারা ফিরে যাবার পর মার্চ মাসে এলেন তিনজন মন্ত্রী—ভারত সচিব লর্ড পেথিক-লরেন্স, ব্যবসা সচিব স্যার ষ্ট্যাফোর্ড-ক্রিপ্‌স্‌ ও নৌবলাধ্যক্ষ মিষ্টার এ, ভি, আলেকজাণ্ডার। দিল্লীর বড়লাট ভবনের কুড়ি খানি ঘর নিয়ে তাঁদের আপিস বসলো। ২৭ শে মার্চ থেকে ১২ই মে পর্যন্ত ভারতের প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দল ও নেতাদের সঙ্গে তাঁরা আলাপ-আলোচনা করলেন। কিন্তু শেষ অবধি মুসলীম-লীগের সঙ্গে তাঁদের বোঝাপাড়া হোল না।

মহাত্মা গান্ধিজীর সঙ্গে স্যার পেথিক-লরেন্স চার বার দেখা করেন। গান্ধিজী ছিলেন দিল্লীর ভাংগী পল্লীতে, ক্রিপ্‌স্‌ সাহেব সেখানে এসে তাঁর সঙ্গে দেখা করলেন, তারপর ১লা এপ্রিল লর্ড লরেন্স গান্ধিজীর সঙ্গে কথাবার্তা কইলেন ৭২ মিনিট।

৩রা এপ্রিল সকাল বেলা আবার গান্ধিজীর সঙ্গে কথা হোল।

৬ই মে সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার সময় মন্ত্রী মিশন ও বড়লাট গান্ধিজীর সঙ্গে নব্বুই মিনিট আলোচনা করেন।

১১ই মে সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় আবার গান্ধিজীর সঙ্গে কথা হয়।

১৬ই মে মন্ত্রী-মিশন তাঁদের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলেন—প্রদেশগুলিকে তিন দলে ভাগ করা হবে—ক, খ, গ। ক হোল হিন্দুপ্রধান প্রদেশ, খ হোল মুসলমান প্রধান প্রদেশ, গ হোল যেখানে দুই সম্প্রদায়ই প্রায় সমান।...সব প্রদেশ থেকে নির্বাচিত প্রতিনিধিরা গণপরিষদ গঠন করবে। তারা স্বাধীন ভারতের আইন-কানুন তৈরী করবে।... এই সময় এক অন্তবর্তী গবর্মেণ্ট সাময়িকভাবে কাজ করবে! বৃটিশ বাহিনী ভারতবর্ষ ছেড়ে চলে যাবে।...ভারতবাসীরা এক জাতি, হিন্দুস্থানে ও পাকিস্তানে ভাগ করা চলবে না।

গান্ধিজী হরিজন পত্রিকায় লিখলেন—আমরা যা ভেবেছিলাম তা হয়নি, তার কারণ আমাদের নিজেদের দুর্বলতা... যদিও ভয় পাবার কারণ আছে যে মন্ত্রীরা মুখে যা বলেছেন কাজে তা করবেন না, আমি কিন্তু তার কোন পূর্বাভাস দেখছি না।

গান্ধিজী বুঝেছিলেন ঠিকই, গোলযোগ বাধালো আমাদের দেশের লোকই—মুসলীম-লীগ ও তাদের নেতা জিন্না। তারা প্রথমেই দাবী করে মুসলমান-প্রধান ছ'টি প্রদেশে তারা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা করবে, তাদের গণপরিষদও করবে আলাদা। ভারতীয়েরা এক জাতি নয়। অন্তবর্তী সরকারেও যতগুলি মন্ত্রী থাকবে তার মধ্যে অর্ধেক লীগের লোক হওয়া চাই।... আরো অনেক আপত্তি তারা তুললো।

কিন্তু কংগ্রেসীরা এর কোনটিই মেনে নিতে পারলেন না।

লীগারেরা সেইজন্য প্রথমে অন্তবর্তী সরকারে যোগ দিল না। পরে লর্ড ওয়াভেলের চেষ্টায় যদিও তারা মন্ত্রীত্ব নিল, তবু গণপরিষদে কিছুতেই যোগ দিল না।

লর্ড পেথিক-লরেন্স পাকিস্তান সম্পর্কে বলেছিলেন—সাম্প্রদায়িক সমস্যা সমাধান হিসাবে, একটি আলাদা মুসলীম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করার কথা আমরা মেনে নিতে পারি না। মুসলীম-লীগ যে পাকিস্তানের কথা বলছে, তাতে শুধু মুসলমান প্রজাই থাকবে না, অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকও থাকবে শতকরা চল্লিশ জন, কোন কোন বিশেষ জায়গায় সংখ্যালঘুরাই হবে সংখ্যাগরিষ্ঠ। যেমন কলিকাতা নগরীর কথাই ধরা যাক, এখানকার মুসলমান জনসংখ্যা তিনভাগের একভাগ মাত্র। তার উপর পাকিস্তান রাষ্ট্র যদি ভারত থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় তাহলে সৈন্যদল দ্বিধা বিভক্ত হয়ে ভারতের প্রতিরোধ ক্ষমতা দুর্বল হয়ে যাবে।...সেই কারণে সেই প্রস্তাব গ্রহণ করার উপদেশ দিতে আমরা পারি না।

মুসলীম-লীগ এর উত্তরে 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম' ঘোষণা করলো! জিন্না লীগের সভায় বললো—মন্ত্রী মিশনের বুদ্ধি পক্ষাঘাত' গ্রস্ত। তাদের বিবৃতিতে না আছে কোন রাজনীতিক ধর্মবোধ, না আছে কোন সততা ও নীতিজ্ঞান।...যার সততা ও ন্যায় বোধ আছে সেই বলবে মুসলীম-লীগ উচ্চতর ও মহত্তর বিচার বুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত।...আমরা তার পরিবর্তে পেয়েছি অবজ্ঞা ও ঘৃণা। শুধু আমরাই কি যুক্তি, নীতি, সততা ও সাধুতা মেনে চলবো, যখন অপর পক্ষে কংগ্রেস শঠতা করবে? ... কংগ্রেস ও বৃটিশের বিরুদ্ধে মুসলমানদের মনে আজ যে ঘৃণা জেগেছে, তা এর আগে আর কোন দিন জাগেনি।...আমরা আজ বুঝতে পেরেছি যে মুসলীম ভারতের পক্ষে এটা সবচেয়ে বড় আশীর্বাদ।...এখন আর আপোষের স্থান নেই, আমরা এখন এগিয়ে যাব। কংগ্রেস ও বৃটিশ তাদের পিস্তল আমাদের পানে তুলে ধরেছে, বৃটিশের পিস্তল আধিপত্যের আর কংগ্রেসের পিস্তল গণসংগ্রাম ও অসহযোগিতার। আমরাও পিস্তল তৈরী করেছি, এবং সেই পিস্তল ব্যবহার করার জন্য আমরাও আজ প্রস্তুত! মানুষের বিচার বুদ্ধিতে যতটা বিচার করা চলে তা করে, এবং দায়িত্বের সমস্ত ঝুঁকি নিয়েই আমরা 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম' ঘোষণা করলাম।...

১৬ই আগষ্ট প্রত্যক্ষ-সংগ্রাম সূচিত হোল কলকাতা সহরে, বৃটিশের বিরুদ্ধে নয় হিন্দুদের বিরুদ্ধে, শত সহস্র নিরীহ নরনারীর রক্তে অনেক গৃহ রক্তাক্ত হোল, রাজপথ হোল শবাকীর্ণ! অতীত দিনে দিল্লী-নগরীকে নাদির-শা যে ভাবে রক্তরঞ্জিত করেছিল, বাংলার লীগ মন্ত্রীরা কলিকাতার বুকে তার প্রতিবিম্ব ফেললো।

কলিকাতার পরেই ১০ই অক্টোবর প্রত্যক্ষ-সংগ্রামীরা হানা দিল নোয়াখালি জেলায়। ২০০ বর্গমাইল স্থান ব্যেপে ২০,০০০ মুসলমান গুণ্ডা ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে হিন্দুদের উপর ব্যাপক ও বেপরোয়া আক্রমণ চালায়। তাদের আগে থেকেই তৈরী রাখা হয়েছিল। লীগ নেতারা তাদের অস্ত্র ও পেট্রল দিয়ে সাহায্য করে। নোয়াখালি থেকে হাংগামা ত্রিপুরাতেও ছড়িয়ে পড়ে। পুলিশ কোন বাধা দেয় নি। লীগ মন্ত্রীসভা হিসাব দেয়: হাংগামায় নোয়াখালিতে ১৭৮ জন ও ত্রিপুরাতে ৪০ জন খুন হয়। তাছাড়া মিলিটারী ও পুলিশের গুলিতে মরে ৬৭ জন। নোয়াখালিতে ২২৬৬টি গৃহ ও ত্রিপুরাতে ২১৭০টি গৃহ লুণ্ঠিত হয়। দু' জেলায় ২৫৯৯টি গৃহ ভস্মীভূত হয়, ত্রিপুরা জেলায় কুটির ভস্মীভূত হয় ৬৫২০টি। নোয়াখালিতে কতজন হিন্দুকে যে মুসলমান করা হয়, তার হিসাব নেই। ত্রিপুরাতে ধর্মান্তরিত লোকের সংখ্যা ৯৮৯৫ জন। কলিকাতা, নোয়াখালি ও ত্রিপুরা থেকে কত মেয়ে যে অপহৃত হয় তার হিসাব কেউ রাখে না।

এই হিসাবটি মুসলীম-লীগের দেওয়া হিসাব, আসল ব্যাপার এর চেয়ে গুরুতর হওয়াই স্বাভাবিক।

বহুদিন অবধি এই সব অঞ্চলে হিন্দুদের নিরাপদে চলাফেরা করা অসম্ভব ছিল। লোক দেখিয়ে পুলিশ নোয়াখালিতে ১০৬১ জনকে ও ত্রিপুরাতে ১১৩৬ জনকে গ্রেপ্তার করে, কিন্তু তাদের মধ্যে ৯০৯ + ৯১২ জনকে ছেড়ে দেয়। পাঁচদিন অবধি এই হাংগামার খবর নোয়াখালির বাইরে আসতে দেওয়া হয় নি!

খবর শুনে গান্ধিজী বেদনায় ম্রিয়মান হয়ে গেলেন। তিনি তখন ছিলেন দিল্লীর ভাঙ্গী পল্লীতে। একদিন সন্ধ্যায় প্রার্থনা-সভায় তিনি বললেন—যেদিন থেকে আমি নোয়াখালির খবর শুনেছি, সেইদিন থেকে আমি আমার কর্তব্যের কথা ভাবছি। ঈশ্বর আমাকে পথ দেখাবেন।

চল্লিশ কোটি নরনারীর রাষ্ট্র জীবনের জটিলতা তখন রাজধানীর বুকে জট পাকাচ্ছে মহাত্মাজী সেই জটের এক একটী গ্রন্থি উন্মোচনে ব্যস্ত। কিন্তু সেই রাজনীতিকে ছাপিয়ে উঠলো, দূরাগত শিশুর আর্তনাদ, লাঞ্ছিতা নারীর অশ্রুজল, গৃহহারা সর্বহারাদের দীর্ঘশ্বাস। ১৮ই অক্টোবর গান্ধিজী বললেন—আমি আগামী কাল কলকাতায় রওনা হব, সেখান থেকে যাব নোয়াখালি। নারীর দুঃখের কাহিনী সর্বদাই আমাকে বিচলিত করে, আমি তাদের চোখের জল মুছাতে যাচ্ছি, তাদের সাহস দিতে যাচ্ছি। তারা তো কোন অপরাধ করেনি।

মহাত্মাজীর শরীর তখন অসুস্থ, রক্তের চাপে (ব্লাড প্রেসার) ভুগছেন। কিন্তু

দৈহিক স্বাচ্ছন্দ্য কোন দিনই তাঁর কাছে কর্তব্যের চেয়ে বড় হয়ে দেখা দেয়নি, তিনি বললেন—শরীর আমার ভাল নয়, নোয়াখালি যাওয়া খুবই কষ্টকর, তবু কর্তব্য আমাকে করতেই হবে!

সেবাগ্রামের আশ্রমিকদের তিনি নির্দেশ দিলেন—আশ্রমের পুরুষ ও নারী কর্মীদেরকে একক এক একটি উপক্রুত গ্রামে গিয়ে সেখানকার নির্যাতিত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রাণ ও মানের রক্ষকরূপে অবস্থান করতে হবে, এবং প্রয়োজন হলে নিজের জীবন বিনিময়েও তাদের রক্ষা করতে হবে।

জনৈক শুভাকাঙ্খী বন্ধু শঙ্কা জানালো—রক্তপিপাসু নরঘাতকেরা যুক্তির কোন ধার ধারে না, সেদিন তারা একজন আশ্রম-কর্মীকে খুন করেছে।

মহাত্মাজী বললেন—সেই জিঘাংসাকে জয় করার জন্যই আমার অভিযান, সেই প্রবৃত্তিকে প্রশমিত করার জন্যই আমার সাধনা!···

গান্ধিজী এলেন সোদপুরে [ ২৯. ১০. ৪৬ ]। সেখানে এক প্রার্থনা সভায় তিনি বললেন—শিশুকাল থেকেই আমি অন্যায়কে ঘৃণা করতে শিখেছি, কিন্তু অন্যায়কারীকে কোনদিনই ঘৃণা করিনি। মুসলমানেরা যদি কোন অন্যায়ও করে থাকেন, তবু তাঁরা আমার বন্ধুই থাকবেন!

সোদপুর থেকে গান্ধিজী ৭ই নবেম্বর চৌমুহানী এসে পৌছলেন, সঙ্গে এলেন সস্ত্রীক সতীশ দাশগুপ্ত আর গান্ধিজীর মন্ত্রশিষ্যেরা। সেখান থেকে সুরু হোল পদব্রজে গ্রাম থেকে গ্রামান্তর পরিক্রমা।

নোয়াখালি জেলায় বিশেষ রেলপথ নেই। ত্রিপুরা জেলা থেকে সুধারাম সহর, আরেক দিকে চট্টগ্রাম ও ত্রিপুরা থেকে ফেণী সহর অবধি রেলপথ আছে। বাকী সবই কাঁচা রাস্তা। ফেণী, চৌমুহানী, রামগঞ্জ, লক্ষ্মীপুর, সোনাগাজী, সোনাইমুড়ী, কোম্পানীগঞ্জ, নোয়াখালী প্রভৃতি অঞ্চলে পাকা রাস্তাও আছে। সন্দীপ, টুমচর, চর-বেলে, চর-বারখিরী, চর-নলচিরা, চর-আমাহুল্লা, চর-লরেন্স প্রভৃতি দ্বীপগুলিও নোয়াখালির অন্তর্গত, সেখানে যাতায়াতের ব্যবস্থা জলপথে। মহাত্মাজী এই সব অঞ্চলে নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারী মাস পর্যন্ত পদব্রজে প্রায় চারশো মাইল পথ পরিভ্রমণ করেন।

| | | |
|---|---|---|
| নভেম্বর ৭ই | ··· | চৌমুহানী |
| ,, ৮ই | ··· | গোপেরবাগ ও দত্তপাড়া |
| ,, ১১ই | ··· | নোয়াখোলা, সোনাচক, খিলপাড়া |
| ,, ১২ই | ··· | গোমাতলী |

| | | |
|---|---|---|
| নভেম্বর ১৩ই | ... | লক্ষীপুর |
| ,, ১৪ই | ... | কাজিরখিল |
| ,, ১৫ই | ... | নন্দনপুর |
| ,, ১৬ই | ... | করপাড়া |
| ,, ১৭ই | ... | দশঘরিয়া ও অন্য একটী পল্লী |
| ,, ১৯শে | ... | মধুপুর |
| ,, ২০শে-২রা জানুয়ারী | ... | শ্রীরামপুর |
| ,, ২৬শে | ... | রামগঞ্জ |
| জানুয়ারী ২রা | ... | চণ্ডীপুর |
| ,, ৭ই | ... | মমিনপুর |
| ,, ৮ই | ... | ফতেপুর |
| ,, ৯ই | ... | দাসপাড়া |
| ,, ১০ই | ... | জগৎপুর |
| ,, ১১ই | ... | লামচর |
| ,, ১২ই | ... | করপাড়া |
| ,, ১৩ই | ... | সাহাপুর |
| ,, ১৪ই | ... | ভাটিয়ালপুর |
| ,, ১৫ই | ... | নারায়ণপুর |
| ,, ১৬ই | ... | রামদেবপুর |
| ,, ১৭ই | ... | পরকোট |
| ,, ১৮ই | ... | বদলকোট |
| ,, ১৯শে | ... | আত্তাখোরা |
| ,, ২০শে | ... | শিরণ্ডী |
| ,, ২১শে | ... | কেথুরী |
| ,, ২২শে | ... | পানিয়ালা |
| ,, ২৩শে | ... | দলতা |
| ,, ২৪শে | ... | মুরাইম |
| ,, ২৫শে | ... | হীরাপুর |
| ,, ২৬শে | ... | বাণশা |
| ,, ২৭শে | ... | পাল্লা |

| | | |
|---|---|---|
| জানুয়ারী ২৮শে | ... | পাঁচগাঁও |
| ,, ২৯শে | ... | অম্লাগ |
| ,, ৩০শে | ... | আমকী |
| ,, ৩১শে | ... | নবগ্রাম |
| ফেব্রুয়ারী ১লা | ... | আমিষপাড়া |
| ,, ২রা | ... | সাতঘরিয়া |
| ,, ৩রা ও ৪ঠা | ... | সাধুরখিল |
| ,, ৫ই | ... | শ্রীনগর |
| ,, ৬ই | ... | ধর্মপুর |
| ,, ৭ই | ... | প্রসাদপুর |
| ,, ৮ই | ... | নন্দীগ্রাম |
| ,, ৯ই, ১০ই | ... | বিজয়নগর |
| ,, ১১ই | ... | হামচাঁদী |
| ,, ১২ই | ... | কাফিলাতলী |
| ,, ১৩ই | ... | পূর্ব কেরোয়া |
| ,, ১৪ই | ... | পশ্চিম কেরোয়া |
| ,, ১৫ই, ১৬ই | ... | রায়পুরা |
| ,, ১৭ই | ... | দেবীপুর |
| ,, ১৮ই | ... | আলুনিয়া |
| ,, ১৯শে | ... | বিরামপুর |
| ,, ২০শে | ... | বিশকাটালী |
| ,, ২১শে | ... | কমলাপুর |
| ,, ২২শে | ... | চরকৃষ্ণপুর |
| ,, ২৩শে | ... | চরসোলাদি |
| ,, ২৪শে থেকে ১লা মার্চ পর্যন্ত হাইমচর | | |

সাধারণতঃ এই পরিক্রমাকে তিনটী পর্যায়ে ফেলা হয় : চৌমুহানী থেকে শ্রীরামপুর অবধি সূচনা পর্ব ( ৭ই নভেম্বর থেকে ১লা জানুয়ারী ), শ্রীরামপুর থেকে সাধুরখিল অবধি প্রথম পর্যায় ( ২রা জানুয়ারী থেকে ৪ঠা ফেব্রুয়ারী ), এবং সাধুরখিল থেকে হাইমচর অবধি দ্বিতীয় পর্যায় ( ৫ই ফেব্রুয়ারী থেকে ১লা মার্চ )।

গান্ধিজী বলেন—এ আমার তীর্থযাত্রা।

এই তীর্থযাত্রার পথে অহিংসার শ্রেষ্ঠ সেবক ভারতের পুণ্যভূমিতে হিংসার যে নির্মম রূপ প্রত্যক্ষ করেন, বিংশশতাব্দীর ইতিহাসে তার তুলনা নেই। যুদ্ধরত জাতি সংগ্রাম ঘোষণা করে যুদ্ধে নামে, প্রতিপক্ষকে মানসিক প্রস্তুতির সময় দেয়, কিন্তু একই দেশের মানুষ ধর্মের দোহাই দিয়ে পুরুষানুক্রমে পরিচিত নিজের প্রতিবেশীর উপর এমন হিংস্র হয়ে উঠতে পারে তা সভ্যজগতের কল্পনাতীত, তার উপর যে দেশের নেতা অহিংসার একনিষ্ঠ সাধনা করে চল্লিশ কোটি নরনারীকে স্বাধীনতার তোরণে এনে পৌঁছে দিয়েছেন, সেই দেশে, তাঁরই বর্তমানে। গান্ধিজী দেখেছেন, কত বাড়ীর মেঝে ও দেয়ালে তখনো রক্তের দাগ কালো হয়ে আছে, কত ঘরের কোণে কঙ্কালের স্তূপ, কত গৃহ ভস্মীভূত হয়ে শুধু ভস্মশেষ পড়ে আছে। মহিলা এসে বলেছে—গায়ে করে তাদের মাথার সিঁদুর মুছে দেওয়া হয়েছে, হাতের শাঁখা ভেঙে দেওয়া হয়েছে, জোর করে রান্না করানো হয়েছে গোমাংস। সর্বহারা বিধবা এসে নীরবে চোখের জল ফেলেছে। কন্যাহারা এসে বলেছে—আমার মেয়েকে ধরে নিয়ে গেছে, আপনি তাকে ফিরিয়ে এনে দিন! সর্বহারা বৃদ্ধ এসে কেঁদে বলেছে—সব ছিল কিন্তু আজ আর কেউ নেই, সাতপুরুষের ভিটাও পুড়ে ছাই হয়ে গেছে!

কি বলে মহাত্মাজী এদের সান্ত্বনা দেবেন! তাঁর বাণী স্তব্ধ হয়ে যায়! তিনি চারিপাশে আলোর দিশা খোঁজেন। তাঁর অন্তরে ধ্বনিত হয়—চতুর্দিক অন্ধকার! আমাকে কাজ করতে হবে, না হয় কর্ম থেকে বিরত হতে হবে। আমি দেখছি যে, এ-জাতীয় মর্মান্তিক অবস্থায় আমার উপযুক্ত ধৈর্য ও কর্মকৌশল আছে বলে মনে হয় না। মানুষের দুর্গতি অধোগতি আমাকে প্রায়শঃ অভিভূত করে ফেলে, আমি আমার নিজের অসহায়তার মর্মপীড়া অনুভব করি!

ধীরে ধীরে তিনি সান্ত্বনার বাণী উচ্চারণ করেন—কেঁদো না, শুধু কাঁদলেই হারানো জিনিষ ফিরে পাওয়া যায় না, এই পৃথিবীতে কিছুই অবিনশ্বর নয়। একদিন না একদিন সবই ভস্মে পরিণত হবে। একদিন আসবে যখন আমাকে ও তোমাকে চিতানলে ভস্মীভূত হতে হবে। সুতরাং সাহস সঞ্চয় করে মানুষের মত মানুষ হও।

হাজার হাজার বছর আগে পার্থসারথী একদিন এই সত্যই উচ্চারণ করেছিলেন :

—গতাসূনঃ গতাসূংশ্চ নানু শোচন্তি পণ্ডিতাঃ···

জাতস্য হি ধ্রুবোমৃত্যুধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ।···

অমন প্রচণ্ড শীতের মাঝেও গান্ধিজীর দিবসের কর্মসূচীর কোন পরিবর্তন হয়নি। রাত তিনটের সময় তিনি যথারীতি ঘুম থেকে উঠতেন। প্রাতঃকৃত্যাদি শেষ করে বসতেন প্রার্থনায়, প্রার্থনার পর সামান্য ফলের রস পান করতেন। তারপর এক ঘণ্টা বা

তার চেয়ে কিছু বেশী সময় তিনি চিঠিপত্রের উত্তর দিতেন, ডায়েরী লিখতেন এবং চরকা কাটতেন। কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে সাতটার সময় পদব্রজে বেরিয়ে পড়তেন পল্লী ভ্রমণে। বন্ধুর পথে খালি পায়ে হাঁটতে হাঁটতে অনেক সময় পায়ের তলা নীল হয়ে যেত, নতুন গাঁয়ে পৌছে গরম জলে পায়ের কাদামাটি ধুয়ে, কিছুক্ষণ তিনি গরম জলে পা ডুবিয়ে বসে থাকতেন। এই সময়টুকু সাংবাদিক শৈলেন চট্টোপাধ্যায়ের কাছে তিনি বাংলা ভাষা শিখতেন। আধ ঘন্টার মধ্যে বাংলা পাঠ শেষ করে যারা তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসতো তাদের সঙ্গে কথা কইতেন।

বেলা এগারোটার সময় একখানি চাপাটি, খানিকটা দুধ, আনাজ সিদ্ধ ও একটু গ্লুকোজ আহার করতেন। এই চাপাটিখানি তৈরী হোত তিন ছটাক আটা, এব ছটাক সিদ্ধ তরকারী, একটু সোডা আর একটু লবণ দিয়ে।

বেলা বারোটার সময় কিছুক্ষণ দেহে তৈলমর্দন হোত, এই সময়েও সাক্ষাৎপ্রার্থী দের সঙ্গে তিনি কথাবার্তা কইতেন। তারপর স্নান। স্নানের পর একটু ডাবের জল পান করতেন।

বেলা তিনটার সময় কোন মহিলা সভা, অথবা গ্রামসেবক সঙ্ঘের কর্মীদেরকে তিনি উপদেশ দিতেন।

বিকাল পাঁচটার সময় বসতো প্রার্থনা সভা। প্রার্থনার পর স্থানীর অধিবাসীদের কিছু জিজ্ঞাস্য থাকলে তার উত্তর দিতেন, এবং বিভিন্ন বিষয়ে বক্তৃতা করতেন।

সভাশেষে বেরুতেন সান্ধ্যভ্রমনে। হয়তো যেতেন কোন মুসলমান অথবা কোন হিন্দুর বাড়ীতে। ঘড়ি ধরে ঠিক আধঘণ্টা হাঁটার পর তিনি ফিরে আসতেন। সূর্যাস্তের আগে রাত্রির আহার শেষ করতেন। দুপুরে যা খেতেন এবেলাও ঠিক তাই।

রাত আটটার সময় খবরের কাগজ পড়ে তাঁকে শোনানো হোত। তারপর যেটুকু সময় তাঁর হাতে থাকতো স্থানীয় লোকদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করতেন

রাত ন'টায় নিদ্রা।

সদাই গান্ধিজীর কাছে থাকতো যে ট্যাঁক-ঘড়ি, সেই ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে গান্ধিজীর দিবসের কাজ পরিচালিত হোত।

গান্ধিজী এই পল্লী পরিক্রমা করেছিলেন একান্ত একাকী। সঙ্গে অনেকেই যেতে চেয়েছিলেন কিন্তু গান্ধিজী তাঁদেরকে নিরস্ত করেন, বলেন—কারুর বিরুদ্ধে আমার কোন অভিযোগ নেই, আমি শুধু পরীক্ষা করে দেখবো আমি সারাজীবন যে অহিংসার সাধনা করে এসেছি, সেই অহিংসা দিয়ে আমি মানুষের মনের অমানুষিকত

দূর করতে পারি কি না। মানুষে মানুষে যে হানাহানি, মানুষে মানুষে যে দ্বেষ, মানুষ হতে মানুষের যে ভয় বিরাগ, সেই বিকার মানুষের মন থেকে দূর করতে আমার অহিংসা কতটা কার্যকরী আমি জীবন-সায়াহ্নে তাই যাচাই করে যাব। একাজ বহুতে মিলে করার কাজ নয়, কাজেই আমাকে একাই এই পরীক্ষা করতে হবে। তাই আজ আমি একা চলেছি। আজ আমার পশ্চাতে আমার পাশে শতসহস্র অনুচরের প্রয়োজন নেই, কেবলমাত্র ঈশ্বরের দেওয়া শক্তির উপরই আমাকে নির্ভর করতে হবে। তাই আমাকে জন-সাধারণের মাঝে অগ্রসর হতে হবে হিংসা দ্বেষ বিমুক্ত অন্তর নিয়ে। আমার অন্তরে কোন কলুষতা থাকলে আমার সাধনা ব্যর্থ হবে। তাই আমি দীনভাবে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করছি, তিনি যেন আমার মন থেকে সকল কালিমা দূর করেন, আমার আত্মায় তিনি যেন শক্তি দেন।...এই আমার তীর্থযাত্রা। সকল সংস্কার মুক্ত হয়ে সর্বস্ব দান করতে করতে দীন ভাবে নগ্নপদে তীর্থস্থলের দিকে অগ্রসর হওয়াই ভারতের তীর্থযাত্রীর আদর্শ। তাই আজ আমি নগ্নপদে চলেছি আমার তীর্থ পরিক্রমায়।...

গান্ধিজীর সঙ্গে ছিলেন অধ্যাপক নির্মল কুমার বসু, নাতনী মনু গান্ধী, উর্দু ভাষায় চিঠিপত্র লেখক সৈয়দ মহম্মদ আহমদ হুনর, আজাদ-হিন্দ ফৌজের কর্ণেল জীবন সিং এবং একদল সাংবাদিক। সাংবাদিকের দল যেন ভারী হয়ে না উঠে, সেইজন্য পরে যারা এসেছিল তাদেরকে তিনি সটান বিদায় করে দেন, এর মধ্যে স্বজাতী ও বিদেশীর কোন পার্থক্য করেননি। মাদ্রাজের হরিজন পত্রিকার প্রতিনিধিকেও চলে আসতে হয়েছে, আবার শিকাগো ডেলিনিউজের প্রতিনিধিকেও ফিরে যেতে হয়েছে।

গান্ধিজীর সঙ্গে থাকতো গান্ধিজীর আপিস—একটি মাঝারী ধরণের টিনের বাকস আর একটি ছোট টাইপ্‌রাইটার মেশিন। এই বাকসটির মধ্যে থাকতো দরকারী যত কাগজ-পত্র আর তার তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন নির্মলকুমার বসু। দেশ-বিদেশ থেকে নানা ধরণের চিঠি নানা অভাব-অভিযোগের কথা প্রতিদিন গান্ধিজীর কাছে এসে পৌছাতো, তাছাড়া সংবাদপত্রে কত রকমের কত বিবৃতি বেরুতো। নির্মলবাবু প্রতিদিন সেই সমস্ত বাছাই করে খান চল্লিশেক চিঠি প্রত্যহ গান্ধিজীকে দেখাতেন এবং গান্ধিজীর নির্দেশমত যেগুলির উত্তর দেওয়া প্রয়োজন উত্তর লিখে দিতেন।

এই চিঠির ব্যাপারে গান্ধিজীর কাছে ছোটবড় খ্যাতি অখ্যাতির বিচার ছিল না, উড়িষ্যার কংগ্রেস-সভানেত্রী মালতী চৌধুরীর চিঠির উত্তর দিতেন, আবার নোয়াখালির অখ্যাত পল্লী ধর্মপুরের তেরো-চৌদ্দ বছরের এক ছোট মেয়ে কমরুন্নেসাকে লিখতেও তাঁর সময়ের অভাব হয় নি।

## আমাদের গান্ধিজী

বাংলা সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী একদল পুলিশও থাকতো গান্ধিজীর পিছনে, আড়ালে। এই পুলিশ দলকে সরিয়ে নেবার জন্ম গান্ধিজী বার বার অনুরোধ জানান, কিন্তু পাছে মহাত্মাজী ও তাঁর সঙ্গীরা কোন রকমে বিপন্ন হয়ে পড়েন সেজন্য বাংলা সরকার সে অনুরোধ রাখেন নি।

গান্ধিজী বলেছিলেন—এখন আমি বাঙালী, এবং নোয়াখালীর অধিবাসী। আমি এখানে এসেছি তাদের কাজের অংশীদার হতে, দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপন করতে!

বাঙালী গ্রামবাসীর সঙ্গে বাংলায় কথা বলার জন্য, তিনি এই আটাত্তর বছর বয়সে আবার নতুন করে বাংলা ভাষা শিখতে আরম্ভ করেন। বালিকা কমরুন্নেসাকে তিনি বাংলা ভাষাতেই চিঠি লিখেছিলেন :

> তোমার পত্র পাইয়া সুখী হইলাম। কিন্তু এত প্রশংসা করিয়াছ কেন মা, আমি তো সকলের মত একজন মানুষ। আমি অবিরত এই প্রার্থনাই করি—ঈশ্বর-আল্লা তেরী নাম, সবকো সম্মতি দে ভগবান। ঈশ্বর তোমার নাম হে ভগবান, আপনি সকলকে শুভ মতি দান করুন। আমার অন্তরের এই প্রার্থনার সহিত তুমিও স্বীয় প্রার্থনা যোগ করিও।
>
> শুভাশীর্বাদ—ইতি
>
> মোঃ কঃ গান্ধী।

এই সম্মতির প্রার্থনা ব্যর্থ হয় নি, নোয়াখালির চিন্তাশীল মুসলমানেরা তাদের ভুল বুঝতে পেরেছিল, পরিবর্তনের সূচনা দেখা দিয়েছিল তাদের মনে। ভাটিয়ালপুরের এক মুসলমান গান্ধিজীর কাছে এসে বলে—মুসলমানেরা অনেক হিন্দু মন্দির ভেঙেছে কিন্তু ভবিষ্যতে কোন মন্দির আক্রান্ত হলে আমি আমার জীবন দিয়ে তা রক্ষা করবো।

কেথুরীতে মুসলমানেরা বলে—দুষ্কর্ম আমি করি আর অন্যেই করুক দোষটা আমাদের সমগ্র মুসলমান সমাজের উপরেই এসে পড়েছে।

কাফিয়াতলীতে বসিরুল্লা কেরাণী নামে একজন মুসলমান বলে—আমরা শান্তি চাই, শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য আমরা চেষ্টা করছি। দুর্বৃত্তদের পাগলামির জন্য আমাদের হিন্দু ভাইয়েরা যে দুর্ভোগ ভুগেছে, আমরা তা থেকে একেবারে বাদ পড়িনি!

ওখানকার মুসলমান কর্মীরা বলে—সাধারণ পল্লীবাসী মুসলমান যাদেরকে একদিন

ভুল বুঝিয়ে ক্ষেপিয়ে তোলা হয়েছিল, তারা তাদের ভ্রম বুঝেছে এবং কৃতকর্মের জন্য অনুশোচনাও করছে, আমরা সকলেই এখন শান্তি স্থাপনের জন্য উৎসুক।

এই ধরণের কথা গান্ধিজী আরো অনেকের মুখে শোনেন।

গান্ধিজী কর্মীদের নির্দেশ দিয়েছিলেন—তোমরা মুসলমান ভাইদের গ্রামে যাও ও তাদের সেবা কর। তাদের বুঝিয়ে দাও যে তোমরাই তাদের যথার্থ শুভাকাঙ্খী প্রতিবেশী···আশ্রমের পুরুষ ও নারী কর্মীগণকে একক এক একটি উপদ্রুত গ্রামে গিয়ে সেখানকার নির্যাতিত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রাণ ও মানের রক্ষক রূপে অবস্থান করতে হবে। এই দুর্বহ কাজে দায়িত্ব গ্রহণ করতে যদি কেউ অনিচ্ছুক হন, তিনি স্বচ্ছন্দে অন্য কোন গঠনমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করতে পারেন।...

এই নির্দেশ মেনে নিয়ে সেবাগ্রাম ও খাদি প্রতিষ্ঠানের কর্মীরা নোয়াখালির গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে পড়েন, গাঁয়ে গাঁয়ে তাঁদের প্রধান কর্মকেন্দ্র স্থাপিত হয়:

১। শ্রীরামপুরে—মহাত্মা গান্ধী, তাঁর ষ্টেনোগ্রাফার শ্রীপরশুরাম ও সেক্রেটারী শ্রীনির্ম্মল কুমার বসু। এটি পরে গান্ধিজীর সঙ্গে ভ্রাম্যমান কেন্দ্রের রূপ গ্রহণ করে।

২। চাংগীরগাঁও—ডাক্তার সুশীলা নায়ার ও শ্রীসৌরীন্দ্র কুমার বসু।

৩। কড়পাড়া—শ্রীমতী সুশীলা পাই ও শ্রীদেবী চৌধুরী।

৪। ভাটিয়ালপুর—শ্রীপ্যারীলাল ও শ্রীবিশ্বরঞ্জন সেন।

৫। পরকোট—শ্রীকানু গান্ধী ও শ্রীভূপালচন্দ্র কামার।
পরে এই কেন্দ্র রামদেবপুরে স্থানান্তরিত হয়।

৬। পানিয়ালা—শ্রীমতী আভা গান্ধীর পিতা শ্রীঅমৃতলাল চট্টোপাধ্যায়।

৭। চরমণ্ডল—শ্রীঠক্কর বাপা, শ্রীমতী আভা গান্ধী ও শ্রীঅরুণাংশু দে।
পরে এই কেন্দ্রটি ভেঙ্গে—হাইমচরে—শ্রীঠক্কর বাপা।
শিরণ্ডী—শ্রীমতী আভাগান্ধী ও শ্রীঅরুণাংশু দে

৮। মান্দোরা—শ্রীদেবেন্দ্র নাথ সরকার

৯। দশঘরিয়া—শ্রীপ্রভুদাস প্যাটেল, ও শ্রীসাধনেন্দ্র মিত্র।

১০। আমিষাপাড়া—শ্রীসুধীর চন্দ্র লাহা ও শ্রীউপেন্দ্র নাথ দাস।

১১। কাজিরখিল—শ্রীসতীশ চন্দ্র দাসগুপ্ত।

প্রতিদিন কাজিরখিল ক্যাম্প্ থেকে শ্রীসতীশচন্দ্র দাশগুপ্তের সম্পাদনায় 'শান্তিমিশন দিনলিপি' নামে একখানি খবরের কাগজ সাইক্লোষ্টাইলে ছাপা হয়ে প্রকাশিত হোত।

তাতে দৈনন্দিন সংবাদ, কর্মীদের কার্যাবলী ও নির্দেশ দেওয়া থাকতো। একটি ব্যাটারী চালিত রেডিও বসানো হয়েছিল তাতে প্রত্যহ সকালে ও সন্ধ্যায় সংবাদ সংগ্রহ করে লিপিবদ্ধ করে লোক মারফৎ গান্ধিজীর কাছে পাঠানো হোত। একটি দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল, এখানে রোগীদের চিকিৎসা ও পরিচর্যার ব্যবস্থা করা হয়। তাছাড়া কর্মীরা গাঁয়ে গাঁয়ে বনিয়াদী শিক্ষার কাজ ও গঠনমূলক কাজ চালাতে থাকেন।

কর্মীদের উৎসাহ দিয়ে গান্ধিজী বলেন—আমার চরিত্র যদি নিষ্কলঙ্ক হয়, মনে মুখে যদি আমি এক হই, তাহলে আমার কাজের ফল ফলবেই। আমার মৃত্যুতেও তা ক্ষয় হবে না। কি ব্যক্তিগত জীবনে, কি সার্বজনীন জীবনে একই রূপ নিখুঁৎ ও পবিত্র হওয়া চাই। সেবার প্রেরণায় যদি তাঁরা কাজে লিপ্ত হয়ে থাকেন, দেহ মনে যদি তাঁরা পবিত্র হন, আমার নামের আকর্ষণে যদি তাঁরা আকৃষ্ট না হয়ে থাকেন, তবে আমার সহকর্মীদের সমবেত প্রায়শ্চিত্ত সময়ে ফলপ্রসূ হবেই হবে। কর্মীর মৃত্যুর সাথে তাঁর ভালকাজ ধুয়ে মুছে যায় এরূপ অন্ধ সংস্কার আমি কখনও মনে স্থান দিই না। পক্ষান্তরে সত্যিকার খাঁটিকাজের ফল কর্মীর মৃত্যুর পর চিরকাল অমর হয়ে থাকে!

মহাত্মাজী বলেছিলেন—বিপুল শুভেচ্ছা নিয়ে নোয়াখালি এসেছি, আমি জানি নোয়াখালিতে যদি আমি ব্যর্থকাম হই, তাহলে আমার অহিংসানীতি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে।

কিন্তু নোয়াখালিতে মহামানবের কার্যক্রম মোটেই সহজসাধ্য হয়নি। পানিয়ালার প্রার্থনা সভায় পাঁচ হাজার হিন্দুমুসলমান সমবেত হয়েছে। মুরাইমের প্রার্থনা সভায় দশহাজার হিন্দুমুসলমান একত্র হয়েছে, আমিষাপাড়ায় পনেরো হাজার নরনারী এসেছে গান্ধিজীর বাণী শুনতে। বৃদ্ধ মুসলমান এসে নত মস্তকে গান্ধিজীর আশীর্বাদ প্রার্থনা করেছে। মুসলমানেরা স্বীকার করেছে—গান্ধিজী বর্তমান যুগে ভারতের কেন, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ নেতা! আবার তারই সঙ্গে দেখা দিয়েছে বিদ্বেষ। শিরণ্ডীর সভায় যখন 'আল্লা-হো-আকবরে'র সঙ্গে 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি উঠেছে তখন কোন এক মুসলমান উত্তেজিত হয়ে উঠে চীৎকার করে—এখানে যারা মুসলমান আছ তারা বন্দেমাতরম উচ্চারণ কর না!

ডাক্তার সুশীলা নায়ার তখনই তাকে জিজ্ঞাসা করেন—আমরা হিন্দুরা 'আল্লা-হো-আকবর' ধ্বনি করতে পারি আপনাদের 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি করতে আপত্তির কি কারণ থাকতে পারে?

মুসলমানটি বলে—আপত্তির কারণ আছে।
কিন্তু কি যে কারণ তা সে বলতে পারে না

একদিকে দেখা গেছে দারুণ শীতে অতি প্রত্যুষে গরীব মুসলমানেরা কাঁটা হাতে পথ পরিষ্কার করেছে মহামানবের যাত্রা পথকে সুগম করে তোলার জন্য। কেউ তাদের সে কাজ করতে বলেনি, কেউ তাদের সেজন্য কোন পারিশ্রমিক দেয়নি, অন্তর থেকে তাদের আহ্বান এসেছে। আরেকদিকে দেখা গেছে কোথাও বড় বড় গাছের গায় হাতে-লেখা পোষ্টার লাগানো:

তোমার যেখানে দরকার সেখানে যাও
ভণ্ডামি এখানে চলিবে না
পাকিস্তান মানিয়া লও
...
মুসলিম লীগ জিন্দাবাদ
কায়দে আজম জিন্দাবাদ
পাকিস্তান কায়েম হউক
কংগ্রেস ধ্বংস হউক।
...
বিহারের কথা মনে কর
তাড়াতাড়ি ত্রিপুরা ছাড়।
তোমায় বলি বারে বারে
তবুও তুমি ঘরে ঘরে
ভাল হবে ফিরে গেলে।

কোথাও বা রামধুনের রামনাম উচ্চারণে আপত্তি উঠেছে, কোথায় উঠেছে কোরাণ পাঠে—হিন্দুর কোরাণ পাঠে অধিকার নেই বলে। গান্ধিজী তার উত্তরে বলেছেন—নোয়াখালিতে আমি এক সম্প্রদায়কে বড় করে অপর সম্প্রদায়কে ছোট করতে আসিনি। আমি হিন্দু ও মুসলমান উভয়েরই সেবা করতে এসেছি। আমি যদি এখানে মরি, তবে আমি একথা বলে মরতে পারি যে আমি হিন্দু ও মুসলমান উভয়ের সেবা করার জন্য এখানে এসেছি।...আমি নিজে হিন্দু, শুধু এই কারণেই আমি আমার অহিন্দু বন্ধুদের হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করতে বলি না। আমি নিজেকে খৃষ্টান, মুসলমান, ইহুদী, শিখ, জৈন, পার্শী প্রভৃতি সম্প্রদায়ের লোক বলে মনে করি। কারণ সকল ধর্মের ভাল জিনিষগুলি আমি গ্রহণের চেষ্টা করছি।

## আমাদের গান্ধিজী

এই কথাগুলি স্মরণ করিয়ে দেয় দু'হাজার বছর আগের জেরুসালেমের আরেক সত্যদ্রষ্টা সর্বহারার বাণী—"Whither thou goest I will go, thy people shall be my people and thy god my god !" (তোমার পথই আমার পথ, তোমার আত্মীয়েরা আমারও আত্মীয়, তোমার ভগবান আমারও ভগবান।)

নোয়াখালিতে গান্ধিজীও ঠিক এই দিকেই চিন্তা করেন—বর্তমানে হিংসা, ঘৃণা ও পরস্পরের প্রতি সন্দেহে পৃথিবী ভারাক্রান্ত ···আগে শুধু পরম ধর্ম সহিষ্ণুতায় বিশ্বাস করতাম এখন এই সহিষ্ণুতা এতটা বৃদ্ধি পেয়েছে যে এখন সকল ধর্মকেই সমান বলে ভাবতে পারি।

একদল মানুষ গন্ধিজীকে সইতে পারে নি। তারা অন্তরাল থেকে গান্ধিজীর প্রতি অশ্রদ্ধা দেখাতে থাকে, কোথাও বা চলার পথে বিষ্ঠা লেপন করে রাখে, কোথাও সাঁকো ভেঙে দেয়, কোথাও বা মহাত্মাজীকে স্বাগতম্ জানবার জন্য যে তোরণ তৈরী করা হয় রাতারাতি তা ভেঙ্গে রাখে, মঙ্গলঘট ও কলাগাছ ফেলে ছড়িয়ে দিয়ে যায়। এই দুর্বৃত্তদল যাদের মনে উত্তেজনা সৃষ্টি করতে চাইছিল, তারা কিন্তু এতে তেমনভাবে সাড়া দেয়নি, গান্ধিজী সেই পথে আসার আগে শান্তিপ্রিয় গ্রামবাসীর দল পথ সাফ করে দিয়েছে, নতুন করে সাঁকো তৈরী করে দিয়েছে।

যারা নিরক্ষর গ্রামবাসীদের মধ্যে হিন্দু-বিদ্বেষের বিষ ঢুকিয়ে দিতে কৃত-সংকল্প হয়েছিল, তারা জানতো যে সংখ্যায় তারা যত কমই হোক না কেন, গ্রামবাসীরা তাদের রুখতে পারবে না, গ্রামবাসীদের সে শিক্ষা নেই, তারা নিজেদের শক্তিকে চেনে না। শ্রীরামপুরে গান্ধিজী কথায় কথায় মুসলমানদের সঙ্গে এই সম্পর্কে আলোচনা করেন। গান্ধিজী জিজ্ঞাসা করেন—এই গ্রামে লোক সংখ্যা কত হবে?

—মুসলমান আছে প্রায় চৌদ্দ শো।

—ইস্কুল আছে কটি?

—বছর দুই আগে একটি ইস্কুল হয়েছিল, তাতে শ'দেড়েক ছাত্র পড়তো।

—তোমাদের মধ্যে বাংলা লিখতে পড়তে জানে ক'জন?

—চল্লিশ জন।

—ম্যাট্রিক পাস করেছে কেউ?

—একজন।

—কোরাণ পড়েছে?

—আমাদের মধ্যে হাজার খানেক লোক কোরাণ আবৃত্তি করতে পারে কিন্তু মানে বোঝে না।

এই যাদের অবস্থা নেতৃত্ববিলাসী মুসলমানদের পক্ষে ধর্মের নামে মনোমত যা খুসি তাই ব্যাখ্যা করে হিন্দুদের বিরুদ্ধে তাদের ক্ষেপিয়ে তোলা কত সহজ। তাই গান্ধিজী যখন তাদের কাছে কোরাণের বাণী ব্যাখ্যা করে শোনান—কোরাণে বলেছে 'তুমি এই দুনিয়ায় বেড়াতে এসেছ,—পথিক মাত্র। সেই ভাবেই চলবে, মনে করবে তুমি যেন নেই, মরে গেছ।' এই বাণী অপেক্ষা উত্তম আর কিছু হতে পারে না। মৃত্যু তো আমাদের যে কোন মুহূর্তে হতে পারে। মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকবার এ চমৎকার পথ।···হজরৎ মহম্মদ বলেছেন, যে ব্যক্তি দীর্ঘজীবি ও সৎ তিনিই উত্তম, আর যে কোন অপকর্ম করে সে অধম। কথা দিয়ে কারুর বিচার করতে নেই, বিচার করতে হয় কাজ দিয়ে···হজরতের এই অনুশাসন সকলের জন্য, কেবল মাত্র মুসলমানদের জন্য নয়!

দুর্বৃত্তেরা শঙ্কিত হয়ে ওঠে, সত্যিকারের ধর্মকথা শোনাতে তো তারা চায় না কাজেই তারা আপত্তি তোলে—গান্ধিজীর কোরাণ পড়ার কোন অধিকার নেই।

নোয়াপাড়ায় এক বিস্ময়কর ঘটনা ঘটে।

কোথা থেকে একটি কুকুর এসে মহাত্মাজীর সঙ্গ ধরে নানাভাবে সে গান্ধিজীর দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করে, মূক পশু মহামানবকে কি যেন বলতে চায়, কি যেন জানাতে চায়।

গান্ধিজী ভ্রমণে বেরুলে কুকুরটি আগে আগে তাঁর পথ দেখিয়ে নিয়ে যায়, মহামানব বোধ হয় তার অন্তরের কথাটি বুঝতে পারেন, অনুসরণ করেন কুকুরটিকে।

চৌধুরীদের পোষা কুকুর, চৌধুরী বাড়ীতে গান্ধিজীকে পৌঁছে দেয়। সে বাড়ীতে জনমানবের সাড়া নেই, একটি গৃহে শুধু এক রাশ মৃতের কঙ্কাল ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ে না। কুকুরটি সেই কঙ্কালের পানে তাকায় আর গান্ধিজীর মুখের পানে মুখ তুলে আর্ত চীৎকার তোলে—ভৌ ভো ভৌ! বোধ হয় সে জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ সর্ববরেণ্য মহাত্মার কাছে প্রশ্ন তুলতে চায়—কেন এমন হোল, কি এদের অপরাধ?

এই কুকুরটি কয়েকদিন গান্ধিজীর সঙ্গে ছিল। সত্যনিষ্ঠ মানবের এই সাথীটি ছ'হাজার বছর আগের আরেক সত্যনিষ্ঠের কথা মনে করিয়ে দেয়। হয়তো সেদিন এই কুকুরটীরই কোন পূর্ব-পুরুষ যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে স্বর্গের দরজা অবধি পৌঁছে ছিল,

সেই সংস্কার আজ তার পশু-বোধকে সহজাত সামর্থ জুগিয়েছে যুধিষ্ঠিরের প্রতিভূকে চিনে নিতে।

'সার্ভা' 'সামাদিসয়ের' ও'একসেলসিয়র' নামে তিনখানি কাগজের সম্পাদক ফরাসী সাংবাদিক মঁসিয়ে কার্টিয়ার ও মার্কিন 'ফ্রেণ্ডস, এম্বুলেন্স ইউনিটের' হোরেস আলেকজাণ্ডার নোয়াখালিতে এসে গান্ধিজীর সঙ্গে দেখা করেন। কার্টিয়ার যখন গান্ধিজীর কাছে আসেন তখন তিনি স্বভাব-চিকিৎসায় চিকিৎসিত হচ্ছিলেন, কপালে মৃত্তিকার কলপ দিয়ে তিনি চোখ বুজে পড়েছিলেন, ফরাসী ভাষাতেই তিনি কার্টিয়ারকে স্বাগতম্ জানালেন। গান্ধিজীর মুখ থেকে ফরাসী ভাষা শোনার প্রত্যাশা কার্টিয়ার করেন নি, তিনি বিস্মিত হলেন কিন্তু খুসি কম হন নি। গান্ধিজী তাঁকে বললেন—ভিকতর হুগোর 'লা মিজারেবল' আমি পড়েছি, প্যারিসের গলিপথে জিন ভালজিন হামাগুড়ি দিয়ে চলেছে—,এই চিত্র এখনও আমার মনে আঁকা আছে!

য়ুরোপ সম্পর্কে মহাত্মাজী ভবিষ্যৎবাণী করেন—হতে পারে য়ুরোপে সবাই হিংসাপন্থী, কিন্তু এইভাবে হিংসপন্থা অনুসরণ করতে থাকলে তাদের ধ্বংস অনিবার্য। হিটলার থেকে আরও জবরদস্ত হিটলার তাকে ধ্বংস করেছে এবং অনন্ত কাল ধরে এইরূপই চলতে থাকবে।

হোরেস্ আলেকজাণ্ডারের সঙ্গে গান্ধিজী আলাপ করেন স্নান করতে করতে, স্নানের ঘরে।

আটজন বৃটিশ সামরিক কর্মচারীও স্বদেশে ফিরে যাবার আগে সেদিন গান্ধিজীর সঙ্গে দেখা করে যান।

বৃটিশ-গিনির সাংবাদিক আয়ুব মহম্মদও সস্ত্রীক নোয়াখালি এসে গান্ধিজীর সঙ্গে দেখা করেন।

গান্ধিজী নোয়াখালির বীভৎসতা জগতের মাঝে প্রচার করছেন মুসলীম লীগাররা তা সইতে পারলো না, তারা গান্ধিজীর মানবতার নীতি অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করতে পারেনি, বার বার তারা গান্ধিজীকে উত্যক্ত করেছে—আপনি বিহারে যান!

গান্ধিজী তার উত্তরে বলেন—নোয়াখালি থেকেই আমি বিহারের কাজ করছি।

গান্ধিজী জানতেন নোয়াখালি শান্ত হলে বিহারও শান্ত থাকবে। কারণ বিহারে যা কিছু ঘটেছিল তা নোয়াখালিরই প্রতিক্রিয়া। কলিকাতার পর নোয়াখালিতে প্রত্যক্ষ-সংগ্রামের বীভৎসতা বিহারের হিন্দুদের ক্ষিপ্ত করে তোলে। ছাপরা ও

কয়েকটি স্থানে হিন্দুরা 'নোয়াখালিকা বদলা লেও' ধ্বনি তুলে সংখ্যালঘু মুসলমানদের উপর চড়াও হয় (২৫শে অক্টোবর '৪৬)। চার হাজার বর্গ মাইল জুড়ে এই হাঙ্গামা ছড়িয়ে পড়ে এবং তিন লাখ মুসলমান ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কিন্তু কংগ্রেসী গবর্ণমেন্ট এই দাঙ্গাকে বেশীদিন চলতে দেন নি। খবর পাওয়ামাত্রই বিহারের প্রধান মন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণ সিংহ ও অন্যান্য মন্ত্রীরা ঘটনাস্থলে এসে পৌছান (২৭শে অক্টোবর)। পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু ও জয়প্রকাশ নারায়ণ সেখানে এসে পৌছান (২রা ও ৪ঠা নভেম্বর)। প্রয়োজনমত পুলিশ গুলি চালায়, ফলে চার শো জন হিন্দু নিহত হয়। ৫,৫৫১ জনকে গ্রেপ্তার করে ও ৬০,০০০ লোককে অভিযুক্ত করা হয়। কংগ্রেস-কর্মীরা চারিদিকে ভ্রমণ করেও হাঙ্গামা নিবারণ করার চেষ্টা করেন। সেই চেষ্টায় ৯০০০ কর্মী হতাহত হন। গান্ধিজী বলেন—বিহার শান্ত না হলে তিনি আমরণ অনশন করবেন!

কংগ্রেস-শাসিত প্রদেশ যা করে, বাংলার মুসলীম-লীগ মন্ত্রীরা তেমন কিছুই করে না, কিন্তু সেজন্য তারা এতটুকু লজ্জা পায় না, ফজলুল হক্ প্রভৃতি নেতারা কল্পিত অভিযোগ আর বিবৃতি প্রচার করতে সুরু করেন। তাদের খুসি করার জন্য নোয়াখালির অবস্থা পুরাপুরি শান্ত ও স্বাভাবিক হবার আগেই গান্ধিজীকে কিছুদিনের জন্য বিহারে যেতে হয়।

১২ই মার্চ থেকে বিহারের গাঁয়ে গাঁয়ে গান্ধিজী পল্লী পরিক্রমা সুরু করলেন। পঁচিশ দিন গান্ধিজী বিহারে ছিলেন। সঙ্গে ছিলেন খাঁন আবদুল গফুর খাঁন।

নোয়াখালিতে যা ঘটেছিল, বিহারেও ঘটেছিল ঠিক তাই। তবে সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি গিয়েছিল উল্টে। নোয়াখালিতে মুসলমানেরা অভিযান চালিয়েছিল হিন্দুদের বিরুদ্ধে, বিহারে হিন্দুরা তার প্রতিশোধ তুলেছিল সেখানকার মুসলমানদের উপর। নোয়াখালির অত্যাচারিত হিন্দুরা যেমনভাবে গান্ধিজীর কাছে এসে চোখের জল ফেলেছিল, বিহারের দুর্গত মুসলমানেরা ঠিক তেমনিভাবেই এসে দাঁড়িয়েছিল মহাত্মাজীর সামনে। গান্ধিজী ব্যথিত হয়ে বলেছিলেন—যারা বলছে যে বিহারে যা অনুষ্ঠিত হয়েছে তা নোয়াখালিরই প্রতিশোধ গ্রহণমাত্র—আমি দৃঢ়ভাবে বলবো যে তারা প্রতিশোধ গ্রহণের যথার্থ পন্থা জানে না। যে মনোবৃত্তির ফলে ভারতের এক সম্প্রদায় অন্য সম্প্রদায়কে শত্রু বলে মনে করে তা আত্মঘাতী!…অপর পক্ষ পশুর স্তরে নেমেছে বলে আপনারাও কি সেই স্তরে নামবেন! আপনারা যদি পুনরায় ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেন তার পূর্বেই যেন আপনারা আমাকে হত্যা করেন।…অগ্নিকাণ্ড ও নিরপরাধ স্ত্রীলোক

এবং শিশুদের হত্যা করাকে কেউ ভুল করে সাহসিকতার কাজ বলবে না, ইহা অতি জঘন্য ভীরুতা।

উৎপীড়িত অশ্রুসজল মুসলমানদের মুখের পানে তাকিয়ে তিনি বলেন—সকল ধর্মেরই শিক্ষা এই যে সাহসের সঙ্গে দুঃখ সইতে হবে। আমার কাছে নোয়াখালিতে মুসলমানদের এবং বিহারের হিন্দুদের পাপের পরিমাণ একই এবং তাহারা সমভাবে নিন্দনীয়!

গান্ধিজী বাঁকীপুরে আসেন ৫ই মার্চ, সেখান থেকে ১০ই আসেন পাটনায়।

তারপর ১৩ই মার্চ—এবাডুল্লা চক

১৪ই· · খসরুপুর

১৭ই··· মাসুরহি

২৪ শে··· রাজঘাট

২৭ শে··· ওকৃড়ি

২৮ শে··· আল্লাগঞ্জ (জহানাবাদ), মালাঠি, গঙ্গাসাগর ও বেলা।

গান্ধিজী একটী আশ্রয়শিবিরও পরিদর্শন করেন, সেখানকার মুসলমানেরা দাবী জানায়—একটি বিশেষ অঞ্চল যেন মুসলমানদের বাসের জন্য ছেড়ে দেওয়া হয়। মহাত্মাজী তার উত্তরে বলেন—কোন একটি বিশেষ অঞ্চলে কেবল নিজেরা বাস করবার জন্য আপনারা গবর্মেণ্টের উপর চাপ দিতে পারেন না। আমি কি সুরাবর্দি-সাহেবকে বলতে পারি যে নোয়াখালিতে কেবল হিন্দুদের থাকবার জন্য একটি অঞ্চল ছেড়ে দেওয়া হোক! এইরূপ কোন দাবীর জন্য আমি নোয়াখালির হিন্দুদের কোনদিন উৎসাহিত করি নাই। আমি বরং তাদের বলেছি যে যদি তারা ভীত হয়ে পড়ে তবে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ পেলে তারা অন্যত্র চলে যেতে পারে। আর বিনিময়ে সম্পত্তি পেলে গবর্মেণ্ট ক্ষতিপূরণ দেবে নাই বা কেন! তেমনি আমি আপনাদের বলবো যে এইরূপ ব্যবস্থা আমার মনোমত নয়। এভাবে আপনাদের ঘর বাড়ী ছেড়ে যাওয়া তো ভীরুতা!

মন্ত্রীদের সম্পর্কে তিনি বলেন—যে সকল হিন্দুমন্ত্রী ভোটের দ্বারা নির্বাচিত হয়েছেন তাঁরা যদি বলেন যে হিন্দুরা তাঁদের আয়ত্তের বাইরে চলে গেছে, সেক্ষেত্রে তাঁদের আর মন্ত্রীত্বের পদে থাকা উচিত নয়—হিন্দুদের উন্মত্ততার আগুনে তাঁদের পুড়ে মরাই বিধেয়। আসলে গবর্মেণ্টকে তো ন্যায়ের পক্ষ নিতে হবে; কোনরূপ অন্যায় বরদাস্ত করা তাঁদের চলে না!

গান্ধিজী দুর্গত বিহারীদের সাহায্যের জন্যও সর্বত্র আবেদন জানান।

আস্‌বে পথে আঁধার নেমে
তাই বলে কি রইবি থেমে,
ও তুই বারে বারে জ্বালবি বাতি—
হয়তো বাতি জ্বল্‌বে না—
তা বলে ভাব্‌না করা চল্‌বে না।

শুনে তোমার মুখের বাণী—
আস্‌বে ঘিরে বনের প্রাণী,
তবু হয়তো তোমার আপন ঘরে
পাষাণ হিয়া গল্‌বে না—
তা বলে ভাব্‌না করা চলবে না।

বন্ধ দুয়ার দেখ্‌লি বলে
অম্‌নি কি আস্‌বি চলে,
তোরে বারে বারে ঠেলতে হবে
হয়তো দুয়ার টলবে না—
তা বলে ভাব্‌না করা চলবে না—

[—রবীন্দ্রনাথ

দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার সব ক'টি রাষ্ট্রের প্রতিনিধি নিয়ে মহাসম্মেলন বসলো দিল্লীতে। এই সম্মেলনে যোগ দেবার জন্য গান্ধিজীকে আমন্ত্রণ জানানো হোল।

সম্মেলনের শেষ অধিবেশনে মহাত্মাজী এলেন।

প্রথম দিন পয়লা এপ্রিল সম্মেলনের সমবেত বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিদের কয়েকটি প্রশ্নের তিনি উত্তর দেন। প্রসঙ্গতঃ তিনি বললেন—এসিয়ার সকল দেশের প্রতিনিধিগণ এখানে সমবেত হয়েছেন। ইউরোপ আমেরিকা অথবা যে সকল দেশ বা জাতি এশিয়ার অন্তর্গত নয় তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার জন্য কি আপনারা এখানে এসেছেন! না, অবশ্যই সেরূপ কোন উদ্দেশ্য আপনাদের নেই। একথা বলতে আমার কোন বাধা নেই যে ভারতবর্ষ প্রধানতঃ অহিংস উপায়ে তার স্বাধীনতা অর্জন করে যদি সেই স্বাধীনতা পৃথিবীর কোন অংশের কোন জাতির স্বাধীনতা হরণ করার কাজে নিযুক্ত করে তবে তা অতীব দুঃখের বিষয় হবে। ইউরোপের অধিবাসীরাই এরূপ কাজ করেছে। তারা এই বিশাল মহাদেশের বিভিন্ন জাতিকে শোষণ করেছে। এশিয়াকে বাঁচতে হবে এবং পশ্চিমের অন্যান্য জাতির ন্যায়ই স্বাধীনভাবে সে বাঁচবে —সম্মেলন থেকে বিদায় নেবার আগে এই দৃঢ় সঙ্কল্প যদি আপনারা গ্রহণ না করেন

তবে তা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় হবে। আমি এই কথাই বলতে চাই যে এইরূপ সম্মেলন নিয়মিত ভাবে হওয়া চাই। যদি আপনারা জিজ্ঞাসা করেন কোথায় তা অনুষ্ঠিত হবে, তা হলে বলবো ভারতভূমিই তার উপযুক্ত স্থান।

দ্বিতীয় দিন মহাত্মাজী সম্মেলনে তাঁর ভাষণ দিলেন। মহাত্মাজী বলেন—বন্ধুগণ আপনারা ভারতবর্ষের প্রকৃত রূপ দেখেন নি। প্রকৃত ভারতীয় আবহাওয়ার মধ্যে আপনাদের সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে না, দিল্লী, বোম্বাই, মাদ্রাজ, কলিকাতা, লাহোর, এবং অন্যান্য বড় বড় শহর তো পাশ্চাত্য ভাবধারায় প্রভাবিত। যদি আপনারা সত্যই ভারতের শ্রেষ্ঠ রূপ দেখতে চান, তাহলে আপনারা গাঁয়ের ভাঙ্গীদের কুটীরে যান, সেখানে তা পাবেন। ভারতে এইরূপ সাত লাখ গ্রাম আছে এবং ৩৮ কোটি লোক এইসব গাঁয়ে বাস করে।···আমি ভারতের এক প্রান্ত হতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত পরিভ্রমণ করেছি। দেখেছি মনুষ্যত্বের অসহায় রূপ, দেখেছি মানুষের দীপ্তিহীন চোখ। ঐসকল মানুষ নিয়েই ভারতবর্ষ। ওই সকল নগন্য কুটীরে এবং এই আবর্জনাস্তূপের মধ্যেই ভাঙ্গীরা বাস করে। সেইখানেই আপনারা জ্ঞানের সারতত্ত্ব আবিষ্কার করতে পারবেন।··· যে সকল মহামানব পশ্চিমকে জ্ঞানদান করেন তাঁদের মধ্যে জোরোয়াষ্টারই প্রথম, তিনি ছিলেন প্রাচ্যের লোক। বুদ্ধ তাঁর অনুগামী, তিনিও ভারতবর্ষ অর্থাৎ পূর্বদেশের লোক। বুদ্ধের পর এলেন যীশু, তিনিও পূর্বদেশের। যীশুর জন্মের পূর্বে ছিলেন মোজেস্! তাঁর জন্ম মিশরে হলেও আসলে তিনি প্যালেষ্টাইনের লোক। যীশুর পরে এলেন মহম্মদ। আমি কৃষ্ণ রাম ও অন্যান্য জ্যোতিষ্কদের কথা ছেড়েই দিলাম। কিন্তু তাই বলে তাদের দীপ্তি কম ছিল না।··· পৃথিবীতে তো এমন কোন ব্যক্তি দেখিনা যাঁরা উল্লিখিত মহাপুরুষদের তুল্য হতে পারেন। দুঃখের [illegible] বলতে হচ্ছে যে খৃষ্ট ধর্ম যখন পশ্চিম দেশে প্রচারিত হোল তখন তা [illegible] হোল।··· এশিয়ার বাণী কি তাই আমি আপনাদের বোঝাতে চাই। পশ্চিমের দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে দেখলে অথবা আণবিক বোমার পন্থা অনুসরণ করে ইহা বোঝা যাবে না, আপনারা যদি পশ্চিম মহাদেশকে কোন বাণী দিতে চান তবে তা সত্য এবং প্রেমের বাণী হবে। আমি কেবল আপনাদের অন্তর অধিকার করতে চাই। এখন গণতন্ত্রের যুগ। যারা অত্যন্ত দরিদ্র তারাও আজ জেগে উঠেছে। এই সময়ে আপনারা দৃঢ়ভাবে আপনাদের বাণী প্রচার করতে পারবেন। আপনারা শোষিত হয়েছেন বলে প্রতিহিংসার দ্বারা আপনারা পশ্চিম-দেশ জয় করবেন না। প্রাচ্যের এই সকল মানীষিগণ যে বাণী রেখে গেছেন আপনারা যদি কেবল বুদ্ধি দিয়ে নয়, হৃদয় দিয়ে তা বুঝতে চেষ্টা করেন এবং সেই বাণী হৃদয়ঙ্গম করার যোগ্যতা অর্জন করেন তাহলে আমার দৃঢ়বিশ্বাস যে

াশ্চাত্যকে সম্পূর্ণভাবে জয় করা যাবে। আর পাশ্চাত্য এই বিজয় স্বেচ্ছায় আলিঙ্গন রবে। পৃথিবী আজ জ্ঞানের তৃষ্ণায় আকুল হয়ে উঠেছে।...পাশ্চাত্য আজ ঝেছে যে আণবিক বোমার ব্যবহারে কেবল পশ্চিম মহাদেশ নয়, সারা বিশ্ব ধ্বংস াপ্ত হবে। বাইবেলে যে প্লাবনের কথা বলা হয়েছে তা বোধহয় আগতপ্রায়। াপনাদের কাজ পৃথিবীবাসীকে তাদের শঠতা ও পাপের কথা জানিয়ে দেওয়া! াপনাদের ও আমার শিক্ষাগুরুগণ এই শিক্ষাই দিয়ে গেছেন।

প্রাচ্যের রাষ্ট্রসমূহের প্রতিনিধিদের মনে এই অর্ধনগ্ন সন্ন্যাসীর ক্ষীণকণ্ঠ কি গভীর রেখাপাত করেছিল তা বোঝা যায় সভাশেষে যখন তারা একে একে গান্ধিজীর কাছে াসেন তাঁদের দেশবাসীর জন্য আশীর্বাদ যাচ্ঞা করতে।

তিব্বতী প্রতিনিধিকে গান্ধিজী বললেন—বুদ্ধের বাণী জাগ্রত করে তোলাই াপনাদের কর্তব্য।

আরব প্রতিনিধিকে গান্ধিজী বলেন—আপনারা ইহুদীদের সঙ্গে প্রীতিপূর্ণ ব্যবহার রবেন।

ইহুদী প্রতিনিধিকে গান্ধিজী বলেন—আপনারা সন্ত্রাসমূলক আন্দোলন থেকে বিরত হন। হিংসার পথে কোন শুভ ফল ফলবে না।

ইন্দোনেশিয়া ও ভিয়েৎনাম প্রতিনিধিদের গান্ধিজী বলেন—তরবারীর দ্বারা যে জয় হবে, তরবারীতেই তার ক্ষয়ও হবে। হিংসার ভিত্তিতে কোন স্থায়ী কল্যাণ হতে পারে না।

বিদায় কালে প্রতিনিধিরা অমৃতকুমারী কাউরকে বললেন—আমরা যেসব মানুষ দেখেছি, ইনি তাঁদের সকলের থেকে স্বতন্ত্র।

একজন বলেন—তাঁকে দেখবার সুযোগ না মিললে ভারত দর্শন আমাদের অসম্পূর্ণ থাকতো!

একজন মহিলা প্রতিনিধি বলেন—তোমাদের ভাগ্য ভালো যে তোমরা এমন নেতা পেয়েছ। এমন নেতার নেতৃত্ব পেলে আমাদের হানাহানি কাটাকাটি করতে হোত না।

'একদা এ ভারতের কোন্ বনতলে
কে তুমি মহান প্রাণ, কী আনন্দ বলে
উচ্চারি উঠিলে উচ্চে—'শোনো বিশ্বজন,
শোনো অমৃতের পুত্র যত দেবগণ

'দিব্য ধামবাসী, আমি জেনেছি তাঁদের,
মহান পুরুষ যিনি আঁধারের পারে
জ্যোতির্ম্ময় ; তাঁরে জেনে, তাঁর পথ চাহি
মৃত্যুরে লঙ্ঘিতে পারো, অন্য পথ নাহি।'
রে মৃত ভারত,
শুধু সেই এক আছে, অন্য নাহি পথ।

[—রবীন্দ্রনাথ

দিল্লী থেকে বড়লাটের চেষ্টায় সাম্প্রদায়িক মিলনের জন্য গান্ধিজী ও জিন্নার এক যুক্ত আবেদন প্রচারিত হয় :

সম্প্রতি যে সকল বে-আইনী ও হিংসাত্মক কাজ ভারতবর্ষের সুনামকে কলঙ্কিত করিয়াছে এবং নির্দোষ লোকদের অশেষ দুঃখের কারণ হইয়াছে—কাহারা আক্রমণ করিয়াছে আর কাহারা আক্রান্ত হইয়াছে সে বিচার এখন না করিয়া আমরা ঐ সকলের জন্য আমাদের অন্তরের গভীর বেদনা জানাইতেছি।

রাজনৈতিক কার্যসিদ্ধির জন্য বলপ্রয়োগ করা আমরা সর্বকালের জন্য নিন্দা করি এবং ধর্ম্ম বিশ্বাস যাহার যেরূপই হউক না কেন, ভারতবর্ষের সকল সম্প্রদায়কে আমরা আবেদন জানাইতেছি যে তাহারা যে কেবল হিংসাত্মক ও শান্তি শৃঙ্খলা নষ্টকারী কার্য করিতে বিরত থাকিবেন তাহাই নহে, কথায় ও লেখায় যেন তাহারা এমন শব্দ ব্যবহার না করেন যাহাতে লোক উত্তেজিত হইয়া উঠিতে পারে।

(স্বাক্ষর)
এম, এ, জিন্না

(স্বাক্ষর)
এম, কে, গান্ধী

১৫ই এপ্রিল ১৯৪৭

এই আবেদন সম্পর্কে পরে গান্ধিজী বলেন—এই প্রকার আবেদন প্রচারের চেষ্টা করার জন্য বড়লাট সকলেরই ধন্যবাদের যোগ্য। তবে বড়লাটের মধ্যস্থতা ভিন্ন মিষ্টার জিন্না ও আমি এই প্রকার আবেদন প্রচার করতে পারলে আরও ভালো হোত। যাই হোক মিষ্টার জিন্না বড়লাটের নিকট এই প্রচার-পত্রে সহি করে আমার সমান অংশীদার হয়েছেন। তিনি যদি ইচ্ছা করেন তাহলে তাঁর স্ব-সম্প্রদায়কে তিনি সহজেই শান্ত করতে পারেন। আমি হিন্দু হিসাবে কিন্তু ওতে স্বাক্ষর করিনি। কারণ আমি হিন্দু হিসাবে কোন কাজ করিনা। প্রত্যেক ধর্মই আমার সমান প্রিয়, আমি বিশ্বাস করি যে, সকল ধর্মের ভিত্তিই এক। ভগবানের নিকট এই প্রার্থনা করছি যে, তিনি ভারতবাসীকে এই সুমতি দিন যেন তারা পরস্পর ভ্রাতৃবিরোধ হ'তে বিরত হয়।

দিল্লী থেকে গান্ধিজী আবার বিহারে এলেন। ১৫ই মে থেকে ২৩শে মে পর্যন্ত টনার আশেপাশে কয়েকটি অঞ্চল তিনি পরিক্রমণ করলেন :

১৬ই মে গুলজারী বাগ ( পাটনা থেকে সাত মাইল )

১৯ শে মে বাঢ়ে ( পাটনা থেকে চল্লিশ মাইল )

২০ শে মে হিলসায় ( পাটনা থেকে ছাব্বিশ মাইল )

২১ শে মে বিক্রম ( পাটনা থেকে ত্রিশ মাইল )

২২ শে মে ফতেপুর ( পাটনা থেকে ষোল মাইল )

নোয়াখালিতে যেমন লীগপন্থীরা অভিযোগ তুলেছিল যে গান্ধিজী সেখানে হিন্দুদের সেবা করতে এসেছেন, বিহারেও তেমনি অভিযোগ উঠলো যে গান্ধিজী সেখানে মুসলমানদের তোষণ করতে গেছেন। তার উত্তরে গান্ধিজী বাঁকীপুরের ময়দানে প্রার্থনা সভায় বললেন—সমগ্র জীবন আমি অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছি, কারও তোষামোদ করা আমার জীবনের ধর্ম নয়। মনুষ্য সমাজের কল্যাণের জন্য কাজ করে যাওয়াই আমার জীবন-ধর্ম। এর মধ্যে কোথাও তোষামোদের স্থান নেই। কোন ব্যক্তি সত্যবাদী, অহিংস, অকপট ও বিবেকের দ্বারা পরিচালিত হলে সে কারও তোষামোদ করতে পারে না।

নাগিনীরা চারিদিকে ফেলিতেছে বিষাক্ত নিঃশ্বাস
শান্তির ললিতবাণী শোনাইবে ব্যর্থ পরিহাস—
বিদায় নেবার আগে তাই
ডাক দিয়ে যাই—
দানবের সাথে যারা সংগ্রামের তরে
প্রস্তুত হতেছে ঘরে ঘরে! [ —রবীন্দ্রনাথ

বিহার থেকে দিল্লী, দিল্লী থেকে কাশ্মীর।

কাশ্মীরে গান্ধিজী তিনদিন ছিলেন, ১লা থেকে ৪ঠা আগষ্ট। আশ্রয় প্রার্থীদের সঙ্গে দেখা করেন, মহারাজা ও মন্ত্রীদের সঙ্গে আলোচনা করেন। শ্রীনগরে দু'দিন ও জম্মুতে একদিন প্রার্থনা সভা বসে। স্বাধীন ভারতে কাশ্মীরের অবস্থা কি হবে সেই সম্পর্কে গান্ধিজী বলেন—যে দলিলটিকে অমৃতসর সন্ধিপত্র বলে গৌরব দেওয়া হয় তা দেখবার সুযোগ আমার হয়েছে। উহা আসলে একটি বিক্রয় কবালা মাত্র। ১৫ই আগষ্ট তারিখে তার আর কোন মূল্য থাকবে না বলে মনে হয়। উহাতে এক

পক্ষে বৃটিশ বড়লাট বিক্রেতা ও অপর পক্ষে মহারাজ গুলাব সিং ক্রেতা ছিলেন। এখন এই সন্ধিপত্রটি বাতিল হয়ে গেলে···সাধারণ বুদ্ধিমতেত কাশ্মীর ও জম্মু রাজ্যের ভাগ্য কাশ্মীরের প্রজাদের ইচ্ছামত নিয়ন্ত্রিত হওয়া উচিত। যত শীঘ্র এই ব্যবস্থা করা যায় ততই ভালো।······

শ্রীনগর থেকে সোদপুর—মহাভারতের উত্তর প্রান্ত থেকে পূর্ব প্রান্তে।

কলিকাতার নাগরিক জীবনে তখনও শান্তি ও স্বাচ্ছন্দ্য ফিরে আসেনি। মহাত্মাজী বিভিন্ন উপদ্রুত অঞ্চলগুলি পরিভ্রমণ করে দেখলেন। তারপর সুরাবর্দীর কাছে প্রস্তাব করলেন—কলকাতার দাঙ্গা নিবারণের জন্য আসুন আমরা উভয়ে একসঙ্গে শান্তি-অভিযানে বাহির হই, বিধ্বস্ত অঞ্চলের কোনও একটি পরিত্যক্ত গৃহে আমরা উভয়ে একই কামরায় বাস করবো। দু'জনেই একসঙ্গে দুর্গত হিন্দু মুসলমানের দুঃখের কাহিনী শুনবো!

দু'দিন পরে মহাত্মাজী বেলেঘাটায় এক মুসলমানের বাড়ীতে এসে উঠলেন (১৩ই আগষ্ট)। সহীদ সুরাবর্দীকেও থাকতে হোল তাঁর সঙ্গে একই ঘরে। গান্ধিজীর সঙ্গে রইলেন অধ্যাপক নির্মলকুমার বসু, আভা গান্ধী ও মানু গান্ধী। কলিকাতা ও নোয়াখালির দাঙ্গার উদ্যোক্তা সুরাবর্দীকে এতটা ঘনিষ্ঠ করে দেখা কলিকাতার হিন্দুরা সইতে পারলো না. কোন কোন হিন্দু বিক্ষোভ প্রদর্শন করলো, সাড়া তুললো—গান্ধিজী ফিরে যাও!

কিন্তু 'করেঙ্গে বা মরেঙ্গে' যাঁর নির্দেশ তাঁর চিত্তের স্থিরতা এতো সহজে বিচলিত হয় না।

তর্কোঽপ্রতিষ্ঠঃ শ্রুতয়ো বিভিন্না,
নাসাবৃষির্যস্য মতং ন ভিন্নম্।
ধর্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং,
মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ॥

(তর্ক দিয়ে কর্তব্য নির্ণয় হয় না, শ্রুতিসকলও ভিন্ন ভিন্ন, এমন ঋষি নাই, যাঁর মত ভিন্ন নয়। ধর্মের গূঢ়তত্ত্ব গুহায় নিহিত, মহাজন যে পথে গমন করেন সেই পথের অনুগামী হওয়াই কর্তব্য।)

মহামানবের সত্য-ধর্মই শেষে জনগণের মনকে আলোকোদ্ভাসিত করলো। ১৫ই আগষ্ট স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে হিন্দু মুসলমান পূর্ব শত্রুতা ভুলে গিয়ে পরস্পরকে সখ্যভাবে গ্রহণ করলো। হিন্দু মুসলমান পরস্পরকে ফল ও মিষ্টান্ন বিতরণ করলো,

একসঙ্গে তোরণ বাঁধলো, একসাথে পতাকা উড়ালো, হাত ধরে পাশাপাশি বাহির হয়ে পড়লো কলিকাতার রাজপথে। গান্ধিজীর প্রেম ও নিষ্ঠা অলৌকিক সাফল্য মণ্ডিত হোল, যে কলিকাতা শহর থেকে সর্বপ্রথম দাঙ্গার উদ্বোধন হয়েছিল সেই সহরেই সর্বপ্রথম মিলনের মহাতিথি উদ্‌যাপিত হোল।

এই মিলনকে স্থায়ী করার জন্য গান্ধিজী শহর ও শহরতলীতে ঘুরে ঘুরে প্রার্থনা সভার অনুষ্ঠান করতে লাগলেন। পনেরো দিন ধরে চললো, ১৭ই আগষ্ট থেকে ৩১ শে পর্যন্ত : নারিকেলডাঙ্গা, মোহোমেডান স্পোর্টিং গ্রাউণ্ড, সরকার বাগান, পোলক ষ্ট্রীট, পার্ক সার্কাস, দেশবন্ধু পার্ক, আলিপুর, গড়ের মাঠ, হাওড়া ময়দান, বালিগঞ্জ লেক ময়দান, মেটেবুরুজ, বিশ্ববিদ্যালয় বিজ্ঞান কলেজ, টালিগঞ্জ পুলিশ লাইন, বারাসত, বাগমারী। প্রার্থনা সভায় সমবেত শতসহস্র জনগণের পানে তাকালে মনে হোত না, যে এই শহরের বুকে কোনদিন হিন্দু মুসলমানের মাঝে কোন বিদ্বেষ ছিল, ক'দিন আগেও তারা পরস্পরকে বিশ্বাস করতে পারতো না।

কলিকাতায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার অন্যতম হোতা সহীদ সুরাবর্দী একদিন সভার মাঝে বললো—মহাত্মা গান্ধীকে প্রকৃতই মহাত্মা বুঝতে পেরে আমি তাঁর পায়ের কাছে আশ্রয় নিয়েছি।

৩১শে আগষ্ট রাত্রে ঘটলো ব্যতিক্রম। রাত্রে বেলেঘাটার বাড়ীতে একজন হিন্দুকে নিয়ে আসা হোল ; রব উঠলো—তাকে ছুরি মারা হয়েছে, কিন্তু তার দেহে ছুরিকাঘাতের কোন চিহ্ন ছিল না।

পরদিন থেকেই সুরু হয়ে গেল আবার সেই হাঙ্গামা। যারা অন্য সম্প্রদায়কে বিশ্বাস করে তাদের পাড়ায় গিয়েছিল, অতর্কিত আক্রমণে তাদের মধ্যে নিহত হোল পঞ্চাশ জন, আহত হোল তিন শো।

গান্ধিজী বললেন—দাঙ্গাকারীদের মাঝখানে চলে যাও। তাদের এই উন্মত্ততা থেকে নিরস্ত কর, অথবা সেই চেষ্টায় প্রাণ দাও। কিন্তু 'পারলাম না' এই কথা বলার জন্য জীবন্ত ফিরে এসো না। অবস্থা যেরূপ, তাতে নেতৃস্থানীয়দের উপর আত্মাহুতির আহ্বান এসে পড়েছে। আজ অবধি একমাত্র গনেশশঙ্কর বিদ্যার্থী ছাড়া অজ্ঞাত ও অখ্যাত সাধারণ লোকই এই সর্বধ্বংসী আগুনে আহুতি পড়েছে, ইহা তো যথেষ্ট নয়!

শান্তি সেনা দল বেরিয়ে পড়লো পথে, সাড়া তুললো—হিন্দু-মুসলমান এক হও!

নাখোদা মসজিদের কাছে শান্তি-সেনার প্রথম দলটি আক্রান্ত হোল। দলের

আগে ছিলেন শচীনমিত্র ও তাঁর তিনজন সঙ্গী, গুণ্ডারা তাঁদের ছুরি মারলো। শচীনমিত্র হাসপাতালে মারা গেলেন। গান্ধিজী বললেন—ভারতের স্বাধীনতাকে জীবন্ত রাখতে হলে আরো অনেককে এরূপ শুভ্র আত্মত্যাগ করতে হবে।

শচীন্দ্রনাথের পত্নীকে তিনি লিখলেন—শচীন মিত্র অমর হয়েছে। এরূপ মৃত্যু তো দুঃখের নয়, বরং আনন্দের। তাঁরই পদাঙ্ক অনুসরণ করে তুমি তাঁর প্রতি তোমার প্রেমের পরিচয় দিতে পার।

সন্ধ্যাবেলা তিনি জানালেন—মন স্থির করে ফেলেছি, আমি অনশন আরম্ভ করবো।

রাত্রি ৮-১৫ মিনিটের সময় গান্ধিজী অনশন স্থরু করলেন, বললেন—যতদিন না এই অবস্থার পুনরায় প্রকৃত পরিবর্তন হচ্ছে, ততদিন আমি অনশন ত্যাগ করবো না। হিন্দুমুসলমান পরস্পরের মধ্যে এইরূপ হানাহানি দেখা অপেক্ষা মৃত্যুই আমার পক্ষে শ্রেয় বলে মনে করি।

আড়াই হাজার বছর আগে স্বেচ্ছায় সিংহাসন ত্যাগ করে এক রাজার কুমার এমনি কটি-বস্ত্র গ্রহণ করে, জনগণের কল্যাণ কামনায় গয়ার এক অশথ গাছের তলে বসে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন—

ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরম্
ত্বগস্থি মাংসং প্রলয়ঞ্চ যাতু
অপ্রাপ্য বোধিম্ বহুকল্প দুর্লভাং
নৈবাসনাৎ কায়ঃ অতশ্চলিষ্যতে ॥

( এই আসনেই আমার দেহ ধ্বংস হোক, কিন্তু মানবসমাজে বহুযুগের আকাঙ্খিত মুক্তির সন্ধান না পেলে আমি আর এখান থেকে উঠবো না।—ভগবান তথাগত )

এক বন্ধু গান্ধিজীকে এসে বললেন—একটু অপেক্ষা করে দেখলে কি ভালো হোত না ?

গান্ধিজী বললেন—পরে করলে অত্যন্ত দেরী হয়ে যাবে। সংখ্যালঘিষ্ঠ মুসলমানদের বিপজ্জনক অবস্থায় ফেলে রাখা যেতে পারে না। আমার অনশন থেকে কোন মঙ্গল লাভ করতে হলে অমঙ্গলকে রোধ করার জন্যই তা করতে হবে। কলকাতাকে আয়ত্বে আনা গেলে পাঞ্জাবের ব্যবস্থাও সহজ হবে। কিন্তু এখন পা টললে আগুন ছড়িয়ে পড়বে। এবং আমি পরিষ্কার দেখছি শীঘ্রই দুই বা তিনটি শক্তি

আমাদের উপর এসে পড়ে আমাদের এই ক্ষণস্থায়ী স্বাধীনতার স্বপ্নকে শেষ করে দেবে।

—কিন্তু ধরুন আপনার যদি মৃত্যু হয়, তাহলে আগুন ত আরো ভয়ঙ্কর হয়ে উঠবে?

—আমাকে অন্ততঃ তা দেখতে হবে না। কিন্তু আমার যেটুকু করবার তা তা করা হবে। মানুষের হাতে এর চেয়ে বেশী কিছু করবার নেই।

অনশনের তৃতীয় দিনে মুসলীম লীগের এক সদস্য এসে গান্ধিজীকে বললেন—আমাদের মাঝে আপনার উপস্থিতিই আমাদের এক বড় সম্পদ। ইহাই আমাদের নিরপত্তার নিশ্চয়তা। আমাদের এ' থেকে বঞ্চিত করবেন না।

গান্ধিজী বললেন—সে দিন তো আমার উপস্থিতির জন্য দাঙ্গাকারীরা থামে নি। তাদের কাছে তখন আমার কথায় কোন ফলই হয় নি। আমার অনশন তখনই ভঙ্গ হবে, যখন এই আগুন নিভবে এবং গত পনেরো দিনের সেই স্বাভাবিক অকলঙ্ক শান্তি আবার ফিরে আসবে। মুসলমানেরা যদি প্রকৃতই আমাকে ভালবাসে এবং আমাকে তাদের সম্পদ বলে মনে করে তবে তারা সমস্ত কলকাতা যদি ক্ষেপে যায় তথাপি নিজের প্রতিহিংসা ও প্রতিঘাত-বৃত্তির নিকট পরাজয় না মেনে আমার প্রতি তাদের এই বিশ্বাস প্রমাণ করে দেবে। ইতিমধ্যে আমার এই সংকটময় পরীক্ষা চলতে থাকবে।

পরে গান্ধিজী বলেন—দুষ্কৃতকারিগণ আমাকে বাঁচাবার জন্য নয়, নিজেদের হৃদয় পরিবর্তন করে অন্যায় থেকে বিরত হোক। সকলেই বুঝুক্ একটা ভাসা-ভাসা শান্তি আমাকে সন্তুষ্ট করতে পারবে না। একটি সাময়িক শান্তির পর আবার আরও ভয়ঙ্কর আগুন জ্বলে উঠবে তা আমি চাই না। তা যদি হয় তবে আমাকে সর্তহীন অনশন গ্রহণ করে মরতে হবে।

কিন্তু কলিকাতা-বাসী পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মহামানবকে সশ্রদ্ধ অন্তরে ব্যক্তিগত ক্ষয় ক্ষতির অনেক উপরে স্থান দিয়েছিল। ছাত্র,শ্রমিক ও কেরাণীরা দলে দলে এগিয়ে এলেন অশান্তি শেষ করার জন্য, সমস্ত উপদ্রুত অঞ্চল দিয়ে শান্তি শোভাযাত্রা বেরুলো।

শোভাযাত্রীর পথ কিন্তু সর্বত্র সরল সাচ্ছন্দ্যময় হোল না, পার্কসার্কাসে গম্যমান একদল শোভাযাত্রী আক্রান্ত হোল (৩রা সেপ্টেম্বর ৪৭), তাদের বাঁচাতে গিয়ে কংগ্রেস-কর্মী স্মৃতীশ বন্দোপাধ্যায়, সুশীল দাসগুপ্ত, ও বীরেশ্বর ঘোষ ছোরার আঘাতে প্রাণ দিলেন। গান্ধিজী বললেন—দুই সম্প্রদায়কে ঐক্যবদ্ধ রাখার জন্য এরূপ নির্দোষ জীবন আহুতি দেবার প্রয়োজন আছে!

সত্যই প্রয়োজন ছিল ; বাঙালী জাতি গান্ধিজীর নির্দেশকে সার্থক করে তোলার জন্ম কি চরম মূল্য দিতে পারে, তা প্রামাণিত হোল। স্বাধীনতার অপ্রতিহত গতিকে মুষ্টিমেয় গুণ্ডা প্রতিহত করতে পারলো না। কলিকাতায় আবার শান্তি ফিরে এলো। শত শত যুবক এসে গান্ধিজীর কাছে যত বে-আইনি অস্ত্রশস্ত্র সমর্পণ করলো, বললো—বাপুজী, আমরা আপনার নিকট শাস্তি চাই।

মহাত্মাজী বললেন—তোমাদের কঠোর শাস্তি দোব। শহরের শান্তি রক্ষার দায়িত্ব তোমাদেরই গ্রহণ করতে হবে।

৪ঠা সেপ্টেম্বর ৯-১৫ মিনিটের সময় গান্ধিজী অনশন ভঙ্গ করলেন। সঙ্গীত ও প্রার্থনার পর ডাক্তার দীনশা মেহতা লেবুর রস তৈরী করে দিলেন, সুরাবর্দ্দীর হাতে গান্ধিজী সেই মিষ্টরস পান করলেন।

গান্ধিজীর কলিকাতার কাজ শেষ হোল।

জ্ঞান বৈরাগ্য ভক্তির কভু নহে অঙ্গ।
অহিংসা নিয়মাদি বুলে কৃষ্ণ সঙ্গ ॥

* * *

সর্ব্বাকর্ষক সর্ব্বাহ্লাদক মহারসায়ন।
আপনার বলে করে সর্ব্ববিস্মরণ ॥
ভক্তি সুখ মুক্তি সিদ্ধি ছড়ায় যার গন্ধে।
অলৌকিক শক্তিগুণে কৃষ্ণ কৃপায় বান্ধে ॥
শাস্ত্র যুক্তি নাহি ইহা সিদ্ধান্ত বিচার।
এই স্বভাব গুণে যাতে মাধুর্য্যের সার ॥

* * *

ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্য কারুণ্য স্বরূপ পূর্ণতা।
ভক্ত বাৎসল্য আত্মা পর্য্যন্ত বদান্যতা ॥
অলৌকিক রূপ রস সৌরভাদি গুন।
কারও মন কোনগুণে করে আকর্ষণ ॥

[—শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

গান্ধিজী এলেন দিল্লীতে।

রাজধানীর সাচ্ছন্দ্য তখন সান্ধ্য-আইনের বিষণ্ণতায় স্তব্ধ হয়ে গেছে।

১৫ই আগষ্ট ভারতভূমিকে খণ্ডিত করে পাকিস্তান সৃষ্টি করা হয়েছে। নবগঠিত মুসলীম-প্রধান রাষ্ট্র ক্ষমতা লাভ করেই পশ্চিম পাঞ্জাব, সিন্ধু, বেলুচিস্তান ও সীমান্ত প্রদেশে মুসলমানেরা হিন্দুর ঘরে ঘরে হানা দিয়েছে, অতর্কিতে হত্যার অভিযান

চালিয়েছে, লুঠ করেছে, মেয়েদের অপমান করেছে, গৃহে গৃহে আগুন জেলেছে। যারা কোন রকমে বাঁচলো তারা সর্বস্ব ত্যাগ করে শুধু প্রাণ নিয়ে পদব্রজে ট্রেনে, মোটারে ও বিমানে নিরুদ্দেশের পথে যাত্রা করলো।

কিন্তু ভারতে আসার পথ নিরাপদ ছিল না। সীমান্ত অতিক্রম করাই হোল এক নির্মম সমস্যা। শেষে লোক বিনিময়ের ব্যবস্থা হোল,—এখান থেকে মুসলমানেরা যাবে তবে ওখান থেকে হিন্দুদের ছাড়া হবে। দু'টি যুদ্ধরত জাতির বন্দী বিনিময়ের মত।

বিংশ শতাব্দীতে ধর্মের নামে এমন বীভৎস হত্যানুষ্ঠান পৃথিবীর কোন দেশকে কলঙ্কিত করেনি! চার্চিল বহুদিন ধরে এই ব্যাপারেরই আভাষ দিয়েছিল, পাকিস্তানীরা সেই পরিকল্পনাকে সার্থক করে তুললো!!

সর্বহারার দল ভারতীয় ইউনিয়নে এসে প্রতিশোধ পরায়ণ হয়ে উঠলো, দিল্লী অঞ্চলে মুসলমানদের জীবন হয়ে উঠলো বিপন্ন। বহু মুসলমান ঘর বাড়ী ছেড়ে আশ্রয়-শিবিরে গিয়ে আশ্রয় নিল।

দিল্লী পৌঁছেই মহাত্মাজী সহরের প্রায় চল্লিশ মাইল পরিভ্রমণ করলেন, বললেন—প্রতিশোধ কখনই প্রতিকার নয়। এতে আসল ব্যাধিই আরও দুরারোগ্য হয়ে উঠবে। যারা নির্বিচারে হত্যা, লুণ্ঠন, অগ্নিসংযোগ প্রভৃতি ব্যাপারে ব্যাপৃত, আমি তাদের নিবৃত্ত হতে একান্ত অনুরোধ করছি।···দিল্লীর অবস্থা শান্ত করবার জন্য আমি 'করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে' নীতির প্রয়োগ করবো।

প্রতিদিন তিনি মুসলীম আশ্রয়প্রার্থী-শিবিরগুলি পরিদর্শন করতে লাগলেন, নরনারী ও শিশুদের সান্ত্বনা দিয়ে তিনি বললেন—এতদিন যারা ভ্রাতৃভাবে পাশাপাশি বাস করছিল, জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডে যাদের রক্ত একত্র প্রবাহিত হয়েছিল, তারা কিরূপে যে পরস্পরের শত্রুতে পরিণত হতে পারে, তা ভাবতেও কষ্ট বোধ হয়! হিন্দু ও শিখ আশ্রয়প্রার্থীরা পশ্চিম পাঞ্জাব হতে যে ভাবে দলে দলে পূর্ব পাঞ্জাবে চলে আসছে তা চিন্তা করলেও বিহ্বল হতে হয়। জগতের ইতিহাসে এর তুলনা নেই!

হিন্দু ও শিখদের গান্ধিজী বললেন—পাকিস্তান হতে অমুসলমানদের তাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে বলে ভারতবর্ষ থেকে মুসলমানদের বিতাড়ণ করা ঠিক হবে না। পাকিস্তান ভুল পথ গ্রহণ করেছে বলে ভারতবর্ষ কেন সে ভুল কাজ করবে? তবে পাকিস্তানে সংখ্যালঘুদের উপর যে অন্যায় কাজ চলছে, তা উপেক্ষা করার কথা আমি ভারত গবর্মেন্টকে বলিনি। সেখানকার হিন্দু ও শিখদের যথাসাধ্য রক্ষা করতে ভারতসরকার বাধ্য। কিন্তু পাকিস্তানের পথ অনুসরণ করে ভারতবর্ষ হতে মুসলমান বিতাড়ন ঠিক নয়। তবে যে সকল মুসলমান এখানে থাকতে চায় না,

তাদের নিরাপদে সীমান্ত পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়া কর্তব্য। আজ শুনছি ভারতে মুসলমান-দের রাখা হবে না, আজ যখন মুসলমানদের বিরুদ্ধে এই ধ্বনি উঠেছে, কাল পার্শী, খৃষ্টান ও ইউরোপীয়দের অবস্থা কি হবে? অনেক বন্ধু আমার ১২৫ বৎসর বাঁচবার আশা রাখেন, কিন্তু ভারতের এই দ্বেষ ও হানাহানি দেখে আমার আর এক মুহূর্ত বাঁচবার ইচ্ছা নেই।

ব্যথিত বেদনার্ত বাপুজী প্রতিনিয়ত ভগবানের নিকট প্রার্থনা করতে লাগলেন—শান্তি যদি না দাও, আমাকে তুলে লও!

২রা অক্টোবর জন্মদিবসে গান্ধিজী বললেন—১২৫ বছর বাঁচবার ইচ্ছা প্রকাশ করে আমি যদি ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে থাকি, তবে বর্তমানে এই পরিবর্তিত অবস্থায় সে ইচ্ছা ত্যাগ করার মত নম্রতাও আমার আছে। চারিদিকে এই হানাহানি, দ্বেষ হিংসা দেখে আর বাঁচতে ইচ্ছা হয় না, তথাপি কেঁদে বলছি,—আমার নয় শুধু তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক, ভগবান! তিনি যদি আমাকে চান, তিনি এখনও কিছুকাল আমাকে এই পৃথিবীতে রাখবেন।

দিল্লীর পথে পথে জয়ধ্বনি উঠলো—মহাত্মা গান্ধিকী জয়!

গান্ধিজী বললেন—যারা আমার জয়ধ্বনি করছে তারা জানে না যে আজ আমার সম্বন্ধে ওই ধ্বনি করা মিথ্যা। হিন্দু ও মুসলমান যদি পরস্পর শান্তিতে বাস না করে তবে আমার আর বেঁচে থাকার সাধ নেই। একতায় বল, আর দ্বন্দ্বে বলক্ষয়, ইহা আমি লোককে প্রাণপণে বুঝাবার চেষ্টা করছি। কিন্তু সে সাধনা যদি ফলপ্রসূ না হয় তবে ফলহীন বৃক্ষের মতই আমার দেহের অবসান হোক!

দাদূ এঁকৈ আতমা সাহিব হৈ সব মাহিঁ।
সাহিবকে নাতে মিলৈ ভেখ পংথকে নাহিঁ॥
জব প্রাণ পৈছানৈ আপ কোঁ আতম সব ভাঈ।
সিরজনহারা সবনকা তা সোঁ লব লাঈ॥
পূরণ ব্রহ্ম বিচারি লে দুতিয় ভাব করি দূর।
সব ঘটি সাহিব দেখিয়ে রাম রহ্যা ভরপুর॥—

[হে দাদূ, একই আত্মা সবার, প্রভু বিরাজিত সবারই মধ্যে; প্রভুর সম্পর্কেই আমরা সবাই পারি মিলতে, ধর্মের ভেখ (বেশ) ও পন্থের (মত ও সম্প্রদায়ের) দিক দিয়াই মিলন অসম্ভব। প্রাণ যখন আপনাকে সকলের মধ্যে চিনতে পারলো,

তখন সব মানুষই ভাই ; তিনিই সবার সৃজনকর্তা, সবাইকে ভাই জেনে তাঁর সাথে প্রেম-ধ্যান কর যুক্ত। পূর্ণব্রহ্মের দিক দিয়ে সকলকে লও জেনে, আপনার দ্বৈতভাব দূর কর, সকল ঘটেই দেখ প্রভু বিরাজিত, সর্বঘটেই রাম ভরপুর বিরাজমান।—দাদূর বাণী ]

গান্ধিজী দিল্লী ও কুরুক্ষেত্রের আশ্রয়-শিবিরগুলি দেখলেন। অক্টোবরের শীত তখন উত্তর ভারতের বুকে ঘনীভূত হচ্ছে, সর্বহারাদের জন্য গান্ধিজী দেশবাসীর কাছে আবেদন জানালেন—কম্বল দাও!

ঝম্ ঝম্ করে দিল্লীর বুকে বৃষ্টি নামে, গান্ধিজী অতন্দ্র চোখে তাকিয়ে থাকেন মেঘময় আকাশের পানে, বজ্রের গুরু গুরু গর্জন তাঁর মনকে আহত করে, সর্বহারাদের চিন্তায় ভারী হয়ে ওঠে তাঁর বুক। দিল্লীর প্রার্থনা-সভার প্রান্তরে তাঁর ব্যথাতুর কণ্ঠ ধ্বনিত হয়—গত রাত্রে বৃষ্টি হয়েছে। বৃষ্টির শব্দে প্রাণ জুড়ায়। তাতে সঞ্জীবনী শক্তি আছে। কিন্তু সেই শব্দে মন বেদনায় ভারী হয়ে উঠলো : দিল্লীর নানাস্থানে অবস্থিত অনাবৃত আশ্রয়কেন্দ্রগুলিতে আশ্রয়প্রার্থীরা এখন কি ভাবে আছে? পূর্ব ও পশ্চিম পাঞ্জাবের আশ্রয়প্রার্থীরা গৃহহীন, আশ্রয়হীন, কার পাপে তাদের এই দশা? শুনতে পেলাম, ৫৭ মাইল লম্বা এক সৈনিক-রক্ষিত হিন্দু ও শিখ শরণার্থীদল পূর্ব পাঞ্জাবে আসছে। সুস্থ মস্তিষ্কে তা ভাবা কঠিন। জগতের ইতিহাসে এরূপ ব্যাপার পূর্বে কখনও ঘটে নাই! মানুষের নিষ্ঠুরতার জন্যই না মানুষের এই দশা? আশ্রয়প্রার্থীদের না আছে মাথা গুঁজবার ঠাঁই, না আছে পেটে অন্ন। আশ্রয়কেন্দ্রে হাঁটুজলে রাত্রি কাটানোই কি তাদের ভবিষ্যতের লিখন? দিনটা ছিল মৌন দিবস। আত্মস্থ হয়ে ভেবেছিলাম দিল্লীর লোকেরা কি পাগল হয়েছে? তাদের মনুষ্যত্ব কি লোপ পেয়েছে? লাখ লাখ হিন্দু ও লাখ লাখ মুসলমান নিজ নিজ জন্মভূমি ছেড়ে যাবে, তা আমার নিকট অভাবনীয়! এই পথে চলতে যদি আর কেউ না থাকে, আমি একাই চলতে পারবো, এ বিশ্বাস আমার আছে।

যদি কেউ কথা না কয়—
(ওরে ওরে ও অভাগা!)
যদি সবাই থাকে মুখ ফিরায়ে
সবাই করে ভয়—

তবে পরাণ খুলে

ও তুই মুখ ফুটে তোর মনের কথা

একলা বলো রে

× ×

যদি ঝড় বাদলে আঁধার রাতে—

দুয়ার দেয় ঘরে

তবে বজ্রানলে

আপন বুকের পাঁজর জ্বালিয়ে নিয়ে

একলা জ্বলো রে॥

যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে

তবে একলা চলো রে॥

[ —রবীন্দ্রনাথ

আর্ত সর্বহারাদের চোখের জল ক্রুদ্ধ ক্ষুব্ধ জনগণের মনে করুণা জাগাতে পারে না, তবে কি মাৎসর্যের কাছে মনুষ্যত্ব পরাজয় মানবে—তবে কি অন্যায়ের বেদীমূলে সত্যাগ্রহী মাথা নত করবে ?

মনুষ্যত্ব সাড়া তুললো—না না। করবো, না হয় মরবো—করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে !

১৩ই জানুয়ারী ১১টার সময় গান্ধিজী আমরণ অনশন সুরু করলেন। বললেন—যখন বুঝবো যে বাইরের চাপ ব্যতীতই কর্তব্য বোধে অনুপ্রাণিত হয়ে দিল্লীর বিভিন্ন সম্প্রদায়ের অন্তরের মিলন হয়েছে, তখনই আমি অনশন ত্যাগ করবো।

সারা ভারত আবার চঞ্চল হয়ে উঠলো। এই তো সেদিন তিনি কলকাতায় অনশন করেছেন, এখনও চার মাস হয়নি, ওই ক্ষীণ দেহে আর কত সইতে পারবে ? দেশের নেতারা ও জনসাধারণ প্রকৃত মিলনের জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠলো।

জহরলাল প্রতিশ্রুতি দিলেন—সাতদিনের মধ্যে আশ্রয় প্রার্থীদের নিজ নিজ বাসস্থানে নিরাপদে রাখার ব্যবস্থা করবেন !

দিল্লীর শান্তি-কমিটি মহাত্মার কাছে প্রতিশ্রুতি দিল—আমরা মুসলমানদের জীবন, সম্পত্তি ও ধর্মবিশ্বাস রক্ষা করে চলবো এবং দিল্লীতে যে সব ঘটনা ঘটছে তা আর কখনও ঘটতে দোব না !

দিল্লীর দু'লাখ নাগরিক এক প্রতিজ্ঞা-পত্রে স্বাক্ষর করলো।

পাকিস্তান ভারত সরকারের কাছ থেকে ৫৫ কোটি টাকা পেতো, কিন্তু তারা অন্যায়ভাবে কাশ্মীর আক্রমণ করার জন্য ভারত সরকার সে টাকা আটকে রেখেছিলেন,

মিলনের পথ সহজ করার জন্য গান্ধিজী সে টাকা ভারত সরকারকে দিয়ে দিতে বললেন।

মন্দির, মসজিদ, গির্জা ও গুরুদ্বারে গান্ধিজীর দীর্ঘজীবন কামনা করে প্রার্থনা করা হোল।

পাঁচদিন পরে গান্ধিজী অনশন ভঙ্গ করলেন।—১৮ই জানুয়ারী বেলা ১২-৪০ মিনিটে মৌলানা আজাদের হাতে তিনি গ্লুকোজ মিশানো কমলা লেবুর রস গ্রহণ করলেন।

কিন্তু এতো করেও গান্ধিজী পাকিস্তানীদের চিত্ত জয় করতে পারলেন না। যখন তিনি দিল্লীতে মুসলমানদের রক্ষা করার জন্য অনশন করছিলেন তখন পাঞ্জাবের পাকিস্তানীরা গুজরাটে (পাঞ্জাব) একখানি ট্রেন আক্রমণ করলো, সেই ট্রেনে দু'হাজার হিন্দু ও শিখ আশ্রয়প্রার্থী আসছিল ভারতে, তাদের প্রত্যেককে পাকিস্তানীরা হত্যা করলো!

একদল হিন্দু ও শিখ এই ব্যাপারে গান্ধিজীর উপর বিরূপ হয়ে উঠলো, অভিযোগ তুললো—মহাত্মাজী মুসলমানদের তোষামোদ করছেন, তাঁর অনশন পক্ষপাতমূলক!

গান্ধিজী বললেন—যারা আমাকে হিন্দু ও শিখের শত্রু বলেন তাঁরা আমাকে জানেন না। আমি কারুর শত্রু হতে পারি না, হিন্দু ও শিখের তো নয়ই।···পাকিস্তানের মুসলমানেরা যাই করুক, আপনারা যেন আপনাদের হাত মলিন করবেন না,··· অন্যায়ের পাল্টা জবাবে অন্যায় করলে অন্যায় কখনও ন্যায় হয় না।···

কিন্তু গান্ধিজীকে বোঝবার মত মনস্বিতা সর্বহারাদের ছিল না, ২০শে জানুয়ারী যখন তিনি বিড়লাভবনের প্রাঙ্গণে প্রার্থনা সভায় বক্তৃতা করছেন, এমন সময় তাঁর পনেরো গজ দূরে একটি দেশী বোমা এসে ফেটে পড়লো। বোমাটি গান্ধিজীকে লক্ষ্য করেই ছুড়েছিল পাঞ্জাবের এক সর্বহারা। গান্ধিজী কিন্তু এতটুকু চঞ্চল হলেন না, শান্তভাবে তিনি প্রার্থনা শেষ করলেন।

গান্ধিজীকে হত্যার ষড়যন্ত্র!

ইনেস্‌পেক্টার-জেনারেল বিশেষ পাহারার ব্যবস্থা করতে চাইলেন। গান্ধিজী বললেন—প্রার্থনা সভা সকলের জন্য উন্মুক্ত—অবারিত, মরতে হয় তো সেখানেই মরবো!

বন্ধুরা বললেন—আগুন নিয়ে এ খেলা কেন!

ভক্তেরা বললেন—আপনি আপনার কাজ করুন, গোয়েন্দাদের তাদের কাজ করতে দিন।

কিন্তু গান্ধিজী রাজী হলেন না, বললেন—বহু চিন্তার পর সম্যক উপলব্ধি করেছি যে মৃত্যু জীবনের রূপান্তর ছাড়া আর কিছু নয়। কাজেই মৃত্যুকে যখনই মুখোমুখি পাব, তখনই তাকে আলিঙ্গন করবো।...পূর্বেও আমার জীবন নাশের চেষ্টা করা হয়েছে, কিন্তু ভগবান আমাকে রক্ষা করেছেন, আক্রমণকারী [illegible] কর্মের জন্য অনুতাপ করেছে। পৃথিবী হতে একজন পাপিষ্ঠকে অপসারিত করার [illegible]ায় কেউ যদি আমার প্রতি গুলি নিক্ষেপ করে, তাহলে সে গুলিতে আসল গান্ধী নিহত হবেন না। আক্রমণকারীর চোখে যাকে পাপিষ্ঠ বলে মনে হয়েছে, সে-ই মারা পড়বে। যারা আমার প্রতি দোষারোপ করছে তাদের প্রতি আমি যেন ক্রুদ্ধ না হই এবং তাঁদের হাতে মৃত্যু হলেও যেন তাদের অমঙ্গল চিন্তা না করি। ঈশ্বর যেন আমাকে সেইরূপ মানসিক শক্তি দেন। আমার মত আরোও শত সহস্র ব্যক্তি মৃত্যু বরণ করুক কিন্তু সত্য যেন কিছুতেই বিনষ্ট না হয়।

যে বোমা ছুড়েছিল সে ধরা পড়ে, তার সম্পর্কে গান্ধিজী পুলিশের ইনেসপেক্টার জেনারেলকে বলেন—তাকে যেন কোন রকম পীড়ন করা না হয়। তাকে বুঝিয়ে সৎপথে আনার চেষ্টা করাই উচিত!

কিন্তু মহাত্মার মহত্ব তখনও সবাই বুঝলো না, বিরোধীরা সাড়া তুললো—পাকিস্তানে গিয়ে তিনি শান্তি প্রচার করুন না কেন!

২৫শে জানুয়ারী প্রার্থনা সভায় গান্ধিজী বললেন—পাকিস্তান একটি ভিন্ন রাষ্ট্র, সুতরাং পাকিস্তান সরকারের অনুমতি পেলেই আমি পাকিস্তানের দুর্গত অঞ্চলে যাব!

কিন্তু—

না পাইয়াছে হিন্দু পথের সন্ধান,
না পাইয়াছে মুসলমান ধর্মের খোঁজ,
সত্য ধর্ম বিহনে,
রাম রহিম নাম লইয়া মারামারি করে
আমরা না হিন্দু, না মুসলমান,
উভয়েই হইয়াছি সয়তানের দাস।

[—গুরু নানক।

এই শয়তানির যবনিকা ছিন্ন করে আলোকের ইঙ্গিত যিনি দেবেন, শয়তানির

হলাহল আকণ্ঠ তাঁকে পান করতে হবে, গান্ধিজী সেজন্য প্রস্তুত ছিলেন, হরিজনে তিনি লিখেছিলেন—পাপীর জন্য নিষ্পাপ লোককে দুঃখ ভোগ করতে হয়, এই কি আমাদের বিধিলিপি নয়! এ বিধি তো ভালই। কারণ নিষ্পাপ লোকের দুঃখ-দহনের মধ্য দিয়ে পৃথিবী সমৃদ্ধতর ও পবিত্রতর হয়েছে!

মহামানব দূর থেকে শুনতে পান দধীচির আহ্বান—কৈলাস শিখর হতে দূরাগত ভৈরবের মহাসঙ্গীতের মত:

হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী, নিত্য নিঠুর দ্বন্দ্ব
ঘোর কুটিল পন্থ তার লোভ জটিল বন্ধ
নূতন তব জন্ম লাগি কাতর যত প্রাণী
কর ত্রাণ মহাপ্রাণ, আন অমৃত বাণী,
এস দানবীর দাও ত্যাগ কঠিন দীক্ষা,
মহাভিক্ষু লও সবার অহঙ্কার ভিক্ষা
লোক লোক ভুলুক শোক খণ্ডন কর মোহ
উজ্জ্বল হোক জ্ঞান সূর্য উদয় সমারোহ
প্রাণ লভুক সকল ভুবন, নয়ন লভুক অন্ধ
শান্ত হে, মুক্ত হে, হে অনন্ত পুণ্য
করুণাঘন, ধরণীতল কর কলঙ্ক শূন্য...

[—রবীন্দ্রনাথ

মহাত্মাজীর ললাট নূতন দিনের আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো, তৃতীয় নয়ন উন্মীলন করে তিনি ভাবীকালের নির্দেশ দেখতে পেলেন, জাতিকে তিনি বললেন—আমি অশান্তির মধ্যে শান্তি খুঁজে বের করবো! অন্ধকারের মধ্যে আলোক খুঁজে বের করবো! নৈরাশ্যের মধ্যে আশার বাণী শোনাবো!

২৯ শে জানুয়ারী।

কাজ শুধু কাজ।

সন্ধ্যার প্রার্থনা সভায় একজন এসে নাম সহি চাইল, বললো—আপনি তো ২রা তারিখে ওয়ার্ধা চলে যাচ্ছেন।

গান্ধিজী বললেন—কে একথা বললো?

—খবরের কাগজে দেখলাম।

গান্ধিজী হেসে বললেন—আমিও গান্ধী সম্বন্ধে ঐ কথা দেখেছি, কিন্তু সে গান্ধী কে আমি জানি না।

( তবে কি গান্ধিজী তাঁর মৃত্যুর পূর্বাভাষ পেয়েছিলেন ? )

সন্ধ্যার পর তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়লেন, তখনও তাঁর হাতে একটি কাজ বাকী। কংগ্রেস গঠনতন্ত্র তৈরী করার ভার নিয়েছেন, তারই কাগজপত্র এখনও দেখা হয় নি, আভাকে বলেন—আমার মাথা ঘুরছে, তবুও কাজ আমি শেষ করবই! আমাকে দেখছি রাত্রি জাগরণ করতে হবে।

গঠন-তন্ত্রের খসড়া দেখা যখন শেষ হোল, রাত তখন সওয়া ন'টা।

শ্রান্ত দেহ শয্যায় এলিয়ে দেবার জন্য তিনি উন্মুখ, এমন সময় একটি মেয়ে বললো—বাপুজী আজ তো আপনি অঙ্গচালনা করলেন না!

—আচ্ছা, তোমরা যখন বলছ তখন আমি তা করবো।

প্রতিরাত্রে শয়নের আগে দুটি মেয়ের কাঁধে হাত দিয়ে প্যারালাল-বারে ওঠা-নামার মত বার কয়েক তিনি ব্যায়াম করে নিতেন, আজ আর সে কাজে তেমন উৎসাহ ছিল না, আজ বার তিনেক ওঠানামা করেই তিনি ছেড়ে দিলেন।

বিছানায় শুয়ে ঘুম না আসা পর্যন্ত চারিপাশের মেয়েদের সঙ্গে তিনি কথাবার্তা কইতেন। আজ তিনি বললেন—মেয়েদের আমি আমার 'ভ্রমণের লাঠি' হতে দিই, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে আমার তা'তে প্রয়োজন নেই। কোন কিছুর জন্য কারও উপর নির্ভর না করতে আমি বহুকাল নিজেকে অভ্যস্ত করে নিয়েছি। মেয়েরা যেমন তাদের বাপের কাছে থাকে, আমার কাছে তেমনই আসে এবং আমাকে ঘিরে থাকে। আমার তা ভালো লাগে, কিন্তু আসলে আমি একেবারে উদাসীন।

কথা বলতে বলতে কোন এক সময় তিনি একটু আনমনা হয়ে গেলেন, ধীরে ধীরে আবৃত্তি করেন একটি গুজরাটি কবিতার দুটি বচন—অদ্‌ভুত এই পৃথিবী, আর কতকাল খেলবো এই খেলা…

( তবে কি গান্ধিজী তাঁর মৃত্যুর পূর্বাভাষ পেয়েছিলেন ? )

নিকটের লোকেরা তাঁর হাত পা মালিশ করতে করতে কোন এক সময় তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন।

পরদিন সকালে প্রার্থনা সভা শেষে পার্শ্বচর বিষাণকে বললেন—আজ সব জরুরী চিঠিগুলি আমাকে দেবে, সারাদিনে আমি সেগুলির কাজ শেষ করে ফেলবো।

কংগ্রেসের গঠনতন্ত্রটি প্যারীলালের হাতে দিলেন, বললেন—খুব ভালো করে পড়ে দেখ, চিন্তা ধারার ফাঁক যদি কোথাও পাও, তবে তা পূরণ করে দিও—

তারপর বাংলা পাঠ।

সাড়ে ন' টার সময় প্রাতঃকালীন আহার : ছাগদুগ্ধ, সিদ্ধ ও কাঁচা আনাজ, কমলা লেবু, আদা, টকলেবু ও ঘৃতকুমারীর নির্যাস।

কথায় কথায় পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘুদের সরিয়ে আনা সম্পর্কে বললেন—আমরা যারা জীবন পণে শান্তি ও ঐক্যের ব্রত গ্রহণ করেছি তাদের পক্ষে তা কখনই সম্ভব নয়। হয়তো শেষ পর্যন্ত খুব অল্প লোকই অবশিষ্ট থাকবে, কিন্তু দুর্বলতার মধ্যে শক্তির সন্ধান করতে হলে এছাড়া আর পথ নেই। সশস্ত্র যুদ্ধে কি যোদ্ধার সংখ্যা কমে যায় না! অহিংস সংগ্রামেই বা তার ব্যতিক্রম হবে কি করে?

তুমি যদি একা নিজের কাজটুকু সুসম্পন্ন করতে পারো তবে সঙ্গীদের সকলের কাজও অগ্রসর হবে।…

সুধীর ঘোষ এসে বললেন—একদল লোক সর্দার প্যাটেলকে সাম্প্রদায়িকতা-বাদী বলে নিন্দা করে ও জহরলালের সুখ্যাতি করে দু'জনের মাঝে ভেদ সৃষ্টি করার চেষ্টা করছে।

গান্ধিজী বললেন—এই কূট চালের কথা আমি জানি, এবিষয়ে কি করা যেতে পারে তাই আমি চিন্তা করছি!

তারপর মৌলানা আজাদ এলেন।

তারপর এলেন কলম্বিয়া ব্রডকাষ্টিং সিষ্টেমের সংবাদদাতা মার্গারেট বুর্কহোয়াইট্, কথায় কথায় তিনি প্রশ্ন করলেন—আপনি সব সময়েই বলে থাকেন আপনি একশো পঁচিশ বছর বাঁচবেন, কিসে আপনার এমন আশা হোল?

ম্লান হেসে বাপুজী বললেন—সে আশা আমি ত্যাগ করেছি।

মার্গারেট বিস্ময়ে প্রশ্ন করলেন—কেন?

গান্ধিজী বলেন—সমগ্র বিশ্ব আজ হিংসায় উন্মত্ত, চারিদিকে চলেছে অত্যাচার আর ব্যভিচারের তাণ্ডবলীলা। অন্ধকারের মধ্যে আমি বেঁচে থাকতে চাই না।

একটু থেমে কি যেন ভাবলেন, তারপর উদাসভাবে বললেন—আমার সেবার যদি প্রয়োজন থাকে, তবে আমি একশো পঁচিশ বছর পর্যন্তই বাঁচবো!

তারপর এলেন পণ্ডিতজী, এলেন সর্দারজী। তাঁদের সঙ্গে কথা বলতে বলতেই গান্ধিজী তাঁর বৈকালিক আহার শেষ করলেন। তারপর আভা ও মানুর কাঁধে ভর দিয়ে প্রার্থনা সভায় যাবার জন্য বাহির হয়ে পড়লেন, ঘড়ির পানে তাকিয়ে

বললেন—দশ মিনিট দেরী হয়ে গেল, দেরী হওয়াটা আমার বড় খারাপ লাগে। ঠিক পাঁচটার সময় আমি প্রার্থনা সভায় থাকতে চাই!

কথা বলতে বলতে গান্ধিজী সভার মাঝে এসে দাঁড়ালেন। দু'পাশে জনতা, তার মাঝ দিয়ে মঞ্চের উপর যাবার পথ। সেই পথ দিয়ে অগ্রসর হতে হতে জনমণ্ডলীকে প্রতিনমস্কার জানালেন। এমন সময় বাঁ দিক থেকে জনতার ভীড় ঠেলে একজন লোক সামনে পথের উপর এসে পড়লো। মানু ভাবলো সে বাপুজীর পায়ের ধূলা নেবার জন্য অগ্রসর হয়ে আসছে, তাই আপত্তি জানিয়ে বললো—প্রার্থনার সময় অতীত হয়ে গেছে!

লোকটি সে কথা গ্রাহ্য করলো না, মানু তার হাত ধরে নিরস্ত করার চেষ্টা করলো, সে ঝাঁকানি দিয়ে মানুকে সরিয়ে দিল। তার ঝটকায় মানুর হাতে যে আশ্রম-ভজনাবলী ও বাপুর পিকদানী ও মালা ছিল তা পড়ে গেল। মানু সেগুলি কুড়িয়ে নেবার জন্য নত হয়েছে, তখন লোকটি একেবারে গান্ধিজীর সামনে এসে দাঁড়ালো, তার হাতে ছিল সাত নলা অটোমেটিক্ পিস্তল, পর পর তিনটি গুলি চালালো গান্ধিজীর উপর। প্রথম গুলিটি লাগলো গান্ধিজীর পেটের ডান দিকে, নাভির আড়াই ইঞ্চি উপরে। দ্বিতীয় গুলিটি দক্ষিণ পাঁজরের সপ্তম স্থানে। তৃতীয় গুলিটি লাগলো গান্ধিজীর বুকে। প্রথম ও দ্বিতীয় গুলি শরীর ভেদ করে পৃষ্ঠদেশ দিয়ে বাহির হয়ে যায়। তৃতীয়টি ফুসফুসের ভিতর থেকে যায়।

প্রথম গুলি খেয়ে গান্ধিজী স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন।

দ্বিতীয় গুলি খেয়ে তিনি 'হা রাম' বলে পড়ে গেলেন।

মানু ও আভা এতক্ষণে ব্যাপারটা বুঝতে পারলো, বাগানের মালী ছুটে এলো—একি! একি!!

একটি রক্তাক্ত রেখা ধীরে ধীরে গান্ধিজীর শুভ্র বসনকে রঞ্জিত করে তুললো।

ডাক্তার রাজ সভারওয়াল ছিলেন পিছনে, বাপুজীর মাথাটি তুলে তিনি মেয়েটির কোলের উপর রাখলেন, তারপর বন্ধুরা নিস্পন্দ দেহটিকে ধরাধরি করে নিয়ে এলেন ভিতরে, বিছানার উপর শুইয়ে দিলেন। একটু গরম জল ও মধু খাওয়াবার চেষ্টা হোল, কিন্তু তা গলা দিয়ে নাবলো না। কয়েক মিনিটের মধ্যেই দেহ নিস্পন্দ হয়ে গেল।

প্যাটেল ছুটে এলেন, মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন মহাত্মাজীর প্রাণহীন দেহের পাশে। জহরলাল ছুটে এলেন, বাপুজীর বসনে মুখ ঢেকে কেঁদে উঠলেন শিশুর মত।

কনিষ্ঠ পুত্র দেবদাস এলেন।

তারপর এলেন জয়রাম দাস, অমৃত কাউর, কৃপালনী!

মাউণ্টব্যাটেন এসে চোখ মুছলেন।

চারিপাশে উঠলো কান্নার স্বর, মূর্ছিত বেদনার বিষন্নতা ঘরখানিকে স্তব্ধ করে দিল, তারপর ধীরে ধীরে দীর্ঘশ্বাসের মত ধ্বনিত হোল:

রঘুপতি রাঘব রাজারাম
পতিত পাবন সীতারাম!

নিখিল ভারত বেতার কেন্দ্রে সহসা প্রোগ্রাম থেমে গেল! তীক্ষ্ণ করুণ স্বর ধ্বনিত হোল—মহাত্মা গান্ধী আততায়ীর গুলির আঘাতে নিহত হয়েছেন। পাঁচটা চল্লিশ মিনিটে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন……পর পর চারটি গুলি ছোড়া হয়, একটি তাঁর বুকের দক্ষিণ পাশে, দুটি তাঁর পেটে বিদ্ধ হয়……ভগবান তাঁর আত্মার কল্যাণ করুন।

নগরে নগরে কর্মমুখর জন-কোলাহল স্তব্ধ হয়ে গেল, ভারতের জনগণ সহসা কি যেন হারিয়ে ফেললো—গান্ধিজী নেই! মহাত্মাজী আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন!! অহিংস সত্যাগ্রহী মানবতার সেবায় বিংশ শতাব্দীর সভ্যতার হিংস্র বিষ নিজের বুকে গ্রহণ করে বিদায় নিয়েছেন, ১৯৪৭ বছর পরে যিশু আবার প্রাণ দিয়ে গেলেন!!! দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে সবার অন্তরে একই প্রার্থনা গুমরে ওঠে—ক্ষমা কর ভগবান, আমাদের ক্ষমা কর! ক্ষমা কর, মহামানব মহাত্মা! অহিংসার প্রশান্ত বুকে এই হিংস্র পাপের কর অবসান!…

—গান্ধিজী নিহত হয়েছেন!

মজঃফরপুরের সিভিল কোর্টের পিওন মহম্মদ ইসমাইল চলেছিলেন পথ দিয়ে, খবর শুনেই তিনি চমকে উঠলেন, পথের উপর আছড়ে পড়লেন আর উঠলেন না।

—গান্ধিজী নিহত হয়েছেন!

জামসেদপুরে মজুরদের সভা বসেছিল, খবর শুনেই কয়েকজন মজুর মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লেন, একজনের মূর্চ্ছা আর ভাঙলো না।

—গান্ধিজী নিহত হয়েছেন!

মীরাটের এক বইয়ের দোকানে বসে ধর্মবীর বই বিক্রী করছিলেন, খবর শুনেই তিনি পড়ে গেলেন, হৃদস্পন্দন থেমে গেল।

## আমাদের গান্ধিজী

—গান্ধিজী নিহত হয়েছেন !

গাঞ্জাম জেলার বিশিষ্টা কর্মী শ্রীমতী ইয়েলাম্বী সান্নায়া খবর শুনে ঝর ঝর করে কেঁদে ফেললেন, তারপরেই লুটিয়ে পড়লেন ধূলায়, আর উঠলেন না।

—গান্ধিজী নিহত হয়েছেন !

রফি আমেদ কিদোয়াইয়ের বৃদ্ধ পিতা ইম্তিয়াজ আলি কিদোয়াই অসুস্থ ছিলেন, খবর শুনেই তিনি থর থর করে কেঁপে উঠলেন, পরক্ষণেই সব স্থির হয়ে গেল।

—গান্ধিজী নিহত হয়েছেন !

বিজয়নগরম্ মহারাজ-কলেজের অধ্যক্ষ কে, আর, সুব্রহ্মণ্যম্ খবর শুনে চমকে উঠলেন, বুক ঠেলে একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস বাহির হয়ে এলো, সেদিন তিনি কিছুই খেতে পারলেন না, পরদিন তাঁর হার্টফেল করলো।

—গান্ধিজী নিহত হয়েছেন !

বাংগালোর উলসুরের আরুলানন্দ নামে একজন লোক খবর শুনে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন, আর উঠলেন না।

—গান্ধিজী নিহত হয়েছেন !

বোম্বাইয়ের এপোলো বন্দরে এক যুবক খবর শুনেই সমুদ্রের সৈকতে বসে পড়লেন, দূরের দিগন্তে তাকিয়ে কি যেন ভাবলেন কে জানে, সহসা তাঁর মনে হোল এই হিংসা-কলঙ্কিত পৃথিবীতে বেঁচে থাকার কোন অর্থ হয় না, পকেট থেকে নোট বইখানি বের করে তিনি লিখলেন 'মহাত্মাজীর সঙ্গেই আমি চললুম !' তারপরেই ঝাঁপিয়ে পড়লেন সাগরের বুকে !

পুলিশের চোখে পড়েছিল, যথাসময় তাঁকে উদ্ধার না করলে সে জলে ডুবেই মরতো।

—গান্ধিজী নিহত হয়েছেন !

বারাণসীর পথে পথে এক অন্ধ-ভিখারী ভিক্ষা করছিলেন, সংবাদ শুনে তিনি পথের উপরেই বসে পড়লেন, অন্ধের চোখ থেকে নেবে এলো অশ্রুর বাদল। তাঁর কণ্ঠ স্তব্ধ হয়ে গেল, ভিক্ষা করার প্রয়োজন আর তাঁর রইলো না, সহসা যেন তিনি উপলব্ধি করলেন, এ পৃথিবীতে জীবন ধারণের কোন প্রয়োজন নেই। তিনি আহার ত্যাগ করলেন। কদিন পরে নিঃশব্দে তিনি দেহরক্ষা করলেন।

—গান্ধিজী নিহত হয়েছেন !

মজঃফরপুর জেলার লালগঞ্জ গ্রামের পঞ্চাশ বছর বয়সের এক নাপিত মিশ্র ঠাকুর খবর শুনে আহার ত্যাগ করলেন, বললেন—'গান্ধিজী বিহীন জগতে বেঁচে

থেকে লাভ কি ? কদিনের মধ্যেই মৃত্যুর কালো ছায়া ঘনিয়ে উঠলো তাঁর উপর, শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার আগে তিনি বললেন—আমার উদ্দেশ্য সফল হতে চলেছে !

—গান্ধিজী নিহত হয়েছেন !

কুম্ভকোনমের পদযাচী নামে এক ব্যবসায়ী খবরটি শুনে কেমন যেন হয়ে গেলেন—দেবতার ক্ষমা-সুন্দর দেহে আততায়ী আঘাত করলো ! হাতের কাছে যা পেলেন তাই দিয়ে তিনি আঘাত করতে লাগলেন নিজের দেহে। আঘাত করতে করতে তিনি অচেতন হয়ে পড়লেন, চারিপাশের লোক ছুটে এসে তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে গেল।

—মহাত্মাজী নিহত হয়েছেন ! এক মারাঠী গুলি করে তাঁকে খুন করেছে।

শ্রীসানে গুরুজী বোম্বায়ের মারাঠী সমাজতান্ত্রিক নেতা, স্বজাতির এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য তিনি একুশ দিন অনশন সুরু করলেন।

রেডিওতে পণ্ডিতজীর ভগ্নস্বর ভেসে এলো—বন্ধু ও সাথীগণ ! আপনাদের আমি আজ কি শোনাব ? কেমন করে বলবো আমাদের প্রিয় নেতা আমাদের বাপুজী আর ইহজগতে নেই !···

ক্ষমা করো ধৈর্য ধরো, হউক সুন্দরতর
বিদায়ের ক্ষণ।
মৃত্যু নয় ধ্বংস নয়, নহে বিচ্ছেদের ভয়,
শুধু সমাপন।
শুধু সুখ হতে স্মৃতি, শুধু ব্যথা হতে গীতি
তরী হতে তীর,
খেলা হতে খেলা-শ্রান্তি, বাসনা হইতে শান্তি,
নভ হতে নীড়।
দিনান্তের নম্র কর, পড়ুক মাথার পর,
আঁখিপরে ঘুম,
হৃদয়ের পত্রপুটে গোপনে উঠুক ফুটে
নিশার কুসুম।
আরতির শঙ্খ রবে নামিয়া আসুক তবে
পূর্ণ পরিণাম,
হাসি নয়, অশ্রু নয়, উদার বৈরাগ্যময়
বিশাল বিশ্রাম।

* * *

# আমাদের গান্ধিজী

হে মহাসুন্দর শেষ, হে বিদায় অনিমেষ,
হে সৌম্য বিষাদ,
ক্ষণেক দাঁড়াও স্থির মুছায়ে নয়ন-নীর
করো আশীর্ব্বাদ।
ক্ষণেক দাঁড়াও স্থির, পদতলে নমি শির
তব যাত্রাপথে,
নিষ্কম্প প্রদীপ ধরি' নিঃশব্দে আরতি করি
নিস্তব্ধ জগতে॥

[—রবীন্দ্রনাথ

গান্ধী-হীন রাত্রি নেবে এলো ভারতের উষর রাজধানীর বুকে।

বিড়লা ভবনের বাহিরে জনতার ভীড়, মহাত্মাজীর মুখখানি তারা একবার দেখতে চায়। উজ্জ্বল আলোয় উদ্‌ভাসিত হোল প্রশান্ত ক্ষমা সুন্দর মুখখানি। জনতা ধ্বনি তুললো—মহাত্মা গান্ধিজী কি জয়!

মৃদু ভেসে আসে সুচেতা ও নন্দিতা কৃপালনীর কণ্ঠ:

—জীবন যখন শুকায়ে যায়, করুণা ধারায় এসো…

ভেসে আসে ভজনের সুর:

—বৈষ্ণব জন তো তেনে কহীয়ে…

ভেসে আসে ভগবদ্‌গীতার শ্লোক:

—ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিৎ নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।

—অজো নিত্যঃ শাসতোঽয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥…

চারিপাশের বাতাস যেন কান্নায় কেঁপে কেঁপে ওঠে।

৩১ শে জানুয়ারী। ম্লান রিক্ত দিন। মেঘের আড়ালে বেদনামলিন সূর্য ম্লান হয়ে থাকে।

বিড়লা ভবন থেকে যমুনার তীর অবধি স্তব্ধ শোকার্ত লোকারণ্য।

বেলা পৌনে বারোটা। মহাত্মাজীর দেহ বয়ে নিয়ে এলেন মানু গান্ধী, পিয়ারীলাল ও কয়েকটি ভক্ত। পিছনে পণ্ডিতজী, সর্দারজী ও অন্যান্য মন্ত্রিগণ। ধীরে ধীরে দেহটীকে তুলে দেওয়া হোল সেনাবিভাগের একখানি পুষ্পসজ্জিত শকটের উপর। শুভ্র খদ্দর ভূষিত দেহ। শুধু মুখখানি গুলিবিদ্ধ বক্ষ অবধি অনাবৃত। শকটের পা-দানির উপর দাঁড়িয়ে একপাশে পণ্ডিতজী, আরেকপাশে সর্দার বলদেও

শেহে, সামনে বসে আছেন দেবদাস গান্ধী। পায়ের কাছে বসলেন সর্দারজী ও রামদাস গান্ধী, পাশে পাশে চললেন আচার্য কৃপালনী ও পিয়ারীলাল। পিছনে রাজেন্দ্রপ্রসাদ এবং কত জ্ঞানী ও গুণীজন ভীড়ের মাঝে হারিয়ে গেলেন। ভারতীয় বিমান ও নৌবাহিনীর লোকেরা শকটখানি এগিয়ে নিয়ে চললো। বিক্ষুব্ধ জনতা উদ্বেল হয়ে উঠলো—মহাত্মা গান্ধিজীকি জয়!

শাঁখ বেজে উঠলো, পুষ্পাঞ্জলিতে ছেয়ে গেল শবাধার, যাত্রা হোল সুরু।

মহা-ভারতের মহামানবের মহাপ্রস্থান।

শোকযাত্রা চলেছে ধীরে ধীরে। সাড়ে পাঁচ মাইল পথ। তু'পাশে লক্ষ লক্ষ ম্লান জনতা, নগ্নপদ, শুষ্ক মুখ, আরক্ত চোখ, অবিন্যস্ত কেশ, ছোট বড় ভেদ নেই, অর্থের পার্থক্য নেই, বর্ণের বিচার নেই—শুধুই মানুষ, একান্ত-আত্মীয় হারা শোকার্ত অমৃতের পুত্র।

বেলা ৪-২০ মিনিটের সময় যাত্রীদল এসে পৌছালো রাজঘাটে।

চিতা প্রস্তুত ছিল। তিন ফুট উঁচু, ১০ ফীট চওড়া, ১২ ফীট লম্বা চন্দনকাঠের বেদীর উপর দেহটী স্থাপিত হোল। যমুনার পবিত্র জল ছিটিয়ে দেওয়া হোল চিতার উপর। নগ্নপদে শ্রদ্ধাবনত মস্তকে এগিয়ে এলেন চীনের রাষ্ট্রদূত, ধীরে ধীরে একটি পুষ্পস্তবক রাখলেন তাঁর পদপ্রান্তে। পণ্ডিত রামধন শর্মা বৈদিক স্তোত্র সুরু করলেন, পুত্র রামদাস কম্পিত হস্তে এগিয়ে এলেন শেষ কৃত্যের জন্য।

চিতাগ্নি শিখা লেলিহান হয়ে উঠলো! পনেরো মণ চন্দন কাঠ, চার মণ ঘি, তু'মণ ধূপধূনা, একমণ নারিকেল, পনেরো সের কর্পূর সংযোগে অগ্নিদেব উগ্র হয়ে উঠলেন মহামানবের শেষ সম্বন্ধটুকু অনন্তলোকে লীন করে দেবার জন্য। একশো গজ দূরে বেষ্টনীর পাশ থেকে ভেসে এলো কান্নার রেশ, সুগন্ধি চন্দনের সুরভি ছড়িয়ে পড়লো বাতাসে। জনতা উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলো—মহাত্মা গান্ধী অমর হোগে!

চিতার পাশে ম্লানমুখে নিষ্পলক চোখে বসে আছেন ভারতের বড়লাট লর্ড মাউন্টব্যাটেন, লেডি মাউন্টব্যাটেন ও তাঁদের মেয়ে পামেলা। পাশে মৌলানা আজাদ, সর্দার প্যাটেল। সর্দারজীর পাশে বসে একটি ছোট মেয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে, সর্দারজী ধীরে ধীরে তার মাথায় সস্নেহে হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন। পণ্ডিতজী দাঁড়িয়ে আছেন একান্ত নিঃসঙ্গ, শ্রান্ত, বেদনার ভারে তাঁর ঋজুদেহ নুয়ে পড়েছে। চিতার লেলিহান শিখা আকাশকে লাল করে দিচ্ছে। লাখ লাখ জনের বেদনা মুখর হয়ে উঠেছে : রাজারাম জয় সীতারাম।

পতিত পাবন সীতারাম॥

## আমাদের গান্ধিজী

সাড়ে চার থেকে ছ'টা, দেড় ঘণ্টার মধ্যেই সব শেষ।

জ্বলিতেছে সম্মুখে তোমার
লোলুপ-চিতাগ্নি-শিখা লেহি লেহি বিরাট অম্বর
... ...
হে বৈরাগী কর শান্তি পাঠ!
উদার উদাস কণ্ঠ যাক ছুটে দক্ষিণে ও বামে,
যাক নদী পার হয়ে, যাক চলি গ্রাম হতে গ্রামে,
পূর্ণ করি মাঠ।
হে বৈরাগী কর পাঠ।
... ...
তোমার গেরুয়া বস্ত্রাঞ্চল
দাও পাতি নভস্থলে, বিশাল বৈরাগ্যে আবরিয়া
জরা মৃত্যু ক্ষুধা তৃষ্ণা, লক্ষ কোটি নরনারী-হিয়া
চিন্তায় বিকল।
দাও পাতি গেরুয়া অঞ্চল।

[—রবীন্দ্রনাথ

•

সমগ্র ভারত তেরো দিন শোক করলো।

চিতাভস্ম তাম্রপাত্রে ভারতের তীর্থে তীর্থে পাঠানো হোল পবিত্র নীরে বিসর্জন দেবার জন্য—কন্যাকুমারী থেকে মানস সরোবর। ভারতের বাহিরেও গেল—কলম্বো, রেঙ্গুন, সিংহপুর...

জহরলাল এলাহাবাদের ত্রিবেণী সঙ্গমে এলেন চিতাভস্ম বিসর্জন দিতে, মহামানবের উদ্দেশ্যে তিনি শেষ প্রণাম জানিয়ে বললেন—শেষ যাত্রা ফুরালো। তীর্থ পথের হোল অবসান। পঞ্চাশ বছরের অধিক কাল মহাত্মা গান্ধী আমাদের এই বিশাল দেশের সর্বত্র বিচরণ করেছেন। হিমালয় থেকে উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, ব্রহ্মপুত্র থেকে কন্যাকুমারী, উত্তর-দক্ষিণ, পূর্ব-পশ্চিম প্রত্যেক অংশে—প্রত্যেক কোণে শুধু পরিদর্শক বা প্রমোদ ভ্রমণকারী রূপে নয়, ভারতের জনসাধারণকে বুঝতে এবং তাদের সেবা করতে তিনি এই দেশের সর্বত্র পরিভ্রমণ করেছিলেন। ইতিহাসে আর কোন লোক এত অধিক ভ্রমণ করেছেন কিনা সন্দেহ। সাধারণ লোককে এতো গভীরভাবে অন্য কেহ হয়ত জানেন নাই, বা এতো

আন্তরিকভাবে সেবাও করেন নাই। এখন তাঁর এই পৃথিবীর যাত্রা শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু আমাদের পথ আরও বাকী।

আমাদের অনেকেই শোকে মুহ্যমান। ইহা ন্যায়সঙ্গত এবং স্বাভাবিক, কিন্তু আমরা শোক করবো কেন? শোক কি তাঁর জন্য?—না অন্য কিছুর জন্য? তাঁর জীবনে এবং তাঁর মৃত্যুতে তিনি যে জ্যোতি বিস্তার করে গেছেন তা যুগ যুগ ধরে আমাদের দেশকে আলোকিত করতে থাকবে। তবে আমরা শোক করবো কেন? দুঃখ তাঁর জন্য নয়—দুঃখ আমাদের জন্য। আমাদের নিজেদের দুর্বলতা, আমাদের অন্তরের বিষ-বিদ্বেষ—আমাদের মধ্যে ভেদ-বিরোধ—সংঘাত সংঘর্ষই দুঃখের কারণ। এই সকল পাপ দূর করার জন্যই মহাত্মা গান্ধী জীবন দিয়েছেন। গত ক'মাস ধরে এই কাজেই তাঁর জীবনের শক্তি ও সেবা কেন্দ্রীভূত করেছিলেন। তাঁর নামের জন্যই কি তাঁকে আমরা সম্মান করি—না তাঁর উপদেশ, তাঁর শিক্ষা এবং যার জন্য তিনি আত্মনিয়োগ করেছিলেন—বিশেষভাবে যে জন্য জীবন দিয়েছেন—তাঁর প্রতি আমাদের এই সম্মান?

গঙ্গার এই তটভূমিতে দাঁড়িয়ে আসুন আমরা আমাদের অন্তরের সন্ধান লই এবং নিজেকেই প্রশ্ন করি—গান্ধিজী আমাদের যে পথ দেখিয়েছেন তা আমরা কতদূর অনুসরণ করেছি? অন্যের সঙ্গে শান্তি ও সহযোগিতায় বসবাস করবার কি চেষ্টা করেছি? এখনও যদি আমরা সেই পথ ধরে চলি, তবে তা আমাদের ও আমাদের দেশের মঙ্গল আনবে। আমাদের দেশে এমন এক বিরাট পুরুষ জন্মগ্রহণ করেছিলেন যিনি আলোক বর্তিকার ন্যায় শুধু ভারতবর্ষকেই পথ দেখান নাই—সমগ্র জগৎকে আলোক দেখিয়েছেন। তথাপি আমাদের এক ভাইয়ের হাতে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। কেন এমন হোল? মনে হতে পারে এ উন্মাদের কাজ! কিন্তু এই শোকাবহ ঘটনার তাতেই ব্যাখ্যা হয়ে যায় না। বিদ্বেষ ও শত্রুতার বিষাক্ত বীজ বপন করা হয়েছিল বলেই ইহা সম্ভব হয়েছে। এই বিষ দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে আমাদের অনেকের মন বিষাক্ত করে দিয়েছে। সেই বিষ হতেই এই বিষের চারা গজিয়ে উঠেছে। ঘৃণা ও বিদ্বেষের এই বিষ দূর করা আমাদের সকলের কর্তব্য। গান্ধিজীর কাছ থেকে আমরা যদি কোন শিক্ষালাভ করে থাকি তাহলে কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে হিংসা ও বিদ্বেষ পোষণ করতে পারি না। কোন ব্যক্তিই আমাদের শত্রু নয়। ব্যক্তির মধ্যে যে বিষের ক্রিয়া চলে তাহাই আমাদের শত্রু। উহা আমাদের শেষ করতেই হবে। ক্ষীণ আমরা, দুর্বল আমরা, কিন্তু গান্ধিজীর শক্তি আমাদের মধ্যে কিছু সঞ্চারিত হয়েছে। তার প্রতিফলিত মহিমায় আমরাও

দাজবার হয়েছি। শক্তি ও ঐশ্বর্য সম্পদ তাঁরই এবং সে পথ যিনি দেখিয়েছেন, তা'ও তাঁরই। সেই পথ অনুসরণের চেষ্টায় আমরা অনেক হোঁচট খেয়েছি, যে পথে তিনি আমাদের জনসেবা করতে শিখিয়েছেন সেই পথে চলতে গিয়ে আমরা বার বার পড়ে গেছি। আমাদের সেই শক্তির স্তম্ভ আর নেই—কিন্তু তাই-বা বলি কেন? তাঁর প্রতিমূর্তি এখানে সমবেত লাখ লাখ নরনারীর মনোমন্দিরে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে আছে। কোটি কোটি দেশবাসী, যাঁরা এখানে উপস্থিত আছেন, অথবা বাহিরে রয়েছেন, কখনও তাঁকে ভুলতে পারবেন না। আমাদের ভবিষ্যৎ বংশীয়েরা তাঁকে দেখে নাই, অথবা তাঁর কথা শুনে নাই। তাদের চিত্রপটেও সেই মূর্তি ধারণ করবে। কারণ সেই মূর্তি এখন ভারতবর্ষের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের অংশ।

ত্রিশ বা চল্লিশ বৎসর পূর্বে গান্ধী-যুগ বলিতে যা বুঝায় তা আরম্ভ হয়েছিল, আজ তা শেষ হোল। তবু হয়তো ভুল বলছি।—সে যুগের অবসান হয়নি। হয়তো প্রকৃতপক্ষে কিছু পরিবর্তিত আকারে উহা আরম্ভ হোল। এতদিন আমরা উপদেশ ও আশ্রয়লাভের জন্য তাঁর দিকে ঝুঁকেছি। এখন থেকে আমাদের নিজেদের পায় দাঁড়িয়ে নিজেদের উপর নির্ভর করতে হবে। তাঁর স্মৃতি যেন আমাদের উদ্বুদ্ধ করে, তাঁর শিক্ষা যেন আমাদের পথ সমুজ্জ্বল করে। বার বার তিনি আমাদের এই বাণী শুনিয়ে গেছেন—'হৃদয় হতে হিংসা ও ভয়ের মূল উৎপাটন কর। হিংসা ও অন্তর্দ্বন্দ্বের অবসান ঘটাও। দেশের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখ!'

তিনি আমাদের স্বাধীনতা এনেছেন, যে পথে তা এনেছেন তা দেখে জগৎ বিস্মিত হয়েছে। কিন্তু আমাদের স্বাধীনতা লাভের মুহূর্তে আমরা আমাদের শিক্ষকের শিক্ষা ভুলেছি। গোঁড়ামি ও অন্ধ উন্মত্ততার প্রবাহ জনসাধারণকে পেয়ে বসেছে এবং আমরা ভারতের সুনাম কলঙ্কিত করেছি। আমাদের বহু যুবক বিভ্রান্ত হয়ে বিপথ-গামী হয়েছে। আমরা কি তাদের তাড়িয়ে দোব—না ধ্বংস করবো? তারা আমাদের আপনারই লোক। আমাদের তাদের চিত্ত জয় করতে হবে। এবং তাদের চিন্তা ও কর্ম যাতে সুপথে পরিচালিত হয়, তার চেষ্টা করতে হবে। সাম্প্রদায়িকতার বিষ আমাদের সর্বনাশ এনেছে। সতর্কতা সহকারে যথাসময় আমরা যদি কাজ না করি, তাহলে উহা আমাদের স্বাধীনতা ধ্বংস করবে। এই বিপদ সম্পর্কে সজাগ রাখবার জন্যই গান্ধিজী দু' তিন সপ্তাহ আগে তাঁর শেষ অনশন করেছিলেন। তাঁর আত্মবিসর্জন সমগ্র জাতির বিবেক উদ্বুদ্ধ করেছে। আমরা তাঁর কাছে সদাচরণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছি। শুধু তখনই তিনি তাঁর অনশন ভঙ্গ করেছিলেন।

গান্ধিজী সপ্তাহে একদিন করে কথা বন্ধ রাখতেন। আজ তাঁর কণ্ঠ চিরদিনের
! নীরব হয়ে গেল। এই নীরবতার শেষ নেই—তথাপি সেই কণ্ঠ আমাদের
ণ, আমাদের অন্তঃকরণে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। আমাদের দেশবাসীর চিত্তে ও মনে
ভারত সীমান্তের বহু দূরের অধিবাসীদের চিত্তে যুগ যুগ ধরে উহা প্রতিধ্বনিত
। থাকবে। কারণ, সেই স্বর সত্যের কণ্ঠস্বর। সত্য কখন কখন দাবিয়ে
। সম্ভব হতে পারে, কিন্তু দমন বা দলন অসম্ভব। হিংসা তাঁর কাছে ছিল সত্যের
রীত। সুতরাং তিনি শুধু বাহুবলের হিংসার বিরুদ্ধেই দাঁড়াতে বলেন নি, মন ও
য়র হিংসার বিরুদ্ধেও দাঁড়াতে বলেছেন। এই হিংসা, এই অন্তর্দ্বন্দ্ব যদি আমরা
গ না করি, অপরের প্রতি অসীম ধৈর্য ও বন্ধুত্ব রাখতে না শিখি, জাতি হিসাবে
হলে ধ্বংস আমাদের অনিবার্য। হিংসার পথ বিপদসঙ্কুল, হিংসা থাকতে স্বাধীনতা
স্থায়ী হতে পারে না। যদি আমাদের মনে হিংসা ও সংঘর্ষের মনোভাব থাকে,
হলে 'স্বরাজ' ও স্বাধীনতার কথা অর্থহীন হয়ে যায়। এই জনতার মধ্যে বহু
াবাহিনী রয়েছেন। আমাদের এই দেশের সম্মান, সততা ও দেশরক্ষা তাঁদেরই
রবময় দায়িত্ব। তাঁরা যদি একসঙ্গে চলেন, একসঙ্গে কাজ করেন, তা হলেই ইহা
ব হতে পারে। কিন্তু তাঁরা যদি পরস্পরের বিরুদ্ধে পরস্পর লেগে থাকেন তাহলে
দের শক্তিরই বা কি মূল্য, দেশ-সেবাই বা সম্ভব হবে কিভাবে ?

গণতন্ত্র চাহে আনুগত্য, সহিষ্ণুতা ও পারস্পরিক সম্ভ্রম রক্ষা। স্বাধীনতা চাহে
পরের স্বাধীনতার সম্মান রক্ষা। পারস্পরিক আলোচনা ও বুঝাবার চেষ্টা দ্বারাই
তান্ত্রিক পরিবর্তন সাধিত হয়, হিংসাত্মক পন্থায় নয়। যদি কোন সরকারের প্রতি
নসাধারণের সমর্থন না থাকে, তাহলে যাদের প্রতি জনসাধারণের সমর্থন আছে,
াদের দ্বারাই আরেক সরকার স্থান গ্রহণ করেন। কেবল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলগুলিই—
রা জানে যে, তাদের প্রতিই জনসাধারণের সমর্থন নেই, তারাই মূঢ়ের ন্যায় মনে
রে যে, হিংসাত্মক কার্য দ্বারা তারা তাদের কার্যোদ্ধার করতে পারবে। ইহা শুধু
ম্পূর্ণ ভুল নয়, মূর্খতাও বটে। কারণ, সংখ্যালঘুদের সংখ্যাগরিষ্ঠদের উপর এই
ংসাত্মক জুলুমবাজীর প্রতিক্রিয়া অবশ্যম্ভাবী। উহাতে সংখ্যাগরিষ্ঠদের হিংস্রক
ত্তে প্ররোচিত করে। এই শোচনীয় শোকাবহ ঘটনা সম্ভব হবার কারণ এই যে,
হু লোক (তাদের মধ্যে কয়েকজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী আছেন) এই দেশের
াবহাওয়া বিষাক্ত করে তুলেছে। এই বিষের মূল উৎপাটন করা সরকার ও জন-
াধারণ উভয়েরই কর্তব্য। ভয়াবহ মূল্যের বিনিময়ে আমাদের শিক্ষালাভ হোল।
মামাদের মধ্যে এমন একজনও কি আছেন, যিনি গান্ধিজীর মৃত্যুর পরে তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ

লাভবান হয়েছি। শক্তি ও ঐশ্বর্য সম্পদ তাঁরই এবং সে পথ যিনি দেখিয়েছেন, তা'ও তাঁরই। সেই পথ অনুসরণের চেষ্টায় আমরা অনেক হোঁচট খেয়েছি, যে পথে তিনি আমাদের জনসেবা করতে শিখিয়েছেন সেই পথে চলতে গিয়ে আমরা বার বার পড়ে গেছি। আমাদের সেই শক্তির স্তম্ভ আর নেই—কিন্তু তাই-বা বলি কেন? তাঁর প্রতিমূর্তি এখানে সমবেত লাখ লাখ নরনারীর মনোমন্দিরে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে আছে। কোটি কোটি দেশবাসী, যাঁরা এখানে উপস্থিত আছেন, অথবা বাহিরে রয়েছেন, কখনও তাঁকে ভুলতে পারবেন না। আমাদের ভবিষ্যৎ বংশীয়েরা তাঁকে দেখে নাই, অথবা তাঁর কথা শুনে নাই। তাদের চিত্রপটেও সেই মূর্তি ধারণ করবে। কারণ সেই মূর্তি এখন ভারতবর্ষের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের অংশ।

ত্রিশ বা চল্লিশ বৎসর পূর্বে গান্ধী-যুগ বলিতে যা বুঝায় তা আরম্ভ হয়েছিল, আজ তা শেষ হোল। তবু হয়তো ভুল বলছি।—সে যুগের অবসান হয়নি। হয়তো প্রকৃতপক্ষে কিছু পরিবর্তিত আকারে উহা আরম্ভ হোল। এতদিন আমরা উপদেশ ও আশ্রয়লাভের জন্য তাঁর দিকে ঝুঁকেছি। এখন থেকে আমাদের নিজেদের পায় দাঁড়িয়ে নিজেদের উপর নির্ভর করতে হবে। তাঁর স্মৃতি যেন আমাদের উদ্বুদ্ধ করে, তাঁর শিক্ষা যেন আমাদের পথ সমুজ্জ্বল করে। বার বার তিনি আমাদের এই বাণী শুনিয়ে গেছেন—'হৃদয় হতে হিংসা ও ভয়ের মূল উৎপাটন কর। হিংসা ও অন্তর্দ্বন্দ্বের অবসান ঘটাও। দেশের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখ!'

তিনি আমাদের স্বাধীনতা এনেছেন, যে পথে তা এনেছেন তা দেখে জগৎ বিস্মিত হয়েছে। কিন্তু আমাদের স্বাধীনতা লাভের মুহূর্তে আমরা আমাদের শিক্ষকের শিক্ষা ভুলেছি। গোঁড়ামি ও অন্ধ উন্মত্ততার প্রবাহ জনসাধারণকে পেয়ে বসেছে এবং আমরা ভারতের সুনাম কলঙ্কিত করেছি। আমাদের বহু যুবক বিভ্রান্ত হয়ে বিপথ-গামী হয়েছে। আমরা কি তাদের তাড়িয়ে দোব—না ধ্বংস করবো? তারা আমাদের আপনারই লোক। আমাদের তাদের চিত্ত জয় করতে হবে। এবং তাদের চিন্তা ও কর্ম যাতে সুপথে পরিচালিত হয়, তার চেষ্টা করতে হবে। সাম্প্র-দায়িকতার বিষ আমাদের সর্বনাশ এনেছে। সতর্কতা সহকারে যথাসময় আমরা যদি কাজ না করি, তাহলে উহা আমাদের স্বাধীনতা ধ্বংস করবে। এই বিপদ সম্পর্কে সজাগ রাখবার জন্যই গান্ধিজী দু' তিন সপ্তাহ আগে তাঁর শেষ অনশন করে-ছিলেন। তাঁর আত্মবিসর্জন সমগ্র জাতির বিবেক উদ্বুদ্ধ করেছে। আমরা তাঁর কাছে সদাচরণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছি। শুধু তখনই তিনি তাঁর অনশন ভঙ্গ করেছিলেন।

# আমাদের গান্ধিজী

গান্ধিজী সপ্তাহে একদিন করে কথা বন্ধ রাখতেন। আজ তাঁর কণ্ঠ চিরদিনের জন্যই নীরব হয়ে গেল। এই নীরবতার শেষ নেই—তথাপি সেই কণ্ঠ আমাদের শ্রবণে, আমাদের অন্তঃকরণে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। আমাদের দেশবাসীর চিত্তে ও মনে এবং ভারত সীমান্তের বহু দূরের অধিবাসীদের চিত্তে যুগ যুগ ধরে উহা প্রতিধ্বনিত হতে থাকবে। কারণ, সেই স্বর সত্যের কণ্ঠস্বর। সত্য কখন কখন দাবিয়ে রাখা সম্ভব হতে পারে, কিন্তু দমন বা দলন অসম্ভব। হিংসা তাঁর কাছে ছিল সত্যের বিপরীত। সুতরাং তিনি শুধু বাহুবলের হিংসার বিরুদ্ধেই দাঁড়াতে বলেন নি, মন ও হৃদয়ের হিংসার বিরুদ্ধেও দাঁড়াতে বলেছেন। এই হিংসা, এই অন্তর্দ্বন্দ্ব যদি আমরা ত্যাগ না করি, অপরের প্রতি অসীম ধৈর্য ও বন্ধুত্ব রাখতে না শিখি, জাতি হিসাবে তা হলে ধ্বংস আমাদের অনিবার্য। হিংসার পথ বিপদসঙ্কুল, হিংসা থাকতে স্বাধীনতা দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে না। যদি আমাদের মনে হিংসা ও সংঘর্ষের মনোভাব থাকে, তাহলে 'স্বরাজ' ও স্বাধীনতার কথা অর্থহীন হয়ে যায়। এই জনতার মধ্যে বহু সেনাবাহিনী রয়েছেন। আমাদের এই দেশের সম্মান, সততা ও দেশরক্ষা তাঁদেরই গৌরবময় দায়িত্ব। তাঁরা যদি একসঙ্গে চলেন, একসঙ্গে কাজ করেন, তা হলেই ইহা সম্ভব হতে পারে। কিন্তু তাঁরা যদি পরস্পরের বিরুদ্ধে পরস্পর লেগে থাকেন তাহলে তাঁদের শক্তিরই বা কি মূল্য, দেশ-সেবাই বা সম্ভব হবে কিভাবে?

গণতন্ত্র চাহে আনুগত্য, সহিষ্ণুতা ও পারস্পরিক সম্ভ্রম রক্ষা। স্বাধীনতা চাহে অপরের স্বাধীনতার সম্মান রক্ষা। পারস্পরিক আলোচনা ও বুঝাবার চেষ্টা দ্বারাই গণতান্ত্রিক পরিবর্তন সাধিত হয়, হিংসাত্মক পন্থায় নয়। যদি কোন সরকারের প্রতি জনসাধারণের সমর্থন না থাকে, তাহলে যাদের প্রতি জনসাধারণের সমর্থন আছে, তাদের দ্বারাই আরেক সরকার স্থান গ্রহণ করেন। কেবল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলগুলিই—যারা জানে যে, তাদের প্রতিই জনসাধারণের সমর্থন নেই, তারাই মূঢ়ের ন্যায় মনে করে যে, হিংসাত্মক কার্য দ্বারা তারা তাদের কার্যোদ্ধার করতে পারবে। ইহা শুধু সম্পূর্ণ ভুল নয়, মূর্খতাও বটে। কারণ, সংখ্যালঘুদের সংখ্যাগরিষ্ঠদের উপর এই হিংসাত্মক জুলুমবাজীর প্রতিক্রিয়া অবশ্যম্ভাবী। উহাতে সংখ্যাগরিষ্ঠদের হিংস্রক হতে প্ররোচিত করে। এই শোচনীয় শোকাবহ ঘটনা সম্ভব হবার কারণ এই যে, বহু লোক (তাদের মধ্যে কয়েকজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী আছেন) এই দেশের আবহাওয়া বিষাক্ত করে তুলেছে। এই বিষের মূল উৎপাটন করা সরকার ও জনসাধারণ উভয়েরই কর্তব্য। ভয়াবহ মূল্যের বিনিময়ে আমাদের শিক্ষালাভ হোল। আমাদের মধ্যে এমন একজনও কি আছেন, যিনি গান্ধিজীর মৃত্যুর পরে তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ

করার সংকল্প গ্রহণ করবেন না? আমাদের এই দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব সমগ্র বিশ্বের শ্রেষ্ঠ পুরুষ, যে আদর্শের জন্য জীবন দিলেন, তা কি আপনারা পালন করবেন না? আপনারা—আমি এবং আমরা সকলেই এই পবিত্র গঙ্গা নদীর বালুতট হতে ফিরে যাব। আমরা সকলেই বিষণ্ণ এবং নিঃসংগ বোধ করবো। আমাদের গান্ধিজীকে আর আমরা দেখতে পাব না। সংশয়ের দিনে, সন্দেহের সময়, সমস্যার ঘনান্ধকারে আমরা যখন বিমূঢ় বোধ করতাম তখন পরামর্শ ও উপদেশের জন্য তাঁর কাছে ছুটে যেতাম। এখন আর আমাদের উপদেশ দেবার কেউ নেই। আমাদের বোঝাই বা কে গ্রহণ করবে? কেবল আমি অথবা আমাদের ন্যায় অল্প কয়েকজন লোকই তাঁর নিকট যেতাম না। হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ দেশবাসী তাঁকে ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও উপদেষ্টা মনে করতেন। আমাদের সকলেরই মনে হোত, আমরা যেন তাঁর সন্তান। তাঁকে জাতির জনক হিসাবে অভিহিত করা ঠিকই হয়েছে। পিতার মৃত্যুতে যেমন পরিবার শোকাচ্ছন্ন হয়, তেমনি জাতির জনক মহাত্মার মৃত্যুতে লক্ষ লক্ষ ভারতবাসীর ঘরে ঘরে কান্নার রোল উঠেছে। এই নদীতট হতে নিঃসংগ বিষণ্ণ অবস্থায় আমরা ঘরে ফিরে যাব, কিন্তু সেই সংগে গর্ব বোধ করবো এই ভেবে যে, আমরা আমাদের বন্ধুরূপে, নেতারূপে এবং প্রধান পরিচালকরূপে এই বিশাল ব্যক্তিকে আমাদের মধ্যে পেয়েছিলাম, যিনি সত্যের পথে, স্বাধীনতার পথে আমাদের ঊর্ধ্ব হতে ঊর্ধ্বে তুলে ধরেছেন। এবং তিনি যে সংগ্রামের পথ দেখিয়েছেন, তা সত্যের পথ। হিমালয়ের শীর্ষে পরম প্রশান্তিতে বসে থাকার পথ তাঁর নয়। তিনি আমাদের যে পথ দেখিয়েছেন সে পথ সংগ্রামের পথ,—অসত্যের বিরুদ্ধে সত্যের, অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়ের সংগ্রাম। এই সংগ্রামে আমাদের অগ্রসর হতে হবে। এই পথে পলায়ন বা বিশ্রাম চাইলে চলবে না। তাঁকে আমরা যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি, তা পালন করতে হবে। সত্যের পথে, ধর্মের পথে আমরা যেন অগ্রসর হই। ভারতবর্ষকে যেন আমরা এমন এক বিশাল দেশে পরিণত করতে পারি, যেখানে সদিচ্ছা এবং পারস্পরিক ঐক্য প্রাধান্য লাভ করে। নরনারী নির্বিশেষে প্রত্যেক মানুষ, ধর্ম ও সম্প্রদায় নির্বিশেষে প্রত্যেক ব্যক্তি তার নিজ সম্মানে এবং স্বাধীনতায় বসবাস করতে পারে। কতবার আমরা ধ্বনি করেছি—'মহাত্মা গান্ধিজী জয়!' কিন্তু আজ সে ধ্বনি করতে আমরা অধোবদন হয়ে ভাবি, কত ছোট হয়ে গেছি আমরা! তাঁর কাছে জয়ধ্বনি বলতে জনসাধারণের স্বাধীনতা ও উন্নতির জয়ধ্বনি বোঝাতো।

গান্ধিজী আমাদের জন্য কোন্ শ্রেণীর জয় চেয়েছিলেন? হিংসা, প্রতারণা,

বিশ্বাসঘাতকতা ও অসদুপায় দ্বারা অর্জিত জয় যা অনেকেরই কাম্য, তা তিনি এদেশবাসীর জন্য চান নি। সে ধরণের জয় কখনও স্থায়ী হয় না। সত্যের শৈলমূলে যে জয়ের ভিত্তি সেই জয়ই স্থায়ী হয়ে থাকে। গান্ধিজী আমাদের সংগ্রামের এবং রাজনৈতিক যুদ্ধের এক নতুন পদ্ধতি দিয়েছেন। দেশবাসীকে দেখিয়েছেন এক নতুন ধরণের ডিপ্লোমেসি। তিনি রাজনীতিতে সত্য, সদিচ্ছা ও অহিংসার সার্থকতা প্রমাণ করেছেন। রাজনৈতিক মতবাদ অথবা ধর্মমত যাই হোক, তিনি প্রত্যেক ভারতবাসীকে ভাইরূপে, বন্ধুরূপে ও সহ-নাগরিকরূপে গ্রহণ করতে শিখিয়েছেন। ভারত-জননীর সন্তান আমরা, আমাদের সকলকেই এখানে আ-মরণ বাস করতে হবে। আমরা যে স্বাধীনতা অর্জন করেছি, সকলেই তার সমান অংশীদার। ত্রিশ কোটি হোক অথবা চল্লিশ কোটি হোক, স্বাধীন ভারতের আশীর্বাদ সকলেরই সমভাবে প্রাপ্য। কয়েকজন ভাগ্যবানের সুবিধার জন্য মহাত্মাজী চেষ্টা করেন নাই অথবা জীবন দেন নাই। তাঁর সেই আদর্শের জন্য সেইভাবে আমাদেরও চেষ্টা করতে হবে। তাহলেই আমরা 'মহাত্মা গান্ধিজী কী জয়' ধ্বনি করতে পারবো!

পণ্ডিতজী চিতাভস্ম নদী নীরে বিসর্জন দিলেন।

স্তব্ধ জনতার ম্লান কণ্ঠ আকাশে বাতাসে বেদনার মূর্ছনা তুললো—

রঘুপতি রাঘব রাজারাম
পতিত পাবন সীতারাম।
ঈশ্বর আল্লা তেরে নাম,
সবকো সম্মতি দে ভগবান।
আল্লা মজদা জিহোভা রাম,
এক হী মালিক তুঝে প্রণাম।
হিন্দু মুসলমান এক ইন্‌সান্
সব হ্যায় তেরে হী সন্তান।

যত কিছু ভালো মন্দ, যত কিছু দ্বিধাদ্বন্দ্ব
কিছু আর নাই।
বলো শান্তি, বলো শান্তি, দেহ সাথে সব ক্লান্তি
হয়ে যাক ছাই।

× × ×

মিছা আনিয়াছ আজি বসন্ত কুসুমরাজি
দিতে উপহার,
নীরবে আকুল চোখে ফেলিতেছ বৃথা শোকে
নয়নাশ্রুধার।

# আমাদের গান্ধিজী

ছিলে যারা রোষভরে　　　　বৃথা এতদিন পরে
করিছ মার্জনা।
অসীম নিস্তব্ধ দেশে,　　　　চিররাত্রি পেয়েছে সে
অনন্ত সান্ত্বনা॥

× × ×

আপন মনের মতো　　　　সংকীর্ণ বিচার যত
রেখে দাও আজ।
ভুলে যাও কিছুক্ষণ　　　　প্রত্যহের আয়োজন
সংসারের কাজ।
আজি ক্ষণেকের তরে　　　　বসি বাতায়ন 'পরে
বাহিরেতে চাহ।
অসীম আকাশ হতে　　　　বহিয়া আসুক স্রোতে
বৃহৎ প্রবাহ॥

× × ×

ব্যাপিয়া সমস্ত বিশ্বে　　　　দেখো তারে সর্ব দৃশ্যে
বৃহৎ করিয়া
জীবনের ধূলি ধুয়ে　　　　দেখো তারে দূরে থুয়ে
সম্মুখে ধরিয়া।
পলে পলে দণ্ডে দণ্ডে　　　　ভাগ করি খণ্ডে খণ্ডে
মাপিয়ো না তারে।
থাক তব ক্ষুদ্র মাপ　　　　ক্ষুদ্র পুণ্য, ক্ষুদ্র পাপ
সংসারের পারে॥

× × ×

ওই হেরো সীমা হারা　　　　গগনের গ্রহ তারা
অসংখ্য জগৎ
ওরি মাঝে পরিশ্রান্ত　　　　হয়তো সে একা পান্থ
খুঁজিতেছে পথ
ওই দূর দূরান্তরে　　　　অজ্ঞাত ভুবন পরে
কভু কোনখানে
আর কি গো দেখা হবে　　　　আর কি সে কথা কবে
কেহ নাহি জানে॥

[—রবীন্দ্রনাথ

— ওঁ শান্তি ওঁ শান্তি ওঁ শান্তি —

## জীবন-পঞ্জী

১৮৬৯—২রা অক্টোবর—কাথিয়াবাড়ের পোরবন্দরে মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী জন্মগ্রহণ করেন। পিতা করমচাঁদ গান্ধী, মাতা পুতলীবাঈ।…তিন ভাই, এক বোন—গান্ধিজী কনিষ্ঠ…

১৮৭৬—রাজকোটের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রবেশ…

১৮৮১—রাজকোটের কাথিয়াবাড় হাইস্কুলে প্রবেশ…মাংসভক্ষণ ও ধূমপান…পরে পিতার কাছে মার্জনা ভিক্ষা…

১৮৮৩—বিবাহ—পত্নী গোকুলদাস মাকনজীর কন্যা কস্তুরবাঈ…

১৮৮৫—পিতৃবিয়োগ…

১৮৮৭—প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ…ভবনগরের শ্যামলদাস কলেজে প্রবেশ…

১৮৮৮—সেপ্টেম্বর মাসে বিলাত যাত্রা…মাতার কাছে নিরামিষ ভক্ষণের প্রতিজ্ঞা…

১৮৮৯—বিলাতের ম্যাট্রিক্ পরীক্ষায় প্রথম বারে ফেল করে দ্বিতীয় বারে উত্তীর্ণ…

১৮৯১—১০ই জুন—ব্যারিষ্টারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ…১২ই জুন বিলাত ত্যাগ…মাতৃবিয়োগের সংবাদ…রাজকোট ও বোম্বাই হাইকোর্টে ব্যবসায় আরম্ভ…

১৮৯৩—এপ্রিল মাসে আবদুল্লা-এণ্ড-কোম্পানীর চাকুরী লইয়া দক্ষিণ আফ্রিকা যাত্রা …জুন মাসে নাটালে 'কুলি ব্যারিষ্টার' হিসাবে প্রথম শ্রেণীর ট্রেণে অপমানিত…ষ্ট্যাণ্ডারটনের পথে গাড়োয়ান কর্তৃক কর্ণমর্দন…জোহানেসবার্গের গ্র্যাণ্ড-ন্যাশন্যাল-হোটেল কর্তৃক কালাআদমীকে স্থান দিতে অস্বীকার…বাইবেল, কোরাণ, জিন্দাবেস্তা ও উপনিষদ পাঠ…ভারতীয়দের সঙ্ঘবদ্ধ করার চেষ্টা…

১৮৯৪—নাটালে ভারতীয়দের ভোটাধিকার লোপের চেষ্টা, গান্ধিজী কর্তৃক ভারতীয় সঙ্ঘ গঠন ও দশহাজার প্রবাসী ভারতীয়ের সাক্ষরিত আবেদন পত্র বিলাতে প্রেরণ…নাটাল সুপ্রীম কোর্টে ওকালতি আরম্ভ—সাহেবদের আপত্তি… ২২শে মে নাটাল-ইণ্ডিয়ান-কংগ্রেসের জন্ম ও নাটাল-শিক্ষা-সমিতির প্রতিষ্ঠা।

১৮৯৬—ভারতে আগমন—স্যার ফিরোজশা মেটা, বদরুদ্দিন তায়েবজী, মহাদেব গোবিন্দ রাণাড়ে, লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক, মহামতি গোপালকৃষ্ণ গোখলের সঙ্গে পরিচয়…দক্ষিণ আফ্রিকা সম্পর্কে পুস্তিকা প্রকাশ…দক্ষিণ আফ্রিকায় সাহেবদের অসন্তোষ…

১৮৯৭—১৩ই জানুয়ারী—স্ত্রী ও দুটি পুত্র লইয়া ডারবানে অবতরণ…প্রহার… পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের পত্নী কর্তৃক প্রাণরক্ষা…পুলিশের সহায়তায় রুস্তমজীর গৃহে গমন…জনতা কর্তৃক সে বাড়ী আক্রান্ত…পুলিশের ছদ্মবেশে পলায়ন…পরে আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ আনতে অস্বীকার করেন, বলেন—'যথাসময় তারা তাদের ভুল বুঝতে পারবে!'…স্বাবলম্বী হবার চেষ্টা—চুলছাঁটা কাপড়কাচা স্বহস্তে ক্ষুরণ…

১৮৯৯—বুওর যুদ্ধে ১১০০ প্রবাসী ভারতীয় লইয়া সেবা-বাহিনী গঠন…

১৯০১—ভারতে প্রত্যাবর্তন কালে উপহার গ্রহণে আপত্তি—অপরিগ্রহ ব্রত… কলিকাতা-কংগ্রেসের অধিবেশনে স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে কাজ…দক্ষিণ আফ্রিকা সম্পর্কে কংগ্রেসে প্রস্তাব গ্রহণ…

১৯০২—ব্রহ্মদেশে গমন—বেশ পরিবর্তন—তৃতীয় শ্রেণীতে ভ্রমণ—কাশীতে আনি-বেশান্তের সঙ্গে সাক্ষাৎ…

১৯০৩—আবার দক্ষিণ আফ্রিকায়…এপ্রিল মাসে ট্রান্সভ্যালে এটর্ণি হিসাবে ব্যবসায় আরম্ভ…গীতা, বিবেকানন্দের রাজযোগ, পাতঞ্জলির যোগসূত্র প্রভৃতি অধ্যয়ন…অপরিগ্রহ ও সমভাব ব্রত গ্রহণ…দশহাজার টাকার জীবনবীমা অপ্রয়োজন বোধে পরিত্যাগ…'ফিনিক্‌স্ আশ্রম' প্রতিষ্ঠা…

১৯০৪—ইংরাজী, তামিল, গুজরাটী, হিন্দী চারিভাষায় 'ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়ন' সাপ্তাহিক পত্রিকার প্রকাশ…

১৯০৬—জুলু বিদ্রোহ…ভারতীয় সেনাবাহিনী গঠন…ব্রহ্মচর্য গ্রহণ…দক্ষিণ আফ্রিকা সরকারের অত্যাচারের প্রতিবাদে বিলাত যাত্রা…

১৯০৭—প্রতিরোধ সত্যাগ্রহ…ভারতীয়দের দলে দলে কারাবরণ…

১৯০৮—১০ই জানুয়ারী গান্ধিজীর বিচার—দু'মাসের জন্য জোহানেসবার্গ জেলে… স্মাটসের সঙ্গে আলোচনা ও মুক্তি…১০ই ফেব্রুয়ারী মীর আলম কর্তৃক প্রহৃত…অসুস্থতার মধ্যেই ছাড়পত্র গ্রহণ…অক্টোবর মাসে নতুন করে আন্দোলন আরম্ভ ও দু'মাসের জন্য কারাদণ্ড…

১৯০৯—জুন মাস থেকে নভেম্বর অবধি বিলাতে অবস্থান…টলষ্টয়ের সঙ্গে পত্রালাপ …'হিন্দ্ স্বরাজ' বই প্রণয়ন…

১৯১০—জার্মান-বন্ধু কালেনবাকের বাগানে 'টলষ্টয় ফার্মের' প্রতিষ্ঠা…স্বাবলম্বী হবার জন্য মুচির কাজ শেখা…

১৯১২—গোখেলের দক্ষিণ আফ্রিকায় আগমন ও টলষ্টয় ফার্মে অবস্থান…

১৯১৩—মাথাপিছু বার্ষিক ৪৫৲ টাকা কর ও হিন্দু বিবাহ আইনের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ…কস্তুরবা'র কারাদণ্ড…২০৩৭ জন পুরুষ, ১২৭ জন নারী ও ৫৭ জন শিশু সত্যাগ্রহী নিয়ে গান্ধীভাইয়ের সত্যাগ্রহ অভিযান, ট্রান্সভ্যালের পথে চারিদিনের মধ্যে তিনবার গ্রেপ্তার ও ছ'দফায় ন'মাস ও তিনমাস কারাদণ্ড…একমাস পাঁচদিন পরে বিনাসর্তে মুক্তিলাভ…এণ্ডরুজ ও পিয়ার্সন সাহেবের দক্ষিণ আফ্রিকায় গমন…

১৯১৪—আশ্রমিকদের নৈতিক অধোগতির প্রায়শ্চিত্তের জন্য ১৪ দিন উপবাস… এণ্ডরুজ-স্মাটস্-গান্ধী চুক্তি—দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের অধিকার স্বীকার…জুলাই মাসে কস্তুরবা ও কালেনবাকের সহিত বিলাত যাত্রা… ছ' সপ্তাহ 'প্রাথমিক প্রতিবিধান' ব্যবস্থা সম্পর্কে অনুশীলন… সরোজিনী নাইডুর সঙ্গে পরিচয়…প্লুরিসি-আক্রান্ত ও ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন…

১৯১৫—'কাইজার-ই-হিন্দ পদক' লাভ…গোখেলের 'ভারত সেবক সমিতির' আশ্রমে…শান্তিনিকেতনে…রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক 'মহাত্মা' বলে উল্লেখ… হরিদ্বারে কুম্ভমেলায় গমন ও স্বামী শ্রদ্ধানন্দের সঙ্গে প্রথম পরিচয়… কোচরাবে ২৫ জন সহকর্মী নিয়ে 'সত্যাগ্রহ আশ্রম' প্রতিষ্ঠা…বিরাম গাঁয়ের শুল্ক ব্যবস্থার প্রতিবিধান…হরিজন দুদাভাইয়ের স্ত্রী ও কন্যাকে আশ্রয় দেওয়ায় বন্ধুবান্ধব কর্তৃক সমাজ-চ্যুত…স্যার সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ কর্তৃক বোম্বাই কংগ্রেসের 'সাবজেক্ট কমিটিতে' সদস্য মনোনীত…

১৯১৬—কাশী-হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্বোধন উৎসব ও লখ্নৌ-কংগ্রেসে যোগদান— পণ্ডিত জহরলাল নেহরুর সঙ্গে প্রথম পরিচয়…

১৯১৭—চম্পারন সত্যাগ্রহ…রাজেন্দ্রপ্রসাদের সঙ্গে প্রথম পরিচয়—কৃপালনী, মহাদেব দেশাই, নরহরি পারিখ…জুন মাসে সবরমতীর তীরে আশ্রম প্রতিষ্ঠা… 'সোস্তাল সার্ভিস লীগে' সভাপতিত্ব…

১৯১৮—আমেদাবাদে মজদুরদের সত্যাগ্রহ…শংকরলাল ব্যাংকার, বল্লভভাই প্যাটেল আম্বালাল সরাভাই, অনসূয়া বেন প্রভৃতির সংগে পরিচয়…খেড়া সত্যাগ্রহ…মুসলীম লীগের সভায় যোগদান…বড়লাটের যুদ্ধ-সম্মেলনীতে হিন্দী ভাষায় বক্তৃতা দান…যুদ্ধে সৈনিক সংগ্রহের চেষ্টা…মরণাপন্ন অসুস্থতা…

১৯১৯—অস্ত্রোপচার…জীবনে প্রথম ভারতীয়-ব্যবস্থা-পরিষদের বিতর্ক সভায় দর্শক… রাউলাট আইনের প্রতিবাদে হরতাল ঘোষণা…দিল্লী যাবার পথে গ্রেপ্তার করে বোম্বাইয়ে প্রেরণ, পাঞ্জাবে প্রবেশ নিষেধ…নড়িয়াদে জনতার উচ্ছৃঙ্খলতার প্রায়শ্চিত্ত হিসাবে তিন দিন উপবাস…'ইয়ং ইণ্ডিয়া' ও 'নব জীবন' পত্রিকা দ্বয়ের সম্পাদক…জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের অনুসন্ধান কমিটিতে মালব্যজী, মতিলাল নেহেরু, স্বামী শ্রদ্ধানন্দ ও দেশবন্ধুর সংগে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ…নিখিল ভারত খিলাফৎ সম্মেলনীর সভাপতি…জালিয়ানওয়ালাবাগ-স্মৃতি-রক্ষা তহবিলের প্রধান কর্মকর্তা…

১৯২০—আবুল কালাম আজাদের সংগে প্রথম পরিচয়…জালিয়ানওয়ালাবাগের প্রতিবাদে 'কাইজার-ই-হিন্দ্ মেডেল' ও 'বুওর-যুদ্ধ-মেডেল' ফেরৎ দেওয়া… প্যারীলালের সহযোগিতা…গান্ধিজী কর্তৃক কংগ্রেসের নিয়ম-কানুন প্রণয়ন …দৈনিক আধ ঘণ্টা সূতা কাটার ব্রত গ্রহণ…

১৯২১—'তিলক-স্বরাজ্য-ফাণ্ডের' জন্য ১ কোটি ১৫ লক্ষ টাকা সংগ্রহ…শেঠ যমুনালাল বাজাজ 'রাও বাহাদুর' পদবী ত্যাগ করে গান্ধিজীর কাজে যোগ দেন ও 'তিলক-স্বরাজ্য-ফাণ্ডে' এক লক্ষ টাকা দেন…বোম্বাইয়ে প্রথম খাদি ভাণ্ডারের উদ্বোধন, কলকাতায় ন্যাশান্যাল-কলেজের উদ্বোধন…আসাম চা বাগানের ধর্মঘটের ব্যাপারে নতুন বড়লাট লর্ড রেডিংয়ের সংগে দীর্ঘ আলোচনা… সারা ভারতে ২০ লক্ষ চরকার প্রবর্তন…বোম্বাইয়ে বিলিতী বস্ত্রের বহ্ন্যুৎসব …যুবরাজের ভারতে আগমনের দিন হরতাল পালনের ব্যাপারে দাংগা-হাংগামা ও তার প্রায়শ্চিত্ত করার উদ্দেশ্যে গান্ধিজীর পাঁচ দিন উপবাস… অসহযোগ আন্দোলন…২০ হাজার কংগ্রেস-কর্মীর কারাবরণ…কংগ্রেস কর্তৃক গান্ধিজীকে সর্বাধিনায়ক হিসাবে মনোনয়ন…

১৯২২—চৌরীচৌরার দুর্ঘটনা, গান্ধিজীর পাঁচ দিন অনশন ও আন্দোলন স্থগিত রাখা…গ্রেপ্তার ও ছ' বছর কারাদণ্ড…জেলখানায় আত্মজীবনী প্রণয়ন…

১৯২৪—এপেণ্ডিসাইটিস্ অপারেশন…কারামুক্তি…জুহুর সাগর তটে…দেশবন্ধু ও মতিলালের কৌনসিল-প্রবেশ নীতির সমর্থন…দিল্লী, গুলবর্গা, নাগপুর, লখ্নৌ, শাজাহানপুর, এলাহাবাদ, জব্বলপুর ও কোহাট দাংগার ফলে গান্ধিজীর ২১ দিন অনশন এবং দিল্লীতে মৌলানা মহম্মদ আলির গৃহে সর্বদলের নেতৃ-সম্মেলন…বেলগাঁও-কংগ্রেসে সভাপতিত্ব…

১৯২৫—সারা ভারত ভ্রমণ…ভাইকমে অচ্ছুৎদের সত্যাগ্রহ…শান্তিনিকেতনে…দেশবন্ধুর মৃত্যুতে বাংলা দেশ থেকে দশ লাখ টাকা সংগ্রহ ও 'চিত্তরঞ্জন সেবা-সদন' প্রতিষ্ঠা…নিখিল ভারত কাটুনী-সংঘের প্রতিষ্ঠা…আশ্রমিকদের অনাচারের প্রায়শ্চিত্তকল্পে সাত দিন অনশন…

১৯২৬—স্বামী শ্রদ্ধানন্দের অপঘাত মৃত্যুতে গান্ধিজী কর্তৃক কংগ্রেসে শোক-প্রস্তাব উত্থাপন ও স্বাধীনতা প্রস্তাবের বিরোধীতা…

১৯২৭—সিংহল ভ্রমণ ও খাদি প্রচারে অর্থ-সংগ্রহ…

১৯২৮—সাইমন-কমিশন বয়কট…বল্লভভাই কর্তৃক বরদৌলি সত্যাগ্রহ…কংগ্রেস অধিবেশনে এক বছরের মধ্যে স্বাধীনতা লাভের প্রস্তাব…

১৯২৯—য়ুরোপ যাবার আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান…কলিকাতায় বিলাতী কাপড়ের বহ্ন্যুৎসব করার জন্য ১৲ টাকা জরিমানা…ব্রহ্মদেশে…সর্বদল সম্মেলনে বড়লাটের উপর আস্থা স্থাপনের প্রস্তাব…দিল্লীতে বড়লাটের সংগে গান্ধিজী, মতিলাল, সাপ্রু, বিঠলভাই ও জিন্নার সাক্ষাৎকারও বড়লাট কর্তৃক ডোমিনিয়ন-ষ্ট্যাটাস সম্পর্কে সঠিকভাবে কিছু বলার অক্ষমতা জ্ঞাপন…গান্ধিজীর অনুপ্রেরণায় কংগ্রেসের বৈঠকে পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব গ্রহণ…

১৯৩০—ইয়ং ইণ্ডিয়ায় ১১ দফা শর্ত প্রকাশ, ওয়ার্ধায় কংগ্রেস কমিটির বৈঠক…৭৯ জন আশ্রমিক নিয়ে ১২ই মার্চ দাণ্ডি অভিযান শুরু…২০০ মাইল পদব্রজে অতিক্রম, ৬ই এপ্রিল সকাল সাড়ে আটটায় লবণ আইন অমান্য…সুভাষচন্দ্র, বল্লভভাই, জহরলাল, মতিলাল গ্রেপ্তার…পেশোয়ার, মাদ্রাজ, বাংলা, করাচী, শিরোদা, রত্নগিরি, পাটনা, কলকাতা, বোলপুর, মেদিনীপুর প্রভৃতি স্থান আইন অমান্যের পুরোভাগে…করাচিতে রাত্রি পৌণে একটার সময় গান্ধিজীকে গ্রেপ্তার…মুক্তির জন্য ১০২ জন মার্কিণ পাদ্রীর আবেদন…পানামায় ২৪ ঘণ্টা ব্যাপি হরতাল…এক লাখ লোকের কারাদণ্ড…পেশোয়ারে নিরস্ত্র নাগরিকদের প্রতি গুলি চালাতে গাড়োয়ালি সৈন্যের অস্বীকৃতি …স্যার তেজ বাহাদুর সাপ্রু ও মুকুন্দরাম রাও জয়াকরের মধ্যস্থতায় গান্ধিজী ও ভারত সরকারের মধ্যে মিটমাট করার চেষ্টা ব্যর্থ…কংগ্রেসকে বাদ দিয়ে প্রথম গোলটেবিল বৈঠকের অধিবেশন…

১৯৩১—২৫শে জানুয়ারী মুক্তিলাভ…চার্চিল কর্তৃক 'অর্ধনগ্ন সন্ন্যাসী' বলে কথিত… বড়লাট আরুইনের সংগে চুক্তি…ভগৎ সিং, রাজগুরু ও শুকদেবের প্রাণ রক্ষার চেষ্টা ব্যর্থ…গুজরাট বিদ্যাপীঠের সমাবর্তন উৎসবে বক্তৃতা…জাতীয়

পতাকার পরিবর্তন…নতুন বড়লাট ওয়েলিংডনের সংগে আলোচনা…দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকে যোগ দেবার জন্ত 'রাজপুতনা' জাহাজে ১৯শে আগষ্ট বিলাত যাত্রা…যাবার পথে সম্বর্ধনা…লণ্ডনে কিংস্‌লি হলে অবস্থান…গান্ধী খুড়ো…আমেরিকার উদ্দেশ্তে বেতার বক্তৃতা…সম্রাট পঞ্চম জর্জ ও মহারাণী মেরীর সংগে সাক্ষাৎ…ম্যাঞ্চেষ্টার, ইটন, অক্সফোর্ড, ক্যাম্‌ব্রিজ প্রভৃতি স্থানে সম্বর্ধিত…বার্ণার্ড শ', লয়েড জর্জ, চার্লি চ্যাপলিন, হ্যারল্‌ড্‌ ল্যাস্‌কি, আর্থার হেণ্ডারসন,ক্যাণ্টারবারীর যাজক-প্রধান প্রভৃতির সংগে সাক্ষাৎ…আমেরিকা, ফ্রান্স, জার্মাণী, ইটালী, প্যালেষ্টাইন, মিশর, হাংগারী, ডেনমার্ক ও আয়ার-ল্যাণ্ড থেকেআমন্ত্রিত…৫ই ডিসেম্বর লণ্ডন ত্যাগ,ফেরার পথে রোমাঁ রোলাঁর সংগে ও মুসোলিনীর সংগে সাক্ষাৎ…২৮শে ডিসেম্বর বোম্বাইয়ে পদার্পণ…

১৯৩২—ছ' দিন ধরে বড়লাটের সংগে আলোচনা…৪ঠা জানুয়ারী রাত তিনটার সময় গ্রেপ্তার…ম্যাকডোন্যাল্‌ড সাহেবের সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার প্রতিবাদে ২০শে সেপ্টেম্বর থেকে ২৬শে সেপ্টেম্বর অবধি অনশন—হিন্দু নেতৃ সম্মেলন, অস্পৃশ্যদের হরিজন আখ্যা দান…রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সামনে অনশন ভংগ… ২২শে ডিসেম্বর আপ্‌পা সাহেবের প্রতি সহানুভূতিসূচক উপবাস…

১৯৩৩—হরিজন-সেবক-সংঘের প্রতিষ্ঠা, ও 'হরিজন' পত্রিকা প্রকাশ…আত্মশুদ্ধির জন্য ৮ই মে থেকে ২১ দিন উপবাস…ছ' সপ্তাহের জন্য আইন অমান্য আন্দোলন স্থগিতের নির্দেশ…সবরমতী আশ্রম হরিজনদের উদ্দেশ্যে দান… ১লা আগষ্ট রাসে যাবার পথে ৩৪ জন আশ্রমিকসহ গ্রেপ্তার…৩ দিন পরে মুক্তি, আদেশ অমান্য করার জন্য আধ ঘণ্টার মধ্যে আবার গ্রেপ্তার ও এক বছর কারাদণ্ড…১৬ই আগষ্ট অনশন আরম্ভ…২০শে আগষ্ট সেস্থুন হাসপাতালে প্রেরিত…২৩শে মুক্তিলাভ…হরিজন উন্নয়নের জন্য ভারত পরিক্রমা ও আট লাখ টাকা সংগ্রহ…

১৯৩৪—বিহার ভূমিকম্পে বিহার ভ্রমণ…আইন অমান্য আন্দোলন স্থগিত…পুণার পথে মহাত্মাজীর মোটারের উদ্দেশ্যে বোমা নিক্ষেপ…হরিজন কর্মী কর্তৃক আন্দোলন বিরোধীর মাথায় যষ্ঠী প্রহার ও তার প্রায়শ্চিত্তের জন্য জুলাই মাসে সাত দিন গান্ধিজীর অনশন…'নিখিল-ভারতগ্রামোদ্যোগ-সংঘের' প্রতিষ্ঠা…কংগ্রেস থেকে চার আনার সদস্যপদ ত্যাগ…

১৯৩৫—সমস্ত বকেয়া কাজ শেষ করার জন্য ২৩শে মার্চ চার সপ্তাহ মৌনাবলম্বন… ইন্দোরে হিন্দি সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতি…সেবাগ্রামে আশ্রমের পত্তন…

১৯৩৬—জাপানী কবি ইয়োনে নগুচি ও ডাঃ অমিয়া কোয়ার সেবাগ্রামে আগমন ও জাপান যাবার আমন্ত্রণ···জন্ম-নিয়ন্ত্রণ আন্দোলনের নেত্রী মার্গারেট সিংগারের সাক্ষাৎকার···নিগ্রো প্রতিনিধিদের সংগে আলোচনা···দশ সপ্তাহ স্নায়বিক দুর্বলতায় অসুস্থ···গান্ধী সেবা-সংঘের দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতিত্ব···নাগপুরে নিখিল ভারত সাহিত্য সম্মেলনে সভাপতিত্ব···জাতীয় শিক্ষাসম্মেলনে সভাপতিত্ব···হিন্দুস্থানীকে রাষ্ট্রভাষা করার জন্ম হরিজনে কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশ···

১৯৩৭—নতুন আইনে কংগ্রেসী মন্ত্রীসভা গঠিত···গান্ধিজীর নির্দেশ—মাদক নিবারণ, কৃষি-ঋণ লাঘব, প্রাথমিক শিক্ষা, কারাগার সংশোধন···কলিকাতায় রবীন্দ্র-নাথের সংগে সাক্ষাৎ···ত্রিবাংকুরে ভ্রমণ—মন্দির দ্বার উন্মুক্ত···মান্দ্রাজে ভারতীয় সাহিত্য-পরিষদে সভাপতিত্ব···কর্ণাটের গান্ধী সেবা সংঘে সভাপতিত্ব ···ওয়াধার শিক্ষা সম্মেলনে সভাপতিত্ব ও নয়া তালিমীর পরিকল্পনা···অসুস্থ-তার জন্ম জুহুতে অবস্থান···রক্তের চাপ বৃদ্ধি···

১৯৩৮—সেবাগ্রামে প্রত্যাবর্তন···লর্ড লোথিয়ান ও তাকাওকার আগমন···পেশোয়ার ভ্রমণ···দালাং গান্ধী সেবা সংঘে সভাপতিত্ব···সেবাগ্রামে বড়দিন উৎসব··· চেক ও জার্মাণ ইহুদীদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন···মিউনিক চুক্তির সমালোচনা···রাজবন্দীদের মুক্তির চেষ্টায় কলিকাতায় আগমন, বিভিন্ন জেলে রাজবন্দীদের সংগে সাক্ষাৎকার ও লাট সাহেবের সংগে আলোচনা···

১৯৩৯—ডাক্তার কাগাওয়ার আগমন···ঠাকুর সাহেবের চুক্তি ভংগে রাজকোটে গান্ধিজীর পাঁচ দিন অনশন···সুভাষচন্দ্রের সংগে মতানৈক্য···রাজবন্দীদের মুক্তির চেষ্টায় কলিকাতায় আগমন ও আলোচনা···সুভাষচন্দ্রকে উপদেশ··· ওয়ার্ধায় কংগ্রেস কমিটির বৈঠক ও মন্ত্রীমণ্ডলীর পদত্যাগের নির্দেশ···বড়-লাটের সংগে আলোচনা···হরিজনে গণপরিষদ গঠন করার উল্লেখ··· সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণের সম্পাদনায় 'গান্ধী জয়ন্তী' পুস্তক প্রকাশ···মালিকান্দায় গান্ধী সেবা সংঘের অধিবেশনে যোগদান···

১৯৪০—শান্তিনিকেতনে আগমন, রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক গান্ধী দম্পতিকে আম্রকুঞ্জে অভিনন্দন···অসুস্থ দীনবন্ধু এণ্ডরুজের সংগে কলিকাতার হাসপাতালে সাক্ষাৎকার···বড়লাটের সংগে সিমলায় দু'বার দীর্ঘ আলোচনা···কংগ্রেস কমিটিগুলিকে সত্যাগ্রহ আশ্রমে রূপান্তরিত করার নির্দেশ···বিনোবা ভাবেকে দিয়ে ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহের সুরু···জহরলাল ও আজাদের কারা-

দণ্ড…প্রেস আইনের প্রতিবাদে 'হরিজন', 'হরিজন বন্ধু' ও 'হরিজন সেবক' প্রকাশ বন্ধ…

১৯৪১—রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ…বরদৌলিতে বল্লভভাইয়ের আশ্রমে মাস খানেক অবস্থান…২৫০০০ জন সত্যাগ্রহীর কারাদণ্ড ও ছ' লাখ টাকা জরিমানা…কংগ্রেস নেতৃত্ব থেকে অব্যাহতি…

১৯৪২—দীনবন্ধু এণ্ডরুজ স্মৃতি তহবিলে ৫ লাখ টাকা সংগ্রহ…মার্কিণ সাংবাদিক লুই ফিসারের সাত দিন সেবাগ্রামে অবস্থান…চিয়াং কাইশেক দম্পতির সংগে কলিকাতায় সাক্ষাৎকার…ষ্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্‌স্‌য়ের সংগে আলোচনা…মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি লুই জনসনের সংগে আলোচনা…১৫ মাস পরে হরি-জনের পুনঃ প্রকাশ…জহরলালকে নিজের উত্তরাধিকারী বলে ঘোষণা… বোম্বাইয়ে ৮ই আগষ্ট 'ভারত-ছাড়ো' প্রস্তাব গৃহীত, সেই রাত্রেই গ্রেপ্তার ও পুণার আগা খাঁ প্রাসাদে বন্দী…আগা খাঁ প্রাসাদে সেক্রেটারী মহাদেব দেশাইয়ের মৃত্যু…ভারতব্যাপী আন্দোলন…চিমুর অত্যাচারের প্রতিবাদে অধ্যাপক ভাঁসালির অনশন…বাংলার অর্থ সচিব ডাক্তার শ্যামাপ্রসাদের পদত্যাগ…

১৯৪৩—সরকারী অনাচারের প্রতিবাদে ২১ দিন অনশন…বড়লাটের মন্ত্রীসভা থেকে স্যার এইচ, পি, মোদী, নলিনীরঞ্জন সরকার ও মাধব শ্রীহরি আনের পদত্যাগ…

১৯৪৪—২২শে ফেব্রুয়ারী আগা খাঁ প্রাসাদে কস্তুরবা'র মৃত্যু…ম্যালেরিয়ায় অসুস্থ …৬ই মে সকাল ৮টায় বিনাসর্তে মুক্তিলাভ · জুহুর গান্ধী-গ্রামে ২৫ দিন মৌনী হয়ে বিশ্রাম গ্রহণ…২১শে মে জীবনে প্রথম সবাক চিত্র দর্শন— 'মিশন-টু-মস্কৌ' গান্ধী-গ্রামে বিশেষভাবে দেখাবার ব্যবস্থা…বোম্বাই ডক বিস্ফোরণে ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চল পরিদর্শন…পাকিস্তান সম্পর্কে জিন্নার সংগে আলোচনা…সেবাগ্রামে রবীন্দ্র মৃত্যু-বার্ষিকী ও গান্ধী-জন্মতিথি উৎসব…কস্তুরবা স্মৃতি-ভাণ্ডারে ১১০ লক্ষ টাকা সংগৃহীত…

১৯৪৫—সাম্প্রদায়িকতা নিবারণকল্পে জিন্নার সংগে আলোচনা…সমস্ত কংগ্রেসী নেতার মুক্তিলাভ, সিমলায় গান্ধিজী ও কংগ্রেসী নেতাদের সংগে বড়লাটের আলোচনা…

১৯৪৬—বৃটিশ মন্ত্রীসভার তিনজন সদস্য স্যার পেথিক লরেন্স, স্যার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্‌স্‌ ও জেনারেল আলেকজাণ্ডারের ভারতে আগমন, গান্ধিজীর সংগে আলোচনা

—গণপরিষদ, অন্তর্বর্তী সরকার, পাকিস্তান ও ভারতের স্বাধীনতা সম্পর্কে আলোচনা…১৬ই আগষ্ট মুসলীম লীগের 'প্রত্যক্ষ-সংগ্রাম' ঘোষণা—কলিকাতা থেকে নাদিরশাহী হত্যাকাণ্ডের সুরু…

১৯৪৭—সাম্প্রদায়িক বীভৎসতা নিবারণের জন্য নোয়াখালি ও বিহারে পদব্রজে পল্লী পরিক্রমা…কাশ্মীর পরিদর্শন…দিল্লীতে দাংগা নিবারণের জন্য ৫ই এপ্রিল একদিনের জন্য অনশন…কলিকাতায় ১লা সেপ্টেম্বর থেকে তিন দিন অনশন …স্বাধীন ভারতের সূচনা…পাঞ্জাব ও কাশ্মীরে পাকিস্তানীদের অত্যাচার ও কাশ্মীর আক্রমণ …যুদ্ধ…১লা এপ্রিল দিল্লীতে এশিয়া সম্মেলনে বক্তৃতা —অখণ্ড বিশ্ব গঠনের জন্য এশিয়াবাসীর কাছে আবেদন…

১৯৪৮—দিল্লীতে সাম্প্রদায়িক মৈত্রী স্থাপনের জন্য ঐকান্তিক চেষ্টা…১৩ই জানুয়ারী ৫ দিনের জন্য অনশন…২০শে জানুয়ারী ১৫ গজ দূর থেকে বোমা বিস্ফোরণ …৩০শে জানুয়ারী প্রার্থনা সভায় যাবার পথে আততায়ীর গুলিতে আহত, বিড়লা ভবনে প্রাণ ত্যাগ…১২ই ফেব্রুয়ারী ভারতের প্রধান প্রধান স্থানে চিতাভস্ম বিসর্জন…ভারতের বাহিরেও চিতাভস্ম প্রেরণ…বিশ্বের শোক…

---

## সত্যাগ্রহ-অভিযান

১৯০৬—( প্রথমবার )—দক্ষিণ আফ্রিকায় ট্রান্সভাল গবর্মেন্টের গেজেটে এশিয়াটিক অর্ডিন্যান্সের খসড়া প্রকাশিত হয়। এই আইনের মূল কথা ছিল, ট্রান্স্‌ভালে ভারতীয়দের প্রবেশ বন্ধ করা ও যারা সেখানে আছে তাদের প্রতি দাগী আসামীর মত ব্যবহার করা। ১২ই সেপ্টেম্বর থেকে গান্ধিজী এই আইন-অমান্য আন্দোলন সুরু করেন। শ'ছয়েক ভারতীয় জেলে যাবার পরে ৩০শে জানুয়ারী, ১৯০৭ সালে জেনারেল স্মাট্‌সের সংগে তাঁর চুক্তি হয়…

১৯০৮—( দ্বিতীয়বার )—স্মাট্‌স্ সাহেব কাল-কানুন তুলে দেবার যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তা রাখলেন না। আবার সত্যাগ্রহ সুরু হোল। দু' হাজার ভারতীয় প্রকাশ্য সভায় তাদের পরিচয়-পত্র পুড়িয়ে ফেললো। পুলিশ কত লোককে জেলে পুরলো, জরিমানা করলো, ভারতীয় মজুরদের বেত্রাঘাত করা হোল, গুলি চালানো হোল, কিন্তু আন্দোলন কমলো না…

১৯১৩—( তৃতীয়বার )—মাথা পিছু তিন পাউণ্ড ( ৪৫৲ টাকা ) বার্ষিক করের বিরুদ্ধে ২২৩৯ জন ভারতীয় নরনারী ও শিশু সংগে নিয়ে নাতালের নিউক্যাস্‌ল্ থেকে ট্রান্স্‌ভালের পথে গান্ধিজীর অভিযান…চার দিনের মধ্যে তিনবার গ্রেপ্তার এবং দু' দফায় এক মাস ও তিন মাস কারাদণ্ড…এক মাস পাঁচ দিন পরে বিনাসর্তে মুক্তিলাভ…

১৯১৪—( চতুর্থবার)—গুজরাটে বিরাম গাঁয়ে শুল্ক আদায়ের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ, ভারত সরকার কর্তৃক সু-বন্দোবস্ত…

১৯১৭—( পঞ্চমবার )—বিহারের চম্পারণ জেলায় নীলকুঠীর সাহেবদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে অভিযান…ছ' মাসের মধ্যে ভারত সরকার কর্তৃক সর্ব বিষয়ের প্রতিকার…

১৯১৭—( ষষ্ঠবার )—ভারত থেকে বিদেশে মজদুর পাঠাবার বিরুদ্ধে প্রতিবিধানের সংকল্প, জাহাজে জাহাজে পিকেটিং করার প্রস্তাব…ভারত সরকার কর্তৃক কুলি পাঠানো বন্ধ…

১৯১৮—( সপ্তমবার )—আমেদাবাদে মিল শ্রমিকদের প্রথম শ্রমিক-সংঘ গঠন…বেতন বৃদ্ধির জন্য বাইশ দিন ধর্মঘট…তিন দিন অনশন…শ্রমিকদের শতকরা ৩৫৲ টাকা বেতন বৃদ্ধি…

১৯১৮—( অষ্টমবার )—গুজরাটের খেড়া জেলায় দুর্ভিক্ষ-পীড়িত চাষীদের কাছ থেকে খাজনা আদায়ের জন্য সরকারী জুলুমের প্রতিবাদ···খাজনা কমাবার জন্য আন্দোলন ও জয়লাভ···

১৯১৯—( নবমবার )—রাউলাট আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ···৬ই এপ্রিল হরতাল ঘোষণা···জালিয়ানওয়ালাবাগের প্রতিবাদ সভায় মিলিটারীর গুলি চালনা, ৪০০ জন নিহত, ১২০০ আহত···

১৯২০—( দশম বার )—সেপ্টেম্বর মাসে অসহযোগ আন্দোলন সুরু···৩০,০০০ সত্যাগ্রহীর কারাদণ্ড···চৌরীচৌরায় থানা জালিয়ে দেবার পর আন্দোলন স্থগিত··· গান্ধিজীর ছ'বছর কারাদণ্ড···

১৯২২—( একাদশবার )—আকালী শিখেরা পাঞ্জাবের 'গুরুকা বাগ' তীর্থ দখল করার জন্য অভিযান করে। এই তীর্থ স্থানটি উদাসী শিখদের অধিকারে ছিল, তারা পুলিশের সাহায্য নেয়। দিনের পর দিন সত্যাগ্রহীরা হাত জোড় করে সত্যাগ্রহ করে পুলিশের মার খায় কিন্তু প্রতিবাদ করে না। শেষে স্যার গংগারাম 'বাগটি' ভাড়া নিয়ে আকালীদের হাতে সমর্পন করেন···

১৯২৪—( দ্বাদশবার )—ত্রিবাংকুর রাজ্যে ভাইকমে অস্পৃশ্যদের সত্যাগ্রহ। সেখানে অস্পৃশ্যদের রাস্তা দিয়ে চলার অধিকার ছিল না, গান্ধিজীর নির্দেশে সত্যগ্রহীরা হাত জোড় করে পথে বসে রইল ও শেষ পর্যন্ত জয়লাভ করলো···

১৯২৭—( ত্রয়োদশবার )—মাদ্রাজে সিপাহী-যুদ্ধের যুগের অত্যাচারী সেনাপতি 'নীল সাহেবের' মর্মরমূর্তি অপসারণের দাবী···কিছুদিন চলার পর সত্যাগ্রহ বন্ধ রাখা হয়, দশ বছর বাদে কংগ্রেসী মন্ত্রীরা সেই মূর্তি অপসারিত করেন···

১৯২৮—( চতুর্দশবার )—গুজরাটে বরদৌলি তালুকে খাজনা বৃদ্ধির প্রতিবাদে প্রজাদের আন্দোলন···গান্ধিজীর আশীর্বাদ নিয়ে সর্দার বল্লভভাইয়ের নেতৃত্ব···সরকার কর্তৃক অনুসন্ধান ও প্রজাদের দাবী স্বীকার···

১৯২৯—( পঞ্চদশবার )—জেলের মধ্যে অনাচারের প্রতিকারের উদ্দেশ্যে মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার আসামী যতীন্দ্রনাথ দাসের ৬৩ দিন অনশন সত্যাগ্রহ করে মৃত্যুবরণ···

১৯৩০—( ষোড়শবার )—আইন অমান্য আন্দোলনের সুরু···পদব্রজে সবরমতী আশ্রম থেকে ১০০ ক্রোশ পথ অতিক্রম করে দাণ্ডি গমন ও লবণ-আইন অমান্য···

সারা ভারতে আন্দোলন…লক্ষাধিক লোকের কারাদণ্ড…পুলিশের গুলি চালনা…৫ই মে গ্রেপ্তার ও যারবেদা জেলে নীত…

১৯৩১—( সপ্তদশবার )—কর্ণাটের চাষীদের কর মকুবের আন্দোলন…জমি জমা সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত ও নীলাম…শেষে সরকার কর্তৃক কৃষকদের দাবী স্বীকার…

১৯৩১—( অষ্টাদশবার )…গোলটেবিল বৈঠক থেকে ফিরে এসে নতুন করে আইন অমান্য আরম্ভের নির্দেশ…১৯৩২য়ের ৪ঠা জানুয়ারী গ্রেপ্তার…এক লাখ লোকের কারাদণ্ড, পেশোয়ারে গুলি চালনা…শেষে গণ-আন্দোলন বন্ধ করে ব্যক্তিগত-আন্দোলনের নির্দেশ…১৯৩৪ সালে গান্ধিজীর নির্দেশে আন্দোলন স্থগিত…

১৯৩৭—( ঊনবিংশবার )—রাজবন্দীদের অনশন-সত্যাগ্রহ………তাদের অভাব-অভিযোগের প্রতিকারের জন্য গান্ধিজীর দুবার কলিকাতায় আগমন ও তাদের মুক্তিদানের চেষ্টা…

১৯৪০—( বিংশবার )—শ্রীবিনোবা ভাবেকে দিয়ে একক সত্যাগ্রহের উদ্বোধন…ত্রিশ হাজার কর্মীর কারাবরণ…

১৯৪২—( একবিংশবার )—'ভারত ছাড়ো' অভিযান…নেতাদের কারাবরণ, সমগ্র ভারত রক্তপ্লাবিত…

১৯৪৭—সাম্প্রদায়িক রক্তপাত নিবারণ কল্পে নোয়াখালি ও বিহারে পদব্রজে গ্রাম থেকে গ্রামান্তর পরিক্রমা…

## কারাবরণ

১৯০৮—ট্রান্সভাল ছেড়ে চলে যাবার নির্দেশ অমান্য করার অপরাধে জোহানেস্‌বার্গে দু'মাস কারাদণ্ড কিন্তু জেলে ছিলেন ১০ই জানুয়ারী থেকে ৩০শে জানুয়ারী অবধি···

—ভোকস্রষ্ট ও প্রিটোরিয়ার জেলখানায় দু'মাস কারাবাস—১৬ই আগষ্ট থেকে ৬ই নভেম্বর···

১৯১৩—নিউক্যাস্‌ল্‌ থেকে নাতাল যাবার পথে চারবার গ্রেপ্তার···দু'দফা বিচারে ন'মাস ও তিনমাস কারাদণ্ড কিন্তু জেলে থাকতে হয় ১৭ই নভেম্বর থেকে ১৮ই ডিসেম্বর পর্যন্ত···

১৯২২—ইয়ং ইণ্ডিয়া কাগজে তিনটি প্রবন্ধ লেখার জন্য ছ'বছর কারাদণ্ডের আদেশ কিন্তু জেলে থাকতে হয় ১৯২২য়ের ১০ই মার্চ থেকে ১৯২৪য়ের ৭ই ফেব্রুয়ারী অবধি···

১৯৩০—লবণ-আইন অমান্য করার অপরাধে বিনা বিচারে বন্দী—১৯৩০য়ের ৫ই মে থেকে ১৯৩১য়ের ২৬শে জানুয়ারী অবধি কারাবাস···

১৯৩২—দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠক থেকে ফিরে আসার পর বিনা বিচারে বন্দী-১৯৩২য়ের ৪ঠা জানুয়ারী থেকে ১৯৩৩য়ের ৮ই মে পর্যন্ত কারাবাস···

১৯৩৩—একক সত্যাগ্রহ আন্দোলন চালাবার অপরাধে ৩১শে মে থেকে ৪ঠা আগষ্ট অবধি কারাবাস···

১৯৩৩—সরকারী নির্দেশ অমান্য করার অপরাধে একবছর কারাদণ্ড কিন্তু জেলে থাকতে হয় ৪ঠা আগষ্ট থেকে ২৩শে আগষ্ট পর্যন্ত···

১৯৪২—'ভারত-ছাড়ো' প্রস্তাবের পর বিনা বিচারে বন্দী—১৯৪২য়ের ৯ই আগষ্ট থেকে ১৯৪৪য়ের ৫ই মে অবধি আগা খাঁ-প্রাসাদে অন্তরীণ···

## অনশন

১৯১৩—দক্ষিণ আফ্রিকায় ফিনিক্স্ আশ্রমে দু'জন আশ্রমিকের উচ্ছৃঙ্খল আচরণের জন্য এক সপ্তাহ অনশন ও পরে সাড়ে চার মাস পর্যন্ত দৈনিক একবার অন্নগ্রহণ···

১৯১৪—ফিনিক্স্ আশ্রমিকদের উচ্ছৃঙ্খল আচরণের জন্য চৌদ্দদিন অনশন···

১৯১৮—আমেদাবাদ মিল-মজদুরদের পক্ষে ধর্মঘটের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করার জন্য তিনদিন উপবাস—১২, ১৩, ১৪ই মার্চ··

১৯১৯—নাড়িয়াদে রেল লাইন তুলে দেবার চেষ্টা হয়েছে শুনে ১৩ই এপ্রিল থেকে তিনদিনের জন্য অনশন···

১৯২১—যুবরাজের ভারত আগমন উপলক্ষ্যে নানাস্থানে দাংগাহাংগামা হয়, তা বন্ধ করার জন্য বোম্বাইয়ে ৯ই নভেম্বর থেকে পাঁচ দিনের জন্য অনশন···

১৯২২—চৌরীচৌরার দুর্ঘটনার জন্য বরদৌলিতে ফেব্রুয়ারী মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে পাঁচদিনের জন্য অনশন···

১৯২৪—কোহাটে হিন্দু-মুসলমান দাংগার জন্য দিল্লীতে ১৮ই সেপ্টেম্বর থেকে একুশ দিনের জন্য অনশন···

১৯২৫—সবরমতী আশ্রমের বাসিন্দাদের অন্যায় কাজের প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য ২৪শে নভেম্বর থেকে সাতদিন অনশন···

১৯৩২—ম্যাকডোনাল্ড বাঁটোয়ারার প্রতিবাদ করে ২০শে সেপ্টেম্বর থেকে য়েরোড়া জেলখানায় আমরণ অনশন স্থুরু করেন, শেষে ২৬শে সেপ্টেম্বর গবর্মেণ্টের প্রতিশ্রুতি পাওয়ায় তিনি আহার গ্রহণ করেন···

১৯৩২—আপ্পা সাহেব পটবর্ধন জেলখানায় মেথরের কাজ করতে চান, কিন্তু জেলের কর্তারা অনুমতি না দেওয়ায় তিনি অনশন স্থুরু করেন। গান্ধিজী তখন য়েরোড়া জেলে, তিনিও ২২শে ডিসেম্বর থেকে সহানুভূতিসূচক উপবাস স্থুরু করেন। দু'দিনের মধ্যেই জেলের কর্তৃপক্ষের সংগে মিটমাট হয়ে যায়···

১৯৩৩—আত্মশুদ্ধি করার জন্য য়েরোড়া জেলে ৮ই মে থেকে একুশ দিন উপবাস। প্রথমদিনেই গান্ধিজীকে গবর্মেণ্ট মুক্তি দেন, পুণার 'পর্ণকুটীতে' তিনি উপবাস শেষ করেন···

১৯৩৩—হরিজনদের সেবার উদ্দেশ্যে জেলে ১৬ই আগষ্ট থেকে অনশন স্থুরু···

চারদিন উপবাস করার পর তাঁকে সেসুন হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। ২৩শে আগষ্ট অবস্থা সংকটজনক দেখে তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয়···

১৯৩৪—হরিজন সেবকদের সংগে বিরোধীদলের দাংগাহাংগামা হওয়ায় জুলাই মাসে গান্ধিজীর সাতদিন অনশন···

১৯৩৭—রাজবন্দীদের প্রতি সহানুভূতি জানিয়ে কলিকাতায় ২৬শে অক্টোবর একদিনের জন্য অনশন···

১৯৩৯—রাজকোটের ঠাকুর সাহেবের প্রতিশ্রুতি-ভংগের প্রতিবাদে ৩রা মার্চ থেকে রাজকোটে অনশন সুরু করেন, বড়লাট মধ্যস্থতা করার প্রতিশ্রুতি দেওয়ায় পঞ্চমদিনে আহার গ্রহণ···

১৯৪৩—ভারত-ছাড়ো আন্দোলন সম্পর্কে বৃটিশ সরকার সত্যাগ্রহীদের উপর যে দোষারোপ করেন তার প্রতিবাদে গান্ধিজী আগা-খাঁ-প্রাসাদে ১০ই ফেব্রুয়ারী থেকে একুশদিন অনশন করেন···

১৯৪৭—৫ই এপ্রিল হিন্দু মুসলমান ঐক্য প্রতিষ্ঠা কল্পে চব্বিশ ঘণ্টা অনশন করেন, বড়লাটের চেষ্টায় সমস্ত হিংসাত্মক কার্যকলাপের নিন্দা করে গান্ধিজী ও জিন্নার যুক্ত বিবৃতি প্রচারিত হয়···

—১লা সেপ্টেম্বর কলিকাতার বেলেঘাটায় হিন্দুমুসলমান সম্প্রীতি স্থাপনের জন্য অনির্দিষ্ট কালের জন্য অনশন আরম্ভ, ৪ঠা তারিখে রাত নটায় অনশন ভংগ···

১৯৪৮—দিল্লী ও ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের সর্বত্র মুসলমান সম্প্রদায়ের পুনর্বসতি কাজ সম্পন্ন করার জন্য ১৩ই জানুয়ারী থেকে আমরণ অনশন আরম্ভ। সমস্ত সম্প্রদায়ের প্রতিশ্রুতি ও আশ্বাসে পাঁচ দিন পরে আহার গ্রহণ···

---

## অর্থ-সংগ্রহ

১। জালিয়ানওয়ালাবাগ স্মৃতি-তহবিল…

২। তিলক স্বরাজ্য-ভাণ্ডার—১ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা…

৩। দেশবন্ধু স্মৃতি-তহবিল—১০ লক্ষ টাকা…

৪। হরিজন তহবিল…

৫। দীনবন্ধু এণ্ডরুজ স্মৃতি-তহবিল—৫ লক্ষ টাকা…

৬। কস্তুরবা স্মৃতি-তহবিলে ১৯৪৪ সালের ২রা অক্টোবর ৭৫-তম জন্ম-তিথিতে ১ কোটি ১০ লক্ষ টাকা উপহার…

৭। সর্বহারা পুনর্বসতি তহবিলে নোয়াখালি পরিক্রমার সময় ৩ লক্ষ টা…

## আশ্রম প্রতিষ্ঠা

দক্ষিণ আফ্রিকায়—

১৯০৩ সালে ফিনিক্স্ আশ্রম

১৯১০ সালে টলষ্টয় ফার্ম

ভারতবর্ষে—

১৯১৫ সালে সবরমতি আশ্রম

১৯৩৬ সালে সেবাগ্রাম আশ্রম

## সাময়িক পত্রের সম্পাদনা

১৯০৪—ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়ন—ইংরাজী, হিন্দী, তামিল ও গুজরাটি ভাষায়

১৯১৯—ইয়ং ইণ্ডিয়া—চারি ভাষায়

—নবজীবন

১৯২৩—হরিজন

## চিতাভস্ম বিসর্জন

বাংলা—ব্যারাকপুর—গঙ্গা

নোয়াখালি—মেঘনা

লাঙ্গলবন্দ (ঢাকা)—ব্রহ্মপুত্র

ত্রিপুরা—নর্মদা

বিহার—গড়মুক্তেশ্বর—গঙ্গা

পাটনা—গঙ্গা

মজঃফরপুর—গণ্ডক

গয়া—ফল্গু

ভাগলপুর—গঙ্গা

রাঁচী—স্বর্ণরেখা

উড়িষ্যা—কটক—মহানদী

পুরী—বঙ্গোপসাগর

আসাম—গৌহাটি—ব্রহ্মপুত্র

শিলচর—বরাক

তেজপুর—ব্রহ্মপুত্র

শিবসাগর—ব্রহ্মপুত্র

ডিব্রুগড়—ব্রহ্মপুত্র

যুক্তপ্রদেশ—হরিদ্বার—গঙ্গা

মথুরা—যমুনা

অযোধ্যা—সরযূ

বেনারস—গঙ্গা

এলাহাবাদ—গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতী সঙ্গম

রামপুর—...

বোম্বাই—বোম্বাই—আরব সাগর

আমেদাবাদ—সবরমতী

সেবাগ্রাম—গোমতী

নাসিক—গোদাবরী

সুরাট—তাপ্তী

গোকর্ণ—আরবসাগর

পাঞ্জাব—জলন্ধর—শতদ্রু নদী
দেশীয় রাজ্য—জম্মু—বিতস্তা
গোয়ালিয়র—শিপ্রা
ওয়ারাঙ্গল ( হায়দরাবাদ )—গোদাবরী
মহীশূর—কাবেরী
ইন্দোর—...
পুষ্কর—পুষ্কর
রাজকোট—আরব সাগর
জুনাগড়—আরবসাগর
পোরবন্দর—আরবসাগর
ভূতা—আরবসাগর
মাদ্রাজ—মাদ্রাজ—বঙ্গোপসাগর
শ্রীরঙ্গম—কাবেরী
কন্যাকুমারী—ভারতসাগর
রামেশ্বর—ভারতসাগর
ভরতপূজা—ভারতসাগর
বেজওয়াদা—কৃষ্ণা
নরসিংওয়াদি—কৃষ্ণা
ফরাসী-ভারত—মাহে—আরবসাগর
ভারতের বাহিরে—মানস সরোবর—মানস সরোবর
রেঙ্গুণ ( ব্রহ্মদেশ )—ইরাবতী
কলম্বো ( সিংহল )—ভারতসাগর
সিংহপুর—প্রশান্ত মহাসাগর
ফিনিক্স—( দক্ষিণ আফ্রিকা )—আমেজানি নদী

———

In my opinion we
have neither father
nor mother neither
wife nor children.
We belong to India
& every old man calls
out to us for service.
As therefore the
professor's father
has other nurses
he should with—
draw in the
gentlest manner
possible believing
that service of India
includes service
of his father. If his
father was without
nursing, service
of him would
have been service
of India. M. K. G.

( আমার মতে আমাদের পিতা নাই মাতা নাই স্ত্রী নাই পুত্র নাই, আমরা ভারতবর্ষের সম্পত্তি। ভারতের প্রতিটি বৃদ্ধ আমাদের কাছে সেবা পাবার দাবী জানাচ্ছে। অতএব অধ্যাপকের পিতাকে সেবা করার জন্য যখন অন্য লোক আছে, তখন দেশ সেবা করলে পিতারও সেবা হবে এই বিশ্বাস রেখে যতদূর সম্ভব নম্রভাবে তাঁর সরে আসা উচিত। যদি তাঁর পিতাকে সেবা করার কেউ না থাকতো তাহলে তাঁর পক্ষে পিতৃ-সেবাই দেশ-সেবা বলে গণ্য হোত।

ম. ক. গ. )

* আচার্য জীবৎরাম ভগবানদাস কৃপালনী সম্পর্কে লিখিত।

प्रांतीय भाषाओंके स्थानमें
नहीं बल्की उनके सिवाय
अन्य प्रांतीय विनिमयके
लिये एक राष्ट्र भाषा
समस्त्रा भारतके लिये
जरुरी है वह भाषा केवल
हिन्दी हिंदुस्तानी हो सकती है

मो. क. गान्धी

প্রাংতীয় ভাষওঁকে স্থানমে
নহীঁ, বল্‌কী উনকে সিবায়
অন্ত প্রাংতীয় বিনিময়কে
লিয়ে এক রাষ্ট্র ভাষা
সমস্তা ভারতকে লিয়ে
জরুরী হৈ বহ ভাষা কেবল
হিন্দী হিংদুস্তানী হো সকতী হৈ।

মো, ক, গান্ধী

( প্রাদেশিক ভাষার স্থলে নয়, পরন্তু বিভিন্ন প্রদেশের ভাব বিনিময়ের জন্ত একটি রাষ্ট্র-ভাষার একান্ত প্রয়োজন, একমাত্র হিন্দুস্থানীই সেই রাষ্ট্রভাষা হতে পারে।

মো, ক, গান্ধী )

I will give you a talisman.
Whenever you are in doubt, or when the self becomes too much with you, apply th following test. Recall the face of the poorest and the weakest man whom you may have seen, and ask yourself, if the step you contemplate is going to be of any use to him. Will he gain anything by it? Will it restore him to a control over hi own life and destiny ? In other words, will it lead to Swaraj for the hungry an spiritually starving millions ?

Then you will find your doubtd and your self meltting away.

( আমি তোমাদের একটি রক্ষা-কবচ দোব। যখনই তোমরা কোন সন্দেহে পড়বে, অথবা যখন নিজের কথাটাই বড় বলে মনে হবে, তখনই নিম্নলিখিত পরীক্ষা প্রয়োগ করবে। সবচেয়ে গরীব ও সবচেয়ে দুর্বল যে মানুষটিকে তুমি দেখেছ তার মুখখানি স্মরণ করে নিজেকে জিজ্ঞাসা করবে যে যে-কাজ তুমি করতে মনস্থ করেছ তা সেই লোকটির কোন উপকারে লাগবে কি না। তার দ্বারা তার কিছু লাভ হবে কি ? তার জীবন ও ভবিষ্যৎকে আয়ত্ত করার মত সামর্থ ফিরে পাবে কি ? অর্থাৎ, বুভুক্ষিত, আধ্যাত্ম ক্ষুধায় ক্ষুধিত লক্ষ লক্ষ জনগণের স্বরাজ আসবে কি সেই পথে ?
তখনই তুমি দেখবে তোমার সন্দেহ ও স্বার্থ দ্রবীভূত হয়ে যাচ্ছে।—মো, ক, গান্ধী )

বহু বৎসরের পরাধীনতার সঞ্চিত জঞ্জাল আমাদের সাফ করতে হবে। হয়তো [illegible] জীবন ধরে খাটলেও তা শেষ হবে না। আমাদের শিক্ষার ধারা যদি অন্যরূপ [illegible]ত, তবে হয়তো এতো সহজে আমরা দমে যেতাম না। বজ্র-কঠোর সংকল্প [illegible] বেঁধে, উচ্চ-উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে আমাদের [illegible] [illegible]কার অতিক্রম করতে হবে। অধ্যাবসায় সহকারে যতদিন লেগে থাকি, ততদিন [illegible]মের মধ্যেই জয় রয়েছে। এইরূপ বিশ্বাস ও সাহস অবলম্বন করে থাকলে [illegible]তে নূতন যুগের অভ্যুদয় হবে।

## [illegible] ও অহিংসা—

আমার মত শত শত লোক নষ্ট হয়ে যাক, তবু সত্যের জয় হোক।

পৃথিবীর দীনতম মানুষ যা ভোগ করতে পারে না, সত্যকারের অহিংসা-ব্রতীর [illegible] আকাংখা করা অন্যায়।

মনে লোভ না থাকলে অস্ত্রের প্রয়োজন হোত না।

ক্রোধে উন্মত্ত হলে কোনই লাভ হবে না। ক্রোধ থেকে আক্রোশ জন্মে, আর [আ]ক্রোশের ফলেই বীভৎস ব্যাপার ঘটে।

ভারতবর্ষ তো পৃথিবীর উপহাসের পাত্র হয়ে উঠেছে, পৃথিবীর লোক আজ জিজ্ঞাসা করছে—আজ কোথায় তোমার অহিংসা, যে অহিংসা দ্বারা তুমি তোমার স্বাধীনতা অর্জন করেছ? আমার তো এই প্রশ্ন শুনে লজ্জায় মাথা হেঁট হয়ে যায়। স্বাধীন ভারত কি পৃথিবীকে শান্তির শিক্ষা দেবে অথবা যে হিংসায় ও ঘৃণায় পৃথিবী মৃতপ্রায় হয়ে উঠেছে, ভারতও পৃথিবীকে সেই ভয়ঙ্কর কথা শোনাবে? আমার বিশ্বাস, ভুল বোঝার ফলেই আমাদের অধিকাংশ দুঃখ উপস্থিত হয়ে থাকে। ভেবে-চিন্তে আমাদের কথা বলা উচিত, অথবা একটা কথাও বলতে নেই। আমাদের চিন্তা আমাদের কথায় ঠিক ঠিক প্রতিফলিত হওয়া চাই এবং কথা প্রতিফলিত হবে কর্মে।

অহিংসা দুর্বলের অস্ত্র নয়, সবলের শক্তি। তোমার আধ্যাত্মিকতা যেন শুধু অলস চিন্তাতেই পর্যবসিত না হয়। শত্রুর সংগে সংগ্রামের শক্তিও যেন তার মধ্যে নিহিত থাকে।

আত্মীয়-স্বজনকে অরক্ষিত অবস্থায় রেখে বিপদ থেকে দূরে পালিয়ে যাওয়া অহিংসা নয়। কাপুরুষতার চেয়ে হিংসাও বাঞ্ছনীয়।

ভালবাসার আগুনে সর্বাপেক্ষা কঠিন জিনিষও গলে যায়, যদি না গলে বুঝতে হবে আগুনের জোর কম।

শারীরিক সামর্থই শক্তির উপাদান নয়, অদম্য ইচ্ছাই তার প্রমাণ।

অস্ত্র যখন হাত থেকে ফেলে দিয়েছি, তখন শত্রুকে অন্তরের ভালবাসা ছাড়া আর কি দিতে পারি?

যারা অহিংসভাবে যুদ্ধ করে তারা অজেয়, কারণ মেশিনগান বা রাইফেলের সংখ্যার উপর তাদের শক্তি নির্ভর করে না।

মানুষকে একবার প্রাণে মেরে ফেললে সে শাস্তিকে সংশোধন করার আর উপায় থাকে না। ঈশ্বরই শুধু প্রাণ নিতে পারেন, কারণ তিনি প্রাণ দিতেও পারেন।

আমার জীবনের মূলমন্ত্রের প্রথম ও শেষ কথা অহিংসা।

অহিংসা আমার কাছে শুধু দার্শনিক তত্ত্ব নয়, এ আমার প্রাণস্বরূপ। সারা জীবনের অভিজ্ঞতায় আমার এই দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে যে, একমাত্র অহিংসার পথেই মানুষকে বাঁচানো যায়।

কেহ আমাকে চপেটাঘাত করলে তাকে ক্ষমা করার মত উদারতা যদি আমার না থাকে, তবে তাকে পাল্টা চপেটাঘাত করার একটা অর্থ হয়, কিন্তু আক্রমণকারী যদি পালিয়ে যায় এবং আমি যদি তার বন্ধুকে মারি, তবে তা আমার পক্ষে অতিশয় নীচতার কাজ। রক্তের বদলে রক্ত চাওয়া বর্বরতা, কারো ধারণা মহাভারতে প্রতি-শোধ গ্রহণের বিধান আছে। কিন্তু মহাভারতের প্রকৃত শিক্ষা হোল, বাহু বলের দ্বারা লব্ধ জয় প্রকৃত জয় নয়। পাণ্ডবদের জয় অসার বস্তু মাত্র।

অহিংসার শব্দ-গত অর্থ হোল 'বধ না করা'। কিন্তু আমার কাছে এর অর্থ আরো অনেক ব্যাপক—মহত্তর ও অসীম। এর সত্যিকারের অর্থ হোল, তুমি কাউকেই আঘাত করবে না। শত্রুর সংস্পর্শে এসেও তুমি কোন নির্মম চিন্তা মনে স্থান দেবে না। এই আদর্শে আমাদেরকে পৌঁছাতে হবে।

আমার অভিজ্ঞতা থেকে আমি উপলব্ধি করেছি যে, সত্য ছাড়া আর কোন ভগবান নেই।

আমি অহিংসাবাদী, আমি আমার শত্রুকেও ভালবাসবো। সত্য ও নির্ভীকতা কার্যকরী অহিংসার অন্তর্ভূক্ত। অহিংসাবাদী ভীরু হতে পারে না। অহিংসায় সব চেয়ে বেশী সাহসের প্রয়োজন হয়। আমরা যদি আজ অমানুষ হয়ে থাকি, তা হয়েছি, কারণ আমরা যে আঘাত করতে জানি না তা নয়, কারণ আমরা মরতে ভয় পাই।

যদি এক পক্ষ অহিংস থাকে তবে কোন হাংগামা হতে পারে না। দাংগার সময় চোখের বদলে চোখ, দাঁতের বদলে দাঁত নেবার নীতি অনুসৃত হয়ে থাকে। বোম্বাই

ও অন্যান্য অঞ্চলের সাম্প্রতিক দাংগায় তা প্রমাণিত হয়েছে। একজন হিন্দুকে হত্যা করা হলে তৎক্ষণাৎ আরেকজন মুসলমানকে হত্যা করা হয়। আবার একজন মুসলমানকে হত্যা করা হলে আরেকজন হিন্দুর জীবনান্ত ঘটে। একে উন্মত্ততা ছাড়া আর কিছু বলা যেতে পারে না। প্রতিশোধ গ্রহণ করে প্রতিকার করা চলে না। কেবলমাত্র অহিংসাই সাম্প্রদায়িক উন্মত্ততার প্রতিকার করতে পারে।

দেহ ও মনকে কার্যক্ষম রাখার জন্য যেটুকু দরকার তাই মানুষের সত্যিকারের প্রয়োজন। মানুষের একটি মাত্র করণীয় কাজ আছে, তা পরম সত্যকে আবিষ্কার করা। মানব সমাজের আর কোন কাজ নেই। তারা আর কিছু করলে নিজের ধ্বংসকেই ডেকে আনবে।

সত্য ত সূর্য অপেক্ষাও ভাস্বর, একদিন তা প্রকাশ পাবেই। সত্যকে পালিশ করার দরকার হয় না। সত্যের অতিরঞ্জন চলে না। সত্যকে খাটো করা যায় না। ছেলেরা খেলাচ্ছলে সূর্যকে আড়াল করে, কিন্তু সূর্য তাতে ঢাকা পড়ে না।

কেবল সত্যই আছে, উহা ছাড়া আর দ্বিতীয় কোনও বস্তু পৃথিবীতে নাই।... সত্যের অনুসন্ধানের উপায় বা সাধনা যেমন কঠিন, তেমনই সহজ। উহা আত্মাভিমানীর নিকট অসম্ভব বলে মনে হলেও একটি নির্দোষ বালকের পক্ষেও সম্ভব। সত্যের অনুসন্ধান যে করতে চায় তাকে ধূলিকণা অপেক্ষাও নীচু হতে হবে। জগৎ ধূলিকণাকে পিষে ফেলে কিন্তু সত্যের পূজারী যদি এমন দীন না হয় যে, ধূলিকণাও তাঁকে পিষে ফেলতে পারে, তবে স্বতন্ত্র সত্যের দর্শন দুর্লভ। বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্রের উপাখ্যানে ইহা স্পষ্ট করে দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে। খৃস্টধর্ম ও ইসলামও এই বিষয়ের প্রমাণ দেয়।

যদি আমরা সত্যাগ্রহী হই এবং নিজেদের সবল মনে করে সত্যাগ্রহ অস্ত্র ব্যবহার করি, তাহলে আমরা বলবান এই বিশ্বাসে দিন দিন আমাদের বল আরো বাড়তে থাকবে এবং আমাদের শক্তি বাড়বার সংগে সংগে সত্যাগ্রহের তেজও বাড়তে থাকবে। আর এই শক্তি যত বাড়বে ততই ইহা পরিত্যাগ করার ইচ্ছা হবে না।

সত্যাগ্রহে যদি অস্ত্র প্রয়োগের যথেষ্ট অবকাশও উপস্থিত হয়, তবুও তা সর্বোতোভাবেই পরিত্যজ্য। সত্যাগ্রহ বা আত্মিক বল এবং অস্ত্রবল একে অন্যের বিরোধী, এই দুই বল এক সংগে প্রয়োগ করা যায় না।

সত্যাগ্রহ প্রীতি-ভাজনদের প্রতিও প্রযুক্ত হতে পারে।

সত্যাগ্রহে বিরুদ্ধ পক্ষকে দুঃখ দেওয়ার চিন্তামাত্র করারও স্থান নেই। সত্যাগ্রহে নিজে দুঃখ সহ্য করে দুঃখ বহন করে বিরোধীকে বশীভূত করার ভাব থাকা চাই।

আত্ম-পরীক্ষা ও আত্ম-শুদ্ধিই অহিংস জীবন যাপনের মূল কথা।

সত্য ও অহিংসা আদিম পর্বতেরই মত পুরাতন।

হিংসা যেমন পশুর ধর্ম, অহিংসা তেমনই মানুষের ধর্ম। সেই জন্যই আমি আত্মত্যাগের প্রাচীন ধর্ম ভারতের সম্মুখে উপস্থাপিত করেছি।

প্রেমময় ঈশ্বরের উপর যাদের জীবন্ত বিশ্বাস আছে, অহিংসা দ্বারা তারা অসাধ্য সাধন করতে পারে।

অহিংসা ও সত্য এমন ওতঃপ্রোতভাবে রয়েছে যে, উহা একটি টাকার এপিঠ ও ওপিঠের মত। যেদিকেই ওলটাও, টাকা টাকাই থাকবে।

অহিংসাকে সাধন ও সত্যকে সাধ্য বলে জানবে। সাধন আমাদের হাতের জিনিষ, এই জন্যই শাস্ত্রে উক্ত হয়েছে—'অহিংসা পরম ধর্ম'।

সত্যাগ্রহের অর্থ হোল সত্যের প্রতি অনুসন্ধিৎসা। সত্যই ভগবান। অহিংসার আলোকে সত্য প্রতিভাত হয়। স্বরাজ হোল এই সত্যেরই একটি অংশ।

সর্বাবস্থায় লোকের সত্য কথা বলবার সাহস থাকা চাই—সত্য কথা যাদের বিরুদ্ধে, তাদের সামনেই উহা বলতে হবে।

আমাদের অন্তরে যে বাণী ধ্বনিত হচ্ছে, তাই সত্য। সত্য স্বপ্রকাশ। যখনই আমরা তার চারিদিকের মাকড়সার জাল উন্মোচন করবো, তখনই তা স্বচ্ছরূপে দীপ্তি পেতে থাকবে।

অহিংসা ব্যতীত সত্যানুসন্ধান অসম্ভব। তাই অহিংসাই সত্যানুসন্ধানের ভিত্তি।

সত্য ব্যতীত কোন নিয়মেরই শুদ্ধ পালন অসম্ভব। সত্য উপলব্ধি হলে সু ও কু সর্বপ্রকারের প্রবৃত্তি অতি সহজেই বশীভূত হয়।

**ধর্ম ও ঈশ্বর—**

মনের ময়লা দূর করার জন্য উপাসনা হচ্ছে ঔষধ।

সকলকে নির্ভীক হতে হবে, ধর্ম ত্যাগের বদলে মৃত্যুকে বরণ করতে হবে।

জগতের সমস্ত শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ করলেও তুমি ধর্মের সন্ধান পাবে না। ধর্মকে বুদ্ধি দিয়ে ধারণা করা যায় না, অন্তর দিয়ে বুঝতে হয়।

ধর্ম ছাড়া রাজনীতি অর্থহীন।

শুধু একজন আছেন, যাঁকে আমরা ভয় করবো, তিনি ভগবান। মানুষ যত উচ্চ পদেই থাক না কেন, তাকে আমরা ভয় করবো না।

আমি জানি কোন দিনই ভগবানকে জানতে পারবো না, যদি না আমি অন্যায়ের

বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে পারি। সেজন্য প্রয়োজন হলে জীবন দিতেও হতে পারে। আমি যত পবিত্র হবার চেষ্টা করবো, তত বেশী ভগবানের নিকটতম বলে উপলব্ধি করবো।

প্রকৃতপক্ষে সকল ধর্ম-ই সমান। বিভিন্ন ধর্ম একই বৃক্ষের বিভিন্ন পত্র। হিন্দু-মুসলমান খৃস্টান প্রভৃতিতে কোন বিরোধের কারণ থাকতে পারে না।

খৃস্টান ধর্ম ও ইসলাম প্রগতিশীল, আর হিন্দু ধর্ম স্থিতিশীল···বা পশ্চাদমুখী, একথা আমি মানি না। বস্তুতঃ কোন ধর্মেই আমি নিশ্চয়াত্মক কোন প্রগতি দেখতে পাই না। পৃথিবী তো আজ কশাইখানায় পরিণত হয়েছে। বিভিন্ন ধর্ম যদি প্রগতি-শীল হবে, তবে কি দুনিয়া এমন কশাইখানা হোত?

ভগবান আমাদের অন্তরে আছেন, আমাদের মাথার উপর আছেন, আমাদের চারিপাশে বিরাজমান। তিনি কাবাতেও নেই, কাশীতেও নেই—আমাদের প্রত্যেকের মধ্যেই তিনি বিরাজমান। যদি আমরা আমাদের চিত্তবৃত্তিকে অন্তর্মুখীন করতে পারি, তবে আমরা তাঁকে উপলব্ধি করতে পারবো। আমাদের অন্তরে স্বর্গীয় সংগীত অবিরাম ধ্বনিত হচ্ছে। মৌন থাকার অন্তর্নিহিত অর্থ হচ্ছে, যে মৃদু কণ্ঠ আমাদের অন্তরে সদাই কথা বলছে, তাকে শোনার চেষ্টা করা। আমি সেই অন্তরের একটি অংশ।

গাছে অগণিত পাতা, কিন্তু মূল তাদের সবারই এক। তেমনি ভগবান এক হলেও যত জীব তত শিব বা ধর্ম—যদিও পাতার মত সবার মূল সে একই। লোকে বিভিন্ন ধর্ম প্রবর্তক বা পয়গম্বরের, তথা তাঁদের প্রবর্তিত ধর্মের অনুসরণ করে থাকে বলে এই সহজ সত্য তাদের কাছে ধরা পড়ে না।

সমগ্র দেশবাসীও যদি একই ধর্মাবলম্বী হয়, তথাপি রাষ্ট্র-ধর্ম বলে কোন ধর্ম হতে পারে তা আমি বিশ্বাস করি না। ধর্ম নিছক ব্যক্তিগত ব্যাপার। রাষ্ট্র হতে ধর্ম পৃথক থাকবে। যত মত তত পথ। এই হেতু কোন অবস্থাতেই ধর্মে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ বাঞ্ছনীয় নয়। প্রত্যেক মানুষেরই ভগবান সম্পর্কে নিজের বিশেষ ধারণা আছে। রাষ্ট্র থেকে কোন ধর্ম প্রতিষ্ঠানে সাহায্য দানের আমি বিরোধী।

ইসলাম বলপূর্বক ধর্মান্তকরণ ও নারী-নির্যাতন অনুমোদন করে না।

ইসলাম বা অন্য কোন ধর্ম যেদিন বাহিরের সমালোচনায় অধৈর্য হয়ে উঠবে, সেদিন ওই ধর্মের পক্ষে দুর্দিন।

সৃষ্টিকর্তাকে ভয় করতে শিখলেই লোকভয় দূর হবে। নিজে ভয় না পেয়ে কেউ কারুর মনে ত্রাসের সঞ্চার করতে পারে না।

সকল হিন্দুই যদি খারাপ হয়, তবে হিন্দু ধর্মই খারাপ, আর সকল মুসলমানই যদি খারাপ হয়, তবে মুসলমান ধর্ম-টাই খারাপ। কিন্তু হিন্দু ধর্মও খারাপ নয়, ইসলাম ধর্মও খারাপ নয়। যিশুখৃস্ট বলেছিলেন যে, একমাত্র তিনিই তাঁর শিষ্য, কারণ তিনিই কেবল তাঁর মত কাজ করেন। যাঁরা শুধু তাঁকে 'প্রভু' 'প্রভু' বলে তারা তাঁর শিষ্য নয়। সকল ধর্মের ব্যাপারেই একথা খাটে।

বলপ্রয়োগ দ্বারা কল্‌মা উচ্চারণ করলেই মুসলমান হয় না, ইহা শুধু ইসলামের লজ্জার কারণ হয়।

ঈশ্বরে যাঁর গভীর বিশ্বাস আছে, তিনি দুর্বল হলেও প্রকৃত শক্তিমান, দরিদ্র হলেও আধ্যাত্মিক সম্পদে সম্পদশালী।

যাদের মুখে মধু, অন্তরে বিষ, তাদের প্রার্থনা যতই আন্তরিক হোক্, তা ঈশ্বরের কাছে পৌঁছায় না।

ঈশ্বরের সেবা যিনি করেন, ঈশ্বর আপনিই তাঁর হৃদয়ে আসন গ্রহণ করেন।

আমি নিজে কোরাণ পাঠ করেছি। কোরাণ কোথাও অমুসলমানদের হত্যা করবার কথা বলেনি। সকল মানুষের প্রতি ন্যায় বিচার করবার শিক্ষাই কোরাণ দিয়েছেন। কিন্তু সকল মুসলমান সেই শিক্ষা অনুযায়ী চলে না। সকল হিন্দুই কি গীতা বা বেদের শিক্ষা অনুযায়ী চলে থাকে? ইহাতে কি গীতা বা বেদের মহিমা খর্ব হয়। * কতিপয় মুসলমানের অপকার্যের জন্য কোরাণের মহিমা খর্ব হবে কেন? কোনও ধর্ম-শাস্ত্রের অনুগামীদের মধ্যে যদি কিছু লোক সাময়িকভাবে উন্মাদ হয়ে পড়ে, তবে সেই ধর্ম শাস্ত্রের প্রতি বিরাগ পোষণ করা ভুল।

দেহ-মন-প্রাণ ঐকান্তিকভাবে নিপীড়িতের সেবায় নিয়োজিত করতে পারলে তবেই প্রকৃত ভক্ত হওয়া যায়।

সকলের অপেক্ষা নীচ-অধম-দীনের মধ্যেই ভগবানের আসন সুপ্রতিষ্ঠিত।

প্রার্থনা বলতে ঈশ্বরের মহিমা এবং বিভূতি-কীর্তন করাই বোঝায়।

রাম-কৃষ্ণ-রহিম-গড্ প্রভৃতি যে কোন নামেই ঈশ্বরকে উপাসনা করা যায় এবং তাতেই তিনি সন্তুষ্ট হন।

বোবা কি তোত্‌লা, অজ্ঞান কি নির্বোধ, উপাসনায় সকলেরই সমান অধিকার আছে।

সত্য কথাটির মূল শব্দ 'সৎ' অর্থাৎ সার বস্তু। যা সত্য নয় তার অস্তিত্ব নেই। তাই ঈশ্বরের পরিচয় সৎ বা সত্য। ঈশ্বরই একমাত্র সত্য একথা না বলে সত্যই ঈশ্বর বলাই উচিত। সত্যপথে চললেই 'পবিত্র-জ্ঞান' বা প্রজ্ঞার উন্মেষ হয়।

ঈশ্বরকে তাই আমরা প্রজ্ঞা বা চিৎ বলেও জানি। প্রজ্ঞার উন্মেষ হলেই আনন্দের সৃষ্টি হয়। সত্য যেমন অনির্বাণ, আনন্দও তেমনি অক্ষয়। ঈশ্বর এই সৎচিৎ-আনন্দেরই সমন্বয়-মূর্তি।

ঈশ্বর-মার্গে কাপুরুষের স্থান নেই, কিংবা পরাজয়ের গ্লানি নেই।

ভগবান মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এবং সেই জন্য ভগবানকে মানুষ ধন্যবাদ না দিয়ে থাকতে পারে না। এই ধন্যবাদেরই নামান্তর প্রার্থনা। প্রার্থনা আমাদেরকে নির্ভীক করে তোলে। ঈশ্বর-উপলব্ধির অর্থই হোল পৃথিবীর সকল ভয় থেকে মুক্তি। প্রার্থনা আমাদের অন্তরের সমস্ত অন্ধকার দূর করে, আমরা যথার্থ দৃষ্টি লাভ করতে সক্ষম হই।

প্রার্থনা জানিয়ে কোন কাজে নামলে সকল বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে শেষে সাফল্য লাভ করা যায়।

মানুষ সামাজিক জীব, অতএব প্রার্থনার ব্যবস্থা এমন হওয়া উচিত যে, সকলে দলে দলে তাতে অনায়াসে যোগ দিতে পারে। লোকে যে-সব কাজ করে তা ব্যক্তি বিশেষের জন্য নয়, সমগ্রভাবে সমাজের কল্যাণের জন্যই করে। সমাজের জন্যই মানুষ। সেজন্য সমাজের মধ্যেই মানুষকে প্রার্থনা করতে হবে এবং প্রার্থনায় যা-কিছু পাওয়া যায় সকলে মিলেই তা গ্রহণ করতে হবে। সমবেত প্রার্থনায় লোকের মনে শান্তি, ঐক্য ও শৃঙ্খলাবোধ আসে। শান্তি, ঐক্য ও শৃঙ্খলা বজায় রাখা দেশবাসীর পক্ষে আজ বিশেষ প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।

মনে রেখো, মানুষের সব চেয়ে বড় পাপ ভগবানকে ভুলে থাকা।

দেহের প্রয়োজন যেমন খাদ্য, আত্মার প্রয়োজনও তেমনি উপাসনা। উপাসনা ব্যতীত প্রকৃত শান্তি আসতে পারে না।

ভগবানই জীবন, সত্যই আলোক, তিনিই প্রেম, তিনিই পরম কল্যাণ।

ইন্দ্রিয় দ্বারা যা প্রত্যক্ষ করা যায়, তার কিছুই চিরস্থায়ী নয়। একমাত্র ঈশ্বরই চিরস্থায়ী।

বিধাতার উদ্দেশ্য নিরূপণের শক্তি কারুরই নেই, সেই অসীম করুণার সমুদ্রে আমরা বিন্দুমাত্র।

ঈশ্বরলাভের পথ বীরের জন্যই, ভীরুর জন্য নয়।

কোন মঙ্গলই পূর্ণ শুভ নিয়ে ঈশ্বরের কাছ থেকে আসে না, বার বার চেষ্টা করে অনেক বিফলতার ভিতর দিয়ে তাকে পরিপূর্ণ করে তুলতে হয়।

আমি মৃত্যুর মধ্যেও জীবনের, অসত্যের মধ্যেও সত্যের, অন্ধকারের মধ্যেও

আলোকের অস্তিত্ব দেখতে পাই। সুতরাং আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, ভগবানই জীবন, সত্যই আলোক—তিনিই প্রেম, তিনিই পরম কল্যাণ।

প্রলোভনের মাঝে যুক্তি কার্যকরী হয় না। বিশ্বাসই আমাদের রক্ষা করে। যারা মদ খায় তাদেরও যুক্তি থাকে, সেখানে ভ্রান্ত-যুক্তি। যুক্তি প্রেরণার অনুসরণ করে। অনেক সময় আইনজীবীরা বিরোধী পক্ষের যুক্তি এমনভাবে প্রদর্শন করে যে মনে হয়, তাঁদের প্রত্যেকেই ঠিক বলছেন। কিন্তু তথাপি তাঁদের একজন নিশ্চয়ই ভ্রান্ত, হয়তো দু'জনেই। অতএব, যুক্তির আক্রমণ প্রতিরোধ করতে পারে নীতি ও সত্যের উপর বিশ্বাস।

নীতির চির স্থায়িত্ব বলে কিছু নেই। আমাদের মত অসম্পূর্ণ মানুষের পক্ষে আপেক্ষিক নীতিবাদই যথেষ্ট। ডাক্তারের কথামত ঔষধ হিসাবে ছাড়া মদ খাওয়া নিছক দুর্নীতি। নিজের স্ত্রী ছাড়া আর কারুর পানে কামজ চোখে তাকানোও অন্যায়। কিন্তু এই উভয় অবস্থাই যুক্তি দিয়ে সমর্থন করা যায়। বিরোধী যুক্তিও আছে। ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কেও অনেক বিরোধী যুক্তি আছে। বিশ্বাস থেকে যে যুক্তি সঞ্জাত হয়, তাই আমাদের আত্মরক্ষার চিরন্তন দুর্গ। আমার বিশ্বাস আমাকে অনেক পতন থেকে রক্ষা করেছে এবং এখনও রক্ষা করে। এখনও আমাকে বিপথে চালিত করেনি। বিশ্বাস কখনও কারুর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে বলে আমি জানি না।

**সমাজ-নীতি—**

অস্পৃশ্যতা আমি হিন্দুধর্মের সকলের চেয়ে বড় কলংক বলে মনে করি।

হিন্দু হয়ে যে জন্মেছে তাকে পতিত বা অস্পৃশ্য মনে করাই পাপ। এরূপ মনে করা শয়তানি ছাড়া আর কিছু নয়। সেইজন্যই আমি ক্রমাগত বলে আসছি যে, অস্পৃশ্যতা একটা মহাপাপ।

অস্পৃশ্যতা হিন্দু ধর্মের অংগ নয়।

অস্পৃশ্যতা অনুমোদন করে হিন্দু ধর্ম পাপ করেছে। এর ফলে আমাদের অধঃপতন হয়েছে। তাই বৃটিশ সাম্রাজ্যে আজ আমরা 'পারিয়া', এমন কি মুসলমানরা পর্যন্ত এই অধর্মের স্পর্শদোষে দুষ্ট এবং দক্ষিণ আফ্রিকায়, পূর্ব্ব আফ্রিকায়, ক্যানাডায় হিন্দুর ন্যায় মুসলমানরাও 'পারিয়া' বলে গণ্য। এই সমস্তই অস্পৃশ্যতারূপ পাপের বিষময় ফল।

যতদিন পর্যন্ত হিন্দুরা জেনেশুনে অস্পৃশ্যতাকে তাদের ধর্মের অংগ বলে মনে করবে, যতদিন পর্যন্ত বেশীর ভাগ হিন্দু তাদেরই একদল ভাইকে স্পর্শ করা পাপ বলে

মনে করবে, ততদিন পর্যন্ত স্বরাজ পাওয়া অসম্ভব। যুধিষ্ঠির তাঁর কুকুরটিকে সংগে না নিয়ে স্বর্গে প্রবেশ করতে পর্যন্ত অস্বীকার করেছিলেন, আর যুধিষ্ঠিরের বংশধরগণ কি আশা করতে পারেন যে, অস্পৃশ্যদের বাদ দিয়ে তাঁরা স্বরাজ পাবেন? যে সকল দুষ্কৃতির জন্য আমরা গবর্নমেণ্টকে শয়তান আখ্যা দিয়ে থাকি, তার মধ্যে কোন্ অন্যায়টা আমরা আমাদের অস্পৃশ্য ভাইদের প্রতি করিনি?

অস্পৃশ্যতা হিন্দুধর্মের অংগ নয়, অধিকন্তু হিন্দু ধর্মের মধ্যে প্রবিষ্ট একটা পচনশীল পদার্থ, একটা ভ্রম ও একটা পাপ। সুতরাং উহার মূলোৎপাটন করা প্রত্যেক হিন্দুরই ধর্ম ও পরম কর্তব্য। প্রত্যেক হিন্দুর উহাকে পাপ মনে করে প্রায়শ্চিত্ত করা উচিত।

অস্পৃশ্যতা বিনাশ না হলে হিন্দুধর্ম অচিরেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে।

হরিজনদের অপবিত্র মনে করার অর্থ-ই হচ্ছে ভগবানকে অপবাদ দেওয়া।

যতদিন :হিন্দুর পবিত্র ধর্ম অস্পৃশ্যতার গ্লানিতে কলংকিত থাকবে, ততদিন স্বাধীনতা পাবার যোগ্যতা তাদের হবে না।

যেদিন অস্পৃশ্যতা প্রকৃতই দূর হয়ে যাবে। সেদিন আর কোন পৃথক পৃথক জাতি থাকবে না। কিন্তু যতদিন জাতিভেদ প্রথা প্রচলিত থাকবে ততদিন অস্পৃশ্য-দের মনে বর্ণ-হিন্দুতে পরিণত হবার অভিলাষ থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু তা'তো সম্ভব নয়। কারণ এরকম চেষ্টার ফলে বর্ণ-হিন্দু ও তপশীলিদের মধ্যে সংগ্রাম দেখা দেবে। কিন্তু যখন জাতিভেদই থাকবে না, তখন সবাই কেবলমাত্র হিন্দু বলে পরি-চিত হবে। অস্পৃশ্যদের প্রতি আমাদের এই কর্তব্য যে, নিজেদের মধ্যে সমস্ত বৈষম্য দূর করে হিন্দু ধর্মের আচার প্রতিপালন করা এবং নিজেদের মধ্যে পৃথক ব্যবস্থার দাবী না করে বিশাল হিন্দুসমাজ-সমুদ্রে নিজেদের মিশিয়ে দিতে চেষ্টা করাই তাঁদের কর্তব্য। আজাদ-হিন্দুস্থান লাভের এই একমাত্র উপায়।

বর্ণ হিন্দুরা যখন ঘোষণা করেন, তাঁরা অস্পৃশ্যতা বর্জন করেছেন, তখন তাঁদের সে ঘোষণাও যেন অকপট হয়। সত্যি সত্যি তাঁদের দেখতে হবে যে, অস্পৃশ্যরা যে কাজ করে তারা তার যে কোন বৃত্তি গ্রহণ করতে সক্ষম এবং প্রস্তুত। প্রয়োজন হলে ভাংগীর কাজ করতেও তাঁদের প্রস্তুত হওয়া উচিত। অবশ্য যাতে স্বাস্থ্যসম্মত ও পরিচ্ছন্নভাবে সে কাজ করা যায় তার ব্যবস্থাও করতে হবে। ইউরোপে আমি ভাংগীদের সম্পূর্ণ পরিচ্ছন্নভাবে মানুষের মলমূত্র সরাতে দেখেছি। তাদের বেতের ঝুড়ি দেওয়া হয়। তার মধ্যে তারা মলমূত্রের ভাণ্ড বহে নিয়ে যায়। এভাবে কাজ করলেও অস্পৃশ্যরা অন্যান্যের সংগে একই বাড়ীতে বাস করতে পারবে ও সমান সুবিধা ভোগ করতে পারবে।

যাদের আমি অচ্ছুৎ বলি, তাদের মধ্যে এসে আমি সুখী হয়েছি। এদের সংগে আমি এক, বরং অচ্ছুৎদের মধ্যে আমি নিম্নতম। জাতিভেদে আমি বিশ্বাস করি না। তাই হিন্দু সমাজের সিঁড়ির সকলের নীচের ধাপে আমি স্থান নিয়েছি। আপনারা সকলেই তাই করুন। তাহলে আর মন্দির প্রবেশ, সার্বজনীন ভোজ ও অস্পৃশ্যতা প্রভৃতি সমস্যার কোন অবকাশ থাকবে না। যখন জাতির জন্য কোন মানুষের বিরুদ্ধে কোন বিধি-নিষেধ প্রয়োগ করা হবে না, একমাত্র তখনই অস্পৃশ্যতা সম্পূর্ণ রহিত হয়েছে বলে গণ্য হবে। অস্পৃশ্যতারূপ দানবের চূড়ান্ত পরাজয়ের পূর্বে সার্বজনীন সামাজিক ভোজ সর্বত্র প্রচলিত হওয়া উচিত। ইংরাজদের চোখের সামনে যেরূপ নিশ্চিতভাবে বৃটিশ শাসনের অবসান ঘটেছে, তাদের যদি সে শাসন সম্পূর্ণ ধ্বংস নাও হয় তাহলেও বৃটিশ জাতি তার সুনাম হারাতে বাধ্য। তেমনি অস্পৃশ্যতার বিনাশ না হলে হিন্দু ধর্মের ধ্বংস হবে।

অস্পৃশ্যতা বর্জনের অর্থ ইহা নয় যে, আহার ও বিবাহাদি বিষয়ে সব একাকার হয়ে যাবে। একে অপরকে স্পর্শ করতে যে ঘৃণাবোধ করে, আমি কেবল তাই দূর করতে চাই। এবং অস্পৃশ্য জাতিরা যাতে সমাজে মানুষের উপযুক্ত সম্মান ও মর্যাদা লাভ করে, আমি সেই চেষ্টাই করছি। কিন্তু এই আন্দোলনসূত্রে কেউ যদি অপরের আহার কিম্বা বিবাহ সম্বন্ধীয় নিয়ম নষ্ট করতে উদ্যত হয়, তবে তিনি তাতে সাহায্য বা সহানুভূতি করতে পারেন না।···আহার শারীরিক ক্রিয়া মাত্র, ইহা এমন কিছু সাধু বা পবিত্র কার্য নয় যে, দশজনকে উহা দেখিয়ে করতে হবে। আমি মনে করি পুত্রের হাতেও পিতা খেতে বাধ্য নয়। মলমূত্রাদি ত্যাগ যেমন লোকে গোপনে সম্পাদন করে থাকে আহারও সেইরূপ গোপনে করা ভালো। সেইরূপ বিবাহ ব্যাপারটি ভোগের ব্যাপার নয়। বিবাহ দ্বারা ভবিষ্যৎ বংশ উৎপন্ন হয়ে থাকে। তা নিয়ে যথেচ্ছাচার করলে ভবিষ্যৎ বংশের অমংগল হবে। সেইজন্য বহু অভিজ্ঞতার ফলে বিবাহ সম্বন্ধে সমাজে যে যে নিয়ম প্রবর্তিত হয়েছে তা কখনই না বুঝে পরিবর্তন করা যুক্তিসিদ্ধ নয়।

হিন্দুরা যেন আত্মপ্রতারণা না করে ভাবে যে, তাদের পক্ষ হতে সবই ভালো চলছে। নিষ্ঠাবান হিন্দু হিসাবে আমি মনে করি যে, আমরা যদি এরূপ ভাবি তাহলে তা মূর্খের স্বর্গবাস-চিন্তারই সামিল হবে।

যদি ভারতের হিন্দু-মুসলমান ও অন্যান্য সম্প্রদায় পরস্পরের বন্ধুরূপে বসবাস করতে আরম্ভ করে এবং পুলিশ ও সৈন্যদলকে কোন ক্ষেত্রেই আর অস্ত্র ব্যবহার করতে না হয়, তবে কতই না আনন্দের বিষয় হবে! সর্বক্ষেত্রে আমরা গুণ্ডাদের

য়াষ দিতে অভ্যস্ত, কিন্তু আমরাই এ সকল গুণ্ডা সৃষ্টি করেছি এবং তাদের উৎসাহ দিয়েছি। প্রত্যেকটি অপকার্যের দায় গুণ্ডাদের উপর চাপানো ঠিক নয়।

আমাদের প্রত্যেকের অন্তরে আছে সেই পরশপাথর, তার স্পর্শে চিত্ত পবিত্র হয়।

হিন্দু ও মুসলমান এক জাতি রূপেই বাস করুক আর দুই জাতি রূপেই বাস করুক, তাদেরকে প্রতিবেশীরূপেই বাস করতে হবে। হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায় যদি প্রীতি বজায় রেখে এক সংগে বাস করতে না পারে, তবে তারা হিন্দুস্থান ও পাকিস্তান কোনটাই পাবে না।

পাকিস্তান বলতে মুসলমান প্রধান প্রদেশে যদি কেবলমাত্র মুসলমানদের ও হিন্দু-প্রধান প্রদেশে কেবলমাত্র হিন্দুদেরই স্বাধীনতা বুঝায় তো তা কখনই গ্রাহ্য হতে পারে না। বিহারে হিন্দুরা স্বাধীন আর মুসলমানরা হিন্দুদের দাস হবে কেন? অথবা মুসলমানেরা বাংলার বাদশাহ এবং হিন্দুরা মুসলমানের নফর এরূপই বা হবে কেন?

নিজের ধর্মের জন্য যিনি যতটা শ্রদ্ধা পোষণ করেন, অন্যের ধর্ম-বিশ্বাসের উপরও তাঁর ততটা শ্রদ্ধা থাকা চাই।

হিন্দু-মুসলমান ও পার্শীগণ একই মাতৃভূমির সন্তান, অতএব নিজেদের পূর্ণ ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠার দায়িত্বও তাদের রয়েছে।

প্রেম যদি জীবনের নীতি না হোত, তাহলে শত শত মৃত্যুর মধ্যে জীবন বলে কোন কিছুরই অস্তিত্ব সম্ভব হোত না।

আমার দেশে হিন্দু মুসলমানকে ভয় করে আবার মুসলমান হিন্দুকে ভয় করে। আমাদের এতদূর অধঃপতন হয়েছে যে, নিজের ছায়া দেখলেই আমরা ভয়ে আঁতকে উঠি।

আত্মরক্ষার জন্য হিন্দু বা মুসলমান কোন সম্প্রদায়কেই আমি অস্ত্র দিতে রাজী নই। কারণ ইহা তো বর্বরতার চিহ্ন মাত্র। ঈশ্বরের প্রতি জীবন্ত বিশ্বাস এবং সেই বিশ্বাসপ্রসূত দৃঢ় মনই আপনাদের অস্ত্র।

গ্রামে গ্রামে ভারতবর্ষের আদর্শে নূতন পল্লী সমাজ গড়তে হবে। উভয় সম্প্রদায়ের যারা শত শত বৎসর পাশাপাশি বাস করছে, কোন প্রলয়-পাপবুদ্ধি তাদেরকে চিরন্তন শত্রুতে পরিণত করতে পারে না। দুর্যোগের কালে প্রতিবিধান করো, কিন্তু দূরদৃষ্টি যেন আচ্ছন্ন না হয়।

যে লোক স্বেচ্ছায় নিজের দোষের কথা পরিষ্কার করে অন্যের কাছে বলে এবং আর না করার প্রতিজ্ঞা করে সে সবচেয়ে পবিত্র প্রায়শ্চিত্ত করে।

কর্মীদের মন থেকে মৃত্যুভয় দূর করতে হবে, এবং যারা বিরোধীতা করবে তাদের চিত্ত জয় করতে হবে। এই চেষ্টার ফলে হয়তো কয়েকজনকে প্রাণ হারাতেও হতে পারে।

পূর্ববংগে যদি একজন হিন্দুও থাকে তাহলে তাকে আমি বলবো—সাহস অবলম্বন কর, এবং মুসলমানদের মধ্যে গিয়ে বাস কর। যদি মরতে হয় তো বীরের মতই মর। বিনা যুদ্ধে মরার মত অহিংসা-শক্তি যদি তোমার থাকে, তবে বিস্ময়ে তারা তোমার স্তুতি করবে। গুণ্ডারা যুক্তি মানে না, কিন্তু সাহস মানে, সে যদি বুঝতে পারে যে, তুমি তাদের চেয়ে সাহসী তবে সে তোমাকে সম্মান করবে।

অপমান ও নির্যাতন ছাড়া যদি আর কোন গতি না থাকে, তবে পুরুষ ও নারী সকলের অন্তরে মৃত্যুবরণ করার মত সাহস ও নির্ভীকতার সঞ্চার করুন। তবেই হিন্দুরা পূর্ববংগে থাকতে পারবে, নচেৎ নয়।

যারা মার খাচ্ছে তারা যেমন মৃত ও কাপুরুষ, আর যারা মারছে তারাও তেমনি মৃত ও কাপুরুষ। উভয়ের মধ্যেই দু'রকম ভীতি বর্তমান আছে।

যে মানুষ নিজে চোখের জল ফেলে, সে পরের চোখের জল মোছাতে পারে না।

**বিবাহ—**

ভিন্ন ধর্মাবলম্বী নরনারীর মধ্যে বিবাহ হলে পর তাদের সাদরে বরণ করে নেওয়াই কর্তব্য।

পুরুষ বা নারী জীবনে একবার মাত্র বিবাহ করবে, এই সাধারণ নিয়ম হওয়া চাই। তথাকথিত উচ্চ জাতির স্ত্রীলোকেরা লোকাচারের দরুণ অনিচ্ছায় বৈধব্য জীবন যাপন করতে বাধ্য হন। কিন্তু পুরুষদের একাধিক বিবাহে আদৌ বাধা নেই। ইহা কলংকের কথা। সমাজে যতদিন এই আচার চলবে ততদিন বাল-বিধবা বা যুবতী বিধবাদের আমি বিবাহ দিতে বলবো। নরনারীর মধ্যে কেউ কারুর ছোট বা বড় নয়। অতএব অধিকারও নরনারীর সমান।

যারা জাতির সেবা করতে চায় অথবা ধর্মজীবনের আস্বাদ পেতে চায় তাদেরকে ব্রহ্মচর্য পালন করতে হবে—বিবাহিতই হোক আর অবিবাহিতই হোক। বিবাহ নারী ও পুরুষকে পরস্পরের সান্নিধ্যে আনে, দু'জনের মাঝে এক বিশেষ ধরণের বন্ধুত্ব স্থাপিত হয় যা ইহ-জীবনে ও পরকালেও অবিচ্ছেদ্য। আমাদের বিবাহের যে সংজ্ঞা আছে তাতে কামনার কোন স্থান থাকা উচিত নয়।

**নারী—**

স্ত্রীলোকদের সাহসী হতে হবে।...ভারতের নারী অবলা নয়। বীরত্বের জন্য

তারা খ্যাতি অর্জন করেছে। সে বীরত্ব কোন তরবারি বা অস্ত্র ব্যবহার নয়। যে বীরত্ব নৈতিক সাহস ও চরিত্রের পবিত্রতার মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে। নোয়াখালিতে যা ঘটেছে তার জন্য নোয়াখালির পুরুষেরাই দায়ী নয়, নোয়াখালির নারীরাও দায়ী। সীতা ও দ্রৌপদীর আদর্শ অনুসরণ কর। সীতা ও দ্রৌপদীর ভগবানে অটুট বিশ্বাস ছিল। তাই কোন দুর্বৃত্তই তাঁদের মর্যাদা নষ্ট করতে পারেনি।···কাপুরুষতা প্রদর্শন করার চেয়ে হিংসার স্থান লওয়া অনেক ভালো।···দুর্বৃত্তের নিকট আত্মসমর্পণ করার পূর্বে নারীদিগকে আত্মবিসর্জন করতে হবে। নারীই হোক আর পুরুষই হোক মৃত্যুকে তুচ্ছ করার মত আত্মিক শক্তি তাদেরকে সঞ্চয় করতে হবে।

নারী পুরুষের চিরসংগিনী। পুরুষের ন্যায় তাদেরও মানসিক বৃত্তি সমস্ফুর্ত। পুরুষের কর্মক্ষেত্রের প্রতি স্তরে হস্তক্ষেপের এবং পুরুষের ন্যায় স্বাধীনতা ভোগের অধিকারও তাদের আছে।

বর্বর যে সব মানুষ স্পর্ধাভরে আপনাকে মুসলমান, হিন্দু অথবা অন্য কোন নামে অভিহিত করছে, তাদের কসাই বৃত্তির সামনে অসহায় দর্শকের মত যেন ঈশ্বর আমাকে না রাখেন।

আইন অনুসারে পুরুষের যে সকল অধিকার আছে, নারীরও তা থাকা উচিত। পুত্র-কন্যার সহিত ব্যবহারে আমাদের কোন পার্থক্য থাকা উচিত নয়।

পর্দা টেনে অথবা অন্য কোন কৃত্রিম উপায়ে সতীত্ব বাঁচান যায় না। উহা অন্তরের অন্তস্থলের জিনিষ, বাইরে থেকে তা আরোপ করা চলে না। যে সতীত্ব পুরুষের দৃষ্টি সহ্য করতে পারে না তা অতি দুর্বল সতীত্ব।

সংসারের কাজে সারাদিন নষ্ট করা মেয়েদের উচিত নয়।

পুরুষকে নারী তার বন্ধু মনে না করে প্রভু ও কর্তা বলে মনে করতে শিখেছে। কংগ্রেসসেবীগণকে ভারতীয় নারীদের হাত ধরে তুলতে হবে। ইহা তাদের গৌরবময় অধিকার।

মাদক নিবারণের চিকিৎসক, স্ত্রীলোক ও ছাত্রদের একটি বিশেষ সুবিধা আছে। তাঁদের সপ্রেম সেবার দ্বারা তাঁরা অতি সহজেই নেশাখোরদের চিত্তজয় করতে পারবেন।

চরকা কাটার সমস্ত দায়িত্ব মেয়েদের উপরেই বর্তেছে, আগের যুগে যেমন ছিল। দু'শো বছর আগে ভারতের মেয়েরা কেবল নিজের দেশের জন্যই সুতো কাটতো না, বিদেশের জন্যও কাটতো।···ভারতের নৈতিক ও আর্থিক স্বাধীনতা মেয়েদেরই হাতে। ভারতের ভবিষ্যৎ তাদের হাতে, কারণ তারাই ভবিষ্যৎ বংশধরদের মানুষ করবে। তারা ভারতের ছেলেমেয়েদের সরল, ভগবৎ-বিশ্বাসী সাহসী নরনারী

রূপে গড়ে তুলতে পারে।...এই সব মেয়েদের অনেকেই দিনে এক আনা রোজগার করতে পারে না, তাদের জন্যই আমি চরখা ও ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে পথে পথে ঘুরছি।

আমার নিকট ইহা পরিষ্কার যে, সম্মতি বা স্বাধীন ইচ্ছার দোহাই দিয়া এক সম্প্রদায়ের স্ত্রীলোকের ভিন্ন ধর্ম গ্রহণ বা ভিন্ন ধর্মের লোকের সহিত বিবাহ স্বীকৃত হতে পারে না। কারণ চারিদিকে যখন জোর জুলুমের তাণ্ডব চলছিল তখন সম্মতি ও স্বাধীন ইচ্ছার কথা বলা ত শব্দের অপব্যবহার করা।

আমার মতে নারী ও পুরুষের মধ্যে মূলতঃ কোন বিভেদ নেই, সুতরাং তাদের সমস্যাও মূলতঃ এক। উভয়ের মধ্যে একই প্রাণশক্তি, একই অনুভূতির ধারা প্রবাহমান। একে অপরের পরিপূরক। একজন আরেকজনের সক্রিয় সাহায্য ছাড়া বাঁচতেই পারে না।

তবু যে করেই হোক, পুরুষ নারীকে পদানত করে রেখেছে, ফলে নারীর মনেও একটা হীনতা-বোধ জন্মেছে। নারী পুরুষের চেয়ে হীন—এই দুরভিসন্ধিমূলক প্রচারে নারীর সহজ বিশ্বাস বিদ্রোহ করেনি। কিন্তু পুরুষের মধ্যে যাঁরা মহাপুরুষ, যাঁরা ঋষি তাঁরা উভয়েরই সমান অধিকার স্বীকার নিয়েছেন।

দু'জনের মধ্যে কোথাও কোথাও যে পার্থক্য আছে তাতে সন্দেহ নেই, উভয়ের মূলগত ঐক্য সত্য হলেও উভয়ের অনৈক্যগুলি মিথ্যা নয়। অতএব দু'জনের কার্যক্ষেত্র আলাদা হতে বাধ্য। মাতৃত্বের বিরাট দায়িত্ব যাদের বহন করতে হবে তাদের কতকগুলি বিশেষ গুণের অধিকারী নিশ্চয়ই হতে হবে—যেসব গুণ পুরুষের না থাকলেও চলে। নারী সহিষ্ণু, পুরুষ ক্ষিপ্র। নারী প্রধানতঃ গৃহলক্ষ্মী। পুরুষ বাইরে থেকে জীবিকার সংস্থান করে আনছেন আর নারী তাকে রক্ষা করেন ও সকলের অংশ-ভাগ করে দেন। ভবিষ্যৎ বংশধরদের মানুষ করে তোলবার কাজই বিশেষ করে তাঁদের কাজ—তাঁদের যত্ন ছাড়া ভবিষ্যৎ জাতি লুপ্ত হয়ে যাবে।

নারীকেও যদি রাইফেল কাঁধে করে গৃহরক্ষার কাজে বেরিয়ে আসতে হয় তাহলে সেটা আমাদের উভয়ের পক্ষেই লজ্জার কথা। সে যেন বর্বর যুগে ফিরে যাবারই সমান। নারী যদি পুরুষের মত ঘোড়ায় চড়া শিখতে থাকেন। তাহলে তাতে নারী পুরুষ উভয়কেই যেন নীচে টেনে আনা হয়। নারীর বিশেষ যে দায়িত্ব তা থেকে নারীকে সরিয়ে আনা পুরুষের পক্ষে পাপ। গৃহকে বাইরের আক্রমণ থেকে রক্ষা করার কাজের চেয়ে গৃহের অভ্যন্তরকে সুন্দর ও সুশৃঙ্খল রাখার কাজ কোন অংশে কম সাহসের নয়।

কর্মক্ষেত্রে এই বিভাগকে স্বীকার করে নিলেও সাধারণ গুণগুলি দু'জনের পক্ষেই সমান প্রয়োজন। জাতিগত ভাবেই হোক বা ব্যক্তিগত ভাবেই হোক জীবনের সকল ক্ষেত্রে সত্য ও অহিংসাকে গ্রহণ কর, এই সমস্যায় এইটুকুই আমার দেবার জিনিষ। আমি বিশ্বাস করি যে এই পথে নারীরাই নেত্রীত্ব নিতে পারবেন এবং যদি তাঁরা এই নেতৃত্ব গ্রহণ করেন তাহলেই মানব সভ্যতার ক্রমবিকাশের পথে তাঁরা সহজেই স্থান খুঁজে পাবেন। তখন তাদের হীনতাবোধ আপনা থেকেই দূর হয়ে যাবে। অহিংসা মানেই হচ্ছে অসীম প্রেম অর্থাৎ কিনা দুঃখ সহ্য করার অসীম ক্ষমতা। সন্তানের জননী যে নারী সেই নারী ছাড়া সব চেয়ে বেশী করে এ ক্ষমতা আর কে দেখাতে পেরেছে? সুদীর্ঘ ন' মাস শিশুকে বহন করে তাকে খাইয়ে বাঁচিয়ে রাখবার জন্য যে দুঃখ পেতে হয় সে-দুঃখও তাঁরা আনন্দের সঙ্গেই গ্রহণ করেন। প্রসব বেদনার চেয়ে বেশী কষ্টের আর কি আছে? কিন্তু সৃষ্টির আনন্দে তারা তা ভুলে যায়। শিশুটিকে গড়ে তোলবার জন্য দিনের পর দিন আর কেইবা এতো কষ্ট সহ্য করে?

নারীর এই প্রেমকে বিশ্বমানবের অভিমুখী করে দাও—সে পুরুষের কামনার বশ হতে পারে এই কথা তাকে ভুলে যেতে দাও। স্রষ্টা এবং নীরব পথ প্রদর্শক হিসাবে তখন পুরুষের পাশে সে তার গৌরবময় আসন অধিকার করবে।

এই যুধ্যমান জগতে শান্তির সন্ধান দেবার কাজ নিয়েই নারী এসেছে।

সত্যাগ্রহের নেত্রী সে সহজেই হতে পারে—তার জন্য অনেক বই পড়ে তাকে জ্ঞান লাভ করতে হবে না। যা প্রয়োজন সে শুধু বহু দুঃখে বিদগ্ধ এবং জলন্ত বিশ্বাসে শাণিত একটী দৃঢ় চিত্ত।

আমার ধারণা আধুনিকারা এক ডজন রোমিওর সঙ্গে জুলিয়েটের ভূমিকা অভিনয় করতে ভালবাসে। তারা এডভেঞ্চার ভালবাসে। আধুনিকারা রৌদ্র, বৃষ্টি ও ঝড় থেকে আত্মরক্ষা করার জন্য বেশ করে না, করে মনোযোগ আকর্ষণের জন্য। প্রাসাধন করে স্বাভাবিক বর্ণকে উজ্জ্বল করে অসামান্য দেখায়। এদের জন্য অহিংসা নয়।...অহিংসা বহু আয়াস সাধ্য। তা চিন্তা ও জীবনধারায় এক বিপ্লব। এই বিপ্লব ধারায় জীবনকে পরিবর্তিত করতে পারলে মেয়েরা দেখবে যে যে-সব যুবক তাদের সংস্পর্শে আসবে তারা তাদেরকে শ্রদ্ধা করতে শিখবে এবং তাদের সামনে সৌজন্যতা প্রকাশ করবে। কিন্তু তথাপি যদি দৈবাৎ তাঁরা এমন বিপদে পড়েন যাতে তাদের সতীত্ব বিপন্ন হতে পারে, তখন দুর্বৃত্তের কবলে আত্মসমর্পণ করার চেয়ে মৃত্যু বরণ করার মত সাহস তাঁদের রাখতে হবে।...অহিংসায় যাদের বিশ্বাস নেই,

তারা সাধারণ আত্মরক্ষার কৌশল শিখবে, এবং অসভ্য যুবকদের অসৌজন্য ব্যবহার থেকে আত্মরক্ষা করবে।

ধর্ষিতা স্ত্রীর লজ্জার কিছু নেই। তাকে কোন প্রকারেই অসতী বা দুশ্চরিত্রা বলা চলে না। যে সমাজ দুশ্চরিত্র পুরুষ বা দুশ্চরিত্রা স্ত্রীলোকের শাসন করে না এবং যে সমাজ বিলাসী সৌখীন স্ত্রী-পুরুষদের অকাজ কুকাজ নীরবে দেখে যায় সেই সমাজই আবার অপর কর্তৃক ধর্ষিতা নির্দোষ স্ত্রীলোকদের সমাজচ্যুত করবার জন্য উঠে পড়ে লেগে যায় দেখে অবাক হতে হয়। সমাজের এই মনোভাব দর্শনে আমি পীড়া অনুভব করছি। এরূপ পাশবিক অত্যাচারের পরে আমার কন্যা বা স্ত্রী যদি মুক্তি পেতেন বা কেউ তাঁকে মুক্ত করে আনতো তবে আমি কি তাঁকে কখনও পরিত্যাগ করতাম, না ঘৃণা করতাম! হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের এরূপ স্ত্রীলোকের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছে, তাদের আমি বলেছি—তোমাদের লজ্জার কিছু নেই।

মেয়েদের জন্য স্থান ছেড়ে দিতে পুরুষদের শেখা উচিত। যে দেশ বা সম্প্রদায়ের নারী সম্মান পায় না তা সভ্য বলে বিবেচিত হতে পারে না।

**ছাত্র—**

ছাত্রাবস্থা সন্ন্যাসের অবস্থার মত। ছাত্রদের পবিত্র ও ব্রহ্মচারীর যোগ্য হওয়া চাই।

যে বিদ্যা দ্বারা ধর্মপালন করা যায় তাহাই প্রকৃত বিদ্যা। 'সা বিদ্যা যা বিমুক্তয়ে'—যা' দ্বারা মুক্তি পাওয়া যায়, তা'ই বিদ্যা। এই সূত্রটী আমার খুব ভালো লাগে।

জ্ঞানের সঙ্গে আমাদের বেদনার যোগ হোক। অজ্ঞানের সঙ্গে অনুভূতির গ্রন্থি বাঁধা পড়লে আমাদের সমাজ অবিলম্বে ধ্বসে পড়বে।

যে জাতির ছেলেমেয়েরা নিজেদের মাতৃভাষায় শিক্ষা না নিয়ে বিদেশের ভাষায় শিক্ষা লাভ করে, সে জাতি স্বেচ্ছায় আত্মহত্যা করে। এতে তারা তাদের জন্মগত অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়।

বনিয়াদি শিক্ষা একসঙ্গে শরীর ও মনকে গড়ে তোলে। ইহা দেশের মাটির সঙ্গে শিশুকে সংযুক্ত করে রাখে এবং তার সামনে ভবিষ্যতের এক গৌরবময় আদর্শ স্থাপন করে।

ছাত্র কথাটি ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করলে বলা যায়, আমিও একজন ছাত্র। তবে তাদের বিদ্যালয় আলাদা। আমার বিদ্যালয়ে এসে আমার গবেষণা কার্যে যোগ দেবার জন্য তাদের আমি আমন্ত্রণ করে রাখছি।

## আমাদের গান্ধিজী

বিদ্যার্থীর নিকট বাল্যকালটাই একটি বিশেষ সময়। এই সময় যে জ্ঞান পাওয়া যায় তা খনও ভোলা যায় না। কিন্তু এই সময়টাতেই ছেলেরা যেখানে সব চাইতে কম জিনিব ায়, যেমন-তেমন-কাজ-চালানো-গোছের একটি ইস্কুলে, তাদের পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

ইস্কুলের ব্যবস্থা এমন হওয়া চাই যে ছেলেরা যেন শুধুই যাতায়াত না করে, তারা যেন চরিত্রবান শিক্ষকের নিকট চরিত্র গড়ে নিতে পারে। হিন্দু বালক-বালিকারা সংস্কৃত শিখবে ও গীতা পড়বে। মুসলমান ছেলেদের আরবী শেখা চাই ও কোরাণ পড়া চাই। তা ছাড়া সকলেরই সুন্দর ও মজবুত সুতাকাটা শেখা চাই এবং তার উপর তুলো ধুনতে ও তাঁত বুনতেও পারা চাই।

রাষ্ট্রীয় শিক্ষা প্রচারের কাজটা অনেক অংশেই বাপমায়ের হাতে আছে। সত্যিকারের লোক-শিক্ষা পুঁথি পড়ায় হয় না, হয় চরিত্র দ্বারা, হাতে পায়ের চেষ্টায় ও শরীরের মেহনৎ দ্বারা। গুজরাটের বাপমায়ের পুঁথি-পড়া বিদ্যার মোহ যায় নি। তারা এখনও ওই বিদ্যার স্বরূপটা দেখতে পান নি। তাঁরা এখনও স্বীকার করেন না যে, বালকদের প্রথমেই নীতি শিক্ষা দিতে হয়, তারপর দিতে হয় শরীরকে তৈরী করার শিক্ষা, তারপর জীবিকা উপার্জ্জনের সাধন হিসাবে কোনও কলা শিক্ষা দিতে হয় এবং তারপর দিতে হয় তাদের মনের বিকাশের শিক্ষা। সর্বশেষে অলঙ্কার হিসাবে তাদের পুঁথিপড়া জ্ঞানে শোভিত করা দরকার।

ছাত্রদের জন্য গান্ধিজী ন'দফা কর্মসূচির নির্দেশ দেন :

১। গ্রামই হবে তোমাদের গবেষণাগার ও কর্মক্ষেত্র।

২। সত্যিকারের ব্রহ্মচারী হবে। দেহ মন আত্মাকে দৃঢ় ও পবিত্র করবে। গোপনে কোন কাজ করবে না, সাহসী হবে। সময়মত কাজ করবে, এক মুহূর্ত নষ্ট করবে না। ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন হবার চেষ্টা করবে।

৩। সত্য ও ভগবানে দৃঢ় বিশ্বাস রাখবে। বিনয়ী ও নম্র হবে। অনুন্নত ও অভাবগ্রস্তদের নিঃস্বার্থ ভাবে সেবা করতে কখনও ক্লান্তি বোধ করবে না।

৪। সুতা কাটবে, খদ্দর পরবে। শ্রমের মর্যাদা দেবে। অর্থনৈতিক স্বাধীনতা প্রবর্তন করার চেষ্টা করবে।

৫। ভারতের ঐক্যের জন্য অবিশ্রান্ত কাজ করবে। জাতিগত ও শ্রেণীগত মনোভাব প্রসূত কার্যকলাপ থেকে নিজেদের মুক্ত রাখবে। রাষ্ট্রভাষা শিখবে ও শেখাবে। মাতৃভাষার উন্নতি করবে।

৬। উদ্দেশ্যমূলক ও ফলপ্রসূ শিক্ষাধারা প্রচার করবে। অশিক্ষিত ও নিরক্ষরদের মাঝে শিক্ষার প্রসার করবে।

৭। পরিচ্ছন্ন স্বাস্থ্যকর উন্নতিশীল গ্রাম গড়ে তোল। মাদক নিবারণ কর। যাতে সবাই খেতে পায় তার ব্যবস্থা কর।

৮। প্রত্যেকটী মেয়েকে তোমার সমকক্ষ বলে মনে করবে। মা বোন বলে ভাববে। জাতিগঠনে তোমার সহকর্মী বলে গ্রহণ করবে।

৯। কর্মঠ দায়িত্বশীল নাগরিক হও। রাজনৈতিক দলাদলিতে মাথা ঘামিও না। জাতির সেরা ছাত্র হও। দুর্যোগের দিনে ভারতমাতার জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করতে প্রস্তুত হও। ছেলেরা প্রত্যেকটি মেয়েকে নিজের মা বোনের মত সম্মান করতে শিখবে। যদি তারা ভদ্র ব্যবহার করতে না শেখে তাহলে তাদের সব শিক্ষাই ব্যর্থ হবে।

**স্বাধীনতার রূপ—**

আত্মশুদ্ধির পক্ষে জনমতের বিচার আদালতের বিচার অপেক্ষা শ্রেয়ঃ প্রতিশোধ চাই না, চাই সংশোধন।

মানুষকে পাশাপাশি বাস করতে হবে। একই অর্থনীতি, একই ব্যবসা, একই বৃহত্তর মানবিক ধর্মে বিভিন্ন ধর্মের অভ্যাস মিলিত হবার সময় এসেছে।

এদেশে চাষের কাজ আর চরকা ও তাঁতের কাজ জাতীয় শরীরের দুই ফুস্‌ফুস্‌। যদি সেই দুই ফুস্‌ফুস্‌কে রক্ষা করার জন্য যত্নবান না হই, পরন্তু যদি অযত্নে একটি ফুস্‌ফুস্‌ নষ্ট হয়ে যায় তাহলে এ জাতি বেশী দিন জীবিত থাকতে পারে না।

নিক্তির ওজনে অত্যাচারের পরিমান বিচার সম্ভব নয়। কোন্ পক্ষের দোষ কতটুকু বেশী বা কম তা বিচার করার জন্য তথ্য প্রমাণ হাতে নেই বটে তবে এটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে এই ব্যাপারে উভয় পক্ষই যখন দোষী, এমতাবস্থায় একটা সত্যকারের বুঝাপড়ায় উপনীত হতে হলে উভয় রাষ্ট্রকেই নিজ নিজ দোষ ক্রটি সম্পূর্ণভাবে স্বীকার করে একটা আপোষ মীমাংসার সর্তে পৌছাতে হবে।

আমি যে স্বাধীন ভারতের কল্পনা করি তা'তে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী সকল ভারতবাসী প্রকৃত বন্ধুর মত বাস করবে। সেখানে কেউ লক্ষপতি থাকবে না। আবার দীন দরিদ্রও কেউ থাকবে না। সমস্তই রাষ্ট্রের অধিকারে থাকবে। কারণ রাষ্ট্রে সকলেরই সমান অধিকার। এই স্বপ্ন সফল করার কাজে মৃত্যু বরণ করাও আমি শ্রেয় মনে করি।

বলপ্রয়োগ ছাড়া ব্যক্তির হাতে মূলধন সঞ্চিত হতে পারে না। কিন্তু অহিংস সমাজ ব্যবস্থায়, রাষ্ট্রের হাতে বিত্ত সঞ্চয় যে শুধু সম্ভব তা নয়, তা অবশ্যম্ভাবী ও বাঞ্ছনীয়।

শারীরিক পরিশ্রম না করে খাদ্য আশা করা যে কোন সুস্থ নাগরিকের পক্ষে অন্যায়। ভারতে লাখ লাখ লোক আছে যারা দিনে একবার মাত্র খেতে পায়—একখানি মাত্র চাপাটি আর একটু নুন। এই মানুষগুলির অন্নবস্ত্রের সংস্থান না হওয়া পর্যন্ত আমাদের যদি কিছু সঞ্চয় থাকে তা ভোগ করার অধিকার আমাদের নেই।

যে জিনিষ আমার এখনই প্রয়োজন নেই তা যদি আমি সংগ্রহ করে রাখি, তাহলে আমি অন্যের চুরি করছি বলে ধরতে হবে।

প্রত্যক্ষ যা দেখা যাচ্ছে তা উপেক্ষা করে প্রমাণ সাপেক্ষ পেঁচালো সিদ্ধান্ত করা কাজের কথা নয়।

যারা ভূমি কর্ষণ করবে, উৎপন্ন ফসলের মালিক তারাই, ভূমির অধিকারী বলে কেউ নেই। একমাত্র অধিকারী ঈশ্বর, কাজেই শ্রমের দ্বারা যে ভূমি কর্ষণ করবে সেই হবে ভূমির সত্বাধিকারী।…এমন সময় আসছে যখন সমস্ত জমির মালিক হবে রাষ্ট্র অর্থাৎ যারা চাষ করবে জমি তাদেরই হবে।*

অসাধারণ প্রতিভা সম্পর্কে বিশেষ বিবেচনার কোন প্রয়োজন নেই। নিজের আহার্য সংগ্রহের জন্য প্রত্যেকেই যদি শারীরিক পরিশ্রম করেন। কবি, ডাক্তার, উকিল প্রভৃতি তাঁদের মনীষা মানবের সেবার কাজে লাগান, এই নিঃস্বার্থ কর্তব্য নিষ্ঠার ফলে তাঁদের সৃষ্টি আরও উন্নত হবে।…কোন শারীরিক পরিশ্রম না করে নিয়মিত খাদ্য আশা করা যে কোন নাগরিকের পক্ষে অন্যায়।

সংখ্যায় রাজন্যবর্গ ৬৪০ কিন্তু বাস্তব দৃষ্টিতে দেখলে তাঁরা সংখ্যায় একশোও হবেন না। তাঁরা ছ' শোই হোন বা একশোই হোন, সে প্রশ্ন অবান্তর। তাঁরা সংখ্যায় এতো নগন্য যে জাগ্রত ভারতে তাঁরা একমাত্র প্রজা-ভৃত্য হিসাবেই তিষ্ঠিতে পারেন। আজিকার মত নামে প্রজা-ভৃত্য নয়, কাজে।

স্বাধীনতা অর্জনে কৃতসংকল্প ভারতবাসীকে তাদের অভীষ্ট থেকে বিচ্যুত করতে

---

জমিদারী সম্পর্কে লুই ফিশারকে গান্ধিজী বলেন—কিষানেরা খাজনা দেওয়া বন্ধ করবে;… তারপর জমি নিজেরা দখল করবে।

লুই ফিশার—গায়ের জোরে?

গান্ধিজী—গায়ের জোরের প্রয়োজন হতে পারে, আবার জমির মালিকেরা তাদের সঙ্গে সহযোগিতাও করতে পারেন।…তারা পালিয়ে যাবেন।

লুই ফিশার—আপনি বলতে চান খেসারৎ না দিয়ে সরকার জমিদারী বাজেয়াপ্ত করবেন?

গান্ধিজী—জমিদারদের খেসারৎ দেওয়ার মত অর্থ কারুরই নেই।

পারে এরূপ শক্তি ইংরাজের নেই। এমন কি ইংরাজ তথা রাজন্যবর্গের সম্মিলিত শক্তিরও নেই।

স্বাধীন ভারত বিপদে পতিত প্রতিবেশীকে সাহায্য করতে অবশ্যই এগিয়ে আসবে।

সাধারণের মংগলের জন্য বৃহৎ যন্ত্রশিল্প অবশ্যই কিছু থাকবে; কিন্তু ঐ সকল যন্ত্র রাষ্ট্রের অধীনে জনসাধারণের মংগলের জন্য পরিচালিত হবে।

ব্যক্তির শ্রমের লাঘব করবার হিতৈষী মনোবৃত্তির ফলে যন্ত্রের প্রচলন হয়নি, লোভই এর জনক। এরূপ অবস্থার বিরুদ্ধেই আমি প্রাণপণ সংগ্রাম করছি।

আজ যন্ত্রের সাহায্যে কিছু লোক লাখ লাখ লোককে পদানত করে রেখেছে। কয়েকটি লোক একচেটিয়া ভাবে বিত্তশালী হবে তা আমি চাই না, আমি চাই সকলেই অর্থের অধিকারী হোক।

আমি কখনই অতি সাধারণ সরল যন্ত্রপাতির বিরোধী নই। এর দ্বারা ব্যক্তির পরিশ্রমের লাঘব হয় এবং লাখ লাখ গ্রামবাসী পরিশ্রমের গুরুভার থেকে মুক্তি পায়।

জীবন যাত্রার উপকরণ বৃদ্ধি করে এবং কল কারখানা দ্বারা সে অভাব মিটিয়ে পৃথিবী যে তার গন্তব্য পথে একপাও এগিয়েছে—এরূপ আমি মনে করি না।

প্রয়োজনের মাত্রা বেশী করা অপেক্ষা স্বেচ্ছায় তার মাত্রা কম করার মধ্যেই সভ্যতার প্রকৃত অর্থ নিহিত আছে।

আমি সেই ভারতই গড়তে চাই, যে ভারতে দরিদ্রতম ব্যক্তিও মনে করবে—এই তার দেশ, এই দেশে তার একটি সক্রিয় সত্তা আছে। সেই ভারতে থাকবে না উঁচু নীচু ভেদ, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে থাকবে অকুণ্ঠ প্রীতি। সেই ভারতে থাকবে না অস্পৃশ্যতার অভিশাপ, থাকবে না মাদকতার বিষ। নারী সেই ভারতে ভোগ করবে পুরুষের সমান অধিকার। সেই ভারত করবে পৃথিবীর প্রত্যেকটি জাতির সংগে সহযোগিতা। আমরা অপরের শত্রু হব না, অপরকে শোষণ চালাতেও দোব না; এই আমার ধ্যানের ভারত।

যে রাষ্ট্রব্যবস্থা জুলুম করে লোকের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয় তা কখনই বাঞ্ছনীয় নয়। ভারতবর্ষ কখনও সেরূপ রাষ্ট্রব্যবস্থা মেনে নেবে না।

স্বদেশী হোক অথবা বিদেশী হোক যে কোন শাসন ব্যবস্থা হতে মুক্ত হবার ক্রমাগত চেষ্টার মধ্যেই স্বাধীনতার অর্থ নিহিত রয়েছে।

যখন আমরা নিজেকে শাসন করতে শিখবো তখনই আমাদের স্বরাজ আসবে।

## [illegible]

**প্রত্যেক ব্যক্তি যখন নিজের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠা করবে তখনই প্রকৃত স্বরাজ লাভ হবে।**

ভারতবর্ষকে যদি পৃথিবীর সম্মুখে মাথা খাড়া করে দাঁড়াতে হয় তবে কোন শ্রেণী বা দল অথবা উপজাতিকে অনগ্রসর বা পশ্চাৎপদ করে রাখলে চলবে না। ভারতবর্ষ অস্ত্রের জোরে কখনও মাথা তুলতে পারবে না।...ভারতবর্ষকে আপন মর্মগত সংস্কৃতির সাহায্যেই গৌরব উজ্জল হয়ে দাঁড়াতে হবে—এই সংস্কৃতি প্রত্যেক নাগরিকের জীবনে পরিস্ফুট হবে, আমি সম্প্রতি যে সমাজতন্ত্র-বাদের কথা বলেছি তারই মধ্যে দিয়ে এই সংস্কৃতি প্রকাশ হবে। কারো কোন মত বা পরিকল্পনা সমাজে প্রচার করে জনপ্রিয় করে তোলার জন্য বলপ্রয়োগের নীতি সর্বপ্রকারে বাদ দিয়ে লুপ্ত করতে হবে।

পূর্ণ স্বরাজ বিচ্ছিন্ন স্বাধীনতা নয়। জাতিগতভাবে স্বাস্থ্যকর ও সম্মানজনক পারস্পরিক নির্ভরশীলতাই স্বরাজের লক্ষ্য।

যদি ভারতের হিন্দু মুসলমান ও অন্যান্য সম্প্রদায় পরস্পর বন্ধুরূপে বসবাস করতে আরম্ভ করে, তবে পুলিশ ও সৈন্যদলের কোন প্রয়োজনই থাকবে না।

আমরা পৃথিবীর অপর লোকদের সংগে শান্তিরক্ষা করে চলবো, আমরা কোন অবস্থাতেই পরন্তপ হব না। আমরা শোষণ করবো না, কিংবা শোষিতও হব না। আমাদের সেনাবাহিনী হবে যতদূর সম্ভব ক্ষুদ্র।

যে স্বার্থ ভারতের কোটি কোটি মূক জনসাধারণের স্বার্থের পরিপন্থী নয়, স্বদেশী হোক আর বিদেশী হোক, আমরা সেই সকল স্বার্থ-ই রক্ষা করবো।

এই ভারতবর্ষ আমার স্বর্গ, কিন্তু তা'বলে আমি স্বদেশী ও বিদেশীর মধ্যে কোন ভেদনীতির কথা ভাবতেও ঘৃণা বোধ করি।

কুশাসনকে অগ্রাহ্য করবার অধিকার প্রজাসাধারণের নিশ্চয়ই আছে। ইহা বহু প্রাচীনকাল থেকেই স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে।

বিদ্বেষ প্রচারে মানুষের কোন কল্যাণ হতে পারে না। পৃথিবীকে নূতন শিক্ষা দেবার জন্য এক অভিনব বিপ্লবের সূচনা করবার গৌরব ভারতবর্ষই লাভ করবে।

দরিদ্র জনগণের স্বরাজই আমার স্বপ্নের স্বরাজ। রাজন্যগণ ও বিত্তশালী ব্যক্তিরা যে সকল দ্রব্য ভোগ করেন, সকলেই স্বচ্ছন্দে সেই সকল দ্রব্য ভোগ করতে পারবে, এই হোল আমার নীতি।

আমার কল্পনার স্বরাজ জাতি বা ধর্মের কোনরূপ বিভেদ বিচার করে না। স্বরাজ সর্বসাধারণের জন্য ; লাখ লাখ বিকলাংগ, অন্ধ, অনশন-পীড়িত মূক জনগণও তাদের মধ্যে থাকবে।

# আমাদের গান্ধিজী

আমাদের সকলেরই এই নিয়ম করা উচিত যে, গ্রামের জিনিষ পেলে কখনং কোথাও অন্য জিনিষ ব্যবহার করবো না।

স্বাধীন ভারতে নয়াদিল্লীর সুরম্য প্রাসাদ ও দরিদ্র শ্রমিকের জীর্ণ কুটীর—এই দুই বিসদৃশ জিনিষ একদিনও থাকতে পারবে না।

ধনীরা যদি স্বেচ্ছায় তাদের ধন ও তজ্জনিত ক্ষমতা ত্যাগ না করেন, তাহলে রক্তাক্ত হিংস্র বিপ্লব একদিন অবশ্যম্ভাবীরূপে এসে উপস্থিত হবে।

সমস্ত কলকারখানা জাতীয়করণ করতে হবে, রাষ্ট্রের অধীন হবে। চিত্তাকর্ষক ও আদর্শ পরিবেশের মধ্যে সেগুলি পরিচালনা করা হবে। লাভের জন্য নয়, মানব সমাজের উপকারের জন্য। উদ্দেশ্য হিসাবে ভালবাসা লোভের স্থান দখল করবে।··· পয়সার জন্য এই পাগলের মত ছুটোছুটি অবশ্যই বন্ধ হবে, শ্রমিকদের শুধু জীবন যাপনের উপযুক্ত বেতন দেবার নিশ্চয়তা দিলেই হবে না, তাদের কার্যধারাকে এক-ঘেয়েমি থেকে মুক্ত করতে হবে। এই নতুন পরিবেশে যারা কারখানায় কাজ করে আর যারা কারখানার মালিক—উভয়েরই ভালো হবে।···

নিজ নিজ রাষ্ট্রে অধিবাসীদের কার্যের জন্য সেই সেই রাষ্ট্র অবশ্যই দায়ী। তর্ক-বিতর্কে তাদের অধিকার নেই, তাদের কর্তব্য পরিষ্কার, কর্তব্য কর আর তজ্জন্য জীবন দাও।

আমরা প্রকৃতই যদি সত্য ও অহিংসার পথে স্বরাজ অর্জনের জন্য বদ্ধপরিকর হতাম, তাহলে যার খোঁজ লওয়া হয়নি এমন একটি ভিখারী বা কুষ্ঠরোগীও ভারতে থাকতো না।

কংগ্রেস কমিটিগুলি শ্রমিকদের জন্য সর্বত্র বিশ্রামাগার খুলতে পারে। সেখানে পরিশ্রান্ত শ্রমিকেরা বিশ্রাম করতে পারবে। এই কাজ যেমন চিত্তাকর্ষক, তেমনি কল্যাণকর।

দেশের বৃহৎ শিল্পগুলি রাষ্ট্রশক্তির অধীনে পরিচালিত হবে। শহর তখন আর্থিক শোষণের কেন্দ্র না হয়ে স্বাস্থ্য ও সম্পদ বৃদ্ধির কেন্দ্রস্বরূপ হবে।

ভবিষ্যতে ভারতের উৎপাদন ও বণ্টন কেন্দ্রগত করা হবে না। চরকার পিছনে সেই আদর্শ নিহিত আছে। গ্রামের উন্নতির জন্য যা কিছু আবশ্যক, তা সবই উৎপাদন করতে হবে।

আমার কল্পনার এই ভারতে অস্পৃশ্যতা বলে কিছু থাকবে না, মাদক দ্রব্য ব্যবহারের সর্বনাশা প্রভাব হতে সকলে মুক্ত থাকবে এবং নারী পুরুষের সমান অধিকার ভোগ করবে।

# আমাদের গান্ধিজী

ভারতবর্ষ যদি প্রকৃত স্বাধীনতা লাভ করতে চায়, তবে পুরস্কার কিংবা ক্ষমতা লাভের লোভ না করে সেবাকার্যের প্রতি নিরবিচ্ছিন্ন একাগ্রতাই মুখ্য উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। আপন বিষয় না ভেবে দেশের বিষয় তাঁদের ভাবতে হবে।

ভারতবর্ষকে দ্বি-খণ্ড করা হলেও কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত সমস্ত ভারতবাসী এক। দেশকে আরও খণ্ডিত করা নিবুর্দ্ধিতা হবে। আরও খণ্ডীকরণ বন্ধ না করলে এখানে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের আর শেষ থাকবে না, আর সেই সকল রাষ্ট্র ভারতবর্ষ আর পৃথিবীর কোন উপকারে আসবে না।

ভারতের লাট নিজ দেহে এবং পরিবেশে সম্পূর্ণভাবে মাদক স্পর্শ মুক্ত থাকবে।...

তাঁর পরিবেশ ও ব্যক্তিত্বের মধ্যে প্রকাশ পাবে চরকায় সুতা কাটা।...

সামান্য কুটিরে তিনি বাস করবেন। তাঁর গৃহের দ্বার সকলের জন্যই সদা অবারিত থাকবে।...

দেশী বা বিদেশী মূল্যবান আসবাবপত্র দেশী গবর্ণরের জন্য নয়। তাঁর মন্ত্র হবে 'উচ্চ চিন্তা ও সরল জীবন'। এই মন্ত্র তাঁর গৃহদ্বারে উৎকীর্ণ হয়ে শোভা বৃদ্ধি করবে না, পরন্তু তাঁর দৈনন্দিন কর্মে নিত্য মূর্ত হয়ে উঠবে।

তিনি কোন ক্রমেই কুত্রাপি অস্পৃশ্যতা স্বীকার করবেন না। জাতিধর্ম ও বর্ণগত কোন ভেদই তিনি মানবেন না। সকল ধর্মের এবং প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের শ্রেষ্ঠ যা-কিছু তা তাঁর মধ্যে প্রতিফলিত হবে।

যে প্রদেশের গভর্ণর হবেন, সেই প্রদেশের মাতৃভাষায় তিনি কথা বলবেন।...

কংগ্রেস আজ ক্ষমতা অধিকার করেছে বলেই কংগ্রেসীগণকে লোভের বশে সরকারী চাকরীর পিছনে পিছনে ঘুরতে হবে—এরূপ আচরণ কংগ্রেস আদর্শের বিরোধী।

চরকা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হলে লাখ লাখ বুভুক্ষুর অন্ন মিলবে। ১৯০০ মাইল লম্বা এবং ১৫০০ মাইল চওড়া এই বিশাল ভারতের কৃষকগণের ক্রম-বর্ধমান দারিদ্র্য-সমস্যার সমাধান কোন শিল্প উন্নয়ন পরিকল্পনার দ্বারাই সম্ভব হবে না। ভারতবর্ষ একটি ছোট দ্বীপ তো আর নয়। ইহা একটি মহাদেশ। ইংলণ্ডের মত একে শিল্প-প্রধান দেশে পরিণত করা যাবে না। আর পৃথিবীর লোককে শোষণ করবার মত কোন পরিকল্পনা ত আমাদের দৃঢ়ভাবে বন্ধ করেই দিতে হবে। আমাদের কুটীরে কুটীরে কার্পাস থেকে বস্ত্র তৈরী করে দেশের ধন বৃদ্ধি করতে হবে। আমাদের যে-সময়টা বিনা কাজে কেটে যায়, তাকে এই পথেই কাজে লাগাতে হবে। এই কর্মই

আমাদের সকল আশার কেন্দ্রস্থল হবে। সুতরাং ভারতীয় জীবনে জল ও বায়ুর ম
চরকার সমান প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।*

অতীতে কংগ্রেসের লোকেরা বিনা বেতনেই তো কাজ করেছে। তবে কংগ্রে
সেবক পার্লামেন্টারী সেক্রেটারী হলে তাকে উচ্চ বেতন দেওয়া হবে কেন? পার্ল
মেণ্টারী সেক্রেটারীর দরকার যে কি তা-ও বুঝি না। গবর্মেণ্টের উপর বেতনভু
সেক্রেটারী আর না চাপানোই কংগ্রেসের উচিত।...আয় না বাড়িয়ে ব্যয় বাড়া
অবিবেচনার কাজ হবে।...

**সৎ জীবন—**

মনো রেখো, তোমার স্ত্রী বন্ধু, সংগী ও সহকর্মী, লালসা চরিতার্থ করার য
নয়।

অবিবাহিতেরা নিজেদেরকে পবিত্র রাখবে, বিনয় শিক্ষা করবে, সর্বপ্রকা
প্রলোভন থেকে আত্মরক্ষা করবে।

সদাই সেই শক্তির কথা চিন্তা করবে, যে শক্তিকে আমরা দেখতে না পেলেও
অন্তরে অনুভব করি। সেই শক্তি সদাই তোমাকে সাহায্য করবে।

সংযমী জীবনধারা বিলাসী জীবনধারা থেকে ভিন্ন। অতএব, তোমার সমাজ,
তোমার পাঠ্য, তোমার আনন্দ আহরণ ও তোমার খাদ্য নিয়ন্ত্রণ করবে। সৎ সংগ
খুঁজবে। আসক্তিমূলক উপন্যাস ও পত্রিকাদি পড়বে না। একখানি ভালো বইকে
সদাই তোমার সংগী করে রাখবে। থিয়েটার ও বায়োস্কোপ বর্জন করবে। ভজন
শুনবে, যার বাণী ও সুর চিত্তকে উন্নত করে। রুচির জন্য আহার গ্রহণ করবে না,
ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য খাবে। বিলাসী মানুষ খেতে ভালবাসে, সংযমী মানুষ জীবন
ধারণের জন্য আহার করে। যে সব মিষ্টান্ন ও পানীয় স্নায়ুর উত্তেজনা সৃষ্টি করে, যে
বিষ ভালো-মন্দের বিচারশক্তি হ্রাস করে, তা বর্জন করবে। ভোজনের মাত্রা ও সময়
নিয়ন্ত্রণ করবে।

ইন্দ্রিয় যখন তোমার উপর আধিপত্য বিস্তার করতে চাইবে তখন নতজানু হয়ে
ঈশ্বরের কাছে সাহায্য চাইবে। রাম নাম এ বিষয়ে বিশেষ সাহায্যকারী। বাহ্যিক
প্রক্রিয়া হিসাবে এক বালতী ঠাণ্ডা জলে কোমরটা ডুবিয়ে ক' মিনিট বসে থাকতে
পারো। ইন্দ্রিয়াসক্তি তৎক্ষণাৎ হ্রাস পাবে।

---

* লর্ড লোথিয়ান জিজ্ঞাসা করেন—গ্রাম-শিল্প ও কুটীর-শিল্পের লক্ষ্য কি?

গান্ধিজী বলেন—কি করে কয়কে অক্ষয়, আবর্জনাকে সম্পদে পরিণত করা যায় তা
শিখানোই কুটীর-শিল্পের লক্ষ্য।

# আমাদের গান্ধিজী

প্রত্যূষে ও রাত্রে শয়নের পূর্বে মুক্ত বাতাসে দীর্ঘ ভ্রমণ করবে।

রাত ন'টায় শোবে, ভোর চারটের সময় উঠবে। শয়নের পূর্বে কিছু খাবে না। সন্ধ্যা ছ'টার সময় রাত্রির আহার শেষ করবে।

স্মরণ রেখো, ভগবান ঈশ্বরের প্রতিভূ, জীবের সেবা করাই তাঁর ধর্ম। এবং তাঁর দ্বারাই ভগবানের মহত্ব ও প্রেমকে সে প্রকাশ করে। সেবা করাই তোমার একমাত্র আনন্দ হোক, জীবনে আর কোন ভোগের প্রয়োজন নেই।

ধূমপান করা আমি একটা পাপ কাজ বলে মনে করি। ইহা মানুষের বিবেক নষ্ট করে এবং মদ্যপানের চেয়েও ইহা ভয়ানক। কারণ, ইহা অলক্ষ্যে ক্ষতি করে। ইহা এমনই একটি কু অভ্যাস যার কবল থেকে মুক্তি পাওয়া বড়ই কষ্টকর। ইহা ব্যয়সাপেক্ষ পাপ। ইহা আমাদের নিঃশ্বাসকে দূষিত করে। আমাদের দাঁতকে বিবর্ণ করে। এবং অনেক সময় কর্কট রোগ সৃষ্টি করে।

ধূমপায়ীরা যদি এই কদর্য অভ্যাস ত্যাগ করে, সেই পয়সাটা জমিয়ে কোন জাতীয় মংগলের উদ্দেশ্যে দান করে, সে নিজের ও জাতির কল্যাণ করবে।

অনশনক্লিষ্ট নরনারীরা যেসব ছোটখাটো চুরী করে সাজা পায়, এদেশে মদ্যপান করা তার চেয়েও বড় অপরাধ বলে আমি মনে করি। আমি অনিচ্ছা সত্বেও অসহায়ের মত ইহা সহ্য করি।...যারা মদ তৈরী করে এবং যারা বারবার নিষেধ সত্বেও তা পান করে তাদেরকে আমি সাজা দেবার পক্ষপাতী। সন্তান আগুনের কাছে যেতে অথবা গভীর জলে নাবতে চাইলে আমরা গায়ের জোরেও তাদের নিরস্ত করি। লেলিহান অগ্নিকুণ্ডে অথবা বন্যার জলস্রোতে লাফিয়ে পড়ার চেয়ে মদ্যপান বেশী বিপজ্জনক। অগ্নি ও জল আমাদের দেহকে ধ্বংস করে, কিন্তু মদ আমাদের দেহ-মন দুই-ই নষ্ট করে দেয়।

আমাদের আহার্য, আমাদের জীবনধারা, আমাদের আলাপ-আলোচনা, আমাদের পারিপার্শ্বিকতা সব কিছুই পাশব-বৃত্তির উত্তেজক। এই উত্তেজনাই আমাদের স্বাস্থ্যের উপর বিষের মত ক্রিয়া করে।

যারা অবিবাহিত আছে তারা অবিবাহিত থাকার চেষ্টা করবে, অন্ততঃ যতদিন পারে। যুবকেরা প্রতিজ্ঞা করবে—পঁচিশ-ত্রিশ বছর অবধি কুমার থাকার।...

পিতামাতার প্রতি আমার অনুরোধ, তারা যেন ছেলে-মেয়েদের অল্প বয়সে বিয়ে দিয়ে গলায় একখানি পাথর বেঁধে দেবেন না।...তাঁরা এই ধরণের হৃদয়হীনতা বন্ধ করুন। যদি তাঁরা সত্যই সন্তানের শুভ চান, তাহলে তাদের দৈহিক, মানসিক ও নৈতিক উন্নতি বিধান করুন।...

যাদের স্ত্রী মারা গেছে অথবা যাদের স্বামী মারা গেছে, তাদের আর বিয়ে না করাই কর্তব্য, ইহাই সত্যকারের স্বাস্থ্য-নীতি।...

স্বামী-স্ত্রীর রাত্রে পৃথক্ শয়ন করা উচিত।...

একবার স্বাস্থ্য ভাঙলে সে স্বাস্থ্য আর পুনরুদ্ধার করা যায় না। একখানি ভাঙা আরসির কাঁচকে যতই জুড়ে রাখো সেটি ভাঙা কাঁচই থাকে।...

**সংবাদপত্র—**

সংবাদপত্রকে শক্তি বলা হয়েছে। সংবাদপত্র সুনিশ্চিত একটা শক্তি। কিন্তু এই শক্তির অপব্যবহার করা অপরাধ। আমি নিজে সাংবাদিক। সহযোগী সাংবাদিকদের প্রতি আমার এই আবেদন যে, তাঁরা যেন নিজেদের দায়িত্ব বুঝেন এবং সত্যের সমর্থন ব্যতীত অন্য কোন ধারণার বশবর্তী হয়ে যেন কার্য পরিচালনা না করেন।

**রাষ্ট্রভাষা—**

হিন্দুস্থানী শিখতে পরাঙ্মুখ কতিপয় ভারতবাসীর জন্য গোটা জাতির উপর বিদেশী ভাষার বোঝা চাপানো যায় না—কেন্দ্রীয় সরকারের যদি অচিরে এই বিচক্ষণ বুদ্ধির উদ্রেক হয়, তাহলে কোন প্রাদেশিক সরকার ইংরেজি ভাষা ব্যবহার করতে সাহস পাবে না। হিন্দুস্থানী অনায়াসে সর্বভারতের ভাষা হতে পারে—কোন প্রদেশের বা কোন সম্প্রদায়ের লোকের তাতে আপত্তি থাকতে পারে না। ইংরাজের রাজনৈতিক পাশ আমরা ছিন্ন করেছি; যা দিয়ে ইংরাজ আমাদের উপর প্রভাব বিস্তার করেছে, এক্ষণে আমি সেই ইংরাজী শিক্ষার পাশ ছিন্ন করতে বলছি। স্বভাবতঃই সমৃদ্ধ ইংরাজী ভাষা আজিকার মত ভবিষ্যতেও বরাবর আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ও কূটনীতির ভাষা থাকবে।

**আত্মদর্শন—**

আমার জীবনে গোপনতা বলে কিছু নেই। আমার জীবনের প্রতিটি পাতা সকলের জন্য খোলা।

আমি সব চেয়ে গরীব মেথরের পায়ের ধুলো নিতে পারি। কিন্তু সম্রাটের কাছে মাথা নীচু করে দাঁড়াতে রাজী নই।

সূচীভেদ্য অন্ধকারের মধ্যে যেদিন আলোর রশ্মি দেখতে পাবো, সেদিন আমি সবাইকে ডাক দোব।

আমার জীবন এখানেই শেষ হতে পারে। এতদিন ধরে যে হিন্দু ও মুসলমান

ভাই-বোনের মত বাস করে এসেছে, তাদের মনে মিলনের প্রতিষ্ঠা করতে আমি আপ্রাণ চেষ্টা করবো। ফলদাতা একমাত্র ভগবান।

হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে ভ্রাতৃভাব স্থাপিত না হলে আমি দেহরক্ষা করবো।

দেখো, আমি এখন বাঙালীর মধ্যে তাদেরই একজন—আজ আমি বাঙালী। আমি নোয়াখালিবাসী। এখানেই আমার কাজ।

আমার মুখের পানে তাকাও, আমি আমার উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কৃতসংকল্প। হয় আমি আমার লক্ষ্যে পৌছাবো অথবা এখানেই দেহরক্ষা করবো।

আমি আবার জন্মগ্রহণ করতে চাই না। কিন্তু যদি পুনরায় জন্মগ্রহণ করি তবে যেন অস্পৃশ্যদের মধ্যেই জন্মাই। তাতে আমি তাদের অসুবিধার অংশ গ্রহণ করতে পারবো, তাদের মুক্তির জন্য খাটতে পারবো।

আমি নিজেকে খৃস্টান, মুসলমান, পার্শী, ইহুদী, শিখ, জৈন অথবা অপর যে-কোন সম্প্রদায়ভুক্ত বলে মনে করি। তার অর্থ এই যে, আমি সর্বধর্মের সার মর্ম গ্রহণ করেছি। এই নীতি-পথ ধরে আমি সংঘাতের দায় হতে অব্যাহতি পেয়েছি এবং ধর্ম সম্বন্ধে স্বীয় বিশ্বাসের পরিধি ব্যাপক করতে সমর্থ হয়েছি।

ইসলাম ধর্মের ব্যাপারে নিজেকে আমি বাইরের লোক বলে মনে করি না। অন্যান্যের ধর্মমতের মত ইসলাম ধর্মকেও আমি নিজের ধর্ম বলেই শ্রদ্ধা করি। এই সহানুভূতি ও বন্ধুত্বের মনোভাব নিয়ে তার সমালোচনাও করি।

আমি প্রতিমা পূজায় অবিশ্বাস করি না।

ভগবান, অদ্বৈতবাদ, পুনর্জন্ম ও মুক্তিতে আমি বিশ্বাস করি।

বেদ, উপনিষদ, পুরান, সমস্ত হিন্দুশাস্ত্র অবতার ও পুনর্জন্মে আমি বিশ্বাস করি।

আমি বিশ্বাস করি বাইবেল, কোরাণ ও জিন্দাবেস্তা বেদের মত অপৌরুষেয়।

প্রতিমা পূজা মানুষের স্বভাব-ধর্ম। আমরা প্রতীক চাই। প্রতিমা আমাদের উপাসনায় সাহায্য করে। কোন হিন্দুই মূর্তিকে ভগবান বলে মনে করে না। মূর্তি পূজাকে আমি পাপ বলে মনে করি না।

আমার মনে ভারতবাসীর যে চিত্র আছে, তাতে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী লোক ঘনিষ্ট বন্ধুভাবে পাশাপাশি লাগালাগি বাস করবে, তাতে ধনী-দরিদ্রের কোন প্রশ্ন থাকবে না। তাদের সকলেই হবে রাজা, আবার প্রজাও। এই স্বপ্নকে স্বার্থক করতে আমি হাসিমুখে মরতে প্রস্তুত। ভারতবাসী গৃহযুদ্ধে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হবে, তা দেখেও বেঁচে থাকার ইচ্ছা আমার নেই।

আমি নিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, যে-জাতির মাঝে আমি জন্মেছি,

দিনের পর দিন ধরে যে জাতির দুঃখকষ্ট আমি প্রত্যক্ষ করেছি, তাদের সেবা করতে হলে সমস্ত সম্পত্তি ও অধিকার ত্যাগ করতে হবে।

যতক্ষণ তোমার দেহ আছে ততক্ষণ সে দেহকে আবৃত করার জন্য বস্ত্রখণ্ড প্রয়োজন। কিন্তু তজ্জন্য যত কম প্রয়োজন তাই গ্রহণ করবে। থাকার জন্য প্রকাণ্ড প্রাসাদের দরকার নেই, মাথার উপর সমান্য একটু আচ্ছাদন হলেই চলবে। খাদ্য সম্বন্ধেও সেই একই কথা।

এখন দেখ, তোমার ও আমার মাঝে আধুনিক সভ্যতার যে সংজ্ঞা বিদ্যমান তার মাঝে প্রাত্যহিক ব্যাপারে কত বিরোধ রয়েছে। যে চিত্র আমি তোমাদের সামনে ধরেছি তা আনন্দময় ও বাঞ্ছনীয় সমাজ-ব্যবস্থা। আরেকদিকে দেখ, আমাদের সভাতার মূলকথাই হচ্ছে অভাব-বোধকে বৃদ্ধি করা। তোমার যদি একখানি ঘর থাকে তুমি দু'খানি ঘর চাইবে, তার পর তিনখানি, যত বেশী পাবে ততো খুসি হবে। এবং এইভাবেই তোমার বাড়ীতে যত আসবাব পত্র পাবে ততই চাইবে। যত বেশী তোমার থাকবে তুমি সভ্যতার ততো বড় প্রতিভূ বলে গণ্য হবে। আমার কথাগুলি তেমন সুন্দর হচ্ছে না, কিন্তু আমি যা বুঝেছি তাই বলছি।···

অপর পক্ষে তোমার যত কম থাকবে, ততো কমই তুমি চাইবে, ততো ভালো থাকবে···ঈশ্বরের ইচ্ছায় যতদিন এই দেহ আমি ধারণ করে আছি, বিলাস বা আত্ম-সুখের জন্য সে দেহকে আমি নিযুক্ত রাখতে পারি না। কিন্তু সারাদিন সেবার কাজেই নিয়োগ করবো। দেহের বেলা যদি এই নীতি খাটে তাহলে বেশ ভূষার বেলায় খাটবে না কেন ?···

যখন জগতের সব কিছু তুমি ত্যাগ করবে, তখন পৃথিবীর সমস্ত বৈভব তোমারই হবে। তখন যতটুকু তোমার সত্যকারের প্রয়োজন তা তুমি পাবে। যখন খাদ্য প্রয়োজন হবে, খাবার তোমার কাছে আপনি এসে পড়বে।

ঈশ্বর তোমাকে পরীক্ষা করছেন। যখন তিনি দেখবেন তোমার বিশ্বাস টলে যাচ্ছে, তোমার দেহ আর সইতে পারছে না, তুমি ডুবে যাচ্ছ তখন ভগবান যেভাবেই হোক তোমাকে উদ্ধার করতে আসবেন। এবং দেখিয়ে দেবেন যে তিনি সবসময় তোমার ডাকে সাড়া দেন। আমি তা দেখেছি। এমন একটি ঘটনাও আমি জানি না, যখন শেষ মুহূর্তে তিনি মানুষকে পরিত্যাগ করেছেন।······

আমি যদি কোন জিনিষ সংগ্রহ করে রাখি যা আমার এখনই প্রয়োজন নেই তা হলে সে জিনিষটি আমি অপরের কাছ থেকে চুরী করেছি বলে গণ্য হবে ;···ভারতে লাখ লাখ লোক আছে যারা দিনে একবার মাত্র খেতে পায়—একখানি চাপাটি ও

একটু লবণ। সেই লাখ লাখ লোক খেতে পরতে না পাওয়া পর্যন্ত কোন জিনিষেই আমার কোন অধিকার নেই।

যখন আমরা আমাদের কোন অভাব মিটাবার জন্ম প্রতিবেশীকে ছেড়ে দিয়ে অন্য কোথাও যাই। তাহলে আমরা জীবনের ধর্ম থেকে পতিত হব।...তোমার গাঁয়ে শহর থেকে যে নাপিত এসেছে তাকে বাদ দিয়ে গাঁয়ের নাপিতের কাছে যাওয়াই তোমার কর্তব্য। তুমি যদি চাও তোমার গাঁয়ের নাপিত নৈপুন্যে শহরের নাপিতের সমকক্ষ হবে, তাহলে তাকে সেইমত শিক্ষা দিতে পার। তাকে শহরে পাঠিয়ে দাও। তা না করে অন্য কোন নাপিতের কাছে যাবার কোন যুক্তি নেই। এরই নাম স্বদেশী।

ভারত পরিভ্রমণ কালে আমি দেখেছি সারা দেশ ভয়ে বিকল হয়ে আছে। পাঁচ জনের সামনে আমরা মুখ খুলতে পারি না। গোপনে আমাদের মতামত ব্যক্ত করি।...আমি শুধু আপনাদের একটি কথা বলতে চাই যে ভগবান ছাড়া আমরা আর কাউকে ভয় করবো না। যখন ভগবানকে ভয় করবো তখন আর কোন মানুষকে ভয় করার প্রয়োজন নেই,তা সে মানুষ যত উচ্চপদেই অধিষ্ঠিত হোক না কেন!

আমি যখন আমার জয়ধ্বনি শুনি তখন মনে হয় যে শ্রবণ-মাত্র প্রত্যেক ধ্বনি এক একটি শেলের ন্যায় হৃদয় বিদ্ধ করছে। যদি বুঝতাম এই রূপ জয়ধ্বনি করলে তোমাদের স্বরাজ লাভ হবে তাহলে আমি এ ক্লেশ সহ্য করতে পারতাম। কিন্তু যখন দেখি লোকের সমস্ত শক্তি ও সময় কেবল অযথা চীৎকারে ব্যয়িত হয়ে কাজের ক্ষতি করছে তখন মনে হয় ঐরূপ জয়ধ্বনি না করে তারা যদি চিতানল প্রজ্জ্বলিত করতো তাহলে তাতে প্রবেশ করে আমি হৃদয়ের জ্বালা নিবারিত করতে পারতাম।

আমি মহাত্মা নই, আমি দীনাতিদীন, কেবল মহাত্মা নামের দুঃখ ভোগের বোঝা মাথায় নিয়ে বেড়াচ্ছি। আমি ঋষি নই, মুনি নই, অবতার নই, নই সন্ন্যাসী। আমি গৃহী, আমি দেশের সেবক, আমি শুধু সত্য-সন্ধানী। আমি সাধু নই, রাজনীতিকও নই। সত্য যে অখিল জ্ঞানের উৎস, ইহাই আমি মাঝে মাঝে গভীর ভাবে উপলব্ধি করি মাত্র।

আমি যদি কোন পুণ্য অর্জন করে থাকি, তবে সে পুণ্য সত্য ও অহিংসা। অতি মানবীয় কোন শক্তি আমার নেই, সে শক্তির কামনাও আমি করি না।

পৃথিবীকে সন্তুষ্ট করবার জন্ম আমি কখনও ভগবানের বিরোধিতা করতে পারি না।

আমি জানি ঈশ্বর উর্ধাকাশে বা পৃথিবী গহ্বরে বাস করেন না। তিনি সকল মানবের মধ্যে সমভাবে বিরাজ করে থাকেন। মানব সেবার ভিতর দিয়েই আমি ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করবার সাধনা করি।

আমি মুক্তি চাই। সমাজের একজন বলে আমি শুধু নিজের জন্যই মুক্তি চাই না। উপরন্তু সকলের জন্যই মুক্তি চাই। তাই আমার এ গণ-প্রার্থনা।

এক অনির্বচনীয় দুজ্ঞেয় শক্তি সব কিছুকে সমাচ্ছন্ন করে বিরাজ করছে। আমি সেই শক্তিকে প্রত্যক্ষ না করলেও অনুভব করি।

আমি প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করেছি যে মৃত্যু জীবনের রূপান্তর ছাড়া আর কিছুই নয়। যেখানেই মৃত্যুর মুখোমুখি হব, সেইখানেই তাকে আলিঙ্গন করবো।

পৃথিবী থেকে একজন পাপিষ্ঠকে অপসারিত করার ইচ্ছায় যদি কেউ আমাকে গুলি করে তাহলে সে গুলিতে আসল গান্ধী নিহত হবেন না, আক্রমণকারীর চোখে যাকে পাপিষ্ঠ বলে মনে হচ্ছে সেই গুলিতে সেই মারা পড়বে।

যারা আমার প্রতি দোষারোপ করছে তাদের হাতে মৃত্যু হলেও যেন তাদের অমঙ্গল চিন্তা না করি, ঈশ্বর যেন আমাকে সেইরূপ মানসিক শক্তি দেন।

আমার সামনে যখন যে কর্তব্য এসে উপস্থিত হয় তা সম্পাদন করেই আমি আনন্দিত। কি বা কেন প্রশ্নদ্বারা আমি বিচলিত বা বিভ্রান্ত হতে চাই না।

জীবনে আমি আশা কখনও ত্যাগ করিনি। গভীর অন্ধকারের মধ্যেও আমার অন্তরে আশার উজ্জ্বল আলো জ্বলতে থাকে। আমি নিজে কখনও সে আশা নষ্ট করতে পারি না।

সত্য ও সুন্দরের পূজারী আমি ; সত্য ও সুন্দরের আরাধনায় নিয়োজিত আমার জীবন, সত্য ও সুন্দরের প্রয়োজনে আহুতি দিতে আমি সর্বদাই প্রস্তুত।

মৃত্যুর সম্ভাবনায় আমি উল্লসিত হয়ে উঠি, যেমন করে লোকে বহুদিনকার হারান বন্ধুকে পেয়ে উল্লসিত হয়।

আমি নিজেকে যে কোন সম্প্রদায় ভুক্ত বলে মনে করি। এই কারণে আমি ধর্ম সম্পর্কে নিজের বিশ্বাসের পরিধি ব্যাপক করতে সক্ষম হয়েছি।

ধর্মনীতি ও অর্থশাস্ত্রের মধ্যে কোন সম্বন্ধ নেই—একথা স্বীকার করতে আমি মোটেই প্রস্তুত নই।

মানুষের প্রকৃতিকে আমি কোনপ্রকারে সন্দেহ করতে প্রস্তুত নই। যে কোন মহান ও বন্ধুসুলভ কাজে মানুষের অন্তর সাড়া না দিয়ে পারে না।

শত্রুর অন্তর জয় করে তাকে বন্ধুতে পরিণত করাই আমার কাজ।

## আমাদের গান্ধিজী

পবিত্র ও সৎজীবনের ভিতর দিয়ে বিনা রক্ত পাতে পৃথিবীতে শান্তিরাজ্য প্রতিষ্ঠা করাই আমার জীবনের সর্বপ্রধান ব্রত।

আমি ইংরাজের বিরোধী নই, যা অসত্য ও অন্যায় আমি তারই বিরোধী।

অহিংসা আমার কাছে শুধু দার্শনিক তত্ত্বই নয়। ইহা আমার প্রাণস্বরূপ। সারা জীবনের অভিজ্ঞতায় আমার এই বিশ্বাস জন্মেছে যে কেবলমাত্র অহিংসার পথেই পৃথিবীকে বাঁচানো যায়।

আমার জীবনের মূলমন্ত্রের আদি ও শেষ কথা অহিংসা।

জীবনকে মহৎ ও উন্নত করার জন্য চরকার চেয়ে বড় আর কিছু আমার জানা নেই। দেশের দরিদ্রতম ব্যক্তির জন্য যখন চরকা কাটা যায় তখন সে চরকা কাটা মহানও হয়ে ওঠে।

আদর্শগত ভাবে আমি সমবণ্টন চাই। কিন্তু যতদূর মনে হয় এই আদর্শ কোন দিনই সফল হবে না। সেইজন্য আমি উপযুক্ত বণ্টনের পক্ষপাতী।

শ্রমসাধ্য পরীক্ষার দ্বারা আমি অহিংসা ও সংযমের যে স্তরে এসে পৌছেছি যে কোন নরনারী আমার মত চেষ্টা করলে সেও সেই স্তরে এসে পৌছাতে পারে।

আমি ব্যাংকিং বুঝি না, তবে ভয় ও ঈশ্বর-বিশ্বাসের অভাবেই যে জীবনবীমার প্রতিষ্ঠা হয়েছে, একথা বেশ বুঝি।

আজ যন্ত্রের সাহায্যে কিছু লোক লাখ লাখ লোককে পদানত করে রেখেছে। কয়েকটি লোক একচেটিয়া ভাবে বিত্তশালী হবে, ইহা আমি চাই না। আমি চাই সকলেই অর্থের অধিকারী হোক্।

দেশকে ভালবাসেন বলে সন্ত্রাসবাদীকেও আমি শ্রদ্ধা করি। যে বীর দেশের জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত তাঁকে আমি শ্রদ্ধা ও সম্মান জানাই। কিন্তু আমার প্রশ্ন এই—হত্যা করা কি পুণ্য কাজ?

আমার মত অল্পাত্মাকে মাপবার জন্য সত্যের মাপকাঠিকে যেন কখনও খাটো করা না হয়।

মানব সমাজকে সজীব করার জন্য জাতি যেন নিজের জীবন দান করতে পারে, সে জাতীয়তাবাদই আমি চাই এইরূপ জাতীয়তাবাদেরই আমি অনুরক্ত।

আপাত দৃষ্টিতে মনে হয় স্বাধীনতার জন্য আমার উদ্‌ভাবিত পথ অতি দীর্ঘ। কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে এই পথই সর্বাপেক্ষা হ্রস্ব ও সরল।

আমার জাতীয়তাবাদ উগ্র সন্দেহ নেই কিন্তু এই জাতীয়তাবাদ অপর জাতিকে অগ্রাহ্য করে না, অপর জাতির অমঙ্গল সাধন করতেও জানে না।

আমার সেবার যদি প্রয়োজন থাকে এবং ভগবানের যদি ইচ্ছা হয়, তবে আমি ১২৫ বৎসর পর্যন্ত বেঁচে থাকবো।

এই ভারতবর্ষ আমার স্বর্গ। কিন্তু তাই বলে আমি স্বদেশী ও বিদেশীর মধ্যে কোন ভেদনীতির কথা ভাবতেও ঘৃণা বোধ করি।

আমার অনশনকে কোন অর্থেই রাজনৈতিক চাল বলে মনে করা উচিত হবে না। ধর্ম ও বিবেকের অনিবার্য আহ্বানে আমি অনশন গ্রহণ করি। গভীর মর্মবেদনা হতেই এই অনশনের জন্ম।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই যে নিজের দুর্বলতা না থাকলে কোন মানুষই স্বাধীনতা হারায় না।

ভারতের স্বাধীনতার ভিতর দিয়ে আমি বিশ্বভ্রাতৃত্ব সম্ভব করে তুলতে চাই। ইহাই আমার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্রত।

শোষণের পিছনে রয়েছে হিংসা। ভবিষ্যৎ অহিংস সমাজে সর্ববিধ শোষণ কলুষ নিশ্চিহ্নভাবে মুছে যাবে—ইহাই আমার কাম্য।

দরিদ্র জনগণের স্বরাজই আমার স্বপ্নের স্বরাজ। রাজন্যগণ ও বিত্তশালী ব্যক্তিরা যে সকল দ্রব্য ভোগ করেন, সকলেই স্বচ্ছন্দে সেই সকল দ্রব্য ভোগ করতে পারেন—ইহাই হোল আমার নীতি।

ভারতবর্ষকে ইংরাজের কবল থেকে মুক্ত দেখাই আমার একমাত্র লক্ষ্য নয়। দেশকে সকল প্রকার হীনতা থেকে মুক্ত করাই আমার পণ।

ভারতবর্ষ তরবারীর নীতি অনুসরণ করে সামরিক জয়লাভ করতে পারে কিন্তু তাহলে সে ভারতবর্ষ আর আমার হৃদয়ের গর্বের বস্তু থাকবে না।

হিন্দুধর্মকে আমি সর্বোচ্চ স্থান দিই না। সেই ধর্মই আমার ধর্ম যা থেকে হিন্দু-ধর্মের উদ্ভব, যা মানুষের প্রকৃতিকে বদলে দেয়, যা অন্তরের সত্যের সঙ্গে মানুষের মনকে অচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত করে, যা আত্মোপলব্ধির জন্য কোন মূল্য দিতেই পশ্চাৎপদ হয় না, যা স্রষ্টাকে জানতে চায় ও স্রষ্টার সঙ্গে যোগাযোগ সৃষ্টি করতে চায়। সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মগত কার্যগুলিকে পৃথক করে ফেলা যায় না। কর্ম থেকে ধর্ম আলাদা নয়।

পুঁজিবাদকে আমি নিশ্চিহ্ন করে ফেলতে চাই, গোঁড়া সমাজতান্ত্রিক ও সাম্যবাদীরা যা চায়, কিন্তু আমার কর্মপদ্ধতি ভিন্ন, আমার ভাষা আলাদা।

মানুষ অনেক সময় দিবাস্বপ্ন দেখতে ভালবাসে, আমিও দিবাস্বপ্ন দেখি। সারা পৃথিবী ব্যেপে শুধুই সজ্জন বিরাজ করছে এই চিত্র পরিকল্পনা করতে আমার

ভালো লাগে।···সমাজতান্ত্রিকেরা বলেন নতুন সমাজ গড়ে উঠবে, নতুন ধারা প্রবর্তিত হবে। আমিও এক নতুন জীবন ধারার অভিলাষী, যা জগতে বিস্ময় সৃষ্টি করবে।

আমি যন্ত্রকে ধ্বংস করতে চাই না, তার কর্মক্ষেত্রকে সীমাবদ্ধ করতে চাই। কুটীর-বাসী কোটি কোটি মানুষের কর্মভার লাঘব করবে যে যন্ত্র তাকে আমি স্বাগত জানাই।···যদি গাঁয়ের ঘরে ঘরে আমরা বিদ্যুৎশক্তি পৌঁছে দিতে পারি, সেই বিদ্যুৎশক্তির সাহায্যে গ্রামবাসীরা যন্ত্র চালালে আমি ক্ষুন্ন হব না।···কিন্তু স্বল্প-সংখ্যক লোকের হাতে বিত্ত ও ক্ষমতা সঞ্চয় করার জন্য যদি যন্ত্রের ব্যবহার হয় আমি তা অন্যায় ও পাপ বলে মনে করি। আধুনা যন্ত্র এই উদ্দেশ্যেই ব্যবহৃত হয়।··· ভারতের সাত লাখ গাঁয়ে যে সজীব যন্ত্র ছড়িয়ে আছে তার বিকল্পে প্রাণহীন যন্ত্র বসাতে চাই না। যন্ত্র যদি মানুষকে সাহায্য করে ও তার কাজকে সরল করে তবেই তার ব্যবহার সার্থক হয়। অধুনা যন্ত্রের ব্যবহার হয় মুষ্টিমেয় লোকের পকেট ভর্তি করার জন্য। যন্ত্র কোটি কোটি লোকের গ্রাস কেড়ে নেয়, সেদিকে দৃষ্টি দেয় না।··· আমাদের দেশের যা কিছু প্রয়োজন তা যদি তিন কোটি লোকের বদলে ত্রিশ হাজার লোকের দ্বারা প্রস্তুত হয়, আমার কোন আপত্তি নেই। কিন্তু ওই তিন কোটিকে অলস করে বেকার বসিয়ে রাখা চলবে না।···পণ্ডিত নেহেরু যন্ত্রশিল্পের পক্ষপাতী, তিনি ভাবেন সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা হলে পুঁজিবাদ থাকবে না। কিন্তু আমার মতে যন্ত্রশিল্পের মধ্যেই দুর্নীতি নিহিত আছে, সমাজতান্ত্রিকতা তার মূলোৎপাটন করতে পারবে না।

আমাকে যদি কেউ মেরে ফেলতে চায়, তার হাতে খুসি মনে আমি মরতে পারবো এই বিশ্বাস আমার আছে। তাহলে অপর সকলকে আমি যেভাবে মরতে বলি, আমার সেইভাবেই মৃত্যু হবে।

আমি মহাত্মা এমন দাবী আমি কখনও করি নাই। আমি আপনাদের মতই একজন সাধারণ লোক—তফাৎ এই যে আমি আপনাদের চেয়ে অনেক বেশী দুর্বল। আমার পক্ষে হয়তো আজ একথা বলা যাবে যে আপনাদের চাইতে ভগবানে আমার বিশ্বাস অধিকতর দৃঢ়। হিন্দু, শিখ, পার্শী, মুসলমান ও খৃষ্টান সকল ভারতবাসীই যদি ভারতবর্ষের জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত থাকে তবে ভারতবর্ষের কখনও কোন বিপদ ঘটবে না। আপনাদের ঋষি বাক্য স্মরণ করতে বলি—একমাত্র সত্যেরই জয় হয়, অসত্যের কখনও নয়।

ভারতের স্বাধীনতার জন্য আমি জীবন পণ করেছিলাম। সেই স্বাধীনতার অপঘাত-মৃত্যু আমি দেখতে চাই না। প্রতি শ্বাস-প্রশ্বাসে ভগবানের কাছে আমি প্রার্থনা

জানাচ্ছি, হয় আগুন নিভাবার শক্তি দাও নয়তো আমাকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে নাও!

**প্রাদেশিকতা—**

সংবাদপত্রে দেখলাম কয়েকজন আসামী মনে করছেন যে আসাম কেবল তাঁদেরই। প্রত্যেক প্রদেশে যদি এইরূপ মনোভাবের উন্মাদনা হয় তাহলে ভারতবর্ষ কার হবে! আমার মত এই যে বিভিন্ন প্রদেশবাসীরা সকলেই ভারতের এবং ভারত তাদের সকলেরই। তবে এর একটিমাত্র সর্ত আছে—তা এই যে, অন্য প্রদেশকে শোষণ, শাসন অথবা কোন মতে ক্ষতিগ্রস্ত করার উদ্দেশ্যে কেউ তথায় গিয়ে বসবাস করতে পারবে না। সকলেই ভারতবর্ষের সেবক, এবং সেবার ভার নিয়ে সকলকেই জীবনযাত্রা নির্বাহ করতে হবে।

সংবাদ এসেছে ( দার্জিলিঙে ) একটি গুর্খা লীগ আছে—ঐ লীগ সমতলের লোক দার্জিলিঙে এলে উষ্মা প্রকাশ করে। উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য তারা বল প্রয়োগ করে এরূপ সংবাদ এসেছে।…এই সব যুবকের কল্পনা শক্তি নেই, ভারতবর্ষের প্রতি ভালবাসাও নেই।

বিহার নিঃসন্দেহে বিহারীদের, কিন্তু বিহার ভারতেরও। আর বিহার সম্বন্ধে যে কথা সত্য সে কথা ভারত যুক্তরাষ্ট্রের অন্যান্য প্রদেশ সম্পর্কেও সত্য। কোন ভারতীয়ই বিহারে বিদেশী বলে গণ্য হবে না।…বিহার, উড়িষ্যা ও আসামে প্রাদেশিক ব্যাপার নিয়ে ব্যক্তিগত বলপ্রয়োগের যে কুৎসিত অভিনয় হোল, তা একেবারেই হওয়া উচিত নয়।

সংকীর্ণ প্রাদেশিকতা আমাদের জীবনের সকল অনর্থের মূল। ভারতের সীমা যতদূর, আমার প্রদেশ কার্যতঃ ততদূর বিস্তৃত হওয়া উচিত। আর ভারতের সীমাও শেষ পর্যন্ত পৃথিবীর সীমারেখায় বিলীন হওয়া চাই। নইলে ধ্বংস হবে।

**ধনিক ও শ্রমিক—**

শ্রমিকেরা অজ্ঞতায় ডুবে আছে। তাই হয় তারা ধনপতিদের কথায় উঠে বসে, নয়ত ধনপতিদের জান-মাল বা কলকব্জা নাশ করার ধৃষ্টতাকে বাহাদুরী মনে করে।… হিংসার আশ্রয় নিলে শ্রমিকদের কল্যাণ হবে না—ফলবন্ত বৃক্ষের মূলেই তাহলে তারা কুঠারাঘাত করবে। শ্রমিক ধনপতি অপেক্ষা বহুলাংশে শ্রেষ্ঠ।…আমি মনে করি মুদ্রা ব্যতীতই কেবল শ্রমিকের দ্বারাই দুনিয়ার কাজ চলতে পারে—ইহা অবাস্তব কল্পনা নয়।…শ্রমিক ধনিক প্রীতির বন্ধনে অভিন্ন দৃষ্টি হোক, ইহাই আমি চাই। পরস্পরের সংগে সহযোগিতা করলে তারা অঘটন ঘটাতে পারবে। কিন্তু সহযোগের পথে বুদ্ধি পূর্বক যতদিন না তারা নিজের ঘর গুছিয়ে নিচ্ছে, ততদিন ধনিকের সংগে

তাদের কিছুতেই সমানের সংগে সমানের সহযোগ হতে পারে না। ধনিকেরা সংঘবদ্ধ ভাবে কাজ করতে জানে তাই শ্রমিকদের তারা তাঁবে রাখতে পারছে।···শ্রমিকদের পরস্পরের সংগে সহযোগিতায় যদি কোন ফাঁক না থাকে, তা যদি অহিংসার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে প্রয়োজনীয় মূলধন আপনিই তাদের হাতে আসবে, যেমন লোহা ছুটে আসে চুম্বকের আকর্ষণে। সেই শুভদিনের আগমনে শ্রমিক-ধনিকের ঝগড়া অন্তর্হিত হয়ে যাবে। তখন শ্রমিক পর্যাপ্ত খেতে পাবে, বাসযোগ্য সুন্দর গৃহে বাস করতে পাবে, সন্তানের উপযুক্ত শিক্ষা দিতে সক্ষম হবে, নিজে লেখাপড়া করবার যথেষ্ট সময় পাবে; প্রয়োজনীয় চিকিৎসার জন্যও আর তখন তাদের ভাবতে হবে না।

**পাকিস্তান—**

স্বীকার করি যে 'লড়কে লেংগে পাকিস্তান' রব তোলা মুসলীম-লীগের অন্যায় হয়েছে। ভারত বিভাগের কথা আমি মনেও স্থান দিতে পারি নাই। বস্তুতঃ জোর করে মুসলমানেরা ভারত বিভাগ করতে পারতো না। কংগ্রেস ও বৃটিশরাজ স্বীকার না করলে পাকিস্তান হোত না। যা হচ্ছে তা এখন ওলটানো যাবে না। পাকিস্তানের মুসলমানদের পাকিস্তানের দাবী এখন গ্রাহ্য। আপনাদের কেবল ভেবে দেখতে বলি স্বাধীনতা আপনারা পেলেন কি ভাবে, কংগ্রেসই বস্তুতঃ লড়েছে। লড়বার অস্ত্র ছিল নিরুপদ্রব আইন বিরোধ। ভারতবাসীর নিরুপদ্রব প্রতিরোধের কাছে পরাজয় স্বীকার করে ইংরাজ ভারতবর্ষ ত্যাগ করেছে। জোর করে পাকিস্তান নাকচ করতে গেলে স্বরাজই নাকচ করা হবে। ভারতবর্ষে আজ দু'টি রাষ্ট্র। ন্যায়-অন্যায়ের প্রতিকারের জন্য নাগরিকদের কর্তব্য একরাষ্ট্রের সহিত অপর রাষ্ট্রের বুঝাপড়া করতে দেওয়া। প্রতিদিন বৃথা এই যে জীবন হানি ঘটছে তাতে কারো লাভ হচ্ছে না, অশেষ ক্ষতিই হচ্ছে। আইনের ধার না ধরে লোকে যদি পরস্পর মারামারি কাটাকাটি করে তবে প্রমাণিত হবে স্বাধীনতা আমাদের ধাতে সয় না। দুই রাষ্ট্রের যে কোন রাষ্ট্র বরাবর ন্যায়ের পথ ধরে চললে অপর রাষ্ট্রের ন্যায় আচরণ করা ছাড়া উপায় থাকবে না। সারা পৃথিবী তখন ন্যায়ের সমর্থনে অগ্রসর হবে।······

আমি চিরকাল যুদ্ধের বিরোধী কিন্তু পাকিস্তানকে যদি কোন ক্রমেই ন্যায়ের পথে আনা না যায়, যদি প্রামাণিক অন্যায়কেও পাকিস্তান অন্যায় বলে স্বীকার করতে অস্বীকার করে, তেমন কিছু নয় বলেই যদি তাকে পাকিস্তান উড়িয়ে দিতে চায়, তবে ইউনিয়ন গবর্মেন্টের পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা ছাড়া উপায় থাকবে না। যুদ্ধ হাসি ঠাট্টা নয়। যুদ্ধ কেউ চায় না। যুদ্ধ সর্বনাশের পথ। কিন্তু আমি কাউকে

## —শ্রদ্ধাঞ্জলী—

**স্বদেশীয়—**

—আমি কি করিয়া তাঁহার কথা প্রচার করিব। তাঁহার ভাস্বর আত্মার তুলনা আমি কিছুই নই। আর যিনি স্বভাবতই মহৎ তাঁহাকে আর চেষ্টা করিয়া মহ করিতে হয় না। তাঁহারা নিজের প্রভায় নিজেই জাজ্বল্যমান থাকেন এবং যখন সমগ্র জগৎ প্রস্তুত হয়, তখন তাঁহারা লোকসমাজে প্রত্যক্ষ হন। যখন সময় আসিবে তখ গান্ধীরও প্রচার হইবে, কারণ আজ তাঁর প্রচারিত প্রেম, স্বাধীনতা ও ভ্রাতৃত্বের বা সমগ্র জগতের বিশেষ দরকার।

সমগ্র প্রাচ্যের আত্মা আজ গান্ধীতে মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে, কারণ তিনিই আজ দেখাইতেছেন যে মানবের আদিম উপদেশ, আধ্যাত্মিকতা, নৈতিক এবং আধ্যাত্মিব জীবনের মধ্য দিয়াই মানবের আত্মার পরিস্ফূর্তি হয়, কিন্তু বিদ্বেষ ও যুদ্ধ-সজ্জার মধে মানবের দেহ ও মন উভয়েই বিনষ্ট হইয়া যায়।

আমরা গান্ধিজীর নিকট কৃতজ্ঞ, কারণ, মানুষের স্বর্গীয় সত্তায় ভারতের বিশ্বাস যে আজও বাঁচিয়া আছে, তাহা প্রমাণ করিবার সুযোগ তিনিই ভারতকে দিয়াছেন।

মহাত্মা গান্ধী যে নৈতিক শক্তির প্রতিভূ এবং পৃথিবীতে একমাত্র প্রতিভূ, সেই শক্তিতে আমাদের সকলের প্রয়োজন আছে।

এমন দিন আসিবে, যে দিন দুর্বল, সৎ, সম্পূর্ণ নিরস্ত্র মানুষ প্রমাণ করিবে যে অবনতরাই পৃথিবীর ভাবী অধিকারী। ইহাই যুক্তিযুক্ত যে মহাত্মা গান্ধী, যিনি শরীরে দুর্বল বস্তুসম্পদে অসহায়, তিনিই প্রমাণ করিলেন যে ভারতের নির্বিত্ত নির্য্যাতিত মানুষের অন্তরে অবনত বিনতের অজেয় শক্তিই গোপন রহিয়াছে।…

—রবীন্দ্রনাথ

—যে সমস্ত মহাপুরুষ নূতন যুগের বার্তা ঘোষণা করেন। ভগবৎ-দত্ত শক্তিবলেই তাঁহারা কার্য করিয়া থাকেন। তাঁদের ভিতর দিয়া আমরা চিরন্তন মহাত্মার অভিব্যক্তি দেখিতে পাই। এই মাহাত্ম্যের আলো-রেখা যুগ-যুগান্তের সঞ্চিত সামাজিক আবর্জনাকে এবং অন্যায়কে স্পর্শ করে ও আমাদিগকে আত্মানুভূতির সুযোগ দেয়। মহাত্মাজী এমনিতর একটি সত্য আবিষ্কার করিয়াছেন—অহিংসব্রত উদ্‌যাপন কর, আত্মাকে অনুভব কর ও আত্মস্থ হও—ইহাই তাঁহার শিক্ষার মূলমন্ত্র। বিভিন্ন যুগে এই প্রকারই বিভিন্ন শিক্ষা ভারতবাসীকে কর্মের পথে নিয়োজিত করিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে

এই মূলসত্যের উপরেই ভারতীয় সভ্যতা স্থাপিত, এবং এই জন্যই জাতি ও ধর্মানুসারে, বহুধা বিভক্ত লক্ষ লক্ষ ভারতবাসীকে একতা সূত্রে আবদ্ধ করা মহাত্মার পক্ষে সম্ভবপর হইয়াছে। পাশ্চাত্যের রীতিনীতিই যে এক মাত্র রীতিনীতি নহে এবং প্রাচ্যের যে অন্ধের ন্যায় পাশ্চাত্যের সভ্যতার অনুসরণ করার কোন প্রয়োজনীয়তা নাই, মনীষী ব্যক্তিগণ বারংবার ইহা বলিয়াছেন। কিন্তু মহাত্মার ভিতর দিয়াই ভারত এই সত্যের পূর্ণ উপলব্ধি করিয়াছে।...

—আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র

—মহাত্মা গান্ধী ভারতবর্ষের এবং ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের যে কল্যাণ সাধন করিয়াছেন তাহা এমনই অনন্যসাধারণ ও অতুলনীয় যে চিরকালের জন্য আমাদের জাতীয় ইতিহাসের পৃষ্ঠায় তাঁহার নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে। ভারতবর্ষের যখন কোনই আশা ছিল না। ভারতবাসীরা যখন জাতীয় সংগ্রামে নূতন পদ্ধতি ও নূতন অস্ত্রের জন্য অন্ধকারে হাতড়াইতেছিলেন, ঠিক সেই শুভ-মুহূর্তে গান্ধিজী তাঁহার অভি-নব অসহযোগ ও সত্যাগ্রহ লইয়া অবতীর্ণ হইলেন। তিনি যেন ভারতবর্ষকে স্বাধী-নতার পথ দেখাইবার জন্য বিধাতা কর্তৃক প্রেরিত হইলেন। অচিরাৎ সমস্ত ভারতবর্ষ স্বেচ্ছায় তাঁহার পতাকাতলে সমবেত হইল। ভারতবর্ষ বাঁচিয়া গেল। প্রত্যেক ভারতবাসীর মুখ আশায় ও বিশ্বাসে উদ্ভাসিত হইল। চরম জয় সম্বন্ধে আর কোন সন্দেহ রহিল না। ইহা বলিলে বিন্দু মাত্র অত্যুক্তি হইবে না যে তিনি যদি ১৯২০ সালে সংগ্রামের অভিনব অস্ত্র হাতে আগাইয়া না আসিতেন তাহা হইলে ভারতবর্ষের মোহ আজও ভাঙিত না। কোনও একজন ব্যক্তি এরূপ অবস্থার বিপাকে এক জীবনে এতখানি সাফল্য অর্জন করেন নাই। ঐতিহাসিক তুলনা হিসাবে তাঁহার কাছাকাছি মুস্তাফা কামালের নাম করা যাইতে পারে। ১৯২০ সাল হইতে ভারত-বাসীরা মহাত্মা গান্ধীর নিকট দুইটি শিক্ষা পাইয়াছে, স্বাধীনতা অর্জনের পক্ষে যে দুটি অপরিহার্য। প্রথমতঃ তাহারা জাতীয় আত্মসম্মান ও আত্মবিশ্বাস ফিরিয়া পাইয়াছে, যাহার ফলে তাহাদের হৃদয় বিপ্লবাত্মক উত্তেজনায় পূর্ণ হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ সমগ্র দেশব্যাপী একটি প্রতিষ্ঠান পাইয়াছে, ভারতবর্ষের দুর্গমতম গ্রামেও, যাহার প্রভাব পৌছিয়াছে। স্বাধীনতার সোজা সড়কে গান্ধিজী আমাদের পৌছাইয়া দিয়াছেন।...

—নেতাজী সুভাষচন্দ্র

—গান্ধিজীর চিন্তাধারার ন্যায্য বিচার করতে হলে—তর্কের পরিবেশে নয়—তাঁর জীবনের কর্মচাঞ্চল্যের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করতে হবে। তিনি নূতন ও পুরাতনের

সংমিশ্রন। একাধারে বিপ্লবী, আবার অতীত আদর্শের অনুরাগী। সত্যি কথা বলতে কি, গান্ধিজীর মধ্যে ভারতের আসল রূপটি ধরা পড়েছে।

ভারতের ধর্ম-ইতিহাসের অনুধাবন করলে দেখা যায় একটা সমন্বয় ও সংমিশ্রনের প্রচেষ্টা। উপনিষদ ও গীতায় সমস্ত প্রাচীন ধর্মমতের সমন্বয় ঘটেছে। ভারতবর্ষ সর্বদাই বিভিন্নমুখী মতবাদকে একত্রীভূত করার চেষ্টা করেছে। চিন্তাধারায় এমন কোন বিপ্লব প্রাচীন ভারতকে বিপর্যস্ত করেনি যাতে মতবাদের মিলনের সংগীত ব্যাহত হতে পারে। ভারতীয় ধর্ম-জিজ্ঞাসা গঠনের, মিলনের এবং গ্রহণের। ধ্বংসের নয়।

বিভিন্ন মতবাদকে গ্রহণ করা মানে বিভিন্ন জীবনধারাকে স্বীকার করা। তর্ক-শাস্ত্রের একটা সূত্রের বন্ধনে অথবা গণিতের হিসাবে জীবনকে যাচাই করা চলে না। থিয়োরী হিসাবে যা সত্য তা শুধু থিয়োরীর সত্য, তাতে জীবনের স্পন্দন নেই।… জীবনে অনেক স্রোত, অনেক গভীরতা।

গান্ধিজীর সমাজ-সেবায় এই জটিল জীবনই মুখ্য হয়ে উঠেছে। সেইজন্তই তাঁর চিন্তাধারা সুদূর প্রসারী—বহু পথ গামী ও বহুল। তিনি কোন্ কথার উপর জোর দিতে চাইছেন, জীবনের কোন্ দিকটায় আলোক সম্পাত করতে চান তা সময়ের মানের উপর নির্ভর করছে। স্থান ও পাত্রের উপর নির্ভর করছে তাঁর মনসিক রূপের অভিব্যক্তি—সমাজ সংস্কারক, রাজনীতিবিদ্ ধর্মোপদেষ্টা, ফকির মহাভিক্ষুক অথবা বিপ্লবী গান্ধিজী কথা বলবেন। তা ছাড়া পরিস্থিতি অনুযায়ী তিনি এমন অনেক কথা সহজেই অবহেলা করেছেন যা অন্য একসময় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলেই মনে হয়েছে। এই আশ্চর্য চিন্তাধারার সমন্বয়, বিভিন্ন ব্যক্তিত্বের প্রকাশ কোন তর্কশাস্ত্রের অনুজ্ঞা মানে না, কারণ বিচারের সিদ্ধান্ত নিশ্চল—জীবনের সকল ঘটনাবলী, মানব-মনের সৃজনপ্রয়াসী বিপ্লবচিন্তা এই আদেশে চলে না—চলে মুহূর্তের গতিকে আশ্রয় করে প্রগতির পথে। সিদ্ধান্ত শতধা হয়ে যায় জীবনের বিচিত্র লীলায়। জীবনকে যে কাল অনুযায়ী বিচার করা হয় তা একদেশদর্শী সেইজন্তই কোন কোন ক্ষেত্রে গান্ধিজীর জীবন-দর্শন বিজ্ঞান সম্মত বলে মনে না হতে পারে—আপাত দৃষ্টিতে এ-ধরণের ভুল ধারণার সুযোগ রয়েছে।

এ ধরণের ভুল ধারণা যাঁরা করতে চান তাঁরা গান্ধিজীর অজস্র বাণী থেকে কেন কোন কথা আহরণ করে নিজেদের পক্ষে সাফাই গাইতে পারেন অথবা তাঁর কোনো কথার উপর জোর দিয়ে সেই কথার পরিবেশকে অবহেলা করতে পারেন। কিন্তু ভাষ্যকারদের মনে রাখা উচিত গান্ধিজীর অজস্র বাণীধারায় সময়ের গতিনির্দেশ রয়েছে।

গান্ধিজীর জড়জীবন ও আধ্যাত্মিক জীবনকে একসুরে বাঁধতে চেয়েছেন এবং

সময়মত এই দুটো জীবনের রূপের কোন একটা সম্বন্ধে আপনার মতবাদ প্রচার করেছেন। এবং সময়ের চাহিদা অনুযায়ী তাতে জোর দিয়েছেন।

গান্ধিজীর সমালোচকদের মধ্যে দু'দলের লোক আছেন। একদল আছেন যাঁরা বেসুরো একটানা, গান্ধিজীকে না বুঝে বিকৃত সমালোচনা করে গান্ধিজীর উদ্দেশ্যকে ব্যাহত করতে চেষ্টা করেছেন। ধর্মভীরুদের মতে গান্ধিজী আধ্যাত্মিক আদর্শের পবিত্রতা রক্ষা করতে পারেন নি, তা রাজনীতি ও ধর্মনীতির সংস্পর্শে কলুষিত হয়েছে, আর যারা ধর্ম সম্বন্ধে কিছুই জানে না তাঁরা গান্ধিজীর নৈতিক শক্তি উপলব্ধি করতে না পেরে জিগির তুলেছেন যে হিন্দুধর্ম বিপন্ন।

আরেক দলে আছেন সমাজতন্ত্রী ও সাম্যবাদীরা। তাঁরা সত্য ও অহিংসার ভিত্তিতে রাজনীতিগত উদেশ্য সাধনকে মহাভ্রান্তি বলেই মনে করেন। তাঁরা গান্ধিজীর উপায় ও লক্ষ্যের মধ্যে সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা খুঁজে পাচ্ছেন না। সব কিছুই ঝাপ্সা। তাঁরা জনগণের যুক্তি ও আর্থিক স্বাচ্ছন্দের জন্য যুদ্ধ করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, কাজেই এর মধ্যে গান্ধিজীর নীতি ও আধ্যাত্মিক শক্তির প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে তাঁরা প্রস্তুত নন। তাঁরা বুঝতে চান না গান্ধিজী কেন সত্য ও অহিংসার উপর এত গুরুত্ব আরোপ করেন।

তাঁরা মনে করেন যে, রাজনীতির একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে যে বিদেশী বা শাসকদের হাত থেকে দেশের মুক্তি এবং জনগণের খাদ্য বণ্টনে সম-স্বার্থ বিধান—এ ব্যাপারে সাধারণের দৃষ্টিকে অহেতুক নৈতিক প্রশ্নে আকর্ষণ না করলেও চলে। স্বাধীনতার সাধনায় তা অসংলগ্ন। শুচিতা ও নীতিকথায় জনসাধারণকে জর্জরিত করে,তাঁরা বলেন, রাজনীতির ও অর্থনীতির ক্রমঃ পরিণতিকে দুর্বল করার কোন অধিকার কারু নেই। জাতি বা জনতার ভাগ্যকে এভাবে বিড়ম্বিত করা নিষ্প্রয়োজন। ব্যক্তিগত চিন্তায় নীতির কথা আসতে পারে। কোন বিশেষ কারণে বা কর্তব্যের প্রয়োজনে ব্যক্তি স্বার্থত্যাগ করতে পারে, কিন্তু কোন জাতি নীতির আদর্শকে বড় করার জন্য আর সব বিসর্জন দিতে পারে না।

কিন্তু সমালোচকেরা তলিয়ে দেখবার চেষ্টা করে না যে গান্ধিজী কোন সময়েই জাতি বা জনতার সত্যকারের স্বার্থকে উপেক্ষা করেন না। জাতির স্বার্থকে তিনি আপাতদৃষ্টিতে বিবেচনা করেন না—গভীর পরিপ্রেক্ষিতে তিনি আসল স্বার্থকে গ্রহণ করেন। গান্ধিজী শুধু বর্তমানে-নিবদ্ধ-দৃষ্টি রাজনীতিবিদ নন। তিনি দেশের রাজনীতিক প্রগতি ও স্বার্থের সংগে নৈতিক উন্নতির কোন সংঘাত দেখতে পান না। তিনি মনে করেন যে, ব্যক্তি বা সমষ্টির নৈতিক মানদণ্ড ছোট গণ্ডীর মধ্যে আত্মকেন্দ্রিক থাকতে

পারে না—নীতির শক্তি অভ্রংলিহ। কদাচারের মূল্য দিতে হবে—আজ না হয় কাল না হয় পরশু এর প্রতিক্রিয়া দেখা দেবেই।

ধার্মিকেরা গান্ধিজীকে দোষ দেন যে তিনি রাজনীতিকে ধর্মের আচ্ছাদন দিয়ে সাম্প্রদায়িক সমস্যার উদ্ভাবন করেছেন। তাদের মতে রাজনীতি ধর্ম থেকে পৃথক থাকাই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু তাঁরা জানেন যে গান্ধিজী রাজনীতির সংগে নৈতিক আদর্শের যোগসূত্র স্থাপন করে ধর্মরাজ্য সংস্থাপনের সুযোগ করে দিয়েছেন।

গান্ধিজী কেন্দ্রীভূত শিল্পপ্রতিষ্ঠানের পক্ষপাতী নন—কিন্তু এই কথাটির বিকৃত প্রচার যাঁরা করেছেন তাঁরা গান্ধিজীর রচনা থেকে কিয়দংশ উদ্ধৃত করে এটিই বোঝাবার চেষ্টা করেছেন যে, কোন অবস্থাতেই গান্ধিজী কোন শিল্প প্রচেষ্টাকে কেন্দ্রীভূত করতে চান না—তা ছাড়া তিনি বিজ্ঞানসম্মত কোন পদ্ধতি মানতে রাজী নন। বিজ্ঞানের আবিষ্কার তিনি প্রীতির চোখে দেখেন না, সেইজন্য প্রকৃতির উপর বিজ্ঞানের সত্যানুসন্ধানের চেয়ে মানবীয় গুণাবলীর বিকাশকে তিনি বড়ো বলে মনে করেন। তাঁর কাছে জাগতিক সমৃদ্ধি থেকে আত্মার উন্নতিই অনেক শ্রেয় ও প্রেয়। তিনি কর্মের ভিতর দিয়ে শিক্ষার ব্যবস্থার পক্ষপাতী, সেজন্য গান্ধিজীকে ইন্‌টেলেক্‌চুয়াল্ জ্ঞানের পরিপন্থী বলে আশংকা করা যায়। কিন্তু আশ্চর্য, সমালোচকেরা এটা জানতে চান না যে গান্ধিজীর আসল লক্ষ্য পরিপূর্ণ জ্ঞান সঞ্চয় এবং তা কেবলমাত্র কাজ ও অভিজ্ঞতা থেকে সম্ভব হতে পারে। গান্ধিজীর উক্তি থেকে ভগ্নাংশ আহরণ করে তাঁর মতবাদকে প্রক্ষিপ্ত প্রমাণ করার জন্য এঁদের উৎসাহের অন্ত নেই।

গান্ধিজীর সংগঠণ প্রতিভা ও জীবনধারা সমন্বয়ের আগ্রহ কোথাও সংঘাত বা প্রতিবাদের মোহে আচ্ছন্ন নয়। হিন্দু ও মুসলিম স্বার্থের বৈরীভাব তিনি কোথাও খুঁজে পান নি। তিনি নিজেকে সকল সম্প্রদায়ের বন্ধু বলে দাবী করেন, আবার নিজেকে সনাতন হিন্দু বলে প্রচার করেন।

গান্ধিজী স্বদেশ ও বিদেশের কল্যাণের পথে কোন সংঘাত দেখতে পান না। ক্ষুদ্র জাতীয়তাবাদীর কাছে গান্ধিজীর মানবতা বিশ্বমৈত্রীর নামে জাতীয় স্বার্থকে অবহেলা করা ছাড়া আর কিছু নয়। আবার আন্তর্জাতিকতাবাদী পণ্ডিতেরা গান্ধিজীকে ক্ষুদ্র জাতীয় স্বার্থ নিয়ে উদ্ভ্রান্ত বলে মনে করেন। দু'দলই গান্ধিজীর বিরাট রচনাবলী থেকে কয়েকটি ছেঁড়া পাতা নজীর হিসাবে সংগ্রহ করে লাফালাফি করছেন।

বছর কয়েক আগে একজন ইংরাজ রাজনীতিক কথায় কথায় গান্ধিজীকে বলেন—বিদেশীর চেয়ে স্বদেশবাসীকে তিনি নিশ্চয়ই বেশী ভালবাসেন। তিনি ভেবেছিলেন যে গান্ধিজী তার কথায় সায় দিবেন। কিন্তু গান্ধিজীর উত্তর শুনে তিনি অবাক হলেন।

গান্ধিজী বললেন—মানুষে মানুষে কোন প্রভেদ আমি দেখতে পাই না। ইংরাজদের ততটাই ভালবাসি যতটা ভারতীয়দের ভালবাসি।

—তাহলে আপনার স্বদেশীর মূলমন্ত্র কি?

—প্রতিবেশীকে ভালবাসা—প্রতিবেশীকে সাহায্য করার জন্য জীবন পাত করাই মানবসমাজের কাজে লাগার প্রথম ও সহজ উপায়।

—তাহলে আপনি মুসলীম লীগের কাজে আত্মনিয়োগ করেন না কেন?

—আমি কংগ্রেসের কাজেও যেমন লেগেছি—মুসলীম লীগের সেবা করতেও আমি তেমনি প্রস্তুত। কিন্তু লীগ তা চায় না। আমি জবরদস্তি করে কারও কাজে লাগতে পারি না, যদি সমর্থন না পাই। তাই প্রার্থনা করে সেই ক্ষতি পূরণ করি।

এতদ্বারা গান্ধিজীর দৃষ্টিভংগীর উদারতা প্রকাশ পাচ্ছে। জীবন সম্পর্কে সুষ্ঠু সমন্বয় বোধক ধারণা না থাকলে এতটা বিশালতা এতটা উদারতা রক্ত মাংসে গড়া মানুষের মধ্যে সম্ভব নয়।

গান্ধিজীর রচনাবলী থেকে অংশবিশেষ উদ্ধৃত করে তাঁকে বিকৃতভাবে প্রচার করার প্রচেষ্টা যেমন গান্ধী-বিরোধীদের মধ্যে প্রবল, তেমনি তাঁর লেখার কোন অংশ-বিশেষের সাহায্যে নিজেদের মুন্সিয়ানার বড়াই করার চেষ্টা কোন কোন গান্ধী-ভক্তের মধ্যেও পরিলক্ষিত হয়। গান্ধিজীর শিক্ষাকে তাঁরা সম্যকভাবে গ্রহণ করতে পারেন না। তাঁরা ততটাই জানেন যতটা তাঁদের সংস্কারকে সাহায্য করে—তাঁদের অনুদার ক্ষুদ্র চেতনা যতটা পেয়ে রাজনীতি ক্ষেত্রে টিঁকে থাকতে পারে।

গান্ধিজীর চিন্তাধারার উপযুক্ত মূল্য দিতে হলে এর মহিমায় এর পরিবেশে তা গভীর অনুভূতিতে হৃদয়ংগম করতে হবে। সমগ্রভাবে একে বিবেচনা করতে হবে—প্রতিটি চিন্তাসূত্রে যে জোর সাময়িক প্রয়োজনে যে রং ফলানো আছে তা মুছে ফেলতে হবে, সমগ্রের পরিপ্রেক্ষিতে তবে আসল সুরটির পরিচয় পাওয়া যাবে। তলিয়ে দেখতে হবে চিন্তাধারা কোথায় স্তিমিত গতিতে চলেছে। দেখতে হবে গান্ধিজীর বাণীতে কোথায় পাদপূরণের দরকার আছে সমগ্রকে উপলব্ধি করার জন্য, সংগতি খুঁজে পাবার জন্য। তাঁর কথায় কোথাও যদি দেশের মাটির রং লেগে থাকে, সেই রং ফলানি নরম হয়ে এলে সর্ব দেশের আদর্শকে খুঁজে পাওয়া যায়—বিশ্বমৈত্রীর আদর্শ সার্বভৌম কল্যাণ। সমগ্র চিন্তাধারা গান্ধিজীর জীবন ও কর্মকে পরিবেষ্টন করে আছে, এর থেকে বোঝা যায় যে তাঁর কাজে ও চিন্তায় যে সংগতি তা তাঁর দেহ ও মনের সুরে বাঁধা বীণার মত মহিমাময় রূপটিকে প্রকাশ করে।

এর থেকেই অনুধাবন করা যায় যে গান্ধিজী বর্তমান সমাজতান্ত্রিকদের মধ্যে সব

চেয়ে ন্যায়ানুরাগী ও বাস্তববাদী। সমাজতন্ত্রবাদের আসল রূপটি কি? কেউ হয়তো বলবেন সাম্য, আবার কেউ বলবেন—শোষণ নীতির উচ্ছেদ, সম্পূর্ণ সাম্য সম্ভব নয়।

শোষণনীতি পরিহারই সমাজতন্ত্রবাদের আসল কথা, সমাজতন্ত্রবাদ নানাভাবে নানা-রূপে প্রচারিত হচ্ছে। ভারত ও ভারতের বাইরে কোন দু'জন সমাজতন্ত্রবাদীকে কোন একটি বিশেষ পদ্ধতিকেই আন্তরিক সমর্থন করতে দেখা যায় না। এই অমিলের মধ্যেও একটি বিষয়ে সকলেরই মনের মিল আছে যে শোষণনীতির পরিহারের জন্য সবাই কৃতসংকল্প।

গান্ধিজীও তাই চান। কার্ল মার্ক্স্ ও গোঁড়া সমাজতান্ত্রিকেরা শোষনের স্বরূপটি অর্থনীতির ক্ষেত্রেই আবিষ্কার করতে পেরেছেন, ধনাধিকারের বৈষম্য থেকেই শোষণের সুযোগ ঘটেছে। কিন্তু অন্যান্য অঙ্গেও শোষণের ভীতি দেখানো হচ্ছে। রাজনীতি-ক্ষেত্রে শোষণনীতি জীবনকে ভারাক্রান্ত করে তুলেছে। ক্ষমতার খেলা হোল বর্তমানের রীতি।

গান্ধিজীর লক্ষ্য হোল—শুধু অর্থনৈতিক শোষণই নয় সর্বপ্রকার শোষণই রদ করা। কেন্দ্রীভূত শিল্প প্রচেষ্টাকে ছড়িয়ে দিলে অর্থনৈতিক শোষণের পথে অনেক বিঘ্ন ঘটে। বিগতযুগে সমাজ বাদের মূল উৎস ছিল কেন্দ্রীভূত শিল্পপ্রচেষ্টা, তখনই বাষ্প-চালিত কল ও কারখানার জন্য শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলি কেন্দ্রীভূত [illegible] বাধ্য হয়েছিল কিন্তু বর্তমানে বৈদ্যুতিক শক্তি সুলভের দিনে শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলি সর্বত্র ছড়িয়ে দেওয়া চলে।

শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলি বিকেন্দ্রীকরণ করা হলে বিরাট পুঁজী [illegible]ভাবে বিভক্ত হয়ে যাবে এবং তাতে এতদিন যে অত্যাচার চলেছে পুঁজীবাদীদের শোষণনীতির ফলে যে নৃশংশ বর্বরতা শ্রেণীগত সংগ্রামে মানুষকে লিপ্ত করেছে তা কি আর থাকতে পারবে?

ভারতবর্ষে আমরা জনবলে বলীয়ান। আমরা জনশক্তি পারি কাজে লাগাতে। বিজ্ঞানের সাহায্যে আমরা কুটীরশিল্পগুলি নতুন পথে পরিচালিত করতে পারি—চরকা ও অন্যান্য যন্ত্রগুলি বিদ্যুতের সাহায্যে চলতে পারে এবং যে সমস্ত শিল্প একান্তই কেন্দ্রীভূত রাখা দরকার—তা রাষ্ট্রের অধীনে জনসাধারণের মালিকানা সত্ত্বে ব্যাপক শিল্প হিসাবে চলতে পারে। এতে আমরা অর্থনীতির ক্ষেত্রে সমাজতন্ত্রবাদ প্রতিষ্ঠা করতে পারবো।

রাজনীতির ক্ষেত্রে ক্ষমতার খেলা থেকে আমরা দূরে দূরে থাকতে পারি শুধুমাত্র অহিংসার আশ্রয়ে। গণতন্ত্রের প্রধান শক্তিই অহিংসা। অহিংসার আশ্রয়ে আমরা লোকের মাথা না ভেঙে লোকের মাথা গুণতে পারি। অহিংসার নীতিতে মেশিন গানের পরিবর্তে বিবেচনা ও উপলব্ধিকে অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করতে পারি।

গান্ধিজী তাই একজন সমাজতান্ত্রিক। তাঁর কাম্য হোল, একটি অকেন্দ্রীভূত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা…তাতে অর্থনীতি ও রাজনীতিগত শোষণের সুযোগ থাকবে না, এবং তার ভিত্তি হবে অহিংসা। এই সমাজতন্ত্রবাদ গান্ধিজী মার্কসীয় রচনা পাঠ করে অনুশীলন করেন নি—এ তাঁর জীবন-দর্শনের অনুসন্ধিৎসার ফল—যার সহজ অভিব্যক্তি রাজনীতি ও অর্থনীতি-ক্ষেত্রে এভাবে প্রকাশ পেয়েছে। এবং গান্ধিজীর অনুসৃত নীতি অবলম্বন করলেই গণতন্ত্রকে বজায় রেখে শোষণ নীতি পরিহার করা চলে। আজ ভারতের নবীন ও প্রবীণ সমাজতান্ত্রিকদের মধ্যে যে ঘোলাটে চিন্তার ছাপ দেখা যায়—তা সহজেই নতুন সম্ভাবনায় উদ্দীপ্ত হতে পারে যদি তাঁরা গান্ধিজীকে গভীরভাবে জানবার চেষ্টা করেন, গান্ধিজীর জীবন ও শিক্ষায় সর্বমংগলময় রূপের সমন্বয় বুঝাবার চেষ্টা করেন।…

—আচার্য জীবৎরাম ভগবানদাস কৃপালনী

—গান্ধিজী মূলতঃ ধর্মপরায়ন ছিলেন। তিনি খাঁটি হিন্দু ছিলেন বটে, কিন্তু ধর্ম সম্বন্ধে তাঁর কোনও গোঁড়ামি ছিল না। তবে ধর্মের সংগে কোন নির্দিষ্ট বা সংস্কারের সম্পর্ক ছিল না। ১৯২৮ সালের জানুয়ারী মাসে তিনি ফেডারেশন-অফ-ইণ্টারন্যাশানাল-ফেলোশিপের বৈঠকে বলেন: "সুদীর্ঘ গবেষণা ও অভিজ্ঞতার পর আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, সকল ধর্মই সত্য, সকল ধর্মে কিছু ভুল-ভ্রান্তি আছে, সকল ধর্মই আমার কাছে হিন্দুধর্মের মতই প্রিয়।"

তাঁর ধর্ম-বিশ্বাসের ভিত্তি ছিল সত্য। নৈতিক ভিত্তির সংগে না মিললে কোন চিরাচরিত প্রথাই তিনি মানতেন না। এজন্য কর্মক্ষেত্রে তিনি যা ভাল মনে করতেন সেই পথ অবলম্বনে তাঁর কোনও অসুবিধা হোত না। রাজনীতিক্ষেত্রে এবং জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে সাধারণ লোকের এতে সুবিধা হতে পারে, কিন্তু কোন অসুবিধাই তাঁকে সত্য পথ থেকে টলাতে পারত না। তিনি প্রত্যেক বিষয়ে নিজের উপর দিয়ে পরীক্ষা করতেন।

ভারতবর্ষ সম্পর্কে তাঁর পরিকল্পনা ছিল এইরূপ: "আমি এমন একটি ভারতবর্ষ গঠনের জন্য কাজ করব, যেখানে দরিদ্রতম ব্যক্তিরাও মনে করবে যে, এটা তাদের নিজের দেশ, যে দেশ গঠনে তাদের হাত থাকবে, এই ভারতবর্ষে ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে প্রভেদ থাকবে না, সকল সম্প্রদায় পরম ঐক্যের মধ্যে বাস করবে—যে দেশে অস্পৃশ্যতা ও পানদোষ থাকবে না…নারী-পুরুষে সমান অধিকার ভোগ করবে…ইহাই আমার স্বপ্নের ভারত।"

হিন্দু ধর্মকে তিনি একটি বিশ্বজনীন রূপ দেবার চেষ্টা করেছিলেন। উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সংস্কৃতিকে তিনি সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ বলে মনে করতে পারেননি। তিনি লিখেছেন: "ভারতীয় সংস্কৃতি—হিন্দুও নয়, ইসলামীয়ও নয়, কারও নিজস্ব নয়। ভারতীয় সংস্কৃতি এ সকলের মিলনের ফল।"

তিনি জাতির আধ্যাত্মিক ঐক্যকে ফিরিয়ে আনতে চেয়েছিলেন। পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত অল্প কয়েকজন ধনী ও দরিদ্র জনসাধারণের মধ্যে যে বিরাট ব্যবধান, তিনি তা ভাঙতে চেয়েছিলেন। তিনি জনগণকে তাদের তন্দ্রা দূর করে জাগরিত করবার চেষ্টা করেছিলেন। এই পদদলিত জনগণকে উন্নত করবার ইচ্ছাকে তিনি ধর্মেরও উপরে স্থান দিয়েছিলেন। তিনি বলেছেন: "অর্ধাহারী জাতির কোন ধর্ম, কলা বা প্রতিষ্ঠান থাকতে পারে না।···আমি এমন কলা ও সাহিত্য চাই যা লক্ষ লক্ষ জনগণ উপলব্ধি করতে পারে।"

ভারতের লক্ষ লক্ষ নিঃস্বের জন্য তাঁর মন সর্বদাই উদ্‌বিগ্ন থাকত। তাঁর যত কিছু কাজ ছিল এদের ঘিরেই। তাঁর আকাংখা ছিল প্রত্যেকের চোখের জল মুছে দেওয়া।

কাজেই এমন একজন লোক যে, ভারতের জনগণকে আকৃষ্ট করবে তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। কেবল জনগণই নয়, শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মনেও তিনি এক বিরাট বিপ্লব এনে দিয়েছেন। এমন কি, তাঁর বিরোধীদের মনেও।

তিনি যখন প্রথম কংগ্রেসে প্রবেশ করেন, তখন কংগ্রেসের কাজ ছিল উচ্চশ্রেণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ। তিনি কংগ্রেসকে একটি গণতান্ত্রিক ও গণপ্রতিষ্ঠানে পরিণত করেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, বৃটিশ শাসনের প্রধান খুঁটি হোল ভয়, মর্যাদাবোধ ও সহযোগিতা। তাই তিনি এ সকল ভিত্তিকে প্রথম আক্রমণ করেন। আমাদের তিনি বলেন: "তোমরা, যারা কৃষক ও শ্রমিকদের শোষণ করে থাকো, তোমরা তাদের মুক্তি দাও। যে প্রথার ফলে দারিদ্র্য ও দুর্দশার সৃষ্টি হয়, সেই প্রথা দূর কর।"

তিনি আমাদের যে সকল উপদেশ দেন, আমরা সে সকল প্রস্তাব মাত্র আংশিক-ভাবেই গ্রহণ করেছি এবং কখন কখনও মোটেই গ্রহণ করিনি। তাঁর শিক্ষার মূল কথা—সত্য ও নির্ভীকতা এবং কাজ। এই কাজ করবার সময় সর্বদাই দৃষ্টি রাখতে হবে জনগণের মংগলের দিকে। বৃটিশ শাসনের সময় ভারতবাসীর মনকে আচ্ছন্ন করেছিল ভয়। সেই ভয় তিনি জনসাধারণের মন থেকে দূর করে দেন।

আমাদের দেশে জাতিভেদ প্রথা দূর করবার জন্য অনেক আন্দোলন হয়েছে, কিন্তু কেবল মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে। এ আন্দোলন কখনও জনগণকে স্পর্শ করেনি।

গান্ধিজী এই আন্দোলন করেছেন জনগণকে নিয়ে। তিনি জাতিভেদ প্রথার মূলে আঘাত করেছেন। তিনি বলেছেন যে, হিন্দুধর্ম ও ভারতকে যদি বেঁচে থাকতে হয়, তাহলে এই প্রথা, এই অস্পৃশ্যতা অবশ্যই দূর করতে হবে।

গান্ধিজী পর্দাপ্রথার প্রবল বিরোধিতা করেছেন। তিনি বলেছেন যে, এই প্রথা অতি জঘন্য ও নৃশংস। তিনি বলেছেন যে, এই বর্বর প্রথা প্রথমে যে উপকারেই লেগে থাকুক না কেন, এখন দেশের অশেষ ক্ষতি করছে। তিনি বলেছেন যে, নারীকে পুরুষের সমান স্বাধীনতা ও আত্ম-উন্নয়নের সুযোগ দিতে হবে।

গান্ধিজী ভারতের প্রাচীন ঐতিহ্য—ত্যাগের প্রতীক। তিনি মনে করতেন যে, তাঁর বাণী কেবল ভারতের জন্যই নয়, উপরন্তু বিশ্বের জন্যও। বিশ্ব-শান্তি তাঁর একান্ত কাম্য। তিনি জাতীয়তাবাদী ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার মধ্যে কোন উগ্রভাব ছিল না। ভারতের স্বাধীনতা কামনার সংগে সংগে তিনি বিশ্বাস করতেন যে, পৃথিবীর সমস্ত স্বাধীন রাষ্ট্রের একটি ফেডারেশনই একমাত্র সঠিক পথ। সমগ্র মানব সমাজের কল্যাণ তাঁর ছিল প্রধান কাম্য। সমগ্র মানব সমাজের কল্যাণকে তিনি দেশের কল্যাণের উর্ধে স্থান দিয়েছিলেন। তাঁর জাতীয়তাবাদ এই ধরণের।

বিগত মহাযুদ্ধ ভারতের সামনে এনে দিয়েছিল বহু অভাব-অভিযোগ। এবং সেই সময় প্রতিষ্ঠিত দুই একটি বড় বড় শিল্প যখন কুটীর-শিল্পের মূলে কুঠারাঘাত করিতে লাগল, তখন গান্ধিজী গুজরাটের প্রসিদ্ধ বণিক-বংশ-ভূত হয়েও ভারতের জীর্ণ কংকাল দেখে শিউরে উঠলেন। ভারতের জনসাধারণের জীবন ধারণের হারের সংগে পাশ্চাত্য দেশের লোকের জীবন ধারণের হারে তুলনা করে তিনি স্থির থাকতে পারলেন না। তিনি দিব্যদৃষ্টিতে বুঝতে পারলেন—দেশের অর্থনৈতিক চেহারা বদলাতে হলে কিরূপ শিল্প ভারতের মত গরীব দেশে প্রযোজ্য হবে। তিনি ছিলেন গ্রাম্য কুটির-শিল্পের পক্ষপাতী। এতে বেকার সমস্যা যত শীঘ্র দূর করা যাবে, বড় বড় শিল্পের দ্বারা তা সম্ভব হবে না। বড় বড় শিল্প চালনার শক্তিকে মানুষের বড় একটা কাজে লাগানো হবে না—যন্ত্রই হবে সে শিল্পের প্রধান শক্তি। তিনি বলতেন, একটি যন্ত্র হাজার হাজার শ্রমিকের মুখের গ্রাস কেড়ে নিতে পারে। তিনি যন্ত্রশক্তিকে বড় ভয় খেতেন। এইজন্যই তিনি আজীবন ভারতবাসীকে দীক্ষা দিয়ে গেছেন, যাতে তারা ঘরে ঘরে কুটির-শিল্প গড়ে তোলে এবং অবসর সময়ে তারা যেন চরকা হতে হাতে কাটা সুতা প্রস্তুত করেন। এই পথ ভিন্ন দেশের অর্থনৈতিক চেহারা বদলাতে হলে দেশের সামনে বাধা আসবে অনেক।...

—পণ্ডিত জবাহরলাল ( ডিসকভারী অফ্ ইণ্ডিয়া )

—নন্‌কো-অপারেশন সম্বন্ধে আমাদের ভিতর মতের অমিল থাকলেও মহাত্মা গান্ধীর মাহাত্ম্য সম্বন্ধে আজকের দিনে আমরা সবাই একমত। একথা যে অন্তত আমার মুখে শুধু কথার কথা নয়, তাই প্রমাণ করার জন্য আমার মতে তাঁর মাহাত্ম্য যে কোথায়, তা পরিষ্কার করে বলবার চেষ্টা করব।

মহাত্মা গান্ধীর চরিত্রবল অসাধারণ। এই চরিত্র কথাটা নানা লোকে নানা অর্থে বোঝে। সুতরাং তাঁর চরিত্রের বিশেষত্ব কোথায় সেইটাই হচ্ছে দ্রষ্টব্য।

ইংরাজীতে যাকে বলে অ্যাসেটিসিজ্‌ম্ তার প্রতি আমার একটা সহজ শ্রদ্ধা আছে। কাষায় বসনকে আমি দেখবামাত্র উচ্চ আসন দিই। কিন্তু তাই বলে যিনি শারীরিক ক্লেশ সম্বন্ধে উদাসীন, আর যিনি শারীরিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যকে বর্জন করেছেন তাঁকেই আমি মহাপুরুষ বলতে প্রস্তুত নই। কেন যে নই, তার উত্তর গীতার শ্লোকে পাবেন:

বিষয়া বিনিবর্ত্তন্তে নিবাহারস্য দেহিনঃ
রসবর্জ্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্টা নিবর্ত্ততে॥

মহাত্মা আত্মার ধর্ম, দেহের নয়। সুতরাং আমার কাছে মহাত্মা গান্ধীর মাহাত্ম্যের সংগে উপবাসাদির বিশেষ কোনও সম্বন্ধ নেই। মহাত্মা গান্ধীর চরিত্রে আমি এই ক'টি অসাধারণ গুণ দেখতে পাই। তিনি সম্পূর্ণ নির্ভীক, সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ, কথায় ও কাজে তিনি সম্পূর্ণ অকপট এবং সম্পূর্ণ সংযত। তাঁহার নির্ভীকতা ও পরার্থপরতা সম্বন্ধে সকলেই একমত। সুতরাং এ বিষয়ে বেশী কিছু বলার প্রয়োজন নেই।

মহাত্মা গান্ধীর বক্তৃতার ভাষা যে কতদূর স্পষ্ট ও পরিচ্ছন্ন, সকলে তা লক্ষ্য করেছেন কিনা জানি না। এ ভাষায় কোন আড়ম্বর নেই, কোন অলঙ্কার নেই, কোনও বাহুল্য নেই, কোনও অত্যুক্তিও নেই। তাঁর এ ভাষা যেমন সংযত তেমনি শক্তিশালী। এর কারণ ভাষায় তাঁর মনের নগ্নরূপ লোকের চোখের সম্মুখে ধরে দেন। তাঁর ভাষার শক্তি ও রূপের পেছনে আছে তাঁর চরিত্র। সম্পূর্ণ অকপট হতে পারলে মানুষের ভাষা যে কি অসাধারণ প্রসাদপূর্ণতা লাভ করে, তার পরিচয় মহাত্মা গান্ধীর ভাষা, যদিচ সে ভাষা তাঁর মাতৃভাষা নয়; একটি বিদেশী ভাষা। আমি তাঁর ভাষার উল্লেখ করলুম তাঁর চরিত্রের একটা গুণ দেখাবার জন্য, তাঁর বক্তৃতায় সাহিত্যিক গুণের পরিচয় দেখাবার জন্য নয়। আমরা যাকে ষ্টাইল্ বলি, সেটা যে মনের গুণ—ভাষার গুণ নয়, মহাত্মা গান্ধীর ভাষা তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। নন্‌কো-অপারেশন ব্যাপারের প্রধান বল হচ্ছে মহাত্মা গান্ধীর চরিত্র-বল। ঐ প্রোগ্রাম যদি অপর কেউ

সৃষ্টি করতেন তাহলে তাঁর জন্মমৃত্যু যে একই তারিখে হ'ত সে সম্বন্ধে আমার মনে কোনই সন্দেহ নেই।

লৌকিক মনের উপর মহাত্মা গান্ধীর যে অলৌকিক প্রভাবের পরিচয় পাওয়া যায় তাকে ঐন্দ্রজালিক বললেও অত্যুক্তি হয় না এবং একটু ভেবে দেখলেই দেখা যায় যে এ ম্যাজিক হচ্ছে তাঁর চরিত্রবলের মন্ত্রশক্তি।

মহাত্মা গান্ধীর নির্ভীকতা ও পরার্থপরতা সম্বন্ধে আমার মনে কখনো কিঞ্চিন্মাত্রও সন্দেহ স্থান পায়নি। তবে তাঁর মুখের কথা যে পুরোপুরি তাঁর মনের কথা, এ বিশ্বাস আমার বরাবর ছিল না। আমার মনে এ সন্দেহ পূর্বে হয়েছে যে, হয়তো তিনি তাঁর মনের কথা সম্পূর্ণ খুলে বলেননি। রাজনীতির সংগে কূটনীতির যে একটা ঘনিষ্ঠ যোগ আছে ও নীতিতে উদ্দেশ্য যে তার উপায়কে পূত করে আবহমানকালের ইতিহাস তার প্রমাণ দেয়। অতএব, পলিটিশিয়ানদের কথা যে সম্পূর্ণ সরল সে বিষয়ে সন্দেহ মানুষের মনে সহজেই জন্মে। তারপর অসংখ্য ননকো-অপারেশন ভক্তদের মুখে অগণ্যবার শুনেছি, যে একটু তলিয়ে দেখলেই দেখা যায় যে, মহাত্মা গান্ধীর কথা সাদা ভাবে বোঝা, না বোঝারই সামিল এবং এইসব ভাষ্যকাররা তাঁর কথার নানা গূঢ় ও কূট অর্থ আমাকে শুনিয়েছেন।

আদালতে তার বিচারের সময় তাঁর কথা ও তাঁর ব্যবহার আমার মন থেকে চিরদিনের জন্য এ সন্দেহ দূর করেছে। তাঁর কথা যে সম্পূর্ণ অকপট, এ বিচারক্ষেত্রেই তা প্রমাণ হয়ে গেছে। যেমন কোন কবির প্রতিভা, তাঁর রচিত নানা কাব্যের ভিতর কোনও একখানি বিশেষ কাব্যে সম্পূর্ণ প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে, তেমনি উক্ত বিচারস্থলেই মহাত্মা গান্ধীর চরিত্রের সৌন্দর্য্য ও শক্তি ব্যক্ত হয়েছে। নির্ভীকতা ও সরলতায়, সংযমে ও সৌজন্যে ও ক্ষেত্রে তাঁর আত্মোক্তি—আমার কাছে একটি ওয়ার্ক অফ্ আর্ট স্বরূপে গণ্য।

পৃথিবীর ইতিহাসে আর একটি মহাপুরুষের—সক্রেটিসের বিচারের বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে, আর সে বিবরণ আজ তিন হাজার বৎসর ধরে মানুষের মনকে মুগ্ধ ও তুষ্ট করে আসছে। মহাত্মা গান্ধীর বিচারের বিবরণ পড়ে আমার ঐ সক্রেটিসের বিচারের কথাই মনে পড়ে। যে সকল গুণের সদ্ভাবে সক্রেটিসের আত্মোক্তি সাহিত্যে অমর হয়ে রয়েছে, প্রায় সে সকল গুণেরই সাক্ষাৎ মহাত্মা গান্ধীর আত্মোক্তিতে পাওয়া যায়। সক্রেটিসের এপোলজি বাংলায় অনুবাদ করবার আমার ইচ্ছা আছে। যদি কখনো সে অনুবাদ করতে সমর্থ হই, তাহলে বাংলা পাঠক মাত্রেই দেখতে পাবেন যে, উভয়ের ভিতর একটি মস্ত আভ্যন্তরিক ঐক্য আছে।

## আমাদের গান্ধিজী

বর্ত্তমানে আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতার প্রভাবে মানুষের মহত্ত্ব কে কি করে, তাই দিয়ে আমরা যাচাই করি, কে কি সে বিষয়ে ততটা মন দিইনে। কিন্তু ভারতবর্ষের প্রাচীন সভ্যতায় মনুষ্যত্বের মাপকাঠি ছিল স্বতন্ত্র। আজকাল আমাদের আত্মচেষ্টার লক্ষ্য হচ্ছে টু-ডু, আর সেকালে ছিল টু-বি, এই দুই অবশ্য এক নয়।

অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করেছিলেন :—

স্থিত প্রজ্ঞস্য কা ভাষা সমাধিস্থস্য কেশব।
স্থিতধীঃ কিং প্রভাষেত কিমাসীত ব্রজেত কিম্॥

এ প্রশ্নের উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ যা বলেছেন, তার দু'চারটি কথা এখানে উদ্ধৃত করে দিচ্ছি :—

প্রজহাতি যদা কামান সর্ব্বান পার্থ মনোগতান্।
আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ স্থিত প্রজ্ঞস্তদোচ্যতে॥
দুঃখেষনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।
বীতরাগ ভয়ক্রোধঃ স্থিতধী মুনিরুচ্যতে॥
যঃ সর্ব্বত্রানভিস্নেহস্তত্তৎ প্রাপ্য শুভাশুভম্।
নাভিনন্দতি ন দ্বেষ্টি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা॥

যে প্রতিষ্ঠিত-প্রজ্ঞ পুরুষের আদর্শ আমরা এতদিন শুধু সংস্কৃত পুস্তকেই পড়ে আসছি, মহাত্মা গান্ধীর চরিত্রে সেই আদর্শের যতটা সাক্ষাৎ পাওয়া গিয়াছে, অপর কারও চরিত্রে ততটা পাওয়া যায়নি।

এইসব কথা বলার উদ্দেশ্য এই প্রমাণ করা যে, মহাত্মা গান্ধী একজন আদর্শ পুরুষ একথা সর্বান্তঃকরণে স্বীকার করেও ননকো-অপারেশন প্রোগ্রাম কেবলমাত্র পলিটিক্যাল প্রোগ্রাম হিসাবে বিচার করার প্রবৃত্তি ও অধিকার আমাদের আছে।

এমন অনেক লোক দেখেছি, যাঁরা মনে করেন যে উক্ত প্রোগ্রাম রচনা করেছেন বলেই জনসাধারণের কাছে তাঁর এত মাহাত্ম্য।

মহাত্মা গান্ধী যদি এর ঠিক উলটো প্রোগ্রাম বার করতেন—অর্থাৎ নন ভায়োলেন্স-এর বদলে তিনি ভায়োলেন্স প্রচার করতেন, তাহলে জনসাধারণ প্রত্যাখ্যান করত, এমন কথা যদি কেউ মনে করেন, তাহলে তিনি স্থিতধীঃ ব্যক্তির বশীকরণ শক্তি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ।

যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে।

# আমাদের গান্ধিজী

এ কথা কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সময় যেমন সত্য ছিল, আজও তেমনি সত্য রয়েছে। একচুল এদিক ওদিক হয়নি।

আমার শেষ কথা এই যে, নন্‌কো-অপারেশন সম্বন্ধে আমাদের যে মতভেদ রয়েছে তার প্রকাশ সম্বন্ধে মহাত্মা গান্ধীর আদর্শ আমাদের চোখের সম্মুখে রাখা উচিত। যদিচ আমরা জানি যে, তাঁর মত স্থিতধীঃ হওয়া আমাদের পক্ষে অসম্ভব। আমরা রাগ দ্বেষ থেকে মুক্ত নই। নির্মমও নই, নিরহংকারও নই। উপরন্তু আমাদের মনে শান্তি নেই। আছে শুধু অশান্তি। তবু উক্ত আদর্শ চোখের সুমুখে রাখলে আমরা ভয়ে মিথ্যা কথা বলিতে ঈষৎ সংকুচিত হব এবং কথায় অসংযম ও অসৌজন্য দেখাতে কিঞ্চিৎ লজ্জিত হব। —প্রমথ চৌধুরী ( সবুজ পত্র )

—দিনে দীপ জ্বালি' ওরে ও খেয়ালি! কি লিখিস হিজিবিজি?
নগরের পথে রোল ওঠে শোন্ 'গান্ধিজী!' 'গান্ধিজী!'
বাতায়নে ছাখ কিসের কিরণ! নব জ্যোতিষ্ক জাগে!
জন সমুদ্রে ওঠে ঢেউ, কোন্ চন্দ্রের অনুরাগে!
জগন্নাথের রথের সারথি কে রে ও নিশানধারী,
পথ চায় কার কাতারে কাতার উৎসুক নরনারী!
কৃষাণের বেশে কে-ও কৃশ তনু—কৃশানু পুণ্য ছবি,—
জগতের যাগে সত্যাগ্রহে ঢালিছে প্রাণের হবি!
কৌমুদি কুলি করে কোলাকুলি কার সে পতাকা ঘেরি,
কার সুদুবাণী ছাপাইয়া ওঠে গর্ব্বী গোরার ভেরী!
ক্রোর টাকা আর ভিক্ষা-ঝুলিতে অপরূপ অবদান,
আগুলিয়া কারে ফেরে কোটি কোটি হিন্দু মুসলমান!
আত্মার বলে কে পশু-বলের মগজে ডাকায় ঝিঁ ঝিঁ
কে রে ও বর্ব্ব সর্ব্বপূজ্য?—'গান্ধিজী', 'গান্ধিজী!'

এশিয়ার হক্ হারুণের স্মৃতি ইসলাম সম্মান—
সর্ব্ববীণায় তিন তারে যার পীড়িয়া কাঁদায় প্রাণ,
সরাজ বুকেতে সারা এশিয়ার ব্যথার স্পন্দ বহি,
সব হিন্দুর হয়ে যে' খোলসা খেলাফতে দিল সহি,
চিত্ত বলের চিহ্ন দেখায়ে গেল যে পূর্ণ সাড়া,
সত্যাগ্রহ ছন্দে বাঁধিল বড়োরে হল ছাড়া,
গান্ধির রাখী কে বেঁধে দিল দুই হিন্দু মুসলমানে,
পাঞ্জাবের আজিও রক্ত জ্বালা মর্ম্ম জাগে যার প্রাণে

# আমাদের গান্ধিজী

ভারতজনের প্রাণ হরণের হরিবারে অধিকারী
নৈযুজ্যের হ'ল সেনাপতি যে রথী দুর্নিবার,
বিধাতার দেওয়া ধর্ম রোষের তলোয়ার যাঁর হাতে
সোনা হয়ে গেছে সত্যাগ্রহ-রসায়ন-সম্পাতে ;
বোধি স্বাতন্ত্র্য শাসনযন্ত্র আমলাতন্ত্র সহ
অভয় মন্ত্র দিয়ে দেশদেশে ফিরিছে যে অহরহ ;
মহাবাণী যার শকতি-আধার অমুদার কভু নহে,
লুকানো ছাপানো কিছু নাই যার, হাটের মাঝে যে কহে—
স্বরাজ প্রয়াসী জাগো দেশবাসী, স্বরাজ স্থাপিত হবে,
ত্যাগের মূল্যে কিনিব সে ধন, কায়েম করিব তপে।

যা কিছু স্ববশে সেই তো স্বরাজ সেই তো সুখের খনি,
আপনার কাজ আপনি যে করে—পেয়েছে স্বরাজ গণি ;
স্ব পাকে স্বরাজ, স্বরাজ স্ব করে নিজের বসন বোনা ;
স্বরাজ—স্বদেশী শিল্প-পোষণে স্বাধিকারে আনাগোনা,
স্বরাজ—আপন ভাষা আলাপনে, স্বরাজ—স্ব রীতে চলা,
স্বরাজ—যা কিছু অশুভ তাহারে নিজের দুপায়ে দলা ;
স্বরাজ—স্বয়ং ভুল করে তারে শোধরানো নিজ হাতে,
স্বরাজ—প্রাণীর প্রাণে অধিকার বিধাতার দুনিয়াতে।
সেই অধিকারে দ্যায় যারা হাত প্রেষ্টিজ অজুহাতে,
স্বরাজ—সে নৈযুজ্য তেমন আমলাতন্ত্র সাথে।
হাতে হাতিয়ারে শিক্ষা স্বরাজ, স্ব প্রকাশের পথে
স্বরাজ—সে নিজ বিচার নিজেরি স্বদেশী পঞ্চায়তে
চরিত্র খুলে আনে যে দখলে এই স্বরাজের মালা,
কর গত তার সারা দুনিয়ার সব দৌলতশালা,
হাতের নাগালে আছে এর চাবী, আয়াস যে করে লভে,
অক্ষম ভেবে আপনারে ভুল করো না, কহে যে সবে ;
আত্মবিশ্বাসের যে অগ্নি, মূর্ত যে প্রত্যয়,
পরাজয় আজো জানেনি যে, সেই গান্ধীর গাহ জয়!

—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

—বাস্তবের সম্মুখীন হবার যে বৈপ্লবিক প্রবৃত্তি তাহাই গান্ধিজীর অনন্যসাধার
ব্যক্তিত্বের মূল কথা। আগে থেকেই কোন ধারণা বা সংস্কার নিয়ে তিনি কো

সমস্তার বিচার করতেন না। জনসাধারণের সংগে তাঁর প্রাণের যোগ ছিল। সেই জন্ত তাদের আশা-আকাংখার কথা তারা নিজেরাই স্পষ্ট করে ধারণা করার আগে মহাত্মাজীর কাছে তা স্বচ্ছ হয়ে উঠতো। লেনিনের মতই তিনি জনগণের ধমনীর গতি অনুভব করতে পারতেন এবং তাদের সংস্পর্শে থেকেই শক্তি ও প্রেরণা আহরণ করতেন। জনগণের জীবন ধারার সংগে তিনি পরিচিত ছিলেন বলেই সামান্ত রাজনৈতিক অনুষ্ঠান থেকে তিনি জনগণের মাঝে বিপ্লবের আগ্রহ জাগিয়ে তুলতে পারেন। এইজন্তই তিনি পাশ্চাত্য প্রভাব থেকে মুক্ত এবং নতুন সামাজিক আদর্শ ও পদ্ধতি নিয়ে পরীক্ষা করতে সক্ষম হয়েছেন।...অতিরিক্ত সত্যনিষ্ঠা ও বিস্ময়কর কর্মশক্তি তাঁর সকল চিন্তা ও কর্মকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। আজ এই বয়সেও সম-সাময়িক জগতের বুকে তিনি একজন শ্রেষ্ঠ প্রগতিশীল বৈপ্লবিক শক্তি। —হুমায়ুন কবীর

—ভারতের ইতিহাসে এতো গভীরভাবে জনসাধারণ কখনও নিজেকে উপলব্ধি করেনি, অসহযোগ আন্দোলনের সময় থেকে যেভাবে তারা উপলব্ধি করেছে। মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে লক্ষ লক্ষ ভারতবাসী যেভাবে শান্তিপূর্ণ উপায়ে স্বাধীনতার জন্ত সংগ্রাম করছে, জগতের মানব জাতির ইতিহাসে এমন ঘটনা আর কোথাও ঘটেছে বলে আমি জানি না। —মৌলানা মোহম্মদ আলি

( কোকোনদ কংগ্রেসের সভাপতি, ১৯২৩ )

—মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্ব জনগণের মাঝে প্রেরণা জাগিয়েছে, তারা বিশ্বাস করতে শিখেছে যে, পৃথিবীতে আজ আর এমন কোন শক্তি নেই যা তাদের স্বাধীনতার পথরোধ করতে পারে। —এস, এ, ব্রেলভি

—গান্ধিজী আজ ভারতের জনগণের মন যেভাবে অধিকার করেছেন, তার অন্ততম কারণ ভারতের জনগণকে তিনি উপলব্ধি করিয়েছেন যে, প্রত্যেকেরই একটা মহৎ সম্ভাবনা আছে। জাতি গঠনের কাজে প্রত্যেকেরই একটা বিশেষ ভূমিকা আছে। পদদলিত পুরুষের সংগে নারীও আজ উপেক্ষিতা অবহেলিতা। তাদের মাঝে গান্ধিজী এলেন যাদুকরের মত। তাঁর অসামান্ত ব্যক্তিত্ব, দ্রুত কর্মক্ষমতা, বিপ্লবাত্মক সাফল্য ও বিস্ময়কর কার্যকলাপ দেখলে তাঁকে অসামান্ত দৈবশক্তিসম্পন্ন মহামানব বলে মনে হয়। কিন্তু তিনি একজন অতি সাধারণ মানুষ। ইহাই তাঁর মহামানবতার গোপন কথা। তিনি আমাদেরই মত একজন—তিনি শুধু বাপুজী। তিনি ভগবান নন, আমাদেরই মত দুর্বলতা ও ভাবপ্রবণতা তাঁরও আছে। সেইজন্তই তিনি আমাদের

এত আপনার জন। সেইজন্যই তাঁর কণ্ঠ ভারতের বিরাট জনগণকে চঞ্চল করে তুলেছে, ঘুম ভাঙিয়ে দিয়েছে।

—কমলা দেবী

—আমি সরলভাবে স্বীকার করছি, যদিও একথা বলতে আমার আজ সত্যই দুঃখ হচ্ছে—ন্যায় ও সত্যের কারণে ধৈর্যশীল সহিষ্ণুতার যে মূর্তি আমি গান্ধিজীর মধ্যে দেখেছি, তাতে যাঁরা নিজেদেরকে খৃস্টান বলেন এবং গান্ধিজীকে কারাগারে নিক্ষেপ করেছেন, তাদের তুলনায় গান্ধিজীকে ক্রুশবিদ্ধ ত্রাণকর্তা যিশুর একজন সত্যকারের প্রতিভূ বলে তাঁকে আমার মনে হয়েছে।

—বিশপ হোয়াইট হেড (মাদ্রাজ)

—১৯৩৮ সালের কথা। আমি নিউইয়র্ক থেকে মোটারে মেক্সিকো যাচ্ছি—তিন হাজার মাইল পথ। চলার পথে ভার্জিনিয়ার এক জায়গায় পেট্রোল নেবার জন্য গাড়ী থামলো, একজন ভৃত্য আমার ভারতীয় পোষাক দেখে জিজ্ঞাসা করলো—আপনি কোন্ দেশ থেকে আসছেন?

—ভারতবর্ষ!

—ভারতবর্ষ? আপনাদের গান্ধিজী কেমন আছেন?

—ভালো।

—তিনি এখনও উপবাস করেন?

—নিশ্চয়।

—তাঁর ছাগলটি কেমন আছে?

—সুস্থ সবল আছে।

সহর থেকে সে অঞ্চলটি বহু দূরে, কিন্তু সেখানেও গান্ধিজী সম্পর্কে লোকের এ আগ্রহ।

অতীত ও বর্তমানকালে বড় বড় নেতারা মানুষের মন ও হৃদয়ের উপর প্রভা বিস্তার করেছেন, শক্তিশালী দেশের নায়ক হিসাবে যে ক্ষমতা তাঁরা পেয়েছিলেন তা জোরে। গান্ধিজীই একমাত্র মানুষ, যিনি কোন রাষ্ট্রশক্তির উপর নির্ভর না করে সে প্রাধান্য অর্জন করেছেন। গান্ধিজীর অনুগামীর সংখ্যা যত, তার অর্ধেক অনুগামী আছে, এমন নেতাও পৃথিবীর ইতিহাসে একজনও আছে কিনা সন্দেহ। এখন তাঁর কথা পৌরাণিক কাহিনীর মত বিস্ময়কর হয়ে উঠেছে।—ইউসুফ মেহেরালি

—গান্ধিজী মূলত মানবধর্মী রাজনীতিক, কিন্তু যে ধরনের রাজনীতিকের সং আমাদের প্রতিদিন দেখা হয়, গান্ধিজী তাঁদের থেকে ভিন্ন ধরণের। তিনি সদা

আদর্শকে কার্যে রূপায়িত করেছেন, চিন্তা, কার্যসূচী ও কর্মধারাকে মহত্তর করে তুলেছেন⋯ তিনি চান ভারতের চিন্তাধারার দিক পরিবর্তন করতে—পাশ্চাত্য থেকে প্রাচ্যে, বাহ্য জগৎ থেকে অন্তর জগতে, শহর থেকে গ্রামে, কারখানা থেকে কুটীরে, যন্ত্র থেকে কুটীর-শিল্পে, অর্থবাদ থেকে সেবা-ধর্মে, আড়ম্বর থেকে সহজ-সারল্যে, মোটার গাড়ী থেকে চরকার চাকায়। —ডাঃ পট্টভি সীতারামিয়া

( কংগ্রেসের ইতিহাস )

—কেউ কেউ বলে তিনি নিহিলিষ্ট আবার কেউ বলে তিনি টলষ্টয়পন্থী। কিন্তু আসলে তিনি এর কোন পন্থীই নন। আসলে একজন খাঁটি সরল দেশপ্রেমিক যিনি ঈশ্বর, ধর্ম এবং ধর্মগ্রন্থে পূর্ণ বিশ্বাসী। —লালা লজপৎ রায়

—গান্ধিজীর সংযম আছে। তাঁর বিবৃতি সর্বযুগের জন্য।⋯গান্ধিজীকে অল্প কথা বলতেই আমরা শুনেছি। অনেকে অনেক দীর্ঘ চাতুর্যপূর্ণ বক্তৃতা দেন, কিন্তু আমাদের মন পড়ে থাকে ক্ষীণদেহ, নম্র, সদা-হাস্যময় মানুষটির উপর। এক মুহূর্ত তিনি চোখের আড়ালে গেলে আমরা অনুভব করি কংগ্রেস-সম্মেলনের প্রাণশক্তি হারিয়ে গেছে।⋯ —বোম্বে ক্রনিকল্

—আমরা বিশ্বাস করি যে, যদি মিষ্টার গান্ধী তাঁর স্বদেশবাসীদের উপর তাঁর আদর্শবাদ প্রভাবিত করতে পারেন তাহলে পৃথিবীতে কোন জাতি আর ভারতীয়দের গায়ে হাত দিতে সাহস করবে না।⋯গান্ধিজীর নীতি অত্যুৎকৃষ্ট, এ নীতির সৌন্দর্য উপলব্ধি করতে হলে চোখ বুঁজে কিছুক্ষণ শুধু ভাবতে হবে।

গান্ধিজী বলেন, অস্ত্রের চেয়ে চরিত্র-শক্তির উপরেই জাতীয়তাবাদ গড়ে তুলতে হবে। যা কিছু খারাপ বলে বুঝবে, তা পরিত্যাগ করবে। অধমকে সম্মান করবে, দৈহিক শ্রমকে শ্রদ্ধা করবে, ধীর হবে, সংযমী হবে, সম্মান দাবী করবে না, ব্যক্তিত্ব দিয়ে সম্মান অধিকার করবে। পশ্চিমের বস্তুতান্ত্রিকতা এবং বাণিজ্য-নীতির কাছে মাথা নোয়াবে না, রাজনীতির জন্য নীতিকে ডুবিয়ে দেওয়া চলবে না।

আমরা গান্ধিজীকে ঠিকমত বুঝতে পারি না⋯আমরা আশা করি, গান্ধিজী স্বরাজলাভের ক্রম-অগ্রসর নীতি সমর্থন করবেন, যাতে ক্যানাডার মত আত্মসম্মান বিসর্জন না দিয়ে ভারতবর্ষ বৃটিশ সাম্রাজ্যের ভিতরেই থাকবে।

—দি ক্যাথলিক হেরাল্ড অব ইণ্ডিয়া

## আমাদের গান্ধিজী

—ইস্কুল কলেজ, অফিস আদালত, ট্রেণ ট্রাম ফুটপাত, সর্বত্রই আজ গান্ধিজীকে নিয়ে আলোচনা হচ্ছে—কোথাও প্রশংসা, কোথাও সমর্থন, কোথাও সমালোচনা, কোথাও ভয়, কোথাও বা আশার কথা। গান্ধিজী যদি সফল হন, তাহলে এদেশে কি হবে, সেই সম্পর্কে যা শোনা যায়, তারই কয়েকটি এখানে উল্লেখ করছি।

গান্ধিজী যদি সফল হন তাহলে—

কোটি কোটি নিরন্ন লোকের মুখে দুটি অন্ন জুটবে,
শিশুরা একটু দুধ খেতে পাবে
মদের দোকান বন্ধ হবে
তাঁতিরা জীবনরক্ষার মত রোজগার করতে পারবে
কুটীর-শিল্পগুলি আবার বেঁচে উঠবে,
নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষের দাম কমবে,
সরল জীবনযাত্রা সহজ হবে······ইত্যাদি।

—দি কর্ণাটিক্ ( পত্রিকা )

—সবাই তাঁর চারি পাশে সমবেত হয়েছে ন্যায় ও বিশ্বাসের প্রেরণায়। তাঁর নেতৃত্বে এদের অবিচল আস্থা। শীর্ণদেহ পাণ্ডুর, বেঁটে-খাটো মানুষটি বিরাট জন-সমুদ্রের আগে আগে এগিয়ে চলেছে, অনুগামীরা নানাসম্প্রদায়ের নানা বৃত্তির—গুজরাতী ব্যবসায়ী, মাদ্রাজী ফেরিওয়ালা, বাঙালী কারুকৎ, বিহারী ও আসামী কিষাণ, সকল ধর্মের নরনারী, ধনী ও দরিদ্র, সবাই নিষ্ঠার সংগে তাঁর অনুগমন করেছে—স্বাচ্ছন্দ্য ভুলে গেছে, গৃহের বিলাস ত্যাগ করেছে, অর্থের মোহ ছেড়েছে কারাগারের শংকা আর তাদের নেই, সব দুঃখের সম্মুখীন হবার জন্য তারা আনন্দে দৃঢ়চিত্তে প্রস্তুত হয়েছে,···অপূর্ব নেতা, বিস্ময়কর তাঁর অনুগামীর দল···দক্ষি আফরিকায় গান্ধিজী ও তাঁর অনুগামীদের সেই সংগ্রাম ইতিহাস তৈরী করেছে।···

গান্ধিজীর চরিত্রের একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে বিদ্বেষ হীনতা। তিনি অনেক দুঃখ সহেছেন কিন্তু কারাগারের কষ্টও তাঁর মনকে তিক্ত করে তুলতে পারে নি অপর গুণটি হচ্ছে তাঁর সহজাত পরমত সহিষ্ণুতা। অহিংসা নীতির উপর তাঁর যে বিস্ময়কর বিশ্বাস তা তাঁর বন্ধু ও সহকর্মীরা সহজে বুঝতে পারেন না, কিন্তু সেজন্য তিনি কখনও বিতর্ক তোলেন না। তার কর্মময় জীবনের অনেক দুর্যোগের সাথী অনেক সহকর্মী, শেষে ভিন্ন মত পোষণ করার জন্য তাঁকে ত্যাগ করেছেন, কেউ কেউ আবার বিরোধী দলেও যোগ দিয়েছেন কিন্তু সেজন্য তাঁদের সংগে গান্ধিজীর বন্ধুত্ব

এতটুকু করে নি। আমার নিজের কথা বলতে পারি যে অনেক সময় তাঁর নীতি ও কর্মধারার উপর আমি আস্থা রাখতে পারিনি…সে কথা তাঁকে জানিয়েছি, কিন্তু তাতে তাঁর প্রীতি ক্ষুণ্ণ হয়নি। যখনই তিনি মাদ্রাজে এসেছেন, যত কাজই তাঁর থাক না কেন আমার গৃহে একবার ক্ষণেক দর্শন দিতে তাঁর ব্যতিক্রম হয়নি।

গান্ধিজীর নীতি কংগ্রেসের উপর যে প্রভাব বিস্তার করেছে তাতে কংগ্রেসকে আজ গান্ধী-কংগ্রেস বলা চলে। কংগ্রেস ও গান্ধিজী আজ এক হয়ে গেছে।

—জি. এ. নটেশন

—১৯৪২ সালে লর্ড লিনলিথগো লুই ফিশারকে বলেন—গান্ধিজী ভারতের বৃহত্তম বস্তু। (Gandhiii is the biggest thing in India)—

—লর্ড লিনলিথগো

—গান্ধী-পরিকল্পনায় প্রতিষ্ঠানের চেয়ে ব্যক্তির উপরেই বেশী আস্থা রাখা হয়েছে। গান্ধী-সমাজের শক্তির উৎস হোল 'নতুন-মানুষ'। আমরা যে হৃদয় পরিবর্তনের কথা শুনি, এ হচ্ছে তাই। এ ছাড়া কোন বিপ্লবই সম্পূর্ণ হয় না, কোন বিপ্লব ঘটে না, কোন উন্নতিও হয় না। তোমাকে মানুষের অন্তরের কাছে আবেদন করতে হবে, ভালবাসার ভিতর দিয়ে, ঘৃণা দিয়ে নয়।…গান্ধিজীর সমাজে নতুন সমাজের সমস্ত প্রাথমিক দায়িত্ব ব্যক্তির উপরেই আছে, পাছে প্রতিষ্ঠানগুলি আদর্শের ধারক হয়ে বসে, সেইজন্য সমাজ-ব্যবস্থাকে যথাসম্ভব সরল রাখার চেষ্টা হয়েছে।

—এম, এল, দাঁতওয়ালা

—একজন ফ্যাসি-বিরোধী আমাকে বললেন—গান্ধিজীর নেতৃত্ব কংগ্রেসের উপর একটা বোঝা।

—সেইজন্যই তো গান্ধিজী কংগ্রেস থেকে বিদায় নিয়েছেন।

—নেতৃত্ব একটা চাকরী কি পেশা নয় যে বিদায় নেওয়া চলবে। এটা হোল আমরণ বহন করার একটা দায়। গান্ধিজীর কংগ্রেস থেকে বিদায় নেওয়া অনুচিত, কংগ্রেসকে একটা বিপ্লবী আন্দোলনের পুরোভাগে নিয়ে যাওয়া তাঁর কর্তব্য।…

একজন উদারনৈতিক বললেন—এনার্কিষ্ট বলে যদি কেউ থাকেন তাহলে তিনি গান্ধিজী। তিনি শাসনতন্ত্রের বিরোধিতায় বিশ্বাস করেন এবং শৃংখলা রক্ষায় আস্থা রাখেন না। যদি তিনি উদারপন্থী হন, তিনি সফল হবেন। যদি চরমপন্থী তিনি

শ্রেয় বলে মনে করেন, তাহলে রাজনৈতিক অচল অবস্থা চলতেই থাকবে।···তাঁর উচিত স্যার চিমনলাল শীতলবাদের মত উদারনৈতিক নেতার উপদেশ মত আইনানুগ কাজ করা এবং অসহযোগ, প্রতিরোধ ও আইন-অমান্যের নিষ্ফলা কর্মপন্থা ত্যাগ করা।···

হিন্দু-মহাসভার এক প্রধান বললেন—দাংগাহাংগামায় মুসলমানদের অত্যাচারের গান্ধিজী নিন্দা করেননি; সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা স্বীকার করে নিয়েছেন।···তিনি সদাই প্রচার করেন, সাম্প্রদায়িক ঐক্য ছাড়া স্বরাজ হবে না। তিনি পাকিস্তান মেনে নিতেও প্রস্তুত। এখন মহাত্মাজীর কর্তব্য হচ্ছে মুসলমানদের প্রতি তোষণ-নীতি পরিত্যাগ করা, জিন্নার কাছে অপমানিত হতে না যাওয়াই তাঁর উচিত। হিন্দু মহাসভায় যদি তিনি যোগ দিতে নাও পারেন, হিন্দু মহাসভাকে দুর্বল করে দেওয়া তাঁর উচিত নয়। তাঁর উচিত হিন্দুদের এক ও সংঘবদ্ধ করা, যেন তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে পারে।···

মুসলীম লীগের এক বন্ধু বললেন—গান্ধিজী দেশের একজন নেতা নন, হিন্দু নেতা মাত্র। কারণ রাজনীতিক্ষেত্রে তিনি অস্পৃশ্যতা, উপবাস প্রভৃতি হিন্দু-রীতিনীতিতেই বেশী গুরুত্ব দেন। তিনি মুসলমানদের কোন সুযোগ-সুবিধা দিতে চাননা বলেই পাকিস্তানের কথা উঠেছে। ঐক্যের চাবিকাঠি তাঁর হাতে আছে। তাঁর উচিত দেশকে ভাগ করে মিঃ জিন্নার সর্ত স্বীকার করে নেওয়া।···

একজন পুঁজিপতি বললেন—গান্ধিজীই শ্রমিক আন্দোলনের জন্য দায়ী। চাষী-মজুরদের মাথায় তিনি কতকগুলো উদ্ভট ধারণা ঢুকিয়েছেন। গরীবকে তিনি বলেন দরিদ্র-নারায়ণ, তাতে ভগবানেরও অপমান করেন আবার গরীবের মনেও মাদকতা জাগিয়ে দেন।···তাঁর কাছ থেকে প্রেরণা পেয়ে কংগ্রেসী মন্ত্রীরা বস্ত্র-শিল্পের উপর কর বাড়িয়েছে, সম্পত্তির উপর কর বসিয়েছে, সুদখোর আর চিনির কারবারী-দের সাজা দিতে চাইছে। তিনি খদ্দরের প্রবর্তন করতে চাইছেন, যাতে মিলের মালিকেরা পয়সা না পায়। যেখানে সম্পত্তি রক্ষা পাবে না, লাভ থাকবে না, মজুরেরা দুর্বিনীত হবে, প্রজারা জমিদারকে মানবে না, সে স্বরাজ আমরা চাই না। এখন গান্ধিজীর উচিত তাঁর দোষ-ত্রুটি স্বীকার করে নেওয়া এবং এমন কোন কাজ না করা যাতে জাতির অর্থনৈতিক কাঠামো ও বিকাশ দুর্বল হয়ে পড়ে।···

এক শ্রমিক নেতা বললেন—গান্ধিজীই হচ্ছেন পুঁজিবাদীদের শেষ দুর্গ। গান্ধিজী বলেন, তিনি জনগণের প্রতিনিধি, অধঃপতিতের জন্য তাঁর বুক ফেটে যাচ্ছে। এ হোল নেহাৎ ভাবপ্রবণ বুর্জোয়া কথা। আমরা চাই পুঁজিবাদ ও ব্যক্তিগত সম্পত্তি

উচ্ছেদ করবার জন্য [illegible] যে বিরাট আয়োজন হচ্ছে, গান্ধিজী তাতে যোগ দিন। তা নাহলে জাতীয় আন্দোলনে গরীবদের কোন আকর্ষণ থাকবে না।···

দেশীয় রাজ্যের এক দেওয়ান বললেন—বয়কট, হরতাল, কালো নিশান দেখানো, পিকেটিং করা, খাজনা বন্ধ করা, আইন অমান্য-করা, জেলে যাওয়া প্রভৃতি গান্ধিজী আসার আগে কে জানতো? কাশী-হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্বোধন বক্তৃতায় তিনি সামন্ত রাজাদের জাঁকজমকের নিন্দা করেন। আপনারা রাজকোটের ব্যাপারে দেখলেন তো? দেশীয় রাজ্যে যত গোলমাল সবের জন্য তিনিই দায়ী। যদি তিনি স্বাধীনতা চান, তাহলে এ ব্যাপারে মাথা ঘামানো তাঁর উচিত নয়।···

দেশীয় প্রজাদলের এক প্রতিনিধি বললেন—গান্ধিজী সামন্ত রাজাদের অনুগ্রহ দেখাবার পক্ষপাতী।···তাঁর ধারণা ওদের মনকে বদলে ফেলা যায়।···

একজন অর্থনীতিবিদ বললেন—গান্ধিজীর প্রাগৈতিহাসিক যুগের কতকগুলি ধারণা আছে, যেমন চরকা ও খাদি। এ অর্থনীতিক অপব্যয় ছাড়া আর কিছু নয়। গান্ধিজীর উচিত আধুনিক অর্থনীতি সমর্থন করে বড় বড় কল-কারখানা প্রতিষ্ঠা করা।···

একজন রাজনৈতিক বললেন—গান্ধিজী রাজনীতি করার উপযুক্ত নন। তিনি সন্ন্যাসী মানুষ, মহাপুরুষ,—রাজনীতির কুটিলতা তাঁর স্বভাব-বিরুদ্ধ। তাঁর নীতি মানার চেয়ে তাঁকে শ্রদ্ধা জানানো সহজ। তিনি বুদ্ধ, চৈতন্য, কবীর ও বিবেকানন্দের মত ধর্ম-নেতা ও সংস্কারক। গান্ধিজীর উচিত রাজনীতি তাঁদের হাতে ছেড়ে দেওয়া —যাঁরা বৃটিশের চাল ও মুসলীম-লীগের ধাপ্পাবাজীর সমান স্তরে নেবে এসে সংগ্রাম চালাতে পারবে। তাঁর এখন রাজনীতি ছেড়ে দেওয়া উচিত।···

সবাই চান গান্ধিজী সব দলেই একযোগে কাজ করুন একই সময়ে।

—গগনবিহারী মেহতা

**বিদেশীয়ঃ**

—আমি ভ্রাতৃভাবে আপনাকে অভিনন্দিত করছি। আপনার সংগে পরিচয় হওয়ায় আমি বিশেষ আনন্দিত।···পৃথিবীর আরেক প্রান্তে থেকেও আমি বেশ বুঝতে পারছি, আপনি ট্রান্সভালে যে কাজ করছেন, তা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কাজ। আজকের পৃথিবীতে যেখানে যত ভালো কাজ হচ্ছে, সে সবের চেয়ে বড় কাজ···এবং একদিন শুধু খৃস্টান সমাজকেই নয়, সারা জগৎকেই এই কাজের অংশ গ্রহণ করতে হবে।···

—কাউন্ট লিও টলস্টয়

—আমাদের ইউরোপীয় বিপ্লবীদের মত গান্ধিজী আইন-কানুন ও অর্ডিন্যান্স সৃষ্টি করার জন্য আসেননি,—তিনি এসেছেন নূতন মানুষ, নূতন সমাজকে গড়বার জন্য।... ইনি হলেন সেই মানুষটি, যিনি ত্রিশ কোটী নরনারীকে বিপ্লবের পথের পথিক করেছেন, বৃটিশ-ভারতের ভিত্তিকে কাঁপিয়ে দিয়েছেন এবং যিনি ধর্মের এমন একটা প্রেরণা এনেছেন, মানুষের রাজনীতিক্ষেত্রে দু' হাজার বৎসরের মধ্যেও যার তুলনা আমরা দেখিনি।...একটা কথা ধ্রুব সত্য—হয় গান্ধিজীর আদর্শ জয়লাভ করবে, না হয় তাঁর আত্মা খৃস্ট ও বুদ্ধের মত নব নব অবতারের রূপ নেবে, শেষে এমন এক অবতারের মধ্যে তাঁর আদর্শের চরম প্রকাশ আমরা দেখতে পাব, যিনি হবেন অর্ধেক মানুষ ও অর্ধেক দেবতা। তাঁর মধ্যে মূর্ত হয়ে উঠবে সেই জীবনের আদর্শ, যা নূতন মানুষকে নিয়ে যাবে নূতন পথে।...

—রোমাঁ রোলাঁ।

—বাইরের কোন শক্তির সমর্থন তাঁর পিছনে নেই, তবু তিনি দেশের জনগণের নেতা। তিনি রাজনীতিক, কিন্তু তাঁর রাজনৈতিক সাফল্য কোন কলা-কৌশলের উপর নির্ভর করে না, নির্ভর করে আস্থাভাজন ব্যক্তিত্ব-শক্তির উপর। তিনি একজন বিজয়ী যোদ্ধা, কিন্তু তিনি সর্বদা বলপ্রয়োগের নিন্দা করেন। তিনি জ্ঞানী ও বিনয়ী, দৃঢ়সংকল্প-পরায়ণ ও সামঞ্জস্য-বিধায়ক। তিনি সারা জীবন দেশের জনগণের কল্যাণ ও তাঁদের উন্নতি বিধানের জন্য উৎসর্গ করেছেন। তিনি এমন একজন মানুষ, যিনি সাধারণ মানুষের মহত্ব নিয়ে ইউরোপের পশু-শক্তির সম্মুখীন হয়েছেন এবং ক্রমশঃ মহত্তর হয়ে উঠছেন। ভবিষ্যৎ যুগের মানুষ হয়তো বিশ্বাস করতে চাইবে না যে, তাঁর মত একজন মানুষ রক্তমাংসের দেহ নিয়ে এই পৃথিবীতে বিচরণ করেছিলেন।...

—আইনষ্টাইন

—আমি আমার নিজের কথা বলতে গেলে একথা নিঃসংকোচে বলতে পারি যে, মহাত্মা গান্ধীর এই নেতিকর (Negative) নীতিকে আমি স্বীকার করে নিতে পারি না। এই নেতিকর নীতির সাহায্যে নিতান্ত সংস্কারসূচক কোন কাজ মাত্র হতে পারে।

সামরিক বলপ্রয়োগের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ তুলে বলা হয় যে, ইহা নিরর্থক। ইহা নিরর্থক তো নয়ই, বরং এত ফলপ্রসূ যে, এর ফল পরিমাণ করা যায় না। যে উদ্দেশ্য নিয়ে সামরিক বলপ্রয়োগ করা হয়, সব সময় যে তাতে উল্টো ফল হয়, তা নয়। প্রায় সকল ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে যতটা ফল আশা করা হয়, তার চেয়ে অনেক বেশী ফল পাওয়া যায়।

## আমাদের গান্ধিজী

…ভারতবর্ষকে হিংসা ও বলপ্রয়োগের দ্বারা অধীন করা হয়েছে এবং হিংসা ও বলপ্রয়োগের দ্বারাই তাকে পদানত করে রাখা হয়েছে। ঠিক আয়ারল্যাণ্ডকে যেমন হিংসা ও বলপ্রয়োগ দ্বারা স্বাধীন করা হয়েছে, ভারতবর্ষকেও ঠিক তেমনি হিংসা ও বলপ্রয়োগের দ্বারা স্বাধীন হতে হবে। ইতিহাসের কাছে একথা অস্বীকার করা অন্ধ অলস বিলাস ছাড়া আর কিছুই নয়। এ যেন বাঘকে বলা যে তুমি অহিংস হয়ে যাও আর ভাত খেয়ে অসহযোগী হয়ে ওঠ। এই সমস্তার একমাত্র যুক্তিপূর্ণ পরিণতি হোল এই যে, যে পর্যন্ত একজনও ইংরাজ ভারতবর্ষে বেঁচে থাকবে সে পর্যন্ত ভারতবাসী নিরাপদ নয় এবং যে পর্যন্ত একজন ভারতবাসী ভারতবর্ষে আছে সে পর্যন্ত ইংলণ্ড নিরাপদ নয়। হিংসার সূত্রপাত হলেই মানুষ যে কোনও উপায়ে নিরাপত্তার জন্য উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে এবং যেহেতু নিরাপত্তা লাভ করা অসম্ভব, সেইজন্য পরিণতিতে অন্তহীন রক্তপাত হিংসা ও বলপ্রয়োগের পথ তৈরী হয়ে মানবতাকে ধ্বংসের পথে ঠেলে নিয়ে চলে।

সেইজন্যই হিংসাকে মানুষ পাপ বলে বিবেচনা করে এবং তা থেকে বিরত থাকতে চায়। খৃস্ট, বুদ্ধ, শেলী, টলস্টয় ও মহাত্মা গান্ধী এই বিবেকের দ্বারা পরিচালিত হয়ে মানবতার মুক্তির জন্য অস্থির হয়েছেন। এবং যেহেতু তাঁরা পাপকে প্রতিশোধ দ্বারা বিরত করতে পারেননি সেইজন্য তার গতিপথও রুদ্ধ হয়নি। যে কারণে পাপের পথ সৃষ্টি হচ্ছে, সেই কারণ রোধ করে মানবাত্মাকে শান্তির পথ সৃষ্টি করতে হবে। পাপ শক্তিমান, তাকে রোধ করতে হলে তার চেয়েও শক্তিমান অস্ত্র ব্যবহার করে তার পথ রোধ করতে হবে।…

—জর্জ বার্ণার্ড শ'

—আমি তাঁকে দিনের পর দিন দেখেছি। তাঁকে দেখেছি ভোরের আগে ঠাণ্ডায়, অন্ধকারে। তাঁকে দেখেছি মধ্যরাত্রে, যখন তিনি মুসলমান প্রতিনিধিদের সংগে কথাবার্তা বলে বাড়ীতে ফিরে এসেছেন। তাঁকে দেখেছি মধ্যাহ্নে ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে আছেন। তাঁকে দেখেছি একজন ভূতপূর্ব প্রধান মন্ত্রীর বসবার ঘরে আগুনের পাশে। তাঁকে দেখেছি সেণ্ট-জেম্‌স্‌-প্যালেসে রাজা মহারাজা এবং মন্ত্রিগণের মধ্যে বসে থাকতে। দেখেছি সব সময়েই তাঁর সেই একই মূর্তি—শান্ত, প্রফুল্ল, কৌতুকপ্রিয়, গুণগ্রাহী, স্বার্থশূন্য, ভগবান এবং মানুষের সংগে একসূত্রে গাঁথা।

—মুরিয়েল লিষ্টার

—গান্ধিজী একজন বিরাট মানুষ। তিনি পৃথিবীর একজন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি, তিনি জগতের শেষ মহামানব। তিনি মহান আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত…সেই আদর্শ

আমাদের বর্তমান সংকটপূর্ণ জগতে কার্যকরী হবে কিনা সে প্রশ্ন উঠতে পারে। কিন্তু মিষ্টার গান্ধী একজন মহান দেশপ্রেমিক, একজন মহামানব, একজন মহান আধ্যাত্মিক নেতা।...

—জেনারেল স্মাটস্

—আমি মনে করি গান্ধিজী অসামান্য আধ্যাত্মিক ও নৈতিক মহত্বের অধিকারী ...তিনিই একমাত্র লোক, যিনি ভারতীয় পরিস্থিতির পরিবর্তন করতে পারেন।...

—অধ্যাপক উড

—সেই হোল পরম ধর্ম, যার লক্ষ্য প্রেম, ক্ষমা, উদারতা ও শান্তি—সেই ধর্ম হোল অন্তরের ধর্ম। এই পরম ধর্মের মর্মকে যারা উদ্‌ঘাটিত করেছেন এবং তার আদর্শকে যাঁরা সত্য করে তুলেছেন নিজেদের জীবনে—তাঁদের মধ্যে তিনজনকে ভাবীকাল সর্বোচ্চ আসন প্রদান করবে। এই তিনজনের নাম—গৌতম, যীশুখৃস্ট এবং গান্ধী। ...মহাত্মা গান্ধীর মত স্বার্থলেশশূন্য মানব-হিতে উৎসর্গিতপ্রাণ মহাপুরুষের দৃষ্টান্ত জগতের ইতিহাসের পৃষ্ঠায় দুর্লভ। জগতের অন্যান্য মহাজনগণের ন্যায় পবিত্রতার প্রতীক এই মহাপুরুষও সব সময় নিজেকে নিতান্ত অকিঞ্চিৎ বলে মনে করেন এবং নিজের ক্ষমতার উল্লেখ করে তিনি বলেন: "ভারতের মুক্তিতেই তাঁর নিজের মুক্তি সাধনের একমাত্র আশা।" তাঁর হৃদয়তন্ত্রী অসীমের সুরে বাঁধা, তাই মানুষ তাঁর কি করতে পারে না পারে, তা তিনি গ্রাহ্য করেন না। তাঁর একমাত্র ভয়, ভারত পাছে ত্যাগ ও অহিংসার আদর্শকে পরিত্যাগ করে পশুবলের আশ্রয় গ্রহণ করে। যদি তাই হয়, তাহলে তিনি হিমালয়ের গভীর অরণ্যে নিজেকে নির্বাসিত করে জীবনের অবশিষ্ট কাল দেশের মংগল কামনার প্রার্থনায় ও উপবাসে কাটিয়ে দেবেন। ঈদৃশ মহাপ্রাণ মহাপুরুষের বিরুদ্ধে প্রবল শক্তিমানের সর্ববিধ প্রচেষ্টা বিফল।...

—ডাক্তার ওয়ালার ওয়ালস্

—যদি রক্তক্ষয়ের সাহায্যে কোন আন্দোলন সাফল্যলাভ করে এবং চরিত্রহীন নরনারী নিয়ে রাষ্ট্র গড়ে তুলতে হয়, তাহলে সেই বিজয় গৌরবকে কি ভগবান বিজয় বলে গ্রহণ করবে? আমাদের তো মনে হয় ভগবান তা করবেন না। আমরা কামনা করি, আয়ারল্যাণ্ডে একজন গান্ধী জন্মগ্রহণ করুন এবং নরনারী তাঁকে ঋষি বলে তাঁর উপদেশ নতমস্তকে পালন করুক।... —আয়ারল্যাণ্ডের কবি ইয়েট্‌স্

—ঐতিহাসিক সত্যের মর্যাদা অক্ষুন্ন রেখে হৃদয়ের সবটুকু শ্রদ্ধা দিয়ে আমি বলছি

যীশু খৃস্টের সংগে গান্ধী একাসনে বসবার যোগ্য ব্যক্তি। এই পবিত্র ও সাধু জীবন-যাপনকারী ভারতীয় মহাপুরুষ প্রেমধর্ম শিক্ষা দিচ্ছেন, নিরুপদ্রব প্রতিরোধের নীতির মধ্য দিয়ে তা আচরণ করবার পথ প্রদর্শন করছেন। তিনি সমাজকে এক অভিনব আধ্যাত্মিক ভিত্তির উপর নতুন রূপ দিয়ে প্রতিষ্ঠা করতে চান। যদি আমি প্রভু যীশু খৃস্টের দ্বিতীয়বার জন্ম পরিগ্রহের বিষয় বিশ্বাস করতাম, তাহলে বলতাম, প্রভু যীশুই মহাত্মা গান্ধীরূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছেন।…

—বার্কিং যাজক রেভারেণ্ড [illegible]

—ভারতে যে সব মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করেছেন, মহাত্মা গান্ধী হচ্ছেন তাঁদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ।—

—[illegible]

—মিষ্টার গান্ধীর চাইতে ন্যায় ও করুণার এতো বড় প্রতিমূর্তি, ক্ষমাশীল ও দুঃখ-ভোগী আমাদের ক্রুশবিদ্ধ ত্রাণকর্তার এতো বড় খাঁটি প্রতিনিধি আমি আর কাউকে জানি না।…

—দি রাইট রেভারেণ্ড হোয়াইট হেড

—যুদ্ধের বিরুদ্ধে শান্তির পথকে অমোঘ অস্ত্ররূপে পরিণত করার যে গৌরব, সে গৌরব গান্ধীর প্রাপ্য। পাশ্চাত্যের লোক মনে করে সাধু হলেই মানুষ হয় বোকা, আর চালাক-চতুর হতে গেলে তাকে অসাধু হতেই হবে। গান্ধী সাধু ও বুদ্ধিমান দুই-ই।…

—শেরউড এডি

—য়ুরোপ থেকে আমদানী আধুনিক সার্বভৌম যেসব রাজনৈতিক নেতা রাষ্ট্রনীতিকে করেছেন জীবনের পেশা, তাঁদের সংগে ভারতবর্ষের নাড়ীর যোগ বিচ্ছিন্ন। জাতির মর্মকে বুঝবার ক্ষমতা তাঁদের নেই। ভারতবর্ষ চায় এমন এক নেতাকে যিনি একাধারে হবেন তার রাষ্ট্রগুরু এবং ধর্মগুরু। গান্ধীর মধ্যে এই দু'য়ের মিলন ঘটেছে।…

—ফুলপ. মিলার

—কল্পনা করুন—কুৎসিৎ, ক্ষীণদেহ, দুর্বল এশিয়াবাসী, তামাটে রঙ, মাথায় ছোট ছোট চুল, গালের হাড় উঁচু হয়ে উঠেছে, ছোট ছোট চোখ, মুখে একটিও দাঁত নেই, বড় বড় কান, উচ্চ নাসিকা, শীর্ণ হাত পা ও কটিত্রাণ পরিহিত একটি মানুষ ইংরেজ বিচারকের সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন, দেশবাসীর কাছে স্বাধীনতার বাণী প্রচার করার অপরাধে। আবার দেখুন—সেই বেশে সেই লোকটি দিল্লীর বড়লাটের প্রাসাদে সিঁড়ি

ইংলণ্ডের সর্বোচ্চ প্রতিনিধির সংগে সমান সর্তে আলোচনা চালাচ্ছেন। আবার কল্পনা করুন—সেই মানুষটি আমেদাবাদের সত্যাগ্রহ আশ্রমে আসবাবপত্রহীন একখানি ঘরে একখানি ছোট মাদুরের উপর বসে আছেন, তাঁর অস্থিসার পা দুখানি যোগাসনের মত স্থাপিত। তিনি চরকা কাটছেন। স্বজাতীয় জনগণের দুঃখবোধে তাঁর মুখ রেখাকিংত, স্বাধীনতাকামীদের প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্য তিনি সদাই প্রস্তুত। এই নগ্ন তাঁতিটি বত্রিশ কোটী হিন্দু-মুসলমানের আধ্যাত্মিক ও রাজনৈতিক নেতা। যখন তিনি জনসভার মাঝে এসে দাঁড়ান, চারিপাশের মানুষ তাঁকে ঘিরে ধরে, পায়ের ধুলা লয়। বুদ্ধদেবের পর ভারতবর্ষে এতো শ্রদ্ধা আর কেউ পাননি। আজকের জগতে তিনি যে সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ সে সম্পর্কে কোন বিতর্ক নেই, তিনি যে সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক লোক সে সম্পর্কেও কোন সন্দেহ নেই। আজ থেকে বহু শতাব্দী পরে, যখন এঁর সমসাময়িক কোন মানুষের কথাই কেউ মনে রাখবে না, তখন লোকে এঁকে স্মরণ করবে।···

—উইল্ ডুরান্ট

—মহান আত্মা—মহাত্মা গান্ধিজীর বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে একজন বলেছেন, তিনি এক নূতন ভাবধারা সৃষ্টি করে সমস্ত জগতকে স্তম্ভিত করেছেন। বিপুল বৃটিশ রাজশক্তির সহিত যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন শান্তি-সেনা দ্বারা। গোলা-গুলি, বন্দুক, কামানের জোরে ইংরেজ যেমন নিজেকে নিরাপদ মনে করে, এই বিশাল ভারত-ভূমির সর্বত্র তাঁরা নিরস্ত্রভাবে তদ্রূপ বা ততোধিক নিরাপদ বলে অনুভব করবে। ইহাই মহাত্মাজীর নূতন ভাবধারাটির স্বরূপ। ত্রিশ কোটীর অধিক নরনারীকে তিনি এই মহান ধর্মসাধনে প্রবৃত্ত করেছেন। ভূমণ্ডলের একটি মহাজাতি আত্মার বলে পরাধীনতার শৃংখলমুক্ত হবার জন্য দৃঢ়সংকল্প হয়েছে।···

—ব্লাক ওয়াইমন

—গান্ধিজী ত্যাগে বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছেন। অভাববোধকে সংক্ষেপ করেছেন। উপবাস করে তিনি আনন্দ লাভ করেন। তিনি এমন দুর্বল যে ছোট শিশুর মত তাঁকে কোলে করে নিয়ে যাওয়া যায়। তিনি শিশুর মতই পবিত্র। তাঁর সঙ্গে যিশুর তুলনা করলে কোন অন্যায় হয় না।···গান্ধিজী একজন দার্শনিক বিপ্লবী······যখন তাঁকে আসন্ন গ্রেপ্তারের শঙ্কা জানানো হয়, তখন তিনি হেসে বলেন—গবর্ণমেণ্টকে বলো আমি বেজায় মোটা ছুটে পালাবো কেমন করে ?···

—কর্ণেল ওয়েজ উড (দি নেশন—লণ্ডন)

—গান্ধিজীর মত মানুষ বহুযুগ অন্তর এক একবার জগতে আবির্ভূত হন। যখন মানব-সমাজে তাঁর একান্ত প্রয়োজন অনুভূত হয়! আজকের খৃষ্টানরা যেমন বলেন

—কিন্তু এসেছিলেন, তাঁর বাণীকে অন্তরে গ্রহণ করার, তাঁর নেতৃত্বকে স্বীকার করার মত মানুষ তখন প্রস্তুত ছিল না। ভবিষ্যৎকালের মানুষ গান্ধিজী সম্পর্কে একথা যেন না বলেন।···

—বি. ওয়াট্‌সন (নিউ ইয়র্ক)

—ভারতে এক অনন্যসাধারণ মানবের আবির্ভাব ঘটেছে।···আমেরিকায় সদ্য আগত একজন ভারতীয়কে আমি জিজ্ঞাসা করলাম—'গান্ধিজীর সঙ্গে তোমার পরিচয় আছে?' তিনি বললেন—'গান্ধিজীকে আমি ব্যক্তিগতভাবে জানি না, কারুর পক্ষেই তা জানা সম্ভব নয়, তিনি মহান্, তিনি বিরাট।' একজন সাধারণ হিন্দু চাষা থেকে সুরু করে বিলাতের বিশ্ববিদ্যালয়ের এক হিন্দু স্নাতক অবধি সকলেই গান্ধিজী সম্পর্কে এই একই মত পোষণ করে।······

গান্ধিজী আদর্শবাদী, তিনি বিশ্বাস করেন যে ভারতের লাখ লাখ জনসাধারণ যদি অন্তর দিয়ে অহিংসাকে গ্রহণ করেন তাহলে বৃটিশের মন বদলে যাবে এবং তারা ভারতের বন্ধু হবে।···

রুশিয়ায় টলষ্টয়ের যে স্থান ছিল, এই মহাপুরুষ সেই স্থান দখল করেছেন।···

যুবরাজ ভারতের যে পথ দিয়ে চলেছেন সে পথ জনশূন্য, দোকান-পাট বন্ধ, বাড়ী গুলি পরিত্যক্ত। সবাই গেছে গান্ধিজীর বক্তৃতা শুনতে। আরেক দিকে বিরাট জনতার মাঝে একটি টেবিল, টেবিলের উপর একখানি চেয়ার। গান্ধিজীকে সেই চেয়ারের উপর বসিয়ে দেওয়া হোল, সেখান থেকে অগনিত জনতার মাঝে তিনি অসহযোগের বাণী প্রচার করছেন।···

—প্রজ্ঞাপার বুরানেলী (ওয়ার্ল্ড ম্যাগাজিন—নিউইয়র্ক)

—বর্তমানে জীবিত যে কোন মানুষের চেয়ে গান্ধিজীর অনুগামীর সংখ্যা বেশী। শুধু মূক জনগনই তাঁর নেতৃত্ব মেনে নিয়েছে তা নয়, বুদ্ধিজীবিদের কাছেও তিনি মহাত্মাজী। উচ্চ সরকারী কর্মচারীরাও মনে করেন নিজের মত স্বীকার করিয়ে নেবার মত প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব তাঁর আছে। পাশ্চাত্য জাতির বুকে জন্মগ্রহণ করেছেন লেনিন—দৃঢ়চেতা, তীক্ষ্ণধী, অক্লান্তকর্মী, যুক্তিবাদী ও শৃঙ্খলা বিধায়ক ব্যক্তিত্ব। প্রাচ্যের বুকে জন্মগ্রহণ করেছেন গান্ধিজী—তেমনি দৃঢ়চেতা, তীক্ষ্ণধী, অক্লান্তকর্মী। কিন্তু লেনিন ছিলেন হিংসায় বিশ্বাসী আর গান্ধিজী অহিংস প্রতিরোধে আস্থাবান। একজন বিশ্বাস করেন তরবারীতে, আরেকজন আত্মিক শক্তিতে। আমাদের যুগে পরস্পর বিরোধী যে দু'টি নীতিবাদ প্রাধান্য পাবার চেষ্টা করছে, এরা দু'জনে সেই দুইদিকের প্রতীক।···

—জেম-সি-মুর (পার্লামেন্টের সদস্য)

ভারতীয়গণের মধ্যে মিষ্টার গান্ধীর মহত্ব ও প্রতিষ্ঠা সমধিক। তাঁর উদ্দেশ্য অতি মহৎ, চরিত্র সুবিমল। দেশসেবায় তাঁর নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগের তুলনা নেই। ভারত গবর্মেণ্ট তাঁকে নিয়ে যেরূপ বিব্রত হয়েছেন, অপর কাউকে নিয়ে সেরূপ হননি। মিষ্টার গান্ধীর বন্ধুবর্গের মধ্যে আমিও অন্যতম। তাঁর অপরাপর বন্ধুগণের ন্যায় আমিও তাঁকে অনুরোধ করছি যে, তাঁর হাতে যে বিপুল শক্তি রয়েছে, তা যেন তিনি দায়িত্ব বুঝে প্রয়োগ করেন। তিনি সময়ে বুঝতে পারবেন যে, ভারতে এমন কতকগুলি লোক আছে, যাদের কার্যকলাপের উপর তাঁর কোন হাত নেই; তারা তাঁর সুনাম ও সুখ্যাতির সুবিধা গ্রহণ করে স্ব স্ব অভিসন্ধি চরিতার্থ করতে সচেষ্ট হয়। —মণ্টেগু (ভারত-সচিব হিসাবে ১৯১৯ সালের ২২শে মে পার্লামেণ্টের কমন্স সভায় বক্তৃতা)

—আজকের জগতে গান্ধিজীর সমকক্ষ কোন মানুষ নেই।

মিষ্টার গান্ধী আমাদের মনে এমন এক সুন্দর জগতের দৃশ্য তুলে ধরেন যা স্বার্থহীন করুণার উপর গড়ে উঠবে।· গৌতম যার আদর্শ তুলে ধরেছিলেন চব্বিশ শো বছর আগে···তিনি একজন খাঁটি আদর্শবাদী মানুষ, ভারতের জনসাধারণ তাঁকে অবতার হিসাবে শ্রদ্ধা করে।···তিনি যে ভাবে বাস্তবকে ঘৃণা করেন ও শক্তিপ্রয়োগের বিরোধী তাতে তাঁকে আমরা ভারতীয় টলষ্টয় বলে ধরে নিতে পারি।···তাঁর বাণী গৌতম বুদ্ধ ও যিশুর কথা মনে পড়িয়ে দেয়, তিনি বলেন বর্তমান সভ্যতা খারাপ, তার উচ্ছেদ করা প্রয়োজন···গান্ধিজী ধর্মসংস্কারকের চেয়ে বড়, তিনি একজন মহাপুরুষ সাধু, দেব-গুণ সম্পন্ন মহাত্মা।···কিন্তু তিনি এমন এক বিপ্লব ঘনিয়ে তুলছেন, রক্তপাত ও বিশৃঙ্খলা ছাড়া যার আর কোন পরিণতি নেই। এবং সেজন্য ভারতসরকার ও ভারতীয় জনগণকে প্রস্তুত থাকতে হবে।··· —পার্সিভ্যাল ল্যাণ্ডন (ডেলি টেলিগ্রাফ)

—গান্ধিজী এক নৈতিক প্রতিভা, তাঁর নীতি ভাবীকালের জন্য, তিনি বিবাদ নিষ্পত্তি করার জন্য যে নীতি ঘোষণা করেছেন তা একদিন মানুষের হিংসাকে জয় করবে,···তবেই সভ্যতা বাঁচবে··· —সি, ই, এম, জোড

—গান্ধিজী বেনিয়া সন্তান। অতি সাধারণ শীর্ণ দেহ। স্বপাক অন্ন আহার করেন, হাতে কাটা সুতার কাপড় পরেন। চরিত্র নিষ্কলুষ। হিন্দু পুরাণ ও শাস্ত্রের উদাহরণ দিয়ে কথা বলেন। ব্যবহার ভদ্র।

···যে সত্য তিনি উপলব্ধি করেন তাই প্রকাশ করেন, স্বার্থ বা বিপদের মুখা-

পেক্ষী হন না।… তিনি যুক্তিতর্কের উপরে, তাঁর বিবেক যা বলে তিনি তাই মেনে চলেন। তাঁর কঠোর সন্ন্যাসী-জীবন তাঁকে মহাত্মা নামে পরিচিত করেছে। 'মহাত্মা' শব্দের মানে, বৈদিক যুগের প্রাচীন ঋষির জ্ঞান-মুকুট তিনি শীর্ষে ধারণ করেছেন। তাঁর স্থান জাতি ও বর্ণের উচ্চে।…পাশ্চাত্য জগৎ হয়তো মিষ্টার গান্ধীকে পাগল বলে ধরবে, কিন্তু প্রাচ্যে এই ধরণের পাগলামি ভগবৎ-প্রেরণালব্ধ বৈশিষ্ট্য বলে গণ্য হয়।…

—স্যার ভ্যালেন্‌টাইন চিরোল

—কুতবমিনার বা তোগলকাবাদের চারিপাশে যে সব অট্টালিকা মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে, সেগুলি ক্ষয়ে ধুলায় মিশে যাবার অনেক পরেও ভারতবর্ষের মায়েরা ভবিষ্যৎ শিশুদের শোনাবেন ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঋষি মহাত্মা গান্ধীর গৌরবময় কাহিনী। ইহার কারণ এই যে, ইতিহাসের বুকে গান্ধিজী যে সৌধ তুলেছেন, তার উপাদান শাশ্বত সম্পদের এবং আধ্যাত্মিকতার, স্বয়ং ভগবানের রাজ্যে তার মূল ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত। দরিদ্রকে দলিত করে এই সৌধ গড়ে ওঠেনি, দরিদ্রের প্রতি প্রেম ও সেবাই এর সবচেয়ে বড় উপকরণ। সামরিক শক্তিরও জাঁকজমক এখানে নেই, আছে মানবাত্মার শান্ত সমন্বয়ের পূত পরিবেশ। বর্ণবৈষম্য অথবা জাত-বিচারের স্থান এখানে নেই—ধর্মের তার্কিক যুক্তিবলই এই প্রশান্ত সৌধের নীরবতা ব্যাহত করতে পারে না; গান্ধিজীর সাম্রাজ্য মানুষের অন্তরের অন্তরে প্রসারিত।…

—দীনবন্ধু এণ্ড্রুজ

—আমাদের এই যুগের কোন্ বিশ্বনায়ককে গান্ধিজীর সহিত তুলনা করা যেতে পারে, তাহাই আমি মাঝে মাঝে চিন্তা করি। এ রকম বহু রাষ্ট্রনায়ক আছেন, যারা বেশ কৃতিত্বের সংগে দেশ শাসন করেন, জোরালো বক্তৃতা করেন, নির্বাচনে সাফল্য লাভ করেন, যুদ্ধ জেতেন, শান্তি-সর্ত রচনা করেন, কিন্তু তাঁরাই আবার কত তাড়াতাড়ি বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে যান। প্রকৃতই যিনি বিরাট, ইতিহাসে তিনি হন চিরস্থায়ী। তাঁর মধ্যে যে জীবন্ত সৃজনীশক্তি বিদ্যমান তার সাহায্যে তিনি পৃথিবীকে বদলেছেন। আমেরিকার উড্রো-উইলসন ও লিংকন এই মহত্ত্বর সংজ্ঞার আওতার মধ্যে আসেন; ইউরোপের লেনিন ও এশিয়ায় গান্ধী।

গান্ধী যখনই কোন কাজ করেন বা কথা বলেন, তখনই মানুষ যেন এক বিরাটত্ব বোধে সচেতন হয়ে ওঠে। এমন কি, যখন তাঁর সংগে মতের অমিল হয় তখনও তাঁর অনুভূতির বিপুলতার দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে থাকা যায় না। গান্ধী খাঁটি হিন্দু,

অকৃত্রিম ভারতীয়। তবুও রাজনীতি সম্পর্কে তিনি যে ভাবধারার পোষক, ত
বিশ্বজনীন—কারণ নীতির উপরেই উহার প্রতিষ্ঠা।··· —ডুই ফিশার

—মহাত্মা গান্ধীর অস্ত্র মেশিনগান নয়, তাঁর অস্ত্র আত্মিক বল ও অহিংস প্রতি
রোধ। স্বাধীনতা সংগ্রামে এখন পর্যন্ত জয়লাভ না করলেও তিনি যথেষ্ট সাফল্য অর্জ
করেছেন। এই ক্ষুদ্রকায় মানুষটির দেহের ওজন হয়তো একশো পাউণ্ডও হবে ন
বটে, কিন্তু কটিবস্ত্র পরেন ও তকলি কাটেন, বিশ্বাসের অযোগ্য সময় উপবাস করে
অথচ ইনিই বৃটিশ সাম্রাজ্যে সমস্ত শক্তি বুক পেতে নিয়েছেন, এমন কি তাকে বো
হয় পরাস্তও করেছেন।··· —জন গান্থার

—লেনিন যদি মহাত্মা গান্ধীর অবস্থায় পড়তেন, তাহলে রাজনৈতিক সমস্যায়
তিনিও মহাত্মা-অবলম্বিত পন্থা গ্রহণ করতেন। কারণ এঁরা দুজনেই এক ধাতের লোক
এবং একই রকমের চিন্তাশীল; তাঁরা দু'জনেই দু'টি আন্দোলনে বিক্ষুব্ধ দেশের চিন্তায়
মগ্ন, কি করলে ভাল হবে এবং কি করলে মন্দ হবে, উহা তাঁরা পূর্বেই ঠিক করতে
পেরেছেন।···এই দুই বীর কর্মীরই মুখ্য উদ্দেশ্য এক। রাজ্যশাসনের ভাণে অর্থ শোষণ
করবার ইচ্ছায় যারা মানুষের প্রতি পশুর অধম ব্যবহার করে, তাদের বিরুদ্ধেই তাঁরা
যুদ্ধ করেছেন। জগতের দুঃখ দূর করে শান্তি স্থাপনই তাঁদের একমাত্র উদ্দেশ্য।

—হেনেরি বার্বাস্

—সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে গান্ধিজীর অনেক কথা আমাদের কাছে অদ্ভুত
লাগলেও, জাতীয় নেতা হিসাবে সেগুলো মোটেই অর্থহীন নয়। ভারতীয় জনগণ
তাঁর কথার মাঝে শক্তির সন্ধান পায়। তাঁর মন সমস্ত ভারতবাসীর মন। তিনি
মহামানব, তাঁকে ভারতীয়েরা বিশ্বাস করে, অন্ধের মত নির্দেশ পালন করে, সমস্ত
দৈহিক শক্তি ও নৈতিক সাহস দিয়ে··· —এডগার স্নো (লুজ এম্পায়ার
উইন ইণ্ডিয়া)

—একদিকে বিশাল ক্ষমতার নিদর্শন ইংলণ্ডের যুবরাজ, অন্যদিকে মাত্র এক টুকরা
খদ্দর পরিহিত নগ্নপদ সন্ন্যাসী—গান্ধী। উভয়েই ভারতের মৃত্তিকায় একই সময়
দণ্ডায়মান, কিন্তু ভারতের জনসাধারণের হৃদয় অধিকার করেছেন গান্ধিজী···সমগ্র
জাতির হৃদয়বৃত্তিকে তিনি সুনিয়ন্ত্রিত করেছেন।··· —লে মাতিন পত্রিকা (ফ্রান্স)

—মিষ্টার গান্ধী অনন্যসাধারণভাবে দেশের সেবা করেছেন, জাতীয় আত্মচেতনার
তিনিই উদ্বোধক··· —টাইমস্

## আমাদের গান্ধিজী

—পাঁচ ফীট ছ'ইঞ্চি উঁচু ক্ষীণ দেহ, সাধারণ পোষাক, এবং অতি-সাধারণ চেহারা ···কিন্তু তাঁর চোখের দৃষ্টি ও পদক্ষেপের দৃপ্তভঙ্গী তাঁকে সাধারণ মানুষের মাঝে অসাধারণ করে তুলেছে···তিনি বক্তা নন্ কিন্তু সারা ভারত তাঁর কথা শোনে···তিনি কোন দলের লোক নন্ তবু তিনি আজ এই ৫২ বছর বয়সে সমগ্র ভারতের চিত্ত দখল করে বসে আছেন···তাঁর ব্যক্তিত্বকে বিচার করা কঠিন···এক বাঙালী ষ্টেশন মাষ্টার বললেন—'তিনি ভগবান!' এক মূর্খ গ্রামবাসী বললেন—'ভগবান কোটি বৎসরে গান্ধিজীর মত এক একজন মহাপুরুষকে পাঠান!' একজন ছাত্র বললো—'গান্ধিজী মহামানব!' এক সরকারী কর্মচারী বললেন—'গান্ধিজী আমাদের কাছে বিভর শিশু পলের কথা মনে করিয়ে দেন!' এক বন্ধু বললেন—'সাবধান, গান্ধিজী একজন বিপজ্জনক বিপ্লবী!'···আমার বিশ্বাস যদি কোনদিন ভারতে স্বাধীন যুক্ত রাষ্ট্র গঠিত হয়, তাহলে ইতিহাসে তাকে গান্ধিজীরই কৃতকর্মের সাফল্য বলে লিখিত হবে···

—গ্লাসগো হেরাল্ড্

—বৃটিশ সুবিধামত ভারতের রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান করবে বলে যে প্রস্তাব করেছে, তার প্রতিবাদে ভারতীয়েরা বিপ্লবের ভয় দেখিয়েছে, পূর্ণ স্বাতন্ত্র্যের দাবী জানিয়েছে এক সন্ন্যাসীর নেতৃত্বে। অভিনব সন্ন্যাসীর দেবতুল্য আচরণ ও দৃপ্ত বাচনভঙ্গী ভারতের মাঝে অসন্তোষ ঘনিয়ে তুলেছে।···

তাদের ছোট দ্বীপটার বাইরে যে সব মানুষের নাম ইংরাজরা শুনে থাকে তাদের কোনটা মোহনচাঁদ করমচাঁদ গান্ধীর * চেয়ে অধিকতর পরিচিত নয়। গান্ধিজী ভারতে যে নীতির প্রবর্তন করেছেন সেই গান্ধিবাদ আজ ভারতে ইংরাজ-শাসনের স্থায়িত্বের পক্ষে ভীতিজনক হয়ে পড়েছে।

গান্ধিজীর বয়স এখন ৫১ বছর, অত্যন্ত ধর্মভীরু, মিষ্টভাষী লোক, সাধুর মত তিনি চলেন, পায়ে জুতা পরেন না, সামান্য কাপড় পরেন কিন্তু তাঁর প্রভাব সমাজের নিম্নস্তর থেকে উর্দ্ধমুখী।

বর্ত্তমান সভ্যতাকে তিনি অভিশাপ বলে মনে করেন। আধুনিক কলকব্জা ও যন্ত্রপাতি, রেলপথ ও টেলিগ্রাফের মধ্যে তিনি ভালো কিছুই দেখতে পান না। প্রাচীন ধারার চাষ-আবাদ ও কুটীর-শিল্পের উপর তিনি আস্থাবান।···

গান্ধিজী স্বপ্নবিলাসী ভারতের এক রহস্যময় মানুষ।···

—নিউইয়র্ক হেরাল্ড

---

* গান্ধিজীর নাম আমেরিকানরা তখন সঠিকভাবে জানতো না।

# শোকোচ্ছ্বাস

**চিন্তানায়ক :**

—আমাদের চতুর্দিকে আজ যে পরিবেশ তাহাতে আমার নীরব থাকাই আমি যে
বলিয়া মনে করি। কারণ এই ধরণের ঘটনায় যে কোন কথাই মূল্যহীন হইয়া পড়ে
ইহা আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। তবে এইটুকু আমি বলিব যে, যে আলোক-বর্তি
আমাদের স্বাধীনতার পথে পথ দেখাইয়া লইয়া গিয়াছে আমরা ঐক্যবদ্ধ
হওয়া পর্যন্ত তাহা প্রজ্জলিত থাকিবে। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, ভবিষ্যৎ
এই জাতি একটি সুমহান ঐক্যবদ্ধ অখণ্ড জাতিতে পরিণত হইবে। ঈশ্বরে
দ্বারা যেভাবে স্বাধীনতা অর্জিত হইয়াছে, সেইভাবেই ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হই
—শোচনীয় মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত পরলোকগত সেই নেতার ইহাই ছিল চি
একমাত্র বিষয়। বহু সংগ্রাম ও ত্যাগ স্বীকারের দ্বারা আমরা যে ক্ষমতা ল
করিয়াছি, তাহা যেভাবেই হোক তাঁহার লক্ষ্যস্থলে আমাদের পৌছাইয়া দিবে। স্বা
ও ঐক্যবদ্ধ অখণ্ড ভারত প্রতিষ্ঠিত হইবে। আমাদের মা তাঁহার সন্তানদের তাঁ
চতুর্দিকে সমাবেশ করিবেন ও তাহাদের একটি সুমহান ঐক্যবদ্ধ শক্তিতে শক্তি
করিয়া তুলিবেন। —শ্রীঅরবিন্দ ( অল্ ইণ্ডিয়া রেডি

—অতি বেশী ভাল মানুষ হওয়া কত যে বিপজ্জনক, ইহাতে তাহাই প্রমা
হইয়াছে। —বর্জ বার্ণার্ড

—মার্কিনের শান্ত এক গ্রামপ্রান্তে অন্যান্য দিনের মত আজও আমাদের স্কু
প্রভাত হোল। বাচ্চারা কিছু দূরের পথে ইস্কুলে যাবে, তাই আমরাও উঠ
বেশ তাড়াতাড়ি। তারপর প্রাতঃভোজনের জন্যে সমবেত হলাম খাওয়ার টেবি
আনুষঙ্গিক হিসাবে টুক্‌রো টুক্‌রো দরকারী কথাবার্তা চলতে লাগল আমা
ভেতর। জানালার সার্সির ওপাশে জমছে পুরু তুষারের আস্তরণ; আকাশও ম্ল
বিষণ্ণ। বাচ্চারা বাইরের দিকে তাকিয়ে রইল বিস্ময়ে—আরও বেশী তুষার
হবে কিনা!

এমন সময় আমাদের পরিবারের কর্তা ঢুকলেন আমাদের কক্ষে। গম্ভীর
তিনি বললেন—বেতারে এইমাত্র একটি মর্মান্তিক সংবাদ ঘোষিত হয়েছে।

[illegible] মনে মনে উঠেছে আমরা তাকালাম তাঁর দিকে। ধীরে ধীরে তিনি মর্মান্তিক ঘোষণাটি উচ্চারণ করলেন—"গান্ধী আর ইহলোকে নেই।"

ভারত থেকে কয়েক হাজার মাইল দূরে ছোট একটি মার্কিন পরিবারে এই শোকাবহ সংবাদটি যে কতখানি বেজেছে, ভারতীয়দের সেই কথাটি আমি জানাব।

ক্রমে সম্পূর্ণ ঘটনাটি শুনলাম আমরা। শান্তির পূজারী গান্ধী—লোকহিতে নিজেকে যিনি সম্পূর্ণ বিলিয়ে দিয়েছিলেন, তাঁর স্বাভাবিক মৃত্যু হয়নি; নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয়েছে তাঁকে! সজল চোখে আমাদের দশ বছরের ছেলেটি বললে—"পৃথিবীতে একটা লোকও যদি বন্দুক তৈরী করতে না জানত!"

আমাদের ভেতর কেউই তাঁকে কোনদিন চাক্ষুষ দেখিনি। ভারতে গেলেও কারাগারের বাইরে তাঁকে পাইনি কোনদিন। তবুও তিনি ছিলেন আমাদের সকলের একান্ত পরিচিত। বিশেষ করে ছোটদের কাছে তাঁর মুখখানি এতই জানা, যেন তিনি আমাদের পরিবারভুক্ত কোন বিশিষ্ট আত্মীয়। দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ী অসমসাহসী যে অল্পসংখ্যক পয়গম্বরের আবির্ভাব ঘটেছে পৃথিবীতে, আমাদের চোখে তিনি ছিলেন তাঁদেরই অন্যতম বলে; আর এই বিশ্বাস তো মিথ্যা নয়।

গান্ধীর এই জীবনের শিক্ষা কি এবং তাঁর এই মৃত্যুই বা কি শিক্ষা দিল, আমরা ভাবতে লাগলাম সেই কথা। গান্ধীর মত মহামানবের জন্ম হয়েছিল ভারতের মাটিতেই। ভারতের এই সৌভাগ্যে আমরা গর্বিত, কিন্তু সেই সাথে দুঃখে এ-কথাও বলতে হলো যে, ভারতের চরমতম দুর্ভাগ্য যে, একজন ভারতবাসীই তাঁকে নিহত করেছে। এই কথা ভাবতে ভাবতে বিষাদাচ্ছন্ন হৃদয়ে আমরা দৈনন্দিন কাজে মনোনিবেশ করতে গেলাম।

ভারতীয়দের কাছে একথা শুনতে হয়ত খুবই আশ্চর্যজনক লাগবে যে, আমরা (আমেরিকানবাসীরা) সেই মহামানবের সম্বন্ধে কত খোঁজ রাখি! ঘণ্টাখানেক আগে রাস্তায় একটি কৃষক আমাকে প্রশ্ন করলে—"সারা পৃথিবী জানে গান্ধী ছিলেন একজন খাঁটি মানুষ। বলতে পারেন, তবু কেন তাঁকে মেরে ফেলা হোল?"

আমি ধীরে ধীরে আমার মাথা নাড়লাম। কৃষকটি দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললে—"আমার কি মনে হয় জানেন? যিশুকে যেমন বিচার-বিভ্রমে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয়েছিল, এ ঘটনাও ঠিক তেমনি কিছু।" কৃষকটি খাঁটি সত্যই বলেছে। যিশুর ক্রুশ ছাড়া ইতিহাসে আর এমন কোন নজীর মেলে না, যার সংগে গান্ধীর এই মর্মান্তিক মৃত্যুকে তুলনা করা যায়। নিজ দেশবাসীর হাতে জীবনদান ঠিক যেন যিশুর পুনরাবৃত্তি। শুধু আমাদের ক্ষুদ্র কক্ষের মুষ্টিমেয় কয়েকজন নয়—সমস্ত আমেরিকার,

সারা বিশ্বের, যারা একবার তাঁর চাক্ষুষ দর্শনও লাভ করেনি, তারাও আজ এই ঘটনায় শোকাচ্ছন্ন। জনপ্রিয়তার চরম শীর্ষে উঠে তিনি মহাপ্রয়াণ করেছেন।

মাত্র কয়েকদিন আগেই আমরা গান্ধীর সম্বন্ধে ক্রম-কৌতূহলী মার্কিন সম্পর্কে কিছু আলোচনা করেছিলাম। একথা অনুভব করতে কষ্ট হয়নি যে, মার্কিনের জীবনে গান্ধীর জন্যে বিরাট আসন রূপায়িত হয়েছে। তাঁর উদ্দেশ্যে প্রকৃত শ্রদ্ধার ভাব আমাদের জনসাধারণের জীবনে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে। এবং আমরা কেবল তাঁর সত্যকে বুঝবার চেষ্টা করতে সুরু করেছি। সামরিক সভ্যতার আবর্তে ঘুরপাক খেতে খেতে আমরা সবেমাত্র গান্ধীর সত্যের দিকে দৃষ্টিপাত করবার প্রয়াস পাচ্ছি। আমাদের পত্র-পত্রিকাগুলিও এই সত্যকে সম্বর্ধনা জানিয়েছে। ভারতবাসীরা আমাদের আগেই গান্ধীর সত্যের দ্বারা লাভবান হয়েছে। আর আমরা সকলেই বুঝতে পেরেছি যে, জাতিসমূহের ভেদ-বৈষম্য দূর করবার পক্ষে গান্ধী-দর্শন অপরিহার্য।

আমি যদি পারতাম, তাহলে ভারতের প্রতিটি নরনারীকে এই কথাটি বুঝিয়ে দিতাম যে, গান্ধী-দর্শনকে উপলক্ষ্য করে বিশ্বের ভাণ্ডারে ভারত কতবড় দান দিয়েছে! আজকের ভারতের পরিচয় শুধু তার ভৌগলিক সীমায় সীমাবদ্ধ নয়—তার পরিচয় 'বৃহত্তর ভারতে'। বিশ্ব-মানবের প্রতীক আজ সে। চার্চিল বা তার সমগোত্রীয় অনেকের কাছে শুনেছি যে, বিশ্ববাসী সর্বসাধারণের পক্ষে স্বাধীন হওয়া সম্ভব নয়। শুধু তাই নয়, তাদের মতে স্বল্পসংখ্যক শক্তিশালী জাতিই অপরাপর জাতিকে শাসন করবার অধিকারী। তারা বলেছেন—কাউকে না কাউকে শাসক-শ্রেণীভুক্ত হতে হবেই। যারা শাসিত হতে চায় না, তারাই নেবে এই দায়িত্ব। কিন্তু এই মতবাদে একটুও বিশ্বাস নেই আমাদের। আমরা মনে করি, পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির সম্পূর্ণ অধিকার আছে, তাদের নিজেদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করবার।

মার্কিনের আশা-আকাংখার প্রতিমূর্তি বৃহত্তর ভারত; আমরা সংবাদপত্রে ভারতের সংবাদ পাবার জন্য থাকি উদ্‌গ্রীব হয়ে। আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে—চার্চিল বর্ণিত 'রক্ত-স্রাব' কি সত্যই রূপ পরিগ্রহ করবে? মানুষ কি শান্তির পথে নিজের বৈষম্য দূর করতে জানে না? পরস্পর হানাহানির স্পৃহাই কি চিরন্তনী হয়ে থাকবে মানুষের অস্থিমজ্জায়? এই জটিল প্রশ্নের উত্তর রূপে আমরা, যারা মানুষকে বিশ্বাস করে জয় করবার শক্তিতে বিশ্বাসী—পেয়েছিলাম গান্ধীকে। অনেখা ক্ষীণদেহ সেই মহামানবকে আমরা মিথ্যাই আদর্শ করিনি। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, মানবজীবনে অমৃতের সন্ধান তিনিই পেয়েছিলেন।

গান্ধীর মহাপ্রয়াণ ভারতের জাতীয় জীবনে শুভ বা অশুভসূচক তা নিরূপণ করবে

ভারতবাসী। যদি তাঁর দর্শনে দৃঢ় বিশ্বাসীরা এ থেকে নতুন শক্তি লাভ করতে পারে এবং তেজদৃপ্ত সংকল্প গ্রহণ করতে পারে, তবে শুধু তাদের পক্ষেই নয়, সমগ্র বিশ্বের মানবতার বিশ্বাসীদের পক্ষেও তা হবে পরম শুভকর। কিন্তু তাঁর শোচনীয় মৃত্যু যদি তাদেরকে ভগ্নোৎসাহ ও পরাভূত করে ফেলে তবে তাদের তো বটেই, বিশ্বের মানবতার সুমহান ঐতিহ্য হবে কলকিংত।

মার্কিন চিন্তাধারায় এই কথাটিই উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে আজ। তাই গান্ধীর মৃত্যু-সংবাদের মত দারুণ শোকাবহ সংবাদকে আমরা শান্তভাবে গ্রহণ করেছি। মার্কিন-বাসীরা আশা রাখে যে, নেহেরু এখনও জীবিত। ভারতের পক্ষে চরম অমংগলকর কিছু ঘটবার আশংকা করবার সময় আসেনি এখনও।

ভারতের অন্যান্য বিখ্যাত সন্তানদের চেয়ে পাশ্চাত্য জগতে যাঁকে বর্তমানে অনেক বেশী জানে, তিনি হচ্ছেন জবাহরলাল নেহেরু। তাঁর বিচক্ষণতা, কর্মদক্ষতা এবং বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ব্যক্তিত্বের প্রতি আমাদের সুগভীর শ্রদ্ধা আছে। ভারত বিভাগের পরিণতি হিসাবে এমন কোন তিক্ততা যেন ভারতের জাতীয় জীবনে না আসে, যার জন্যে বিক্ষিপ্ত জনমতকে পুরোপুরি সন্তুষ্ট না করতে পারবার অজুহাতে নেহেরুকে তাঁর দায়িত্বপূর্ণ কাজ থেকে অপসারিত হতে হয়। তা যদি হয়, তা হলে পাশ্চাত্যের বিচারে সত্যই ভারতের পক্ষে সে এক মহাদুর্দিন। সুধী ভারতীয়েরা নিশ্চয় এই রকম মারাত্মক ভুল করবেন না। মার্কিন দৃষ্টিকোণ থেকে একথা আমি বলছি না। যারা ভারতের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বিশ্বাসী এবং যারা আশা রাখে যে, বিশ্বের জাতি-সংঘের গতিপথের পুরোভাগে ভারতই একদিন এসে দাঁড়াবে, তাদের পক্ষ থেকেই এই কথা আমি উচ্চারণ করছি। ভারতীয় জনগণ যদি অল্প কয়েকজন চরম এবং উগ্রপন্থীর পরিচালনায় পরস্পর বিভক্ত হয়ে বিভ্রান্ত না হয়ে তাদেরই মাটির এই মহা-মানবের আদর্শকে অনুসরণ করতে পারে, তবেই তারা তাদের দেশের এই শ্রেষ্ঠতম সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে পারে।

ভারতীয়দের কাছে এই কথা কয়টি শুধু স্মারক নয়, এ আমাদের আন্তরিক আশা এবং কামনা।

—পার্ল বাক

—গান্ধী মহাত্মা পরলোকগমন করেছেন, কিন্তু যে কোটী কোটী মানুষ এই পৃথি-বীতে মানব-সভ্যতা রক্ষার জন্য তাঁর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে তাদের কাছে তিনি মৃত নন। তাঁকে যারা হত্যা করেছে তারা ভারতবাসী নয়। এই বর্বর মানুষগুলি কোন দেশেরই নয়। তবে এরা আমাদের একটি জিনিষ দেখিয়েছে—তাঁকে স্পর্শ করে এমন সাধ্য কারুরই নেই। আজিকার মত আর কখনও গান্ধিজীর আদর্শ এত

প্রয়োজনীয় হয়ে দেখা দেয়নি। প্রতীচ্যের একজন অধিবাসী হিসাবে এই কথা বলছি —বলছি একজন লেখক হিসাবে, যে লেখক এইসব কিছু গভীরভাবে চিন্তা করেছে এবং আরেকবার কল্পনাতীত সংকটময় ভবিষ্যতের সম্মুখীন হয়েছে। আপনাদের মহান নেতা এক নতুন আশা সঞ্চার করেছেন, আর দিয়েছেন এক নতুন চ্যালেঞ্জ যা গ্রহণ করা আমাদের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন। ইহা সমবেত দায়িত্বও বটে।

—টমাসম্যান

—মহাত্মা গান্ধীর সাধনা ও সিদ্ধি দেখেই আমরা তাঁর ধর্ম ও জাতি সম্বন্ধে সম্যক ধারণা করতে পারি। পৃথিবীর আর কোন দেশেই একটি বৃদ্ধ লোকের অনশন জনসাধারণকে অস্ত্রহীন করতে পারে না। মহাত্মা গান্ধী সর্বযুগের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণের অন্যতম।

—মঁসিয়ে মরিয়াক ( ফরাসী লেখক )

—মহাত্মা গান্ধী একজন দেশপ্রেমিক এবং সর্বোপরি একজন চিন্তানায়ক ছিলেন ঘৃণার চেয়ে প্রেমই যে শক্তিশালী তিনি একথাই জগৎকে শিক্ষা দিয়েছেন।

—মসিঁয়ে ল' জিউন ( ফ্রান্স

—পৃথিবীর জনসাধারণকে আজ ঠিক করতে হবে যে, তারা আনবিক বোমা পক্ষপাতী কিম্বা মহাত্মা গান্ধীর সমর্থক। মহাত্মা গান্ধী বিশ্বাস করতেন যে, আত্মি শক্তিই প্রকৃত শক্তি। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, ইহা তরবারি অপেক্ষা অধিকত শক্তিশালী। ঘৃণার পরিবেশের মধ্যে তিনি প্রেমের প্রতীকরূপে, প্রতিহিংসা পরিবেশের মধ্যে ক্ষমার প্রতীকরূপে বাস করেছেন। মানুষের মধ্যে যে ঐশী শক্তি আছে, তা জগৎ জয় করতে পারে; ইহাই হোল গান্ধিজীর গোপন বাণী। তি ইহাকেই সত্য নামে অভিহিত করতেন। নিজের জীবনে তিনি ইহা কার্যকরী ক তুলেছেন। যদি আমরা বেঁচে থাকতে চাই, তাহলে আমাদের এই সত্য স্বীক করে নিতে হবে।

—রেভারেণ্ড জন্ হোম্

—তিনি শান্তির অগ্রদূত ও খৃস্টানদের বন্ধু ছিলেন।

—পোপ ( ভ্যাটিকান সিটি, ইতালী

রাষ্ট্রনায়ক :

—তাঁর জীবন ও কার্যধারা তাঁর জীবনের কীর্তিস্তম্ভ হয়ে থাকবে। তিনি জাত নেতা ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁর আদর্শ ও কার্যাবলী বিশ্ববাসীর মনে গভীর রেখাপ

করেছে। যে শান্তি ও বিশ্ব-ভ্রাতৃত্বের জন্য মহাত্মা জীবনপাত করলেন, অগণিত বিশ্ববাসী তা থেকে প্রেরণা লাভ করবে।

গান্ধিজীর হত্যা সংবাদে আমি অভিভূত হয়েছি।

—**প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান** ( মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র )

—মহাত্মা গান্ধীর অপ্রত্যাশিত শোচনীয় মৃত্যুতে আমার মনে যে বেদনার সৃষ্টি হয়েছে, তা আমি গোপন রাখতে পারছি না। তাঁর মৃত্যুতে সমগ্র জাতির ক্ষতি হোল। তিনি যে আদর্শ প্রচার করেছেন, তা সকলের মনে বদ্ধমূল না হলে জগতের অপূরণীয় ক্ষতি হবে। আমার মনে হয় সকল প্রকার হিংসার নিন্দা করাই তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করার শ্রেষ্ঠ উপায়।

—**প্রেসিডেন্ট গণজালেজ ভিডেলা** ( চিলি )

—অহিংস উপায়ে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে গিয়া শ্রেষ্ঠ ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি হিংসার আক্রমণে জীবন বলি দিলেন—এই সংবাদে আমরা শোকাভিভূত হয়ে পড়েছি। শুধু ভারত নয়, সমগ্র মানবজাতি শ্রেষ্ঠ নেতাকে হারালো।

—**প্রেসিডেন্ট চিয়াং কাইশেক ও তাঁর পত্নী** ( চীন )

—মহাত্মা গান্ধীর মৃত্যুতে সমগ্র ব্রহ্মদেশ শোকে মূহ্যমান। ব্রহ্মের স্বাধীনতার জন্য তাঁর আগ্রহ ছিল অপরিসীম। এই অবস্থায় তাঁর মৃত্যুতে আমরা মর্মাহত হয়েছি। ভারতবাসী বর্তমান পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা সহকারে পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ জাতি বলে পরিগণিত হবে।

—**প্রেসিডেন্ট সাও শোয়ে থাইকি** ( ব্রহ্মদেশ )

—মহাত্মা গান্ধীর মৃত্যুতে ভারতবাসী যে শোক পেয়েছে, তজ্জন্য আমি ভারতবাসী ও ভারত গবর্মেণ্টকে সমবেদনা জানাচ্ছি। আয়ার্ল্যাণ্ডের অধিবাসীরাও ভারতবাসীর এই দুঃখে শোক প্রকাশ করছে। যে দয়া, ভ্রাতৃত্ব ও শান্তির জন্য গান্ধিজী চিরদিন কাজ করেছেন, ভগবানের আশীর্বাদে ভারতবাসী ও জগৎবাসী, সেই আদর্শে উদবুদ্ধ হোক, এই প্রার্থনা করছি।

—**প্রেসিডেন্ট সিন ও'কেলি** ( আয়ার্ল্যাণ্ড )

—মহাত্মা গান্ধীর অকাল মৃত্যুতে চেকোস্লোভাকিয়ার সরকার গভীর সহানুভূতি জানাচ্ছে। চেকোস্লোভাকিয়ার জনসাধারণ গান্ধিজীর মৃত্যুতে আপনাদের সহিত শোক প্রকাশ করছে।

—**অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট** ( চেকোস্লোভাকিয়া )

## আমাদের গান্ধিজী

—স্বাধীনতার প্রতীক মহাত্মা গান্ধীর মৃত্যুতে আপনার দেশ যে মহান ব্যক্তিকে হারালো, তার জন্য আমরা আন্তরিক সহানুভূতি জ্ঞাপন করছি।

—**ডক্‌টর এডোয়ার্ড বেনেস** ( প্রেসিডেণ্ট, চেকোশ্লোভাকিয়া )

—মহাত্মা গান্ধীর মৃত্যুতে শুধু ভারতের নয়, সমগ্র বিশ্বের ক্ষতি হোল। তাঁর রাজনৈতিক ও মানবিক মহত্বের জন্য কলম্বিয়ার অধিবাসীরা আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করছি।

—**ম্যারিনো স্পিনাবেবেজ** ( প্রেসিডেণ্ট কলম্বিয়া )

—মহাত্মা গান্ধী ছিলেন শান্তি-দূতের এক অসাধারণ প্রতীক। তাঁর মৃত্যুতে সমস্ত জগৎবাসী ক্ষতিগ্রস্ত হোল। আমি ফেডারেল কাউন্সিল ও জনগণের পক্ষ থেকে আপনাদের কাছে গভীর শোক ও সহানুভূতি জানাচ্ছি।

—**প্রেসিডেণ্ট** ( সুইস কনফেডারেশন)

—ভারতের সর্বজনপূজ্য নেতার শোচনীয়ভাবে মৃত্যু হওয়ায় আমি নিজের ও লেবানীজ গবর্মেণ্টের পক্ষ থেকে আপনাকে ও ভারতবাসীকে আমাদের আন্তরিক সহানুভূতি জ্ঞাপন করছি। মহাত্মা গান্ধীর মৃত্যুতে বিশ্ববাসী শোক করবে, কারণ বর্তমান ইতিহাসে তিনি মহান ব্যক্তি।

—**প্রেসিডেণ্ট** ( লেবানন )

—ভারতের শ্রেষ্ঠ জাতীয় নেতার মৃত্যুতে আমি শোকাভিভূত হয়ে পড়েছি। মহাত্মা গান্ধীর পরিবারবর্গকে আমার আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।

—**প্রেসিডেণ্ট জে, কে, পাসিকিভি** ( ফিনল্যাণ্ড )

**রাজন্যবর্গ :**

—গান্ধিজীর মৃত্যুসংবাদে রাণী ও আমি মর্মাহত হয়েছি। ভারতবাসী ও মানবতার এই অপূরণীয় ক্ষতিতে তাদেরকে আমার আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করবেন।

—**রাজা ষষ্ঠ জর্জ ও রাণী** ( ইংলণ্ড )

—প্রাচ্য একজন দেশপ্রেমিক ও মনুষ্যজাতির মহান সেবককে হারালো। আদর্শ পুরুষ মহাত্মা গান্ধীর শোচনীয় মৃত্যুসংবাদে আমি মুহ্যমান। দেশপ্রেম ও মানবিক আদর্শ রক্ষার জন্য তাঁর শান্তি-সংগ্রাম ত্যাগ ও বীরত্বের অনতিক্রম্য আদর্শ হয়ে থাকবে।

—**রাজা ফারুক** ( মিশর )

—ভারতীয়দের শ্রেষ্ঠতম মুখপাত্রের শোচনীয় মৃত্যুতে আমরা ভারতীয়দের প্রতি আন্তরিক সহানুভূতি জানাচ্ছি। —রাজা হেইলে সেলাসী (আবিসিনিয়া)

—মহাত্মা গান্ধীর মৃত্যুতে ভারতের যে ক্ষতি হোল তজ্জন্য আমরা গভীর বেদনা বোধ করছি। —রাজকুমার ( কেউয়া ও হওয়াই )

—শান্তিসাধক মহাত্মা গান্ধীর জীবনের এই বিয়োগান্ত পরিণতির সংবাদে আমি মর্মাহত হয়েছি। আমি তাঁর বিদেহী আত্মার পারলৌকিক শান্তি কামনা করে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করছি। ভারতবাসীর প্রতি আমার আন্তরিক সহানুভূতি জানাচ্ছি। —দালাই লামা ( তিব্বত )

—ইহা একটি শোকাবহ ঘটনা। —সম্রাট হিরোহিতো ( জাপান )

**প্রধান মন্ত্রী :**

—ভারতের মহাত্মা গান্ধী বর্তমান জগতের অনন্যসাধারণ প্রতিভাবান ব্যক্তি। তিনি বর্তমান ইতিহাসে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এক যুগের লোক বলে বিবেচিত হতেন।

সাধারণ সন্ন্যাসীরূপে বাস করে গেলেও মহাত্মা গান্ধী লক্ষ লক্ষ দেশবাসীর প্রভূত শ্রদ্ধাভাজন হয়েছিলেন। তাঁর প্রতিভা কেবলমাত্র সম-ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থাকায় বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যেও বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছে। প্রায় পঁচিশ বছর যাবৎ মহাত্মা গান্ধীই ভারতের বিভিন্ন জটিল সমস্যা সমাধানের পুরোধা ছিলেন। ভারতের স্বাধীনতার জন্য তিনিই ভারতবাসীর আশা-আকাংখার একমাত্র মুখপাত্র ছিলেন। কিন্তু তিনি কখনই একজন জাতীয়তাবাদী ছিলেন না। বস্তুতঃ অন্য জাতি কর্তৃক শাসিত হওয়ার বিরুদ্ধে তিনি ভারতবাসীর হয়ে আজীবন তুমুল সংগ্রাম পরিচালনা করে এসেছেন। এমন কি, তিনি প্রকাশ্যে পাশ্চাত্যের বিরুদ্ধে প্রাচ্যের এক স্বাভাবিক ঘৃণা পোষণ করতেন। পাশ্চাত্য বস্তুতন্ত্রের বিরুদ্ধে তিনি আজীবন সংগ্রাম করে আসছেন। সাধারণ সমাজ-জীবনে ফিরে যাবার জন্য তিনি সদাসর্বদাই আগ্রহান্বিত ছিলেন।

তথাপি তাঁর অহিংসাবাদ একটি অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য প্রশংসনীয় নীতি ছিল। নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধকে তিনি তাঁহার জীবনের অন্যতম আদর্শরূপে গ্রহণ করেছিলেন। তিনি যে নীতি ও কার্যক্রমকে অন্যায় ও অশোভন বলে মনে করতেন, তারই বিরুদ্ধে পূর্ণ দৃঢ়তার সহিত নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ আন্দোলন চালিয়ে আসতেন। হিংসার দ্বারা

উদ্দেশ্য সিদ্ধির তিনি ঘোর বিরোধী ছিলেন। ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য তাঁর নির্দেশ অমান্য করে যখনই লোকক্ষয়কারী আন্দোলন পরিচালিত হোত, তখনই তিনি দুঃখিত হতেন।

যে ঐকান্তিক আগ্রহ সহকারে তিনি তাঁর উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হতেন, তা নিঃসন্দেহে প্রশংসা অর্জন করতো।

তাঁর জীবনের শেষ ক' মাসে সাম্প্রদায়িক দাংগার ফলে যখন ভারতের নবলব্ধ স্বাধীনতা বিপন্ন হবার উপক্রম হয়, তখন তিনি আমরণ অনশনের সিদ্ধান্ত করে সাম্প্রদায়িক হানাহানির পরিসমাপ্তি ঘটাবার জন্য আগাইয়া আসেন। শেষ পর্যন্ত হানাহানি বন্ধ হয়ে গিয়ে দেশের আবহাওয়ার সম্পূর্ণ পরিবর্তন সাধিত হয়।

হত্যাকারীর নিষ্ঠুর আঘাতের ফলে কেবলমাত্র তাঁর জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে নাই। বরং তাঁর জীবনের সংগে শান্তি ও ভ্রাতৃত্বের বাণী চিরতরে স্তব্ধ হয়ে গেছে। তবে আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ভারতের জনসাধারণ তাঁর এই বাণীকে স্মরণ করে তাঁর আরব্ধ কার্য সম্পন্নের জন্য আগিয়ে যাবে এবং সাম্প্রদায়িক ও পারস্পরিক ভ্রাতৃ-বন্ধন দৃঢ়রূপে পুনঃ প্রতিষ্ঠা করর দেশের কলংক মোচন করবে।

—**ক্লিমেণ্ট এটলি** ( প্রধানমন্ত্রী, ইংলণ্ড )

—গান্ধিজীর মৃত্যুসংবাদে আমরা অত্যন্ত বিচলিত হয়েছি। তাঁর প্রতি নতমস্তকে আমরা শ্রদ্ধা জানাই। আশা করি, তাঁর ভারতবর্ষের অবস্থা মন্দের দিকে যাবে না।

—**রবার্ট শুম্যান** ( প্রধানমন্ত্রী, ফ্রান্স )

—এই মহান দেশপ্রেমিকের মৃত্যুতে আমরা শোকাচ্ছন্ন। তিনি ছিলেন পৃথিবীর নৈতিক আদর্শের মূর্ত প্রতীক। ভারতের এই গভীর ক্ষতিতে পর্তুগীজ সরকারের পক্ষ হতে আমি সহানুভূতি জানাচ্ছি।

—প্রধানমন্ত্রী, পর্তুগাল

—মহাত্মা গান্ধীর শোচনীয় মৃত্যুতে ফিনল্যাণ্ডের জনগণের গভীর সহানুভূতি গ্রহণ করুন।

—প্রধানমন্ত্রী, ফিনল্যাণ্ড

—মহাত্মা গান্ধীর মৃত্যুসংবাদে ডেনমার্কবাসী যারপরনাই দুঃখিত। তিনি বৃদ্ধ বয়সে দেশের শান্তির জন্য জীবনদানে প্রস্তুত হয়েছিলেন। এর পরেই তিনি আততায়ীর হাতে নিহত হলেন। গত মহাযুদ্ধ মানুষকে পশুর স্তরে কতদূর নিয়ে গেছে এই ঘটনাই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

—**হান্স হেডটফ্ট** (প্রধানমন্ত্রী, ডেনমার্ক)

—অহিংসার পূজারীকে হিংসার যূপকাষ্ঠে বলি হতে হোল, ইহাই সর্বাপেক্ষা মর্মান্তিক।

—**ম্যাকেঞ্জি কিং** ( প্রধানমন্ত্রী, ক্যানাডা )

## আমাদের গান্ধিজী

—ভারতের মুক্তি ও স্বাধীনতার জন্মদাতা ও অন্যতম নেতা মহাত্মা গান্ধীর পরম শোকাবহ হত্যাকাণ্ডের সংবাদে আমি অত্যন্ত আঘাত পেয়েছি। তাঁর এই পৈশাচিক হত্যাকাণ্ডে সমগ্র জাতি নিদারুণ আঘাত পেয়েছে।

—**হাসিমি** ( প্রধানমন্ত্রী, ইরাণ )

—আমরা কেবল মহাত্মা গান্ধীর জন্য দুঃখিত নহি, পরন্তু মহাত্মা গান্ধীকে হত্যা করা হয়েছে বলে আমরা সমগ্র জগতের জন্য দুঃখ বোধ করছি। সমস্যা সমাধানের চেষ্টার উপায় হিসাবে হিংসার উচ্ছেদ করতে হবে।

—**তেৎস্যু কাতায়ামা** ( প্রধানমন্ত্রী, জাপান )

—মহাত্মা গান্ধীর মৃত্যু সংবাদে অষ্ট্রেলিয়ার জনগণ ও সরকার শোকাভিভূত। মহাত্মার কল্যাণের জন্য ও বিশ্বে শান্তি স্থাপনের চেষ্টায় যে সাধক পুরুষ প্রাণ পণ করেছিলেন, তাঁর পরলোকগমনে অষ্ট্রেলিয়া আজ ভারত সরকার ও ভারতবাসীদের প্রতি প্রগাঢ় সহানুভূতি জানাচ্ছে। —**জেসেফ চিফ্‌লি** (প্রধানমন্ত্রী, অষ্ট্রেলিয়া)

—হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য শান্তি স্থাপনের চেষ্টা করতে করতে ভারতের শান্তিকামী নেতার মৃত্যু হওয়ায় বিশ্ববাসীর সংগে মিশর গভীর শোক প্রকাশ করছে। তিনি ছিলেন বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মানবদের অন্যতম। কারণ, তিনি সর্বদাই তাঁর দেশবাসীর কল্যাণের জন্য কাজ করেছেন।

—**নোকরাশী পাশা** ( প্রধানমন্ত্রী, মিশর )

—মহাত্মা গান্ধীর শোচনীয় মৃত্যু ঘটায় আমরা শোকাচ্ছন্ন হয়েছি। তিনি ছিলেন শান্তির দূত, শ্রেষ্ঠ দেশপ্রেমিক, ভারতের জনসাধারণের প্রিয় নেতা।

—প্রধানমন্ত্রী, আফগানিস্তান

—প্রাচ্যের যা কিছু মহৎ তা গান্ধিজীর মধ্যে মূর্তি পরিগ্রহ করেছিল। তিনি ছিলেন আমাদের পথ-নির্দেশক আলোকবর্তিকা। কিন্তু ইহাই যথেষ্ট নয়, তিনি অমর, জগতের অন্যতম প্রধান গুরু। পৃথিবী তাঁর বাণী বাস্তবে রূপায়িত করতে চেষ্টা করবে।

—**সেনানায়ক** ( প্রধানমন্ত্রী, সিংহল )

—ভারতের শোচনীয় সংবাদে ব্রহ্ম গবর্মেণ্ট ও অধিবাসীগণ শোকে মগ্ন। মহাত্মা গান্ধীর মৃত্যুতে ব্রহ্মদেশবাসীরও ক্ষতি হোল। —থাকিন নু (প্রধানমন্ত্রী, ব্রহ্মদেশ)

**পররাষ্ট্র সচিব :**

—মনুষ্যজাতির এই শোকের দিনে সমগ্র ইতালি আজ শোকাচ্ছন্ন। সর্ব্বব্যাপী যে বিষাক্ত আবহাওয়া আমাদিগকে বিচলিত করছে মহাত্মা গান্ধী নিহত হওয়ায় তা আরও ঘনীভূত হোল।

ইউরোপেই জাতীয়তাবাদের জন্ম হয়। বর্তমানে এশিয়া ও আফ্রিকায় এই জাতীয়তাবোধ মূর্ত হয়ে উঠছে এবং তথায় অপরাধ ও রক্তপাতের মাত্রা বেড়ে চলছে। —কাউণ্ট স্ফারজা (পররাষ্ট্র সচিব, ইতালি)

—মহাত্মা গান্ধীর মৃত্যুতে ভারত সরকার ও ভারতের জনসাধারণের যে অপূরণীয় ক্ষতি হোল, তজ্জন্য ব্রেজিল সরকার গভীর সহানুভূতি জানাচ্ছে।

—পররাষ্ট্র সচিব, ব্রেজিল

—গান্ধিজী নিহত হওয়ার সংবাদে ব্রহ্মদেশ মর্মাহত হয়েছে। প্রত্যেক বর্মী মহাত্মাকে সম্মান করতো। ভারতের এই মহা-সন্ন্যাসীর মৃত্যুতে সকলে শোকাকুল। —উ, টিন, টাট (পররাষ্ট্র সচিব, ব্রহ্মদেশ)

—ভারত ও পৃথিবীর যে ক্ষতি হোল তা প্রকাশের ভাষা নেই।…মহাত্মা গান্ধী শেষ বয়সে যে কঠোর কর্তব্য গ্রহণ করেছিলেন, তৎপ্রতি আমরা সাগ্রহে তাকিয়ে ছিলাম, কিন্তু তাঁর মৃত্যুসংবাদ পেয়ে আমরা যৎপরনাস্তি মর্মাহত হয়েছি। আপনাদের দেশের জনসাধারণের উপর এর যে কি প্রতিক্রিয়া হয়েছে তা আমরা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করছি। ভারতে মহাত্মা গান্ধী অনুসৃত শান্তি ফিরে আসুক এবং তাঁর পরিত্যক্ত নীতির দ্বারা ভারতবাসী তাঁর অসমাপ্ত কার্যাবলী সমাধা করতে কৃতকার্য হোন, ইহাই আমাদের একান্ত কামনা। —আর্নেষ্ট বেভিন (পররাষ্ট্র সচিব, গ্রেট বৃটেন)

## আমাদের গান্ধিজী

—এই সাংঘাতিক হত্যাকাণ্ডে আমরা ব্যথিত। ভারতের এই গভীর দুঃখে আমরা সহানুভূতি জানাচ্ছি। মহাত্মার স্মৃতি নরোয়েবাসীদের মনে বহুকাল জাগরূক থাকবে। তিনি শান্তি ও সৌভ্রাতৃত্বের জন্য আজীবন সংগ্রাম করে গেছেন।

—পররাষ্ট্র সচিব, নরওয়ে

—আজ বিশ্ববাসীর দারুণ দুর্দিন। এক উন্মাদের হস্তে মহামানবের জীবন অবসান হোল! এই মহামানবের জীবন, কার্য ও শিক্ষা মানব জাতির পক্ষে এমনই একটা জিনিষ, যা সুচিরকালের মধ্যেই অবিনশ্বর হয়ে থাকবে।

—**জর্জ বিদো** ( পররাষ্ট্র সচিব, ফ্রান্স )

—মহাত্মা গান্ধী মনুষ্যজাতির বিবেক। তাঁর হত্যায় আমেরিকাবাসী শোকাভিভূত হয়েছে। আমরা এই দুঃসময়ে আপনাদের সমবেদনা জানাচ্ছি।

—**জর্জ মার্শাল** ( পররাষ্ট্র সচিব, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র )

**লাটসাহেব:**

—গান্ধিজী নিহত হওয়ার সংবাদে মনে হোল যে, বিরাট আলোকবর্তিকা নির্বাপিত হয়ে গেল। অন্ধকার ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে সকলের হৃদয় উদ্বেগ-চঞ্চল। আমার মনে হয়, আমাদের এই বিশ্বে আজ নিদারুণ দুর্দৈব। গান্ধিজী সকল মানবের। মহাত্মার স্মৃতি সকলের মনে চির জাগরূক থাকবে।

—**মঁসিয়ে বারোঁ** ( লাটসাহেব, ফরাসী-ভারত )

—সিংহলের অধিবাসীগণ ও গবর্মেণ্ট মহাত্মা গান্ধীর মৃত্যু সংবাদে শোকাভিভূত হয়ে পড়েছে। ভারতের অপূরণীয় ক্ষতি হওয়ায় আমরা আপনাদেরকে সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।

—লাটসাহেব, সিংহল

—মহাত্মা গান্ধীর মৃত্যুতে অপূরণীয় ক্ষতি হওয়ায় বিশ্ববাসী শোকাভিভূত⋯আমি ভারতবাসীকে তাদের গভীর শোকের সময় সহানুভূতি জানাচ্ছি।

—লাটসাহেব, সিয়েকেলিস

—মহাত্মা গান্ধীর মৃত্যু হওয়ায় সুদানবাসীরা মর্মাহত হয়েছে। পরম শোকের দিনে সুদানের গবর্মেণ্ট ও অধিবাসীদের পক্ষ থেকে আমরা ভারত গবর্মেণ্টকে আমাদের সহানুভূতি জানাচ্ছি।

—বড়লাট, সুদান

—কাপুরুষোচিত আক্রমণের ফলে মিষ্টার গান্ধী নিহত হয়েছেন জেনে আমি মর্মাহত। এই শোচনীয় মুহূর্তে কোনরূপ বিতর্কমূলক বিষয়ের অবতারণা চলে না। তাঁর সংগে আমার রাজনৈতিক বিরোধ যাহাই থাকুক না কেন, তিনি হিন্দু সমাজের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি এবং নেতা হিসাবে তাঁদের সকলের আস্থাভাজন ও শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। হিন্দুস্থান ও পাকিস্তানে স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হবার এত অত্যল্পকাল পরে এরূপ একটি ঐতিহাসিক সংকটময় মুহূর্তে তাঁর মৃত্যুতে যে ক্ষতি হয়েছে তজ্জন্য আমি বিশাল হিন্দুসমাজ ও মিষ্টার গান্ধীর পরিজনবর্গের প্রতি গভীর দুঃখ ও আন্তরিক সহানুভূতি জ্ঞাপন করছি। ভারত ডোমিনিয়নের পক্ষে ইহা অপূরণীয় ক্ষতি। এই সংকট-মুহূর্তে সে মহান ব্যক্তির স্থান পূরণ করা অত্যধিক কষ্টসাধ্য হবে।

—**জিন্না** (বড়লাট, পাকিস্তান)

**পরিষদ প্রধান:**

—গান্ধিজী প্রেম, করুণা, দয়া ও ভ্রাতৃত্বের অগ্রদূত। তিনি সর্বদা অকল্যাণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন। যুদ্ধের সময়েও তিনি ভ্রাতৃত্ব ও জাতিসমূহের মধ্যে শান্তির বাণী প্রচার করেছেন। পৃথিবীর কর্তব্য নিজের বিবেকের অনুসন্ধান করা ও গান্ধীর ব্রত পূর্ণ করা। চেকোশ্লোভাক জাতির পক্ষ থেকে ইহার ন্যাশান্যাল এসেম্ব্লি ভারতের শ্রেষ্ঠ সন্তানের বিয়োগে আন্তরিক শোক প্রকাশ করছে।

—**ডক্টর জোসেফ ডেভিড** (স্পীকার, চেকোশ্লোভাকিয়া)

—মহাত্মা গান্ধীর মৃত্যু পৃথিবীর দুর্ভাগ্য। ইহা সর্বত্র মানব সমাজকে ব্যথিত করবে।

—প্রেসিডেন্ট, তুরস্ক-পরিষদ

**সচিব:**

—অতি ভয়ংকর সংবাদ। একজন মহাপুরুষের এই পরিণতি অতীব দুঃখের।

—**হার্বার্ট মরিসন** (সহকারী প্রধানমন্ত্রী, গ্রেট বৃটেন)

—পৃথিবীতে সহসা আর এরূপ পুরুষের আবির্ভাব হবে না।

—**এ, ভি, আলেকজাণ্ডার** (দেশরক্ষা সচিব, গ্রেট বৃটেন)

**ভূতপূর্ব্ব সচিব :**

—ভারতের মহান পথ-প্রদর্শক আমার প্রিয় বন্ধু, গান্ধিজীর নিষ্ঠুর হত্যার কথা শুনে আমি বিশেষ দুঃখিত হয়েছি। আমার মনে হয়, তাঁর অন্তিম কামনা ছিল এই যে, তাঁর মৃত্যুর প্রতিশোধ যেন কোনমতেই না লওয়া হয়। এবং তাঁর মৃত্যুতে এশিয়ার এই বিরাট উপ-মহাদেশে যেন শান্তি স্থাপিত হয়।

—**লর্ড পেথিক লরেন্স** (ভূতপূর্ব ভারত ও ব্রহ্ম সচিব)

—অত্যন্ত মর্মান্তিক ব্যাপার ঘটেছে। আমি মনে করি মহাত্মাজীর জীবন অবসান শুধু ভারতের পক্ষে ক্ষতিকর নয়, সমগ্র বিশ্বের পক্ষেই ক্ষতিকর। কেননা, বর্তমান যুগে শান্তির জন্ত সংগ্রামে তিনি সকলের উর্ধে স্থান পাবার যোগ্য।

—**লর্ড লিষ্টওয়েল** (ভূতপূর্ব সহকারী ভারত সচিব)

—দল-নির্বিশেষে সমস্ত ইংরাজই এই দুর্ঘটনায় মর্মাহত হবে। ইহা সত্যই বেদনা-দায়ক যে, যিনি আজীবন ভারতবাসীদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক ঐক্যের বাণী প্রচার করলেন, তিনিই শেষে এইভাবে প্রাণ দিলেন। ভারতবাসী তাঁকে জাতির স্রষ্টা হিসাবেই মনে রাখবে। —**লিওপোল্ড্ আমেরী** (ভূতপূর্ব ভারতসচিব)

—এই ঘৃণিত অপরাধে আমি স্তম্ভিত।

—**উইনষ্টন চার্চিল** (ভূতপূর্ব প্রধানমন্ত্রী, গ্রেট বৃটেন)

—গান্ধিজীর হত্যা ভারত, তথা পৃথিবীর একটি মর্মন্তুদ ঘটনা। পৃথিবীতে তাঁর ন্তায় আধ্যাত্মিক মহাপুরুষ আর জন্মগ্রহণ করেননি। তিনি কেবল অহিংসার কথা বলতেন না, কাজে ও আত্মত্যাগের দ্বারা তা প্রমাণ করে গেলেন।

—**স্তার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রিপস**

—আমি অভিভূত হয়েছি। তাঁর মৃত্যুর পর ভারত শান্ত থাকবে বলে আমি আশা করি। —**মঁসিয়ে লিয়ঁ ব্লুম** (ভূতপূর্ব প্রধানমন্ত্রী, ফ্রান্স)

—গান্ধিজীর মৃত্যুতে দেশ তার অন্তরাত্মাকে হারালো। তাঁর এই মুক্ত আত্মা

হিন্দু ও মুসলমান এবং ভারতের সকল শ্রেণীর মধ্যে সত্যকার ঐক্য প্রতিষ্ঠা করতে পারবে।
—**ডাক্তার খানসাহেব** ( ভূতপূর্ব প্রধানমন্ত্রী, সীমান্ত প্রদেশ )

**ভূতপূর্ব্ব লাট :**

—গান্ধিজীর মৃত্যুর পর ভবিষ্যৎ-ভারতের অদৃষ্টে কি নিহিত আছে তা বলা যায় না।
—**লর্ড লিনলিথগো** (ভূতপূর্ব বড়লাট, ভারতবর্ষ)

—মহাত্মা গান্ধীর হত্যা ভারতের পক্ষে দারুণ দুর্দৈব। তাঁর এই শোচনীয় মৃত্যুর ফলে তাঁর সকল দেশবাসী তাঁর নীতি অনুধাবন করুক, ইহাই সকলে আশা করে। ইতিহাসে এরূপ খুব কম ব্যক্তিরই সন্ধান পাওয়া যায়, যিনি তাঁর সময়ে জনগণের উপর এরূপ প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছেন।

—**লর্ড হ্যালিফাক্স্** ( ভূতপূর্ব বড়লাট, ভারতবর্ষ )

—ভারতের বাইরে বহু লোকই মহাত্মা গান্ধীকে বিপ্লবী বলে জানে। আমি পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির সংগে পরিচিত হয়েছিলাম।

—**আর, জি, কেসী** (ভূতপূর্ব লাট, বাংলাদেশ)

**নেতৃবৃন্দ :**

গান্ধিজীর হত্যার সংবাদে আমি গভীর শোকানুভব করছি। আমার বিশ্বাস, পৃথিবীর সর্বত্র এজন্য শোক অনুভূত হবে। তিনি আমার সময়কার একজন শ্রেষ্ঠ মানব ছিলেন এবং আমাদের মধ্যে মত ও পথের পার্থক্য বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও তাঁর প্রতি আমি গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করতাম। ত্রিশ বছর অথবা ততোধিক কাল আমাদের মধ্যে পরিচয় ছিল এবং তাঁর প্রতি আমার শ্রদ্ধা ক্রমশঃই গভীরতা লাভ করেছে। একজন শ্রেষ্ঠ পুরুষ লোকান্তরিত হলেন এবং আমরা ভারতের এই অপূরণীয় ক্ষতিতে তাঁদের সংগে শোক প্রকাশ করছি।

—**জেনারেল স্মাট্‌স্** ( দক্ষিণ আফ্রিকা )

—আমাদের এবং ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের শেষ অধ্যায়ের প্রায় একই রূপ ছিল। আজ ভারতীয়েরা শোকসন্তপ্ত। তাদের দুঃখে আমরা সমবেদনা জানাই। যে নেতা তাদের জন্য স্বাধীনতা এনেছেন, তারা তাঁকেই হারিয়েছে। তাঁর আত্মত্যাগ

ভারতীয়দের মধ্যে সৌহার্দ্য আনুক, ইহাই আমাদের প্রার্থনা। এই সৌহার্দ্য-বন্ধন স্থাপনই তাঁর জীবনের সকলের চাইতে প্রিয় ছিল।

—**ইমন ডি' ভেলেরা** ( আয়ারল্যাণ্ড )

—মহাত্মার মৃত্যু ভারতের পক্ষে একটা চরম আঘাত—বিশেষ করে তার জাতি-গঠনের সময়। গান্ধিজীর আধ্যাত্মিক জীবন কাহিনীর সংগে সকলেই পরিচিত। তিনি ইহলোকে না থাকিলেও তাঁর প্রভাব দেশবাসীর উপর চিরকাল থাকবে। বিশ্ব-বাসীও তাঁর আদর্শে অনুপ্রাণিত থাকবে। তাঁর মৃত্যুর এই ভীষণতা ও বেদনা মানুষের হৃদয় হতে হিংসা প্রবৃত্তি দূর করে দেবে।

—**মিসেস্ রুজভেল্ট** ( মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র )

—আমরা বিশ্বাস করি, তাঁর আদর্শ বেঁচে থাকবে, সকল জাতির বিবেক জাগ্রত হবে এবং বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে।

—**ডক্টর চু চিয়া হুয়া ও ডক্টর তাই চি তাও** ( চীন )

—মহাত্মা গান্ধীর মৃত্যু শুধু ভারতের কেন, সমগ্র পৃথিবীর পক্ষে অতীব দুঃখের বিষয় ও জঘন্যতম ঘটনা।

—**আগা খাঁ** ( লণ্ডন )

—ইতিহাস প্রমাণ করবে যে, মহাত্মা গান্ধী মানবজাতির অন্যতম শ্রেষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। গান্ধিজীর মৃত্যু হয়নি—তিনি বেঁচে আছেন। ঈশ্বরের পুত্রদের কখনও মৃত্যু হয় না।

—**ডক্টর হিউলেট জনসন** ( ক্যাণ্টারবারী )

—শান্তি প্রতিষ্ঠাকল্পে মহাত্মাজীর প্রচেষ্টা মানব সমাজ চিরদিন স্মরণ করবে।

—**মিষ্টার ল্যাজারাস** ( বৃটেন )

—মৃত্যুতে তিনি আরও শক্তিশালী হলেন। মৃত্যু তাঁর মহাজীবনের পরম পূর্ণতা। যে আদর্শের জন্য তিনি সাধনা করেছেন, সেই আদর্শের জন্যই তাঁর মৃত্যু হোল।

—**ষ্ট্যানলি জোন্স্** ( বৃটেন )

—মহাত্মাজীর আত্মার প্রভাব কার্যে পরিণত হলে ভারতে কোন ধ্বংস-যজ্ঞ

অনুষ্ঠিত হবে না। গান্ধিজী ভারতের লক্ষ লক্ষ দরিদ্র কৃষকের চেতনা সঞ্চার করে তাদের কতকটা মর্যাদা দিয়েছেন। তাঁর আত্মার প্রভাব ঘৃণার সমস্ত অগ্নি নির্বাপিত হবে। তাঁর কণ্ঠস্বর আজ নীরব। —রেজিন্যাল্ড্ সোরেনসেন (বৃটেন)

—মহাত্মা গান্ধী কোন দলবিশেষের নন—সকলের জন্য শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে কাজ করেছেন। তাঁর মৃত্যুতে মহান আদর্শের বিরাট ক্ষতি হোল। শুধু ভারত ও পাকিস্তান নয়, সারা বিশ্বে এর প্রতিক্রিয়া অনুভূত হবে।

—নাহাশ পাশা ( ওয়াফ্‌দ্ দল, মিশর )

—মানবজাতির প্রতি ইহা জঘন্যতম অপরাধ। মহাত্মা গান্ধীর মৃত্যুতে বিশ্ববাসী একজন মহামানবকে হারালো।

—আজম পাশা ( সেক্রেটারী-জেনারেল, আরব লীগ )

—সাম্প্রদায়িকতার বিষ নির্মূল করতেই গান্ধিজী জীবন দান করেছেন। ভারত ও পাকিস্তানের নেতাদের উপর গুরু দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে। সাম্রাজ্যবাদ সৃষ্ট বিভাগকে ধ্বংস করার দায়িত্ব তাঁদেরই। প্রকৃত স্বাধীনতার মর্মার্থ উপলব্ধি করতে হলে দু' পক্ষের মিলিত হয়ে এক পথের সন্ধান করতে হবে।

—রজনী পাম দত্ত ( কমিউনিষ্ট পার্টি, ইংলণ্ড )

—গান্ধিজীর বিয়োগে সমগ্র বিশ্বের সহিত আমরা ক্ষতিগ্রস্ত।

—ডক্টর মোহম্মদ হাতা ( রিপাবলিকান পার্টি, ইন্দোনেশিয়া )

—ভারতের এই দুঃখজনক পরিস্থিতিতে অত্যন্ত মর্মাহত হয়েছি। আমার আন্তরিক সহানুভূতি গ্রহণ করুন।

—এডোয়ার্ড ফেলান (ডিরেক্টর জেনারেল, আন্তর্জাতিক শ্রমিক প্রতিষ্ঠান)

—সংবাদটি এতই মর্মান্তিক যে, চিন্তা করা যায় না। তাঁর মৃত্যুর ফলে বিশ্বব্যাপী প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে। ইহা ছাড়া বর্তমানে আমি কিছুই বলতে পারি না।

—ডাক্তার ইউসুফ দাদু ( দক্ষিণ আফ্রিকা )

—মহাত্মা গান্ধীর মৃত্যু মর্মান্তিক। এতে ভারতের অপূরণীয় ক্ষতি হোল।

—জে, ডব্‌লু, গডক্রে ( দক্ষিণ আফ্রিকা )

—বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ মানবের মৃত্যুতে ভারতীয় আমরা জগদ্বাসীর সহিত শোক করছি। —ডাক্তার জি, এম, নাইকার ( নেতাল ভারতীয় কংগ্রেস)

—ভারতের মহাশোকে আমরা আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।

—উইলিয়ম ফিলিপ্‌স্ ( আমেরিকা )

—মানব-মৈত্রী ও সম্প্রীতির অন্যতম সাধক এবং দরিদ্র ও নিপীড়িত জনসাধারণের মুক্তির একমাত্র প্রতীক, যুগশ্রেষ্ঠ কর্মবীর মহাত্মা গান্ধীর অমূল্য জীবনের ভয়াবহ পরিসমাপ্তির সংবাদে মরক্কোবাসী অতিশয় মর্মাহত হয়েছে।

—আমেদ বেলাফ্রেত ( সেক্রেটারী জেনারেল, রাবাত, মরক্কো )

—হিন্দু-মুসলীম ঐক্য স্থাপনের আকাংখিত লক্ষ্যের অনুসরণে মহাত্মা গান্ধী কর্তব্যরত বীর সৈনিকের ন্যায় আত্মোৎসর্গ করেছেন।

—শ্রী পি, সি, যোশী ( কমিউনিষ্ট দল, ভারতবর্ষ )

—পাঠানদের মধ্যে 'মালংগ বাবা' নামে পরিচিত মহাত্মা গান্ধীকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয়েছে, এ নিদারুণ খবরে আমি শোকাভিভূত হয়েছি। আমি আশা করি, আমার অনুগামীগণ মহাত্মাজীর পদাংক অনুসরণ করবে এবং তিনি যে শান্তি-ব্রতে আত্মাহুতি দিলেন, তাঁর সেই অসমাপ্ত কাজ সম্পন্ন করবে।

—কাবুল উপজাতি সর্দার ( সীমান্ত প্রদেশ )

—দেশের চরম সংকটজনক সময় গান্ধিজীর মৃত্যু চরম দুর্ভাগ্যের। অদ্যকার এই ঘোর অন্ধকারের দিনে তিনিই একমাত্র আলোর দিশারী ছিলেন। তাঁর প্রেম, সত্য ও অহিংসার বাণী আমাদেরকে পরিচালিত করবে—আমি এই আশা নিয়ে আছি।

—খান আবদুল গফ্‌ফর খাঁ ( সীমান্ত )

—ভারতের ইতিহাসে ইহা সর্বাপেক্ষা মর্মান্তিক ও কলংকজনক ঘটনা। গান্ধিজীর

মৃত্যুতে পৃথিবী একজন শ্রেষ্ঠ শান্তিদূত হারালো। ...তারগণ তাদের বাপুজীকে চিরতরের মত হারালো।

—**চৌধুরী আকবর খান** ( সভাপতি, ভারতীয় কর্মচারী সংঘ )

—আমি মহাত্মা গান্ধীকে শ্রদ্ধা করতাম। আমার মনে হয় তিনি একজন মহাপুরুষ। ডিক শেফার্ড ও আমার স্বামী তাঁকে মহাপুরুষ মনে করতেন। তাঁর হৃদয় আন্তরিকতায় ও ঔদার্য গুণে পূর্ণ ছিল। ১৯৩১ সালে আমার স্বামী ইংলণ্ডে তাঁর সংগে সাক্ষাৎ করলে তিনি আমার স্বামীকে বলেছিলেন—'অস্ত্র ত্যাগে আমি সেলাম জানাচ্ছি।' তাঁর সে কথা আমি ভুলিনি। শান্তিকামী জেনারেল ক্রোজিয়ারের প্রতি মহাত্মা গান্ধীর ইহাই ছিল অভিনন্দন বাণী। যাঁরা গান্ধিজীকে জানেন, তাঁরা কখনই তাঁকে বিস্মৃত হবেন না। আর যাঁরা তাঁকে জানবার সুযোগ পাননি, তাঁরা তাঁর শ্রেষ্ঠ আদর্শের মধ্য দিয়ে তাঁকে স্মরণ রাখবে।

—**শ্রীমতী গ্রেস ক্রোজিয়ার** ( লণ্ডন )

**জল :**

—মহাত্মা গান্ধীর মৃত্যুতে আমাদের গভীর শোক জানাচ্ছি। হিন্দু, মুসলমান, খৃস্টান, পার্শী প্রভৃতি সকলের পক্ষ হতে আমরা গান্ধিজীর উত্তরাধিকারী আপনার প্রতি আনুগত্য জানাই।

—**দক্ষিণ আফ্রিকার নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ কমিটি**

—সমগ্র সমাজের শান্তির দূত মহাত্মা গান্ধীর শোচনীয় মৃত্যুতে আমাদের আন্তরিক সহানুভূতি জ্ঞাপন করছি।

—**ট্রেড ইউনিয়ন** ( ফ্রান্স )

—নেতালে তিনি যে সত্যাগ্রহ করেছিলেন, উহাই স্বদেশে সার্থকতার সহিত প্রয়োগ করেন। তিনি যেভাবে জীবনে সংগ্রাম করেছেন, সেইভাবেই প্রাণ দিয়েছেন। সমস্ত বিদ্বেষ বিস্মৃত হয়ে ঐক্যবদ্ধ ও ভ্রাতৃভাবে আমাদের আজ দাঁড়াতে হবে।

—**নেতাল ভারতীয় সমিতি**

—গান্ধিজীর হত্যা ভারত ও পৃথিবীর পক্ষে প্রচণ্ড আঘাত স্বরূপ। সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণার শাস্তি তিনি পেলেন। এই সাম্প্রদায়িকতা

সাম্রাজ্যবাদী দেশ বিভাগের সৃষ্টি। আগষ্টের সংস্কারের যে এইরূপ পরিণতি ঘটবে তা গান্ধিজী পূর্বেই আশংকা করেছিলেন। **—বৃটিশ কমিউনিষ্ট পার্টি**

**রেসিডেন্ট :**

—আমি গবর্মেণ্টের পক্ষ থেকে মহাত্মা গান্ধীর মৃত্যুতে আপনাকে ও ভারত-বাসীকে সমবেদনা জ্ঞাপন করছি। **—বৃটিশ রেসিডেন্ট** ( জাঞ্জিবার )

**রিজেন্ট :**

—মহাত্মা গান্ধীর আকস্মিক ও মর্মান্তিক জীবনাবসানে আমি অত্যন্ত শোকাভিভূত হলাম। শান্তি-প্রতিষ্ঠা ও শান্তির বাণী প্রচার করবার জন্যই তিনি জীবনধারণ করেছিলেন এবং সেই কারণেই তিনি দেহত্যাগ করলেন। আমি তাঁর বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করছি এবং বিশেষ ধর্মীয় কৃত্যাদি উদ্‌যাপন করছি। শোক-সন্তপ্ত ভারতবাসীর প্রতি আমি আমার আন্তরিক সমবেদনা ও সহানুভূতি জ্ঞাপন করছি। আশা করি আপনারা বিশ্ব-শান্তির জন্য সাধকপ্রবরের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করবেন। **—তিব্বতের রিজেন্ট**

**সেনাপতি :**

—এই সর্বজনমান্য নেতার নির্বোধ হত্যার চাইতে বর্তমান পৃথিবীর ইতিহাসে আর কোন ঘৃণিত ঘটনা দেখা যায় নাই। তাঁর আদর্শ শান্তির প্রতীক।

**—জেনারেল ম্যাকআর্থার**

**নিরাপত্তা পরিষদ :**

এক অতি শোকাবহ ঘটনা আমাদের সমস্ত চিন্তাকে সমাচ্ছন্ন করেছে। গান্ধিজীর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে সমগ্র জগৎ আজ যে ভাবাবেগে অধীর হয়েছে, তারই প্রভাবের মধ্যে আজ আমরা এখানে মিলিত হয়েছি। এই ঘটনার অর্থ সমগ্র পৃথিবীর নিকট—বিশেষ করে ভারতবাসীর নিকট কি, তা আমরা ভালভাবেই জানি। আমি নিরাপত্তা পরিষদের পক্ষ হতে একজন উন্মাদের কার্য-কলাপের ফলে যা হয়েছে ভারতবর্ষের প্রতিনিধিদের, তাঁদের গবর্মেণ্টের ও সমস্ত জাতির উদ্দেশ্যে সেইজন্য আন্তরিক সহানু-ভূতি ও সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।

গান্ধিজী জগৎকে এক মহান শিক্ষা দিয়ে গেছেন। আপন ব্রতের প্রতি এক-

খানি আন্তরিকতার পরিচয় বহু মানবের মধ্যেই বিরল। বহুবার তিনি আপনার আদর্শকে অক্ষুণ্ণ করবার প্রয়োজনে তাঁর জীবনকে আহুতি দেবার জন্য প্রস্তুত হয়েছিলেন। বহুদূরে অধিষ্ঠিত থেকেও সমগ্র জগতের সম্মুখে তিনি এক মহা আদর্শের প্রতীকরূপে উদ্ভাসিত হয়েছেন—সেই সংগেই তিনি তাঁর স্বজাতির স্বাধীনতার ও সর্বোচ্চ ও সর্বোত্তম আদর্শ ছিলেন। তিনি ভারতবর্ষকে স্বাধীন দেখে গেলেন, তাঁর দীর্ঘ জীবনের ইহা সর্বাধিক সার্থকতা। কিন্তু তিনি কেবল স্বাধীনতারই সাধক ছিলেন না—তিনি তদপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ কিছুর ধারক ও বাহক ছিলেন। তিনি অহিংসা ও সৌভ্রাত্রের সমর্থক ছিলেন, যা আমাদের এই প্রতিষ্ঠানের মূলনীতি। এইজন্যই তাঁর স্মৃতিকে আমরা চিরকাল শ্রদ্ধার সহিত বহন করবো।

তিনি ছিলেন ঐক্য, বিবেক ও সৌভ্রাত্রের প্রতীক। এইজন্যই তাঁর নাম আমাদের বিভিন্ন বিতর্কের সময় উল্লিখিত হয়েছে। আমাদের বিশ্ব-মৈত্রী ও শান্তির অনুকূল চেষ্টায় যেভাবেই হোক আমরা তাঁকে আমাদের প্রধান মিত্ররূপে গণ্য করেছি। গান্ধিজীর জীবন অবসানে তাঁর আরব্ধ কাজ শেষ হয়ে যাবে না—পৃথিবী হতে অপসারিত হয়েও তিনি দেহবিমুক্ত একটি ভাবরূপেই তাঁর জীবনাদর্শ নিয়ে চিরদিন জাগরূক থাকবেন। তাঁর স্বদেশ ও বহির্বিশ্বে যাঁরা তাঁর স্মৃতিকে সম্মান করবেন, তাঁরা—তিনি যে জন্য জীবন ধারণ করেছিলেন এবং যে কাজে জীবন উৎসর্গ করলেন, সেই মহাব্রতের প্রতি চিরদিন শ্রদ্ধাশীল থাকবেন। —**জাজানফ্** ( সভাপতি )

—মানব ইতিহাসে কোন কোন শ্রেষ্ঠ পুরুষ আততায়ীর হাতে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন। তাঁদের জীবন যে বিপন্ন, একথা তাঁরা জানতেন। কিন্তু গান্ধিজীর মত কেউই মৃত্যুর প্রতি এমন উপেক্ষার ভাব প্রদর্শন করেন নি।

**—ফিলিপ নোয়েল বেকার** ( বৃটিশ প্রতিনিধি

—সংকট ও বিরোধের কালেই সহনশীলতার প্রয়োজন সর্বাপেক্ষা বেশী। তাঁ আত্মত্যাগ পৃথিবীর মানব সমাজকে উদ্‌বুদ্ধ করবে এবং তারা দৃঢ়তার সহিত গান্ধিজী আদর্শ গ্রহণ করবে, ইহাই আমরা একান্তভাবে আশা করছি।

**—সেনেটর ওয়ারেন অষ্টিন** (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনি

—ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নেতা গান্ধিজী ভারতের ইতিহাসে গভীর প্রভ

রেখে গেছেন। স্বাধীনতা লাভের জন্য ভারতবর্ষ দীর্ঘকাল যে সংগ্রাম চালিয়েছে, তার সঙ্গে গান্ধিজীর নাম চিরদিন জড়িত থাকবে।

—গ্রামিকো ( সোভিয়েট প্রতিনিধি )

—গান্ধিজী পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ মানব ছিলেন। ফ্রান্সে এমন একজন লোকও নাই, যিনি গান্ধিজীর নাম জানেন না বা গান্ধিজীকে শ্রদ্ধা করেন না।

—তুনিল ( ফরাসী প্রতিনিধি )

—মহাত্মা গান্ধীর মৃত্যুতে এশিয়ার এক যুগ-মানবের জীবন অবসান ঘটলো।

—ডাক্তার টি, সিয়াং ( চীনের প্রতিনিধি )

—গান্ধিজীর মৃত্যু কেলমাত্র ভারতবর্ষের পক্ষেই বিপর্যয়স্বরূপ নয়। তাঁর প্রভাব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে এবং শান্তি ও স্বাধীনতা-প্রয়াসী মানুষের চিত্তে ঐক্যবুদ্ধি বৃদ্ধি করবে বলেই আমি আশা করি। —জেনারেল ম্যাকনটন ( ক্যানাডার প্রতিনিধি )

—গান্ধিজী ছিলেন বর্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ মানব। ন্যায়-বুদ্ধিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে তিনি প্রাণ বিসর্জন দিলেন। শেষ পর্যন্ত পৃথিবীর শান্তিবাদী শক্তিগুলি জয়ী হবে বলেই আমরা আশা করি। —ডক্টর জোসি অকি ( আর্জেন্টিনার প্রতিনিধি )

—গান্ধিজীর মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু তার ফলে ভারতে স্থায়ী গবর্মেন্ট প্রতিষ্ঠার কাজ ব্যাহত হবে না বলেই আমি আশা করি ও বিশ্বাস করি।

—ভাসিলি তারাসেঙ্কু ( ইউক্রেনের প্রতিনিধি )

—যিশু খৃস্টের অদৃষ্টে যা ঘটেছিল, শান্তির মূর্ত প্রতীক গান্ধিজীর অদৃষ্টেও তাহাই ঘটলো। আশা করি যে, তিনি যে বীজ বপণ করে গেছেন, উহা একদা মহীরূহে পরিণতি লাভ করবে এবং সম্মিলিত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠানের সনদকে সার্থক করে তোলার সহায়ক হবে। —ফারী এল খৌরী ( সিরিয়ার প্রতিনিধি )

**সাহিত্যিক :**

—তিনি এ যুগের একমাত্র ঋষি ও মহাপুরুষ। শুধু ভারত বা এশিয়ার মতো দেশেই আধ্যাত্মিক শক্তির বলে এতোখানি রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার করা সম্ভব।

পাশ্চাত্য জগতে এমন কোন দৃষ্টান্ত কোনো দিন দেখা যেতে পারে না, প্রাচ্য রাজনীতিতে পাশ্চাত্যের হস্তক্ষেপ কতখানি অন্যায় এই থেকেই তাদের বোঝা উচিত।

**—লিন-য়ু-তাং**

—মহাত্মা গান্ধীর মৃত্যুতে আমি মর্মাহত। আমি গান্ধীজীকে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ মানব বলে গণ্য করি। তাঁর মৃত্যুতে কেবল ভারতই নয়, সমগ্র বিশ্ব ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ভারত তার জাতীয় ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ নির্মাতাকে হারিয়েছে—হারিয়েছে মানবত্তার একজন দরদীকে। মহাত্মা গান্ধী আজীবন অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে-ছেন এবং শান্তির জন্য যথাসর্বস্ব ত্যাগ করেছেন।

**—কামিল চন্দরজী** (ইরাক)

—ভারতের ত্রাণকর্তাকে বলিদান দেওয়া হয়েছে। তিনি আর ইহলোকে নেই। ভারতবর্ষকে এই দুরপনেয় কলংকের ভার চিরদিন বহন করতে হবে। দুঃখ ও দুর্ভাগ্য-নিপীড়িত দেশবাসীর ভাগ্যে আজ যা ঘটেছে তার ন্যায় অবর্ণনীয় মর্মন্তুদ ঘটনা আর কোনও জাতির ভাগ্যে ঘটেনি। ভারতের দীপ নির্বাপিত হয়েছে—বিশ্বের পবিত্রতম আধ্যাত্মিক শক্তির চরম বিকাশের মুহূর্তে অকালে অবসান ঘটলো।

**—ডক্টর সৈয়দ হোসেন**

—তাঁর প্রদর্শিত পুণ্য-পথের তিনিই ছিলেন একক যাত্রী, তাঁর পিছনে কেউ হয়তো আসেনি, কত লোক তাঁকে ভুল বুঝেছিল। নোয়াখালির সুপুরি বাগানের পথে পথে লাঠি হাতে তিনি একাই চলেছেন সারা জীবন ধরে, কেউ নেই তাঁর সংগী অহিংস মন্ত্রের ঋষিও তিনি, ওই মন্ত্রে দীক্ষিত একমাত্র শিষ্যও তিনি। চলার পথে কতবার চেয়ে চেয়ে দেখেছেন, কেউ তাঁর পিছনে নেই, ধূ ধূ শূন্য পথ। তাঁর এ ছবিই আমরা মুগ্ধ হয়ে দেখছি, মুখের বাণী অন্তরের সায় পেয়েছে এই ছবি ভেবে।

মহাত্মা গান্ধী বিশ্ব-দেবতার হাতে লেখা একখানি এপিক কাব্য—বুদ্ধ, যি রচনার পরে কিছুদিন বিশ্রাম করবার পরে এখানাতে তিনি হাত দিয়েছিলেন।

ট্র্যাজিক পরিণতি দ্বারা এইসব মহাকাব্যকে নিখুঁৎ ক্লাইম্যাক্সে তুলবার কৌশ —সেই স্থান, কাল, মৃত্যুহীন মহাকবির নিজস্ব ধারা—আমরা কি বুঝব তাঁর টেক নিক? তবে দেখতে পাচ্ছি যে, এই টেকনিক দ্বারা তিনি তাঁর হাতের বড় ব এপিককে অমর ও চিরবরণ্যে করে রেখেছেন বিশ্ববাসীর মনে। অনন্তের সে গ্রন্থাগারের আলমারিতে তাঁর নতুন শেষ-কন্যা কাব্যখানি স্থান পেল, রক্ত-রা

অক্ষরে লেখা কাব্যের নামটি দিব্য আভায় জ্বল জ্বল করছে শত শতাব্দী পরেও।

বাপুজী! আমাদের নাবালক রেখে চলে গেলে, ওপর থেকে সর্বদা দৃষ্টি রেখো আমাদের দিকে। তোমার উপযুক্ত যেন হতে পারি—সর্বদা আশীর্বাদ করো। তোমার আশীর্বাদে সব বাধাকে আমরা জয় করবো। —বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

—ইচ্ছা হোল চীৎকার করে কাঁদি। চীৎকার করে কেঁদে ডাকি—ডাকি মহাত্মাজীর আত্মাকে ; জীবনের শেষ মুহূর্তটি পর্যন্ত কর্মের পতাকা, ধর্মের পতাকা বহন করে আততায়ীর আক্রমণকে বুকে নিয়ে সকল কর্ম শেষ করে যে আত্মা চলেছে অমৃতলোকের উদ্দেশ্যে, সেই আত্মাকে ডাকি—ফিরে এস হে পিতা, হে মহাত্মা, হে শান্ত, হে শুভ্র, হে অনন্ত পুণ্যের প্রতীক, তুমি জিতেন্দ্রিয়, তুমি জিতনিদ্র, জিতাহার, তুমি অপরাজিতা মন্ত্রের তপস্বী, তোমার পরাজয় নেই, তোমার মৃত্যু নেই, তুমি তো জিতমৃত্যু, হতে পারে না তোমার মৃত্যু, তুমি ফিরে এসো—তুমি ফিরে এসো—তুমি ফিরে এসো। —তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

হে মহাপথিক, হে মহাপথ,
হে মহাসারথি, হে মহারথ,
হে উজ্জ্বল ;
নয়ন জল
নয়নে থাক্
শুনেছি বন্ধু তোমারি ডাক,
যুগযুগান্তে যে আহ্বান
মথিয়া তুলিবে পাষাণ প্রাণ
অসাড় হৃদয়, বারম্বার!
নমস্কার।

হে মহাযুদ্ধ, হে মহাজয়,
হে মহাজন্ম, হে মহা-লয়,
হে দিকপাল ;
সকলকাল
কৃতাঞ্জলি
মহতী পূজার হে মহাবলি,
পুজিবে তোমারে আনত শির,
মহাভারতের হে মহাবীর
হে উদ্গাতা নব-গীতার
নমস্কার।

## আমাদের গান্ধিজী

হে মহাকাব্য, হে মহাকবি,
হে মহাশিল্পী, হে মহাছবি,
হে নির্ভীক ;
কোটালে ঠিক
শ্বেত কমল
রক্ত সায়রে হে শতদল !
ছন্দ গন্ধ বর্ণ রূপ
কি অপরূপ, কি অপরূপ,
নন্দিছে আলো-অন্ধকার ।
নমস্কার ।

হে মহাকর্মী, হে মহা-কাজ,
হে মহা-সেবক, হে মহা-রাজ,
জয়তু জয় ;
অশ্রু নয়
নয়কো লাজ
কেবল কাজ—তোমার ডাক
সবার হৃদয়ে ভরিয়া থাক্‌
খুলিয়া যাক সকল দ্বার ।
নমস্কার ।

হে মহাশিশু, হে মহাগুরু,
হে মহা-অন্ত, হে মহা-শুরু,
চিরন্তন,
হে মহাজন,
যুগন্ধর
পন্থাকীর্তি হে সুন্দর,
ভারত-ভারতী বীণার সুর
তোমাতে বাজাল কি সুমধুর
সত্যের জয় অহিংসার ।
নমস্কার ।

নমস্কার হে মহাকাল,
হে নীল-কণ্ঠ, চন্দ্র-ভাল
নমস্কার
বারম্বার
হে নির্ভয়,
লক্ষ লক্ষ কোটি জয়
তুচ্ছ করিয়া সব তিমির
জ্বালালে আলোক তপস্বীর
হে ধ্রুব-তারা মানবতার,
নমস্কার ।
নমস্কার ।

—বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় ( বনফুল )

## আমাদের গান্ধিজী

—আজ গান্ধিজীর চিতার অগ্নি যখন সবেমাত্র নিভিয়াছে, ধরিত্রী-মাতার যে অঞ্চল তাঁকে শেষ আশ্রয় দিয়াছিল, তার উত্তাপ তখনও সম্পূর্ণ প্রশমিত হয় নাই। সেই সন্ধিক্ষণে আমাদের বিবেচনা করিতে হইবে—প্রেয়ের পথে, চিরাচরিতের পথে আমরা গা ঢালিয়া দিব, না, দুর্জয় সাহস লইয়া সমগ্র জগতের জন্য নূতন পথ, কল্যাণের পথ সন্ধানের সংকল্প গ্রহণ করিব? চেষ্টা করা সত্ত্বেও যদি অসুর-ধর্ম আমাদের আচরণে আত্মপ্রকাশ করে, তাহাতে বিচলিত হইবার কিছু নাই। প্রশ্ন হইল, আমরা কি সেই স্রোতের নিকট আত্মসমর্পণ করিব, না, যাহাকে শ্রেষ্ঠতর, কল্যাণতর বলিয়া ব্যক্তির জীবনে উপলব্ধি করিয়াছি, সমষ্টির কর্মপ্রচেষ্টার মধ্যেও তাহাকেই প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য সংগ্রাম করিব?

আজ স্বীয় অপকীর্তির আঘাতে সজাগ হইয়া তাহাই বিবেচনা করিবার শুভক্ষণ উপস্থিত হইয়াছে, ইহা অপেক্ষা অধিক মঙ্গল আর কি হইতে পারে?

—নির্মলকুমার বসু

—জাতিকে জাগিয়ে তিনি মুক্তি দিয়েছেন, সবার জন্য ঠাঁই ক'রে দিয়েছেন দেশমাতার কোলে; দেবতার মন্দিরে, এবং ভারতের ঠাঁই ক'রে দিয়েছেন জগতের সব মানুষের সভার মধ্যে! আজ তাঁর শরীর ভস্ম হ'য়ে গেলেও জাতির সব ভাই বোনের মধ্যে তিনি জীবন্ত হ'য়ে রয়েছেন ছড়িয়ে। যে কাজ তিনি ক'রে গিয়েছেন যে কথা তিনি ব'লে গিয়েছেন জাতির প্রত্যেকটি মানুষ সেই কাজ আর কথাকে সত্য ক'রে তুলে, কি হরিজন কি অন্ত্যজন সকল জনই মহাজন হ'য়ে ভারতকে মানুষের স্বর্গ ক'রে তুলুক।

মানুষের হোক জয়।
মহামানুষ মহাত্মার জয় হোক!

—শ্রীদক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার

—পৃথিবীর ইতিহাসে এমন লোক খুব কমই দেখা যায়, যাঁরা জীবিতকালে ও মৃত্যুর পরে সমানভাবে শ্রদ্ধা ও সম্মান, ভক্তি ও ভালবাসা জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সকলের নিকট সমানভাবে লাভ করিয়া চিরস্মরণীয় হইয়া থাকেন। সেইরূপ মহামানবদের জন্ম হয় দেশ, সমাজ ও জাতির কল্যাণের জন্য। যুগে যুগে দুর্গত জনগণের পথ নির্দেশ করিতেই তাঁহারা আসেন আবার কার্যশেষে তাঁহাদের তিরোভাব হয়।

## আমাদের গান্ধিজী

মহাত্মা গান্ধী সেই শ্রেণীর মহামানবদের একজন, যাঁহার মত মহাপুরুষ সহস্র বৎসরের মধ্যে একজন পৃথিবীতে আবির্ভূত হন।...

এশিয়া মহাদেশ হইতেছে মহামানবদের জন্মভূমি। এইখানেই যীশুখৃস্ট জন্মগ্রহণ করিয়া প্রেমের ধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন। এই এশিয়াতেই আরবের মরুভূমিতে মহাপুরুষ হজরত মুহম্মদ জন্মগ্রহণ করিয়া ঊষর মরুভূমিতে প্রবর্তন করিয়াছিলেন প্রেমের ধারা, মহাসাম্যের ও ঐক্যের বাণী। অরথুষ্ট্র এশিয়ারই এক শ্রেষ্ঠ মহামানব, তাঁহার নাম কেহ কোন দিন ভুলিবে না। কনফুসিয়াসের নামও চীন দেশের ঘরে ঘরে প্রতিদিন লোকমুখে ধ্বনিত হইতেছে।...

অহিংসার পুণ্য-বাণী বুদ্ধদেবের কণ্ঠ হইতেই ধ্বনিত হইয়াছিল। এই পুণ্য ভূমিতে একে একে কত মহাজনের জন্ম হইল—নানক আসিলেন, কবীর দাদু রামানন্দ, শ্রীচৈতন্য, রামমোহন, রামকৃষ্ণ...

ইংরাজের কঠোর শাসন-নীতির নিষ্পেষণে জাতির প্রাণ যখন সঞ্জীবনী সুধার জন্য তৃষিত হইয়া উঠিয়াছিল, তখন সুধার ভাণ্ড লইয়া দেখা দিলেন মহাত্মা গান্ধী।... সে ক্ষীণকায় মানুষটির প্রভাবে চল্লিশ কোটী নরনারীর হৃদয়-বীণার তারে তারে আনন্দলহরী ধ্বনিত হইয়া উঠিত, যাঁহার কর্ম-প্রেরণায় কোটী কোটী পুরুষ ও নারী পথ চলিতে শিখিয়াছিল, যাঁহার ব্যক্তিত্ব ও নেতৃত্ব ছিল অসামান্য...

—যোগেন্দ্র নাথ গুপ্ত

—মহাত্মার বাণী দেশের লোক সর্বান্তঃকরণে পালন করলে কি হোত বলতে পারি না—তবে যতটুকু শুনেছে তাতে তার ইষ্টই হয়েছে। —কালিদাস রায়

হিমগিরি তাঁরে দিল উদারতা
ধরণী কোমল স্নেহ
মানব-প্রেমের চন্দনে ওই
চর্চিত পূত দেহ।...
কোটি হৃদয়ের অযুত বাসনা
ওই বুকে পেলো ভাষা
শিখালো বিশ্বে মানবের প্রতি
মানবের ভালবাসা।...
ভারত আত্মা জেগেছিল কোন
অমৃত মন্ত্র নাম।
প্রণাম করেছে বিশ্ব তাঁহাকে
গান্ধী দিয়েছে নাম।

—কার্তিক বন্দ্যোপাধ্যায়

## আমাদের গান্ধিজী

জগতের যত রক্ত থামাতে চলেছিল অভিযানে,
সেই অভিযান শেষ ক'রে গেলে নিজের রক্ত দানে।
দিল্লীর সেই নিধন যজ্ঞে যে ধোঁয়া উঠিল জেগে,
ভারতবাসীর মুখ হোলো কালি সেই কালো ধোঁয়া লেগে।
ঘিরি তব সমাধিরে—
যুগ যুগ ধরি কাঁদিবে মানব, গান্ধিজী এসো ফিরে।

—সুনির্ম্মল বসু

—কত রাজা, কত রাজ্য, উত্থান-পতন
কত রাজদণ্ড, আর সৌভাগ্যের গর্ব্ব-আস্ফালন
মিশাইল ধূলিতলে; সেই তুচ্ছ কাহিনী প্রাচীন
ক্ষীণ বুদ্বুদের মত কালগর্ভে হয়েছে বিলীন।
কিন্তু যেবা সত্যের পূজারী, দুঃখের সাধনা লয়ে
দুর্গম জ্ঞানের পথে বাহিরিল নিশ্চিন্ত নির্ভয়ে
মানব কল্যাণ লাগি, তুচ্ছ দেহ বিনাশিয়া তাঁর
কিম্বা তাঁরে বন্দী করি ক্ষমতার অন্ধ অহঙ্কার
প্রচারিয়া বাহুবলে কে রুধিবে তাঁর অভিযান?
মধ্যাহ্ন ভাস্বর যথা তেজস্কর জ্যোতির নিশান
উড়ায় গগনপথে মেঘরন্ধ্র করি অতিক্রম
চলি যায় সম্মুখের পানে, বন্ধু, তেমনি দুর্দ্দম
দুর্জ্জয় সত্যের গতি।
......বন্ধু, একি দুঃসহ বেদনা!
যাদের লাগিয়া ঋষি করিলেন দুঃখের সাধনা
তারাই বধিল তাঁরে। ঈশ্বরের এ কি অভিশাপ!
কিম্বা যুগ যুগান্তের মানুষের পুঞ্জীভূত পাপ
মহামানবের মাঝে এতদিনে লভিয়াছে ক্ষয়?

—বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়

**পত্র-পত্রিকা:**

—আব্রাহিম লিংকনের হত্যার পর থেকে পৃথিবীর ইতিহাসে মহাত্মা গান্ধীর হত্যার ন্যায় শোচনীয় ঘটনা আর ঘটেনি। মহাত্মাজীর মৃত্যুতে পৃথিবীর শান্তি

## আমাদের গান্ধিজী

যে-ভাবে ব্যাহত হয়েছে, সেরাজোভের হত্যাকাণ্ডের পর ... কোন ঘটনায় পৃথিবীর শান্তি এইভাবে বিপন্ন হয়নি।

পৃথিবীর ইতিহাসে এরূপ লোকের সংখ্যা বিরল। গান্ধিজীর নশ্বর দেহ বিলুপ্ত হলেও তাঁর মৃত্যু হয়নি। তাঁর মহান কার্য ও জনগণের হৃদয়ে তাঁর প্রভাব চিরস্থায়ী। পৃথিবীর ইতিহাসে তিনি চিরদিন বেঁচে থাকবেন।

গান্ধিজী কেবলমাত্র বিরাট পুরুষ ছিলেন না। তিনি ... লোক ছিলেন। বিরাটত্বের সহিত সততার এই যোগাযোগ খুব কমই পরিদৃষ্ট হয়। গান্ধিজী ভারত ও জগতের কল্যাণ ও শান্তির জন্য যে কাজ করে গেছেন, তা ধ্বংস হওয়া সম্ভব নয়।

—হার্স্ট সংবাদপত্রসমূহ (নিউইয়র্ক)

—মহাত্মাজীর মহানুভবতা সম্যক উপলব্ধি করতে হলে, আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে, যে জাতিকে তিনি গড়ে তুলেছেন তার মারফতে নয়, সর্বকালের সর্বজাতির কল্যাণকামী মানব হৃদয়েই তাঁর সন্ধান পাওয়া যাবে। আমাদের আজ এই সত্যই হৃদয়ংগম করতে হবে যে, গান্ধিজী শুধু যে মহামানব ছিলেন তা নয়, তিনি ছিলেন সমগ্র বিশ্বের এমন এক বিরাট ধর্মপ্রাণ পুরুষ, পাশ্চাত্য দেশ যুগ যুগ ধরে যাঁর সন্ধান দিতে পারেনি।

আমাদের অভিজ্ঞতার মাপকাঠিতে আমরা যদি গান্ধিজীর বিচার করতে যাই, তাহলে আমরা হয়তো তাঁর মহত্ত্বকে ছোট করে দেখবো, এবং ... করে তাঁর দুর্বলতার সন্ধান করতে গেলে বর্তমান যুগের রাজনীতির পরিমাপে হয়তো তাঁর অমর্যাদা করে বসবো।

—লাইফ (আমেরিকা)

—গান্ধিজীর মৃত্যু ভারতের একার ক্ষতি নয়। যে দুরাত্মা তাঁকে হত্যা করেছে সে গান্ধিজীর সকল সদ্‌গুণকেই অস্বীকার করে এই নিষ্ঠুর কাজ করেছে। কিন্তু এই ক্ষতির মধ্যেও আশার আলো রয়েছে।

হয়তো ইহা দ্বারা ভারতের সকল বৈষম্য নির্মূল হবে। এখন নেতৃবৃন্দের উচিত সকল হতাশা ত্যাগ করে ভারত ও পাকিস্তানের অর্জিত স্বাধীনতাকে বাস্তব রূপ দেবার জন্য অধিকতর প্রেরণার সহিত কাজ করা। আমরা আশা করি, দেশবাসী গান্ধিজীর মহান আদর্শকে বাস্তবে রূপায়িত করার কাজে আত্মনিয়োগ করবেন।

—বাল্টিমোর সান (আমেরিকা)

—পৃথিবীর লাখ লাখ ধর্মগুরুগণের মধ্যে গান্ধিজীও একজন ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর প্রতিক্রিয়া স্বরূপ তাঁর আরব্ধ কার্য আপনিই সমাপ্ত হবে বলে আশা করা যায়।

**—সানফ্রানসিস্‌কো ক্রনিক্‌ল্‌** (আমেরিকা)

—গান্ধিজী ভারতের একজন সাধুসন্ন্যাসী বলে পরিচিত ছিলেন। এখন তিনি শহীদের সম্মান লাভ করলেন।

**—নিউইয়র্ক ডেলি নিউজ** (নিউইয়র্ক)

—মুসলমানগণ তাদের একজন হিন্দু বন্ধুকে হারিয়েছে। গান্ধিজী মানবজাতিকে ভালবাসতেন। হিন্দু-মুসলমান তাঁর কাছে সমান প্রিয় ছিল।

**—নিউইয়র্ক ডেলি মিরর** ( নিউইয়র্ক )

—মহাত্মা গান্ধী ভারত-পাকিস্তান মৈত্রী স্থাপনের দ্বারা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার নিরাপত্তা বিধান ও পৃথিবীর শান্তি স্থাপনের পথ প্রদর্শন করতে চেয়েছিলেন।

ভারত ও পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দ গান্ধিজীর প্রদর্শিত পথে দুই ডোমিনিয়নের মধ্যে মীমাংসা সাধন করতে পারবেন। উভয় ডোমিনিয়নে যে শোকোচ্ছ্বাস দেখা দিয়েছে ইহাও খুব সুলক্ষণ।

উগ্র সাম্প্রদায়িকতা ও দেশে হিন্দুরাজ প্রতিষ্ঠার বিরোধিতা করায় একজন ঘাতকের হাতে গান্ধিজীর মৃত্যু হয়েছে। তিনি যে আদর্শ দেখিয়ে গেছেন তদ্দ্বারা উভয় ডোমিনিয়নে এবং সমগ্র জগতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এখন হইতেই এই কাজে অগ্রসর হওয়া প্রয়োজন।

**—লণ্ডন টাইম্‌স্‌** ( লণ্ডন )

—গান্ধিজী নিহত হওয়ার প্রতিক্রিয়া দেখবার জন্য জগৎ আকুল প্রতীক্ষায় আছে। গান্ধিজীর মৃত্যুতে হয়তো ঈশ্বর-প্রেরিত মহাপুরুষের দ্বারা জগতের যে মংগল হয়েছিল, তাও হতে পারে। কিংবা ইহা দ্বারা হিন্দু চরমপন্থীগণ অধিকতর শক্তিলাভ করতে পারে।

**—সান্‌ডে টাইম্‌স্‌** ( লণ্ডন )

—ভারত ও পাকিস্তানের সৌহার্দ্য স্থাপনের জন্যই মহাত্মা গান্ধীর জীবনাবসান ঘটেছে। আশা করা যায় যে, দেশের এই ঐতিহাসিক দুর্ঘটনা ভারতের এবং পাকিস্তানের শান্তি ফিরিয়ে এনে মহাত্মার মৃত্যুকে সার্থক করবে।

**—ইয়র্কসায়ার পোষ্ট** ( লণ্ডন )

## আমাদের গান্ধিজী

—এই সংবাদ বিশ্ব-মানবের প্রতি কঠোর আ[illegible] হেনেছে। ভারতের নেতৃবৃন্দ দেশে শান্তি আনতে পারলে মহাত্মার মৃত্যু সার্থক হবে এবং দেশ স্বাধীনতার প্রকৃত গৌরব অর্জন করবে। **—ডেলি ওয়ার্কার** ( লণ্ডন

—দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি জীবন দান করেছেন। তাঁর এই আত্মত্যা[illegible] সফল হবে কিনা, এখনও ঠিক করে বলা যায় না। **—ডেলি হেরাল্ড** (লণ্ডন

—তাঁর মহান আত্মা চিরকাল তাঁর দেশবাসীর মধ্যে প্রতিফলিত হতে থাকবে। **—টেলিগ্রাফ** ( বৃটিশ অধিকৃত জার্মানী

—এই হত্যাকাণ্ডের তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেবার খুবই সম্ভাবনা আছে। **—ডয়েট্‌ল্যাণ্ড** ( সোভিয়েট অধিকৃত জার্মানী

—মহাত্মা গান্ধী নিহত হওয়া ভারতের চরম দুর্ভাগ্য এবং দেশে ইহার তী[illegible] প্রতিক্রিয়া দেখা দিবে। **ভারবার্ণ** ( জেনেভা

—নির্যাতিত মানবতার এই জীবন্ত প্রতীক রাজনৈতিক [illegible]ত্ততার নিকট প্রা[illegible] বিসর্জন দিলেন। **—সবোডনে নভিনি** [illegible] চেকোশ্লোভাকিয়া

—মহাত্মা গান্ধীর হত্যাকারী নিশ্চয়ই যুদ্ধে যোগদান করেছিল। **—ডিয়ারিও দামানা** ( পর্তুগাল

—স্বাধীনতা ও নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের অগ্রদূতের মৃত্যু হোল। গান্ধিজীর মধ[illegible] দিয়ে ভারতের আশা-আকাংখা মূর্ত হয়ে উঠেছিল। **—এল কমার্সিও** (পেরুভিয়া

—মানুষ কতদূর কৃতঘ্নতা ও সংকীর্ণতার নীচে নেমে যেতে পারে, তা ভারতে[illegible] সর্বশ্রেষ্ঠ স্বদেশভক্ত ও ঐক্য বিধায়ক মহাত্মা গান্ধীকে হত্যা করায় দেখা গেল। **—আলকোৎলা** ( মিশর

—সারা বিশ্বে দীর্ঘকাল যাবৎ গান্ধিজীর অভাব অনুভূত হবে। মহাত্মা গা[illegible]

স্বদেশের মুক্তি-সংগ্রামে জগৎকে বিস্মিত করেছিলেন, একথা হয়তো ভাবীকালের মানুষ বিশ্বাস করতে চাইবে না।

—**ডেমোক্র্যাট ইরাণ** (ইরাণ)

—নব বিভক্ত ভারতের শান্তি প্রতিষ্ঠায় যখন মহাত্মা গান্ধী তাঁর বিরাট ব্যক্তিত্বের প্রভাব বিস্তার করছিলেন, সেই সময় আততায়ীর হস্তে তাঁর জীবনের অবসান ঘটলো। পৃথিবীর ইতিহাসে আর কখনও এরূপ উন্মত্ততা ও নৃশংসতা দেখা যায় না।

বর্তমান বিশ্বে মহাত্মা গান্ধীই সম্ভবতঃ একমাত্র মহাপুরুষ—বর্তমান জাতীয়তাবাদ ও রাজনীতি ক্ষেত্রেও তিনি মহামানবস্বরূপ। দরিদ্র ও নিপীড়িতদের সহিত একাত্মা হয়ে দীর্ঘকাল থাকা, অনাড়ম্বর ও নিঃস্বার্থ জীবন, কুসুমাদপি কোমল ও বজ্রাদপি কঠোর চরিত্র, ব্রত পালনের জন্য তাঁর কঠোর তপশ্চর্যা, বিরোধ সংকীর্ণতা ও অসত্যাচারণের প্রতি তাঁর উপেক্ষা, জাতিভেদ শ্রেণীভেদ ধর্মভেদ ও বর্ণভেদের মধ্যে সমন্বয় সাধনে ঐকান্তিক শান্তি প্রচেষ্টা ও আধ্যাত্মিক জীবনের নির্দেশদান, সর্বোপরি অহিংসা মতবাদ প্রচার—এই সকল জীবনের ও ব্যক্তিত্বের দিক দিয়া তিনি মহাপুরুষ ছিলেন।

—**ষ্টেট্ টাইম্স্** (সিংগাপুর)

—গান্ধিজী প্রাচ্য দেশকে আত্মসম্মান ও মর্যাদাবোধ শিক্ষা দিয়েছেন। গান্ধিজী ভারতে জন্মগ্রহণ করলেও তিনি সমগ্র বিশ্বের—সমগ্র মানবতার

—**সিংহল টাইম্স্** (সিংহল)

—পৃথিবীর ইতিহাসে মহাত্মাজী শ্রেষ্ঠ বীর বলে পরিগণিত হবেন। গৌতম বুদ্ধের পর মহাত্মা গান্ধী ছাড়া আর কেউ জনগণের নিকট হতে এত সম্মান লাভ করেনি।

—**নিউ লাইট অফ্ বর্মা** (ব্রহ্মদেশ)

—মহাত্মা গান্ধীর জীবদ্দশাতেই বুঝা গিয়েছিল যে, তাঁর অনুচরদের মধ্যে অনেকেই যে তাঁকে শুধু ঋষি বলে মনে করেন, তা নয়, তাঁকে এক নতুন ধর্মের প্রবর্তক বলে মনে করেন। এখন তাঁর এই অন্তিম ত্যাগের ফলে তাঁর মতবাদ ধর্মের পর্যায়ে উন্নীত হবে এবং মহাত্মাজী অন্যায় ও পাপের হাত থেকে এবং এক জাতির হাতে অন্য জাতির দাসত্ব থেকে মানবজাতির পরিত্রাতা বলে পরিগণিত হবেন।

—**বার্মিজ রিভিউ** (ব্রহ্মদেশ)

## আমাদের গান্ধিজী

—মহাত্মা গান্ধী আর ইহলোকে নেই। বিশ্ববাসী আর তাঁকে দেখতে পা
না, আর তাঁর কণ্ঠনিঃসৃত বাণী শুনতে পাবে না। গত কয়েক মাস ধরে গান্ধিজ
তাঁর দেশবাসীর জন্য তাঁর দেহ ও আত্মা উৎসর্গ করেছিলেন। তাঁর দেহ ও আত
প্রেম ও সত্যের প্রতীকরূপে চিরকাল বিরাজ করবে।

বর্তমান ভারতের শ্রেষ্ঠ মানব আততায়ীর গুলিতে নিহত হয়েছেন। সা
ভারতে যে মহাপুরুষের বাণী সর্বাপেক্ষা অধিক ফলপ্রসূ ছিল, তাঁর বাণীই আজ নিস্ত
হোল। মহাত্মার হত্যাকারী নরাধমই কেবল এই কসাইসুলভ অপকর্মের জন্য দা
নয়। এই পাপাত্মার সহযোগী কারা—এই প্রশ্নের উত্তর খুবই সহজ। যাদের কা
কলাপের সংগে এই দুরাত্মার কার্যকলাপের সাদৃশ্য রয়েছে, তারা প্রত্যেকেই
হত্যাকাণ্ডের জন্য দায়ী।

ভারত ও পাকিস্তান গান্ধিজীর মৃত্যুতে যারপরনাই ক্ষতিগ্রস্ত হোল। আ
আশা করি, এই ঘটনা থেকে দেশবাসী সাবধান হবে এবং মহাত্মার আত্মাহুতির ফ
লাখ লাখ প্রাণ রক্ষা পাবে। আজ আমরা আশা করি, ভারত ও পাকিস্তানের হি
মুসলমান একসংগে শহীদের জন্য অশ্রু বিসর্জন করে দুই স্বাধীন রাষ্ট্রের শান্তি অ
রাখতে আত্মনিয়োগ করবে। —**পাকিস্তান টাইমস** (লাহো

—মহাত্মা গান্ধী তাঁর জীবনের শেষ সময় নির্ভীকতার সংগে ভারতের মুসল
সংখ্যালঘুদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। এরূপ একটী মহৎ জীবনের মর্মা
সমাপ্তিতে কেবল ভারতের মুসলমানেরাই নয়, পাকিস্তানের সকল মুসলমান
বেদনায় মাথা নত করছে।

গান্ধিজীর 'করেংগে' প্রতিজ্ঞা সফল হোল না, অতএব নিজের জীবনের মূল্য
তাঁকে নিজের অংগীকার পূরণ করতে হোল। তাঁর নিজের কথায় তিনি গৌরব
মুক্তিলাভ করেছেন। কিন্তু ইতিহাসের সাক্ষ্য এই যে, মহান ব্যক্তি জীবিত
যা করতে পারেন নাই, মৃত্যুর পরে তা সম্পন্ন করেছেন। —**ডন** (ক

---

# সন্ধানী

## আমাদের গান্ধিজী

—ম্যারিনা স্পিনাবেবেজ
—প্রেসিডেণ্ট, স্থইস কনফেডারেশন
—প্রেসিডেণ্ট লেবানন
—জে, কে, পাসিকিভি
—রাজা ষষ্ঠ জর্জ ও রাণী
—রাজা ফারুক
—রাজা হেইলে সেলাসী
—রাজকুমার, কেউয়া ও হাওয়াই
—দালাই লামা
—সম্রাট হিরোহিতো
—ক্লিমেণ্ট এটলি
—রবার্ট শুম্যান
—প্রধান মন্ত্রী, পর্তুগাল
—ঐ ফিনল্যাণ্ড
—ঐ আফগানিস্থান
—হ্যান্স হেডফট
—ম্যাকেঞ্জি কিং
—হাসিসি
—তেৎস্থ কাতায়ামা
—জেসফ চিফলি
—নোকরশী পাশা
—শ্রীসেনানায়ক
—থাকিন স্থ
—কাউণ্ট স্ফারজা
—পররাষ্ট্র সচিব—ব্রেজিল
—উ-টিন টাট
—আর্ণেষ্ট বেভিন
—পররাষ্ট্র সচিব, নরোয়ে

—জর্জ বিদো
—জর্জ মার্শাল
—মঁশিয়ে বারেঁা
—লাটসাহেব, সিংহল
—লাট সাহেব, সিয়েকেলিস
—বড়লাট, স্থদান
—জিন্না
—ডক্টর জোসেফ ডেভিড
—প্রে[illegible]ণ্ট তুরস্ক পরিষদ
—হার্বার্ট মরিসন
—এ, ভি, আলেকজাণ্ডার
—লর্ড পেথিক লরেন্স
—লর্ড লিষ্টওয়েল
—লিওপোলড আমেরী
—উইনষ্টন চার্চিল
—স্যার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্‌স
—মঁশিয়ে লিঁয় ব্লুম
—ডাক্তার খান[illegible]হেব
—লর্ড লিনলিথগো
—লর্ড হ্যালিফ্যাক্‌স্‌
—আর জি কেসী
—জেনারেল স্মাট্‌স্‌
—ইমন ডি ভেলেরা
—মিসেস রুজভেল্ট
—ডক্টর চু চিয়া হুয়া ও ডক্টর তাই চি তাও
—আগা খাঁ
—ডক্টর হিউলেট জনসন
—মিষ্টার ল্যাজারাস
—ষ্ট্যান্‌লি জোন্‌স

—রেজিন্যাল্ড সোরেনসেন
—নাহাশ পাশা
—আজম পাশা
—রজনী পাম দত্ত
—ডক্টর মোহম্মদ হাতা
—এডোয়ার্ড ফেলান
—ডাক্তার ইউসুফ দাদু
—জে, ডবলু গডফ্রে
—ডাক্তার জি, এম নাইকার
—উইলিয়ম ফিলিপ্‌স্‌
—আমেদ বেলাফ্রেত
—পি সি যোশী
—কাবুল উপজাতি সর্দার
—খান আবদুল গফফর খাঁ
—চৌধুরী আকবর খান
—শ্রীমতী গ্রেস ক্রোজিয়ার
—দক্ষিণ আফরিকা নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ কমিটি
—ট্রেড ইউনিয়ন
—নেতাল ভারতীয় সমিতি
—বৃটিশ কমিউনিষ্ট পার্টি
—বৃটিশ রেসিডেন্ট
—তিব্বতের রিজেন্ট
—জেনারেল ম্যাক আর্থার
—লাজানফ
—ফিলিপ্‌ নোয়েল বেকার
—সিনেটর ওয়ারেন অষ্টিন
—গ্রামিকো
—তুনিল
—ডাক্তার টি সিয়াং
—জেনারেল মাকনটন
—ডক্টর জোসি অকি
—ভাসিলি তারাসেস্কু
—ফারী এল খৌরী
—লিন উ তাং
—কামিল চন্দরজী
—ডক্টর সৈয়দ হোসেন
—বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
—তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
—বলাইচাদ মুখোপাধ্যায়
—নির্মলকুমার বসু
—দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার
—যোগেন্দ্র নাথ গুপ্ত
—কালিদাস রায়
—ফটিক বন্দ্যোপাধ্যায়
—সুনির্মল বসু
—বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়
—হার্ষ্ট সংবাদপত্র সমূহ
—লাইফ
—বালটিমোর সান
—সানফ্রানসিস্‌কো ক্রনিকিল্‌
—নিউইয়র্ক ডেলি নিউজ
—ঐ ঐ মিরর
—লণ্ডন টাইমস্‌
—সানডে টাইমস
—ইয়র্কসায়ার পোষ্ট
—ডেলি ওয়ার্কার
—ঐ হেরাল্ড
—টেলিগ্রাফ
—ডয়েটল্যাণ্ড
—ডারবার্ণ

যে সব বই থেকে সাহায্য নিয়েছি :

মহাদেব দেশাই অনূদিত 'অটোবায়োগ্রাফি'

সতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত অনূদিত 'দক্ষিণ আফরিকায় সত্যাগ্রহ'

ডকটর পট্টভি সীতারামিয়া লিখিত 'হিষ্ট্রি অফ্ কংগ্রেস'

সতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত অনূদিত 'স্বাস্থ্যরক্ষা'

ফ্রেণ্ড্স্ এণ্ড ফো সম্পাদিত 'এম, কে, গান্ধী'

সতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত অনূদিত 'য়েরোড়া জেলের অভিজ্ঞতা'

রোমাঁ রোলাঁ লিখিত 'মহাত্মা গান্ধী'

কৃষ্ণদাস লিখিত 'গান্ধিজীর সঙ্গে সাতমাস'

মহাদেব দেশাই লিখিত 'সিংহলে গান্ধিজী'

যোগেশচন্দ্র বাগল লিখিত 'মুক্তির সন্ধানে ভা...

হেমেন্দ্রলাল রায় অনূদিত 'বিলাতে গান্ধিজী'

বি, সেনগুপ্ত ও আব চৌধুরী সম্পাদিত 'মহাত্মা গান্ধী'

হেমেন্দ্রলাল রায় অনূদিত 'বিলাতে ভারতের দাবী'

প্যারীলাল লিখিত 'এপিক ফাষ্ট'

সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন সম্পাদিত 'গান্ধিজী জয়ন্তী'

হিন্দুস্থানী তালিমী সংঘ কর্তৃক প্রকাশিত 'বেসিক ন্যাশ ন্যাল এডুকেশন'

লুই ফিশার লিখিত 'গান্ধিজীর সঙ্গে সাতদিন'

প্রভাত বসু লিখিত 'গান্ধিজীর গল্প'

যোগেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় লিখিত 'মহাত্মা গান্ধী'

বিজয়ভূষণ দাশগুপ্ত লিখিত 'মহামানব মহাত্মা'

রমণী রঞ্জন গুহরায় লিখিত 'মহাত্মা গান্ধী'

মহীতোষ রায় চৌধুরী লিখিত 'গান্ধিজীর তিরোধানে'

গোপালচন্দ্র রায় লিখিত 'মহাত্মা গান্ধীর শান্তি অভিযান'

সুকুমার রায় লিখিত 'সীমান্ত গান্ধী'

মুবারক সিং লিখিত 'মহাত্মা গান্ধীজ্ কনফেসন'

দুর্লভ সিং লিখিত 'রিবেল প্রেসিডেন্ট'

হরিপদ চট্টোপাধ্যায় লিখিত 'গান্ধিজীকে জানতে হলে'

কৃষ্ণা হাথিসিং লিখিত 'কোন খেদ নাই'

ঋষি দাস লিখিত 'আবুল কালাম আজাদ'

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখিত 'মহাত্মা গান্ধী' ও 'সঞ্চয়িতা
আর, এন, খান্না লিখিত 'গান্ধিজীস্ ফাইট ফর ফ্রীডম্'
সুকুমার রায় লিখিত 'নোয়াখালিতে মহাত্মা'
কামাক্ষী প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় সঙ্কলিত 'মহাত্মা'
শৈলেশ বসু লিখিত 'মহামানব'
কংগ্রেস সাহিত্য সংঘ কর্তৃক প্রকাশিত 'তুমি মহাত্মা'
তেণ্ডুলকার, চলাপতি রাও, মৃদুলা সরাভাই ও বিঠলভাই ঝাভেরী সম্পাদিত 'গান্ধিজী'
হেমেন্দ্র নাথ দাসগুপ্ত লিখিত 'দেশবন্ধু স্মৃতি'
সুরেন্দ্রচন্দ্র ধর লিখিত 'দেশপ্রিয় যতীন্দ্র মোহন'
কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখিত 'শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃত'
ক্ষিতিমোহন সেন লিখিত 'দাদূ'
খাদি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রকাশিত 'আশ্রম ভজনাবলী'
রাষ্ট্রভাষা প্রচার সমিতি কর্তৃক প্রকাশিত 'নেতাওঁকী কলমসে'
ধম্মপদ
শ্রীমৎভগবদ্গীতা
হরিজন পত্রিকা
শনিবারের চিঠি—গান্ধী সংখ্যা
মাসিক বসুমতী—গান্ধী সংখ্যা
সাপ্তাহিক দীপালী
সাপ্তাহিক দেশ
দৈনিক যুগান্তর
আনন্দ বাজার পত্রিকা
কিশোর এশিয়া

**নানাভাবে যাঁরা সাহায্য করেছেন :**

ছাপার কাজে : 'মাসপয়লার' সম্পাদক ক্ষিতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য
দীপালীর সম্পাদক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
ছবি সম্পর্কে : 'নূতন পত্রের' সম্পাদক সুখেন্দুবিকাশ সেনগুপ্ত
'শিশুসাথীর' হরিশরণ ধর
মানচিত্র সম্পর্কে : শিল্পী পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী
সন্ধানী সংকলন করেছেন : সন্তোষকুমার মাজি
গান্ধিজীর বাণী প্রকাশের অনুমতি দিয়েছেন : নবজীবন ট্রাষ্ট্রের কর্তৃপক্ষ
রবীন্দ্রনাথের বাণী প্রকাশের অনুমতি দিয়েছেন : বিশ্বভারতীর কর্তৃপক্ষ

—এঁদের সকলের কাছেই লেখক কৃতজ্ঞ।

mkgandhi

গান্ধিজীর পিতা করমচাঁদ

গান্ধিজীর জন্মস্থান

দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়-এম্বুলেন্স বাহিনী

ডারবান থেকে প্রিটোরিয়া

টলষ্টয় ফার্মে গান্ধিজী
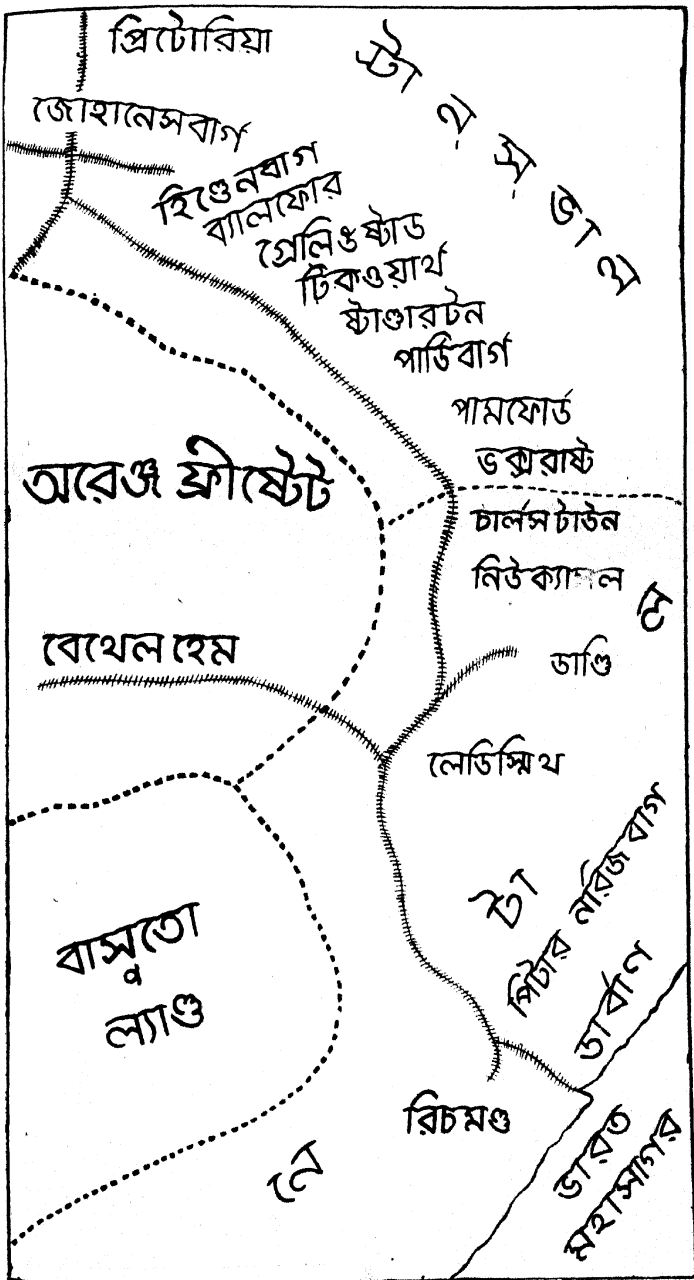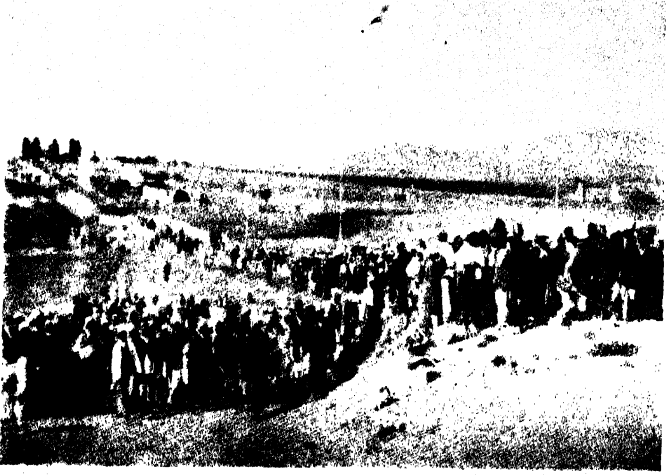
দক্ষিণ আফ্রিকার সত্যাগ্রহ অভিযান

গান্ধিজীর গ্রেপ্তার

শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রসকাশে

Dear Mr Gandhi,

That you could think of my school as the right and the likely place where your Phoenix boys could take shelter when they are in India has given me real pleasure — and that pleasure has been greatly enhanced when I saw those dear boys in that place. We all feel that their influence will be of great value to our boys and I hope th[illegible] they in their turn wi[illegible] gain something which will make their stay in Shanti Niketan fruitful. I write this letter to thank you for allowing your boys to become our boys as well and thus form a living link in the _sādhanā_ of both of our lives.

Very sincerely yours
Rabindranath Tagore
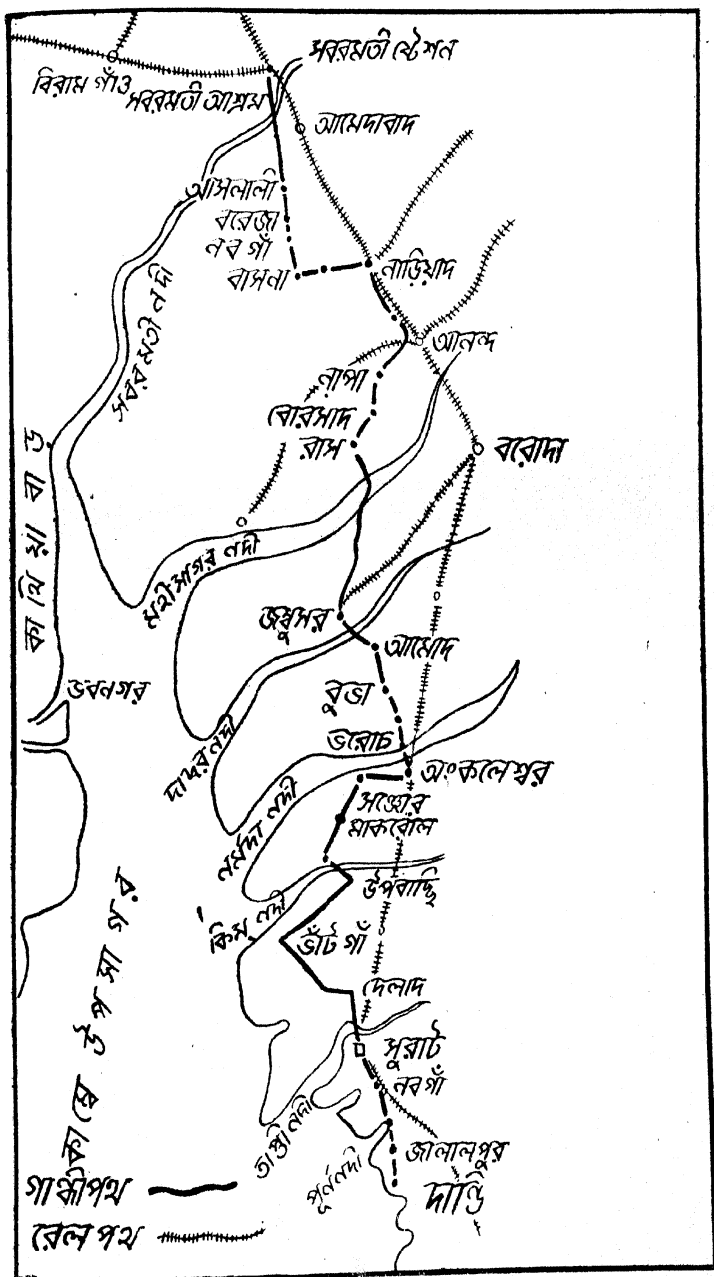
সবরমতীর থেকে দাণ্ডির সমুদ্র তীর

সেবাগ্রাম আশ্রম

To the people of Midnapore dist.
I have made myself
acquainted with your condition
to the extent it was possible
without a local visit. I
tender my congratulations
for your courage and patience
with which you have borne
your sufferings. Out of such
sufferings will be born
a new nation pulsating
with life. Earthly possessions
are no compensation for loss
of liberty. It is a matter of
joy that you have preferred
deprivation of these to
that of your liberty. I hope
you will not neglect the duty
of manufacturing free
salt

Allahabad M K Gandhi
2 . 2 . 31

মেদিনীপুরবাসীর প্রতি বাণী

দাণ্ডি-অভিযান

রাজপুতানা জাহাজের শিশু বন্ধু

৬২ বৎসর বয়সে

চার্লি চ্যাপলিন ও মহাত্মা গান্ধী
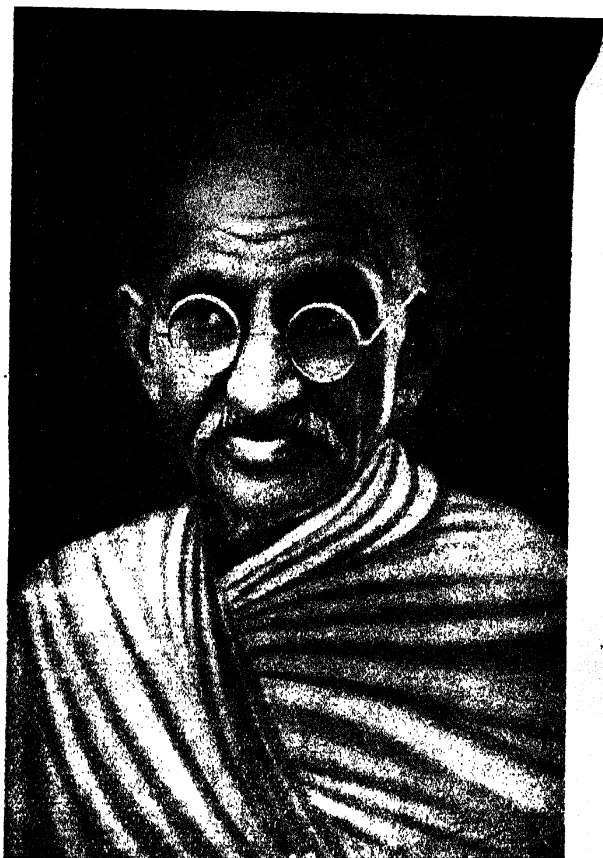
মহাদেব দেশাই ও গান্ধিজী :

গান্ধিজী ও সুলতান সারিয়ার

গান্ধিজী ও থাকিনন্

গান্ধিজী ও চিয়াং কাইসেক

গান্ধিজী ও লর্ড পেথিক লরেন্স

গান্ধিজী ও মাউণ্টব্যাটেন

গান্ধিজী ও সুভাষচন্দ্র

রামধুন গাহিতে গাহিতে গান্ধিজী বাঁশের সাঁকো পার হইতেছেন

নোয়াখালির- প্রভুভক্ত কুকুর ও গান্ধিজী
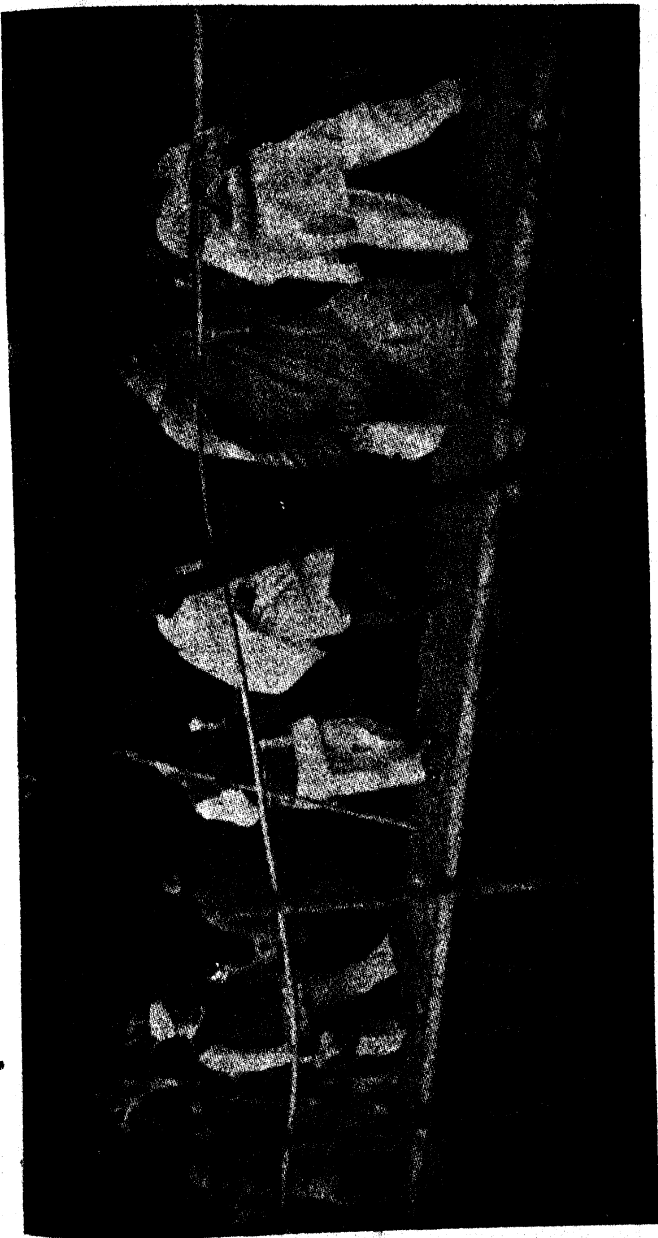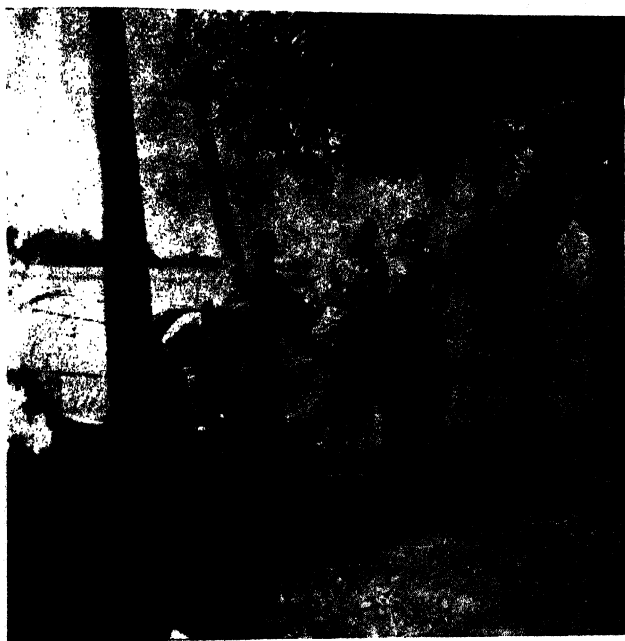
সুচেতা কৃপালনী, সতীশ চন্দ্র দাসগুপ্ত, পিয়ারীলাল
আভাগান্ধীর সহিত রামগঞ্জের নৌকাঘাটে

নোয়াখালির পথে

নোয়াখালির কিশোর বন্ধু

নোয়াখালির জঙ্গলীপথ

বিশকাটালি
বিরামপুর
আলুনিয়া
দেবীপুর
পশ্চিম কেরোয়া
পূর্ব কেরোয়া
রায়পুরা
হামচাদী
বিজয়নগর
নন্দীগ্রাম
প্রসাদপুর
ধর্মপুর
শ্রীনগর
সাধুরখিল
সাতঘরিয়া
আমষাপাড়া
মসিমপুর
চণ্ডীপুর
শ্রীরামপুর
ফতেপুর
জগতপুর
দাসপাড়া
লামচর
করপাড়া
সাহাপুর
ভাটিয়ালপুর
নারায়ণপুর
রামদেবপুর
পরকোট
বাদলকোট
আতাখোরা
শিরণ্ডী
কেথুরি
পানিয়ালা
মুরাইম
হীরাপুর
পাল্লা
পাঁচগাও
জয়াগ
লাকসা
ফ রি দ গ
র া য় পু র
ল ক্ষ্মী পু র
রিক্রমা
নোয়াখালির মানচিত্র